কেশব-চরিত

"যো মাং পশ্যতি সর্ব্বত্র সর্ব্বঞ্চ ময়ি পশ্যতি।
তস্যাহং ন প্রণশ্যামি স চ মে ন প্রণশ্যতি॥"

(ভগবদ্গীতা)

স্বর্গীয় চিরঞ্জীব শর্ম্মা কর্ত্তৃক
বিরচিত

তৃতীয় সংস্করণ

ভট্টাচার্য্য এণ্ড সন্

কলিকাতা, ঢাকা ও ময়মনসিংহ

মূল্য ১।৹ [illegible]

ভূমিকা

আগে আগে মনে করিতাম, প্রাচীন মহাত্মাদিগের জীবনপ্রতিমা ভূতকালের গর্ত্ত হইতে উত্তোলন করা বড় কঠিন কার্য্য; কিন্তু এখন দেখিতেছি, যাঁহার সঙ্গে এত কাল সহচর অনুচর হইয়া ছিলাম, এবং যাঁহার অন্তরের ভাব অনুভব এবং বাহিরের কার্য্য দর্শন করিলাম, তাঁহার জীবনচরিত রচনা করা আরো কঠিন। পুরাকালের বিষয়ে যতটা স্বাধীনতা চলে, ইহাতে তাহা চলে না। এখানে আর কোন প্রকার কল্পনার সাহায্য পাওয়া যায় না। স্বপক্ষদিগের প্রগাঢ় অনুরক্তি, বিপক্ষ-[illegible]শেষ বিরক্তি, ইহারই মধ্যস্থলে দাঁড়াইয়া আমি প্রকৃত তত্ত্ব [illegible] করিয়াছি। যখন যখন মনের মধ্যে উচ্চ ধর্ম্মের আবির্ভাব হয়, [illegible] আত্মা যোগানন্দরসে মজে, হৃদয় ভক্তি প্রেমে মাতে, চিত্তে বৈরাগ্যের [illegible]লে, তখনই কেবল কেশবচরিত্রের গৌরব এবং স্বর্গীয় প্রভাব [illegible] উপলব্ধি করিতে পারি। বাস্তবিক এ চরিত্র অতি অদ্ভুত। [illegible] নিদ্রিত মনোবৃত্তি সকল জাগিয়া উঠে, প্রাণের মধ্যে যেন [illegible] জ্বলিতে থাকে। অগ্নিস্বরূপ কেশবাত্মার মহত্ত্ব এবং উচ্চ [illegible]লোচনা করিলে আশা ও বিশ্বাসে বক্ষ প্রসারিত হয় এবং হৃদয় [illegible]র সীমা অতিক্রম করিয়া মহাকাশে উড়িতে থাকে। কিন্তু [illegible] কি হইবে? ভাবতরঙ্গে প্রাণ মন ভাসিয়া যায়, বাহিরে তাহার [illegible] অবস্থা প্রকাশ করিতে পারি না। অদৃশ্য বিচ্ছেদাশ্রু কেবল [illegible] কবিতা চিত্তপটে অঙ্কিত করিতে পারে। ভাবিতে গেলে [illegible]তে পারি না। আবার লিখিতে গেলে ভাব রাখিতে পারি না। তবে সুবিধার বিষয় এই, তাঁহার জীবনক্রিয়া তদীয় মুখের বক্তৃতা,

উপদেশে এবং হস্তের রচনায় অনেকের চক্ষু কর্ণের বিবাদ ভঞ্জন করিয়া দিয়াছে। সুতরাং এ স্থলে ব্যক্তিগত অন্ধানুরক্তি বা কল্পনা-শক্তির সাহায্য না লইয়াও যথার্থ বিষয়ের অনুসরণ করা একেবারে অসম্ভব নহে। যে শক্তির সাহায্যে কেশবচন্দ্র সকল স্থান হইতে সার গ্রহণ করিতেন, সেই নববিধানরূপিণী পবিত্রাত্মা মহাশক্তিদেবী আমার প্রতি সর্ব্বদা প্রসন্ন থাকুন! এক দিকে তাঁহার মানবীয় সাধারণ জীবন, অপর দিকে তাঁহার বিশেষ ভারপ্রাপ্ত স্বর্গাভিমুখী দেবচরিত্র। সাময়িক অসার অনিত্য ঘটনাপুঞ্জের ভিতর দিয়া শ্রীমৎ ব্রহ্মানন্দের জীবনপ্রবাহ যে দিকে দিবানিশি প্রধাবিত হইত, কোন প্রতিবন্ধক মানিত না, সেই পথ অনুসরণপূর্ব্বক আমি তাঁহার মহচ্চরিত্র বর্ণনে প্রয়াস পাইয়াছি।

কেশবচরিত্র পূর্ব্বকালের প্রাচীন মহাপুরুষোত্তমদিগে[illegible] অনেক বিস্তৃত স্থান অধিকার করিয়াছিল। ইহা মহা[illegible] প্রশস্ত এবং গভীর। বিচিত্রতায় ইহা অনুপম। পৃথিবী[illegible] এমন কোন বিষয় নাই, যাহার সহিত কেশবের সম্বন্ধ [illegible] ভবিষ্যৎ, ব্যক্ত অব্যক্ত, ইহলোক পরলোক, ভূলোক এ[illegible] সমস্তই তাঁহার চিন্তা কল্পনা বিচার সমালোচনার মধ্যে [illegible] করিত। এত বড় প্রশস্তমনা গভীরাত্মা মহাপুরুষের স[illegible] এবং কার্য্যকলাপ যথাযথরূপে লিপিবদ্ধ করা যে আমার [illegible] সামান্য ব্যক্তির পক্ষে অত্যন্ত কঠিন কার্য্য, তাহা আর কা[illegible] বুঝাইতে হইবে না। সাধু অভিপ্রায়ে নীত একটি চি[illegible] চরিত্র মানবীয় বিচিত্র অবস্থার মধ্য দিয়া কিরূপে ভগবানের আদেশ পালন করিয়া হাসিতে হাসিতে স্বর্গে চলিয়া যায়, তাহারি [illegible] এ স্থলে দৃষ্ট হইবে। বহুল প্রতিকূল অবস্থার সঙ্গে সংগ্রাম করিয়া তিনি তাঁহার স্বর্গীয় চরিত্রের দৃষ্টান্ত মনুষ্যবংশের জন্য রাখিয়া গিয়াছেন

নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে সে সমুদায় দেখিলে এবং বিনীত ভাবে তাহা গ্রহণ করিলে পরম মঙ্গল লাভ হইবে।

কেশবচরিত্র এক প্রকাণ্ড সংগ্রামক্ষেত্র বিশেষ। যে সকল গুরুতর ঘটনা ইহাতে ঘটিয়াছে, তাহার আনুপূর্ব্বিক বিস্তারিত বিবরণ বর্ণনে আমি অক্ষম। ঐতিহাসিক কোন গুরুতর তত্ত্ব পরিত্যক্ত না হয়, এ জন্য যত দূর পারিয়াছি, তাহা সংক্ষেপে স্পর্শ করিয়া গিয়াছি।

দ্বিতীয় সংস্করণে এবার কোন কোন অংশের পরিবর্ত্তন এবং পরিবর্দ্ধন করা গেল। "কেশবচরিত" বাহির হওয়ার পর ইংরাজি এবং বাঙ্গালা বৃহৎ বৃহৎ পুস্তকে ইহা অতি বিস্তৃতরূপে প্রচারিত হইয়াছে। এই জন্য একবার মনে করিয়াছিলাম, এ গ্রন্থ পুনর্মুদ্রিত করিবার আর প্রয়োজন নাই। কিন্তু প্রথম সংস্করণ "কেশবচরিত" যখন একেবারে নিঃশেষিত হইল এবং তাহার পর অনেকে ইহা পড়িবার জন্য যখন আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন, তখন স্থির করিলাম, ঈদৃশ এক খণ্ড সংক্ষিপ্ত জীবনী প্রচলিত থাকা বাঞ্ছনীয়। কেন না, কেশবজীবনের জ্ঞাতব্য গুরুতর ঘটনা সকল বাঙ্গালা ভাষায় একখানি গ্রন্থে সংগৃহীত থাকিলে অনেকের পাঠের পক্ষে সুবিধা হইবে। বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত এ সম্বন্ধে ইংরাজি বাঙ্গালা পুস্তকে যাহা কিছু প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার সার মর্ম্ম ইহাতে সকলে দেখিতে পাইবেন।

খৃষ্টাব্দ—১৮৯৭।

শ্রীচিরঞ্জীব শর্ম্মা

তৃতীয় সংস্করণের বিজ্ঞাপন

স্বর্গীয় চিরঞ্জীব শর্ম্মা বিরচিত "কেশবচরিতের" দ্বিতীয় সংস্করণ গ্রন্থকারের জীবিতাবস্থায়ই মুদ্রিত হইয়াছিল। উক্ত সংস্করণ নিঃশেষিত হওয়াতে এবং বর্ত্তমান সময়ের পক্ষে বইখানির উপযোগিতা ও অনেকের আগ্রহাতিশয্য দেখিয়া, উহার তৃতীয় সংস্করণ নববিধান পাবলিকেশান কমিটীর উদ্যোগে ও ভট্টাচার্য্য এণ্ড সনের সহায়তায়, কোমলমতি বালক-বালিকাগণের সুখপাঠ্য ও সহজবোধ্য করিবার উদ্দেশ্যে, যথাযথ সংশোধন ও স্থানে স্থানে সামান্য পরিবর্ত্তন সহকারে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইল। কেশবচন্দ্র উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর আদর্শ পুরুষ। তাঁহার সর্ব্বতোমুখী প্রতিভাশালী অমূল্য জীবন বর্ত্তমান যুগাদর্শের সর্ব্বোচ্চ মঞ্চে এবং সর্ব্ব-সমন্বয়ের মহামিলনমন্দিরের উচ্চতম সোপানে সমারূঢ়। বর্ত্তমান স্বাধীনতার মহাযুগে, ধর্ম্ম, কর্ম্ম, রাজনীতি, সমাজনীতি, শিক্ষা, সভ্যতা ইত্যাদি সকল বিষয়েরই সঙ্গে কেশবজীবন অচ্ছেদ্যরূপে সংযুক্ত। ভারতের ভাবী বংশ এবং উদীয়মান যুবকমণ্ডলী এ জীবনাদর্শ সম্মুখে রাখিয়া জীবনপথে অগ্রসর হইলে, মানবজীবনের সর্ব্বাঙ্গীন পূর্ণতালাভে সক্ষম হইবেন। স্বর্গীয় চিরঞ্জীব শর্ম্মার অমর লেখনী এই অমর জীবন সকলের জন্য রাখিয়া গিয়াছে। তিনি শ্রীকেশবের সহচর, অনুচর ও সমযোগিরূপে তাঁহার অন্তরের ভাব যাহা অনুভব ও বাহিরের কার্য্য যাহা স্বচক্ষে দর্শন করিয়াছেন, পবিত্রাত্মরূপিণী বাগ্দেবীর প্রেরণায় তাহাই যথাযথ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। তিনি কল্পনার তুলিতে অতিরঞ্জন না করিয়া, দেবালোকে সে উজ্জ্বল জীবনের যে সত্য ছবিখানি তাঁহার নির্ম্মল হৃদয়ে প্রতিভাত হইয়াছিল, তাহাই অবিকল চিত্রিত করিয়া

গিয়াছেন। এই নূতন সংস্করণে বইখানি পাইকা অক্ষরে, ডবল ক্রাউন ১৬ পেজী ফর্ম্মার ৪২৯ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ হইয়াছে। বইর আকারও যথেষ্ট পরিমাণে বাড়িয়া গিয়াছে। সুন্দর জীবনের চরিত-পুস্তকখানি যাহাতে সুদৃশ্য হয়, যুবকমণ্ডলীর মনোমত হয়, লাইব্রেরী ও প্রাইজের উপযুক্ত হয়, এবার তজ্জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করা হইয়াছে। এখন সর্ব্বসাধারণের দৃষ্টি "কেশবচরিতের"দিকে আকৃষ্ট হইলে সকল পরিশ্রম সার্থক হইবে।

৩নং রমানাথ মজুমদারের ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।
১৬ই জুলাই, ১৯৩১।

শ্রীঅক্ষয়কুমার লধ

সূচীপত্র

কেশব-চরিত

যুগধর্ম্মের অভ্যুদয়

কিরূপ বংশে জন্মিয়া, কিরূপ পারিবারিক, সামাজিক ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার ভিতর দিয়া কেশব-চরিত গঠিত এবং বিকশিত হইয়াছিল, সর্ব্ব প্রথমে তদ্বিষয়ে আমরা কিছু বলিতেছি। আধুনিক বঙ্গ-সমাজের প্রথম সংস্কারক এবং হিতৈষী রাজা রামমোহন রায়, রাধাকান্ত দেব এবং রামকমল সেন। ইঁহারা তিন জন ইংরাজি স্কুল কলেজে শিক্ষা প্রাপ্ত না হইয়াও স্ব স্ব প্রতিভাগুণে স্বদেশের উন্নতির দ্বার উদ্‌ঘাটিত করিয়া যান। তদনন্তর হিন্দু কলেজ স্থাপনের পর রীতিপূর্ব্বক ইংরাজি শিক্ষা করিয়া যে কয়েক ব্যক্তি স্বদেশ-সংস্কারকার্য্যে ব্রতী হন, তাঁহাদের দ্বারা হিন্দু ধর্ম্মনীতি, আচার ব্যবহার, পান ভোজন সম্বন্ধে একটী অভিনব যুগের আবির্ভাব হয়। রামগোপাল ঘোষ, রসিকলাল মল্লিক, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রামতনু লাহিড়ী প্রভৃতি এই দলের মধ্যে গণ্য মান্য এবং বিখ্যাত। এই প্রথম শিক্ষিত সংস্কৃতমনা ব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক যখন দেশের প্রাচীন ধর্ম্মবিশ্বাস এবং

রীতিনীতি কতক পরিমাণে বিপর্য্যস্ত হইয়া যায়, এবং পরে ইংরাজিশিক্ষিত যুবক মাত্রেই যখন উচ্ছৃঙ্খল-চরিত্র হইয়া পড়ে, সেই মহা-সঙ্কটের দিনে কেশবচন্দ্র এবং তদীয় সহচরবর্গ পতিত ভারতের পুনরুদ্ধারের জন্য ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে জীবনপথে পদার্পণ করেন। যদিও তৎপূর্ব্বে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাজনারায়ণ বসু, অক্ষয়কুমার দত্ত, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রভৃতি মহাত্মাগণ তাঁহাদের সহযোগিগণের সহিত ধর্ম্ম ও সমাজ-সংস্কারকার্য্য আরম্ভ করিয়াছিলেন, কিন্তু কলেজ স্কুলের নাস্তিকবৎ ইয়োরোপীয় শিক্ষক এবং তদানীন্তন রাজপুরুষ ও খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মযাজকগণের বিজাতীয় সাংঘাতিক সংস্কার, রীতি দ্বারা ইংরাজিশিক্ষিত যুবক-সম্প্রদায় একবারে উন্মার্গগামী হইয়া পড়িয়াছিল। তখন যাহারা ব্রাহ্ম কিম্বা খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিত, সাধারণতঃ তাহাদের চরিত্র ভাল ছিল না। দেশের প্রাচীন প্রথা, ধর্ম্মনিয়ম না মানাই তখনকার লোকেরা পরম পুরুষার্থ জ্ঞান করিত।

এইরূপ শোচনীয় অবস্থার মধ্যে যখন কেশবচন্দ্র কলেজের শিক্ষা শেষ করিয়া বাহির হইলেন, তখন তাঁহার ভিতরে এক দিকে পৈতৃক বৈষ্ণব ধর্ম্মের অন্ধভক্তিমূলক সাত্ত্বিক ভাব এবং অপর দিকে ইয়োরোপীয় জ্ঞান সভ্যতা এই দুইটী মহাশক্তি পরস্পরের সহিত সামঞ্জস্য সাধনের জন্য সংগ্রাম করিতেছিল। ইঁহার আগমনের পূর্ব্বে কুসংস্কার, পৌত্তলিকতা, জাতিভেদ এবং অন্যান্য প্রাচীন কুপ্রথা ও দূষিত দেশাচারের উচ্ছেদ-সাধনের কার্য্য অনেকটা অগ্রসর হইয়াছিল বটে, কিন্তু নবীন সংস্কর্ত্তাগণ হিন্দু

সমাজের ভয়ে প্রকাশ্যরূপে তৎসম্বন্ধে কাজে বড় একটা কিছু করিয়া উঠিতে পারিতেন না। এ সময় রাজনীতি এবং ইংরাজি সাহিত্য-চর্চ্চার জন্য নগরের স্থানে স্থানে ছোট বড় কয়েকটি সভা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল ; তাহাতে শিক্ষিত নামধারী কুসংস্কার-বর্জ্জিত মার্জ্জিত-বুদ্ধি ব্যক্তিগণ বিবিধ বিষয়ে মতামত সমালোচনা এবং বক্তৃতাদি করিতেন। ইংরাজি কোন কোন কবির রচনা মুখস্থ রাখা এবং ইংরাজি ভাষায় রচনা করিতে শেখা তখনকার শিক্ষার চরমোৎকর্ষ ছিল। কিন্তু নৈতিক চরিত্র সংগঠন, বিজ্ঞান দর্শন আলোচনা, কি বিশুদ্ধ ধর্ম্মনীতির চর্চ্চা সম্বন্ধে কাহারও প্রায় অনুরাগ উৎসাহ দৃষ্ট হইত না। যাহা কিঞ্চিৎ ছিল, তাহা ভক্তিশূন্য শুষ্ক বৌদ্ধভাবের অনুগামী। প্রকৃত প্রস্তাবে তখন ধর্ম্মসংস্কার আরম্ভ হয় নাই ; কেবল প্রাচীন ব্রাহ্মদিগের দ্বারা বৈদান্তিক একেশ্বরবাদ ধর্ম্মের কিছু কিছু আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছিল। সমাজসংস্কার বিষয়ে কেবল বিদ্যাসাগরপ্রবর্ত্তিত বিধবাবিবাহের কথা কিছু কিছু শুনা যাইত ; তাহার দুই একটি অনুষ্ঠানও হইয়াছিল। কিন্তু ইংরাজি সাহিত্য, ভূগোল, ইতিহাস জ্যামিতি, জ্যোতিষ, পদার্থ ও মনোবিজ্ঞান শিক্ষা করিয়া দেশের প্রাচীন ভ্রান্ত ধর্ম্মমত এবং দূষিত রীতি নীতি পরিহারপূর্ব্বক কিরূপে বিশুদ্ধ-চরিত্র, নীতিপরায়ণ, ঈশ্বরভক্ত এবং সত্যনিষ্ঠ হইতে হয়, এবং ভগ্নপ্রায় প্রাচীন ধর্ম্মগৃহের স্থানে কিরূপে সার্ব্বভৌমিক অথচ জাতীয় নব ধর্ম্মসমাজ গঠন করিতে হয়, ইতিপূর্ব্বে তৎসম্বন্ধে কাহারো কোন পরিষ্কার জ্ঞান জন্মে নাই।

এই গভীর অভাব পূরণের জন্য যথাসময়ে কেশবচন্দ্র সেনের আবির্ভাব হয়। তিনি প্রথম হইতেই এই পথে পদার্পণ করিয়াছিলেন। তাঁহা কর্ত্তৃক কেবল যে হিন্দুসমাজ, হিন্দুধর্ম্ম সংশোধিত হইয়াছে তাহা নহে, পূর্ব্বপ্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মধর্ম্মে এবং প্রচলিত খ্রীষ্ট ধর্ম্মেও তিনি নবজীবন দান করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার আগমনের অব্যবহিত পূর্ব্বে হিন্দুজাতি ও বঙ্গসমাজ এক দিকে শিক্ষিতাভিমানী নব্য সভ্যদিগের কুদৃষ্টান্তে ধর্ম্মনীতি-হীন, উচ্ছৃঙ্খল-চরিত্র, অপর দিকে শিথিল-বিশ্বাসী যজমান-সন্তুষ্টকারী ব্রাহ্মণ পণ্ডিত গুরু পুরোহিতগণের স্বার্থপরতায় ভাবভক্তিবিহীন চরিত্রহীন নির্জীবপ্রায় ছিল। ফলতঃ একটী নবযুগধর্ম্মের অভ্যুদয়ের পূর্ব্বে সচরাচর পুরাকালে যুগে যুগে স্বদেশে বিদেশে যেরূপ অবস্থা দেখা গিয়াছে, এখানে তাহাই হইয়াছিল। যেমন চৈতন্যের পূর্ব্বে অদ্বৈত, ঈশার পুর্ব্বে জন্, তেমনি কেশবের পূর্ব্বে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ যুগধর্ম্মের আগমনবার্ত্তা ঘোষণা করেন। পরে যথাসময়ে ভক্তগোষ্ঠীসহ কেশবচন্দ্র আসিয়া যুগধর্ম্মলীলার রঙ্গভূমিতে অবতীর্ণ হইলেন। সময় ঠিক তাঁহার মত পবিত্র-চরিত্র, বিশুদ্ধ-জ্ঞানী, ভক্তিমান্, সম্ভ্রান্তবংশীয়, মহাপ্রতিভাশালী বাগ্মিপ্রবর এবং প্রিয়দর্শন এক মহাপুরুষের জন্য আশার সহিত প্রতীক্ষা করিতেছিল। বঙ্গদেশ, ভারতবর্ষ ও সমস্ত পৃথিবী এবং হিন্দুধর্ম্ম, ব্রাহ্মধর্ম্ম, তৎসঙ্গে খ্রীষ্ট বৌদ্ধ মহম্মদীয় ধর্ম্ম, সকলে মিলিয়া কেশবচন্দ্রকে আপনাদের সংস্কর্ত্তা, পূরণকর্ত্তা, মিলনকারী এবং পুনর্জ্জীবন-

দাতারূপে প্রাপ্ত হইয়া, সাদরে তাঁহাকে বরণ করিল। তিনি কেবল প্রাগুক্ত সময়ের জন্য স্বদেশসংস্কারের নিমিত্ত আসিয়াছিলেন তাহা নহে, সমস্ত পৃথিবী ও মানবপরিবারের সুদূর ভবিষ্যৎ কল্যাণের নিমিত্ত বিধাতা কর্তৃক বিশেষরূপে প্রেরিত হইয়াছিলেন। লক্ষণ দেখিয়া স্পষ্ট প্রতীতি হয়, বর্ত্তমান সময়ের ঠিক উপযোগী তাঁহার জীবন। যে সকল গুণ, ক্ষমতা, ধর্ম্মভাব থাকিলে আধুনিক নব্য শিক্ষিত কৃতবিদ্য সমাজকে স্বর্গের দিকে চালিত করা যাইতে পারে, তাঁহাতে তৎসমস্ত গুণের প্রচুর সমাবেশ ছিল। সাময়িক অবস্থার সহিত কেশবজীবন তুলনা করিয়া দেখিলে, ইহাতে বিধাতার বিশেষ কৃপার নিদর্শন সুস্পষ্ট পরিলক্ষিত হয়।

বংশ-মাহাত্ম্য

বংশগত গুণ, নৈসর্গিক উপকরণ, অন্তর বাহ্যের অবস্থা জীবনচরিতের প্রধান উপাদান বলিয়া পরিগণিত হয়। কিন্তু মহাপুরুষচরিত্রে ইহা ব্যতীত আরো কিছু নূতন স্বর্গীয় অলৌকিক শক্তি থাকে। যাহা পরিবারমধ্যে বংশগত গুণে ছিল না, যাহা বাহিরের উপকরণ এবং সামাজিক সংসর্গেও ছিল না, ঈদৃশ নূতনবিধ সদ্‌গুণ এবং দৈবপ্রভাব এ স্থলে দেখা যায়। কেশবচন্দ্রের জীবনে সকলে তাহার উজ্জ্বল প্রমাণ প্রাপ্ত হইয়াছেন। তাঁহার

জন্মস্থান যদিও কলিকাতা মহানগরীর অন্তর্গত কলুটোলায়, কিন্তু তাঁহার পৈতৃক বাসস্থান হুগলীর পরপারে জাহ্নবী-তটে গৌরিভা গ্রামে। কলুটোলার বৈদ্যবংশীয় সেনপরিবার একটী প্রসিদ্ধ সম্ভ্রান্ত পরিবার। কেশবচন্দ্র সেনের প্রপিতামহ গোকুলচন্দ্র সেন এক জন মধ্যবিধ গৃহস্থ ছিলেন। তিনি সামান্যরূপ গ্রাম্য লেখা পড়া শিখিয়া ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির অধীনে হুগলীতে একটী চাকরি করিতেন। তাঁহার তিন পুত্র,—প্রথম মদনমোহন, দ্বিতীয় রামকমল, তৃতীয় রামধন। রামকমল সেন দ্বারাই এই পরিবার প্রথমে সম্ভ্রান্ত পদবীতে উত্থিত হইয়াছে। রামকমল এক জন অতি আশ্চর্য্য প্রতিভা-শালী অসাধারণ ব্যক্তি ছিলেন। এরূপ লোক লক্ষের মধ্যে এক জন পাওয়া যায় কিনা সন্দেহ। প্রথমে তিনি গৌরিভা গ্রামে গুরুমহাশয়ের পাঠশালায় সামান্য কিছু লেখা পড়া শিক্ষা করেন। পরে কলিকাতা আসিয়া একটি ইংরাজি স্কুলে ভর্ত্তি হন। তথাকার ইংরাজি পাঠ্য পুস্তক তৎকালে তুতিনামা আর আরব্য উপন্যাস মাত্র ছিল। অর্থাভাবে তিনি তথায় বেশী দিন পড়িতে পান নাই। সেই জন্য স্কুল ছাড়িয়া প্রথমে এসিয়াটিক সোসাইটীর অধীনে এক মুদ্রা-যন্ত্রে মাসিক আট টাকা বেতনে কম্পোজিটারের কার্য্যে নিযুক্ত হন। তদনন্তর আট বৎসর পরে আর চারি টাকা বেতন বৃদ্ধি হয়। কিন্তু তাঁহার স্বাভাবিক বুদ্ধিপ্রতিভা, সততা, কার্য্য-দক্ষতা এবং জ্ঞানানুশীলনস্পৃহা ক্রমে কর্ত্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ

করিল। প্রসিদ্ধ সংস্কৃতজ্ঞ উইলসন সাহেব রামকমলকে বড় ভাল বাসিতেন। তিনি তাঁহাকে কিছু কাল পরে তথাকার ক্লার্কের কাজে নিযুক্ত করেন। উক্ত সোসাইটীর পুস্তকালয়ে সংস্কৃত ইংরাজি পুরাতন অনেক পুস্তক এবং কাগজ পত্র থাকিত। অবসর কালে রামকমল তাহা মনোযোগপূর্ব্বক পড়িতেন। সংস্কৃত পাঠে তাঁহার বিশেষ অনুরাগ ছিল। কিছু দিন পরে তিনি তথাকার সহকারী সম্পাদকের পদে নিযুক্ত হন; তদনন্তর গুণ, ক্ষমতা, চরিত্রবলে টাকসালের দেওয়ানী পদে, পরে বেঙ্গল ব্যাঙ্কের দেওয়ানী পদে দুই হাজার টাকা বেতনে চাকরী করেন।

এইরূপে রামকমল সেন কেবল বিদ্যা সম্পদ্ অর্থ বিত্ত মান সম্ভ্রমলাভে কৃতকার্য্য হইলেন তাহা নহে, তৎকালে দেশে নানাবিধ জ্ঞান সভ্যতার সংস্কার ও উন্নতিকল্পে যে কোন অনুষ্ঠান হইত, তিনি তৎসমুদায়ের এক জন প্রধান সহায় এবং পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। নিজে যদিও এক জন বৈষ্ণবধর্ম্মাবলম্বী সাত্ত্বিক হিন্দু, কিন্তু রামমোহন প্রভৃতি দেশসংস্কারক এবং উইলসন ও অন্যান্য হিতৈষী ইংরাজদিগের সহিত একযোগে হিন্দু কলেজ, মেডিকেল কলেজ ও অন্যান্য কলেজ স্কুল স্থাপন বিষয়ে তিনি অর্থ এবং শারীরিক মানসিক পরিশ্রম দ্বারা যথেষ্ট সহায়তা করিতেন। তাঁহার কৃত সুবৃহৎ ইংরাজি বাঙ্গালা অভিধান সে সময়ের শিক্ষোন্নতি বিষয়ে সাধারণের প্রচুর উপকার সাধন করিয়াছিল।

এই রামকমল সেনই কলুটোলার সেনপরিবারের নাম সম্ভ্রম প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন। তিনি একাদিক্রমে চল্লিশ বৎসর কাল রাজসেবা দ্বারা রাশি রাশি অর্থ উপার্জ্জন করেন। সেন-পরিবারের প্রশস্ত উচ্চ অট্টালিকা তাঁহারই কীর্ত্তিস্তম্ভ। ইহা ব্যতীত অনেক বাড়ী এবং বিষয় তিনি করিয়া যান। তিনি এক জন উচ্চ শ্রেণীর ক্রিয়াশীল ধার্ম্মিক ব্যক্তি ছিলেন। যত্নের সহিত আত্মীয় এবং দরিদ্র কুটুম্বদিগকে পোষণ করিতেন। বাড়ীতে পূজা পার্ব্বণ শ্রাদ্ধাদি উপলক্ষে আহারের এমন আয়োজন হইত যে, সচরাচর তেমন আর কোথাও বড় দেখা যাইত না। কিন্তু রামকমল সেন নিজে ব্রতধারী ভক্তের ন্যায় জীবন যাপন করিতেন। প্রাতে এক পেয়ালা চা, আর দুই চারি খানা জিলাপি খাইয়া কাজে বাহির হইতেন, পরে সন্ধ্যার সময় স্বহস্তে রন্ধনপূর্ব্বক ভোজন করিতেন। জ্ঞান, সভ্যতা, অর্থোপার্জ্জন, দেশহিতৈষিতার সঙ্গে সঙ্গে কেমন তাঁহার চমৎকার বৈরাগ্য ছিল! কেশবচন্দ্র ঠিক যেন তাঁহার আদর্শে সংগঠিত। রামকমল সেনের স্বহস্তলিখিত কতকগুলি সরলভাবের প্রার্থনা পারিবারিক লাইব্রেরীতে পওয়া গিয়াছিল। তাহা অতিশয় ভক্তিভাবপূর্ণ। স্নান, ভোজন, শয়ন, বিদেশভ্রমণকালের উপযোগী এই সকল প্রার্থনা।

এই পরম বৈষ্ণব মহাত্মার ঔরসে কয়েকটী গুণবান, বুদ্ধিমান্ পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। কেশবের পিতা প্যারীমোহন তন্মধ্যে দ্বিতীয়। প্যারীমোহন অন্য কোন বিষয়ে যদিও বিখ্যাত হইতে

পারেন নাই, কিন্তু হৃদয় বড় তাঁহার কোমল এবং দয়ার্দ্র ছিল। তিনি অতি প্রিয়দর্শন সুন্দর পুরুষ ছিলেন। নির্দ্দোষ-চরিত্র, দয়ার্দ্র-হৃদয় প্যারীমোহন গোপনে দুঃখী বিপন্নদিগকে দান করিতেন। দরিদ্র ভিখারীরা তাঁহার কাছে যথেষ্ট সহানুভূতি প্রাপ্ত হইত। তিনি বুদ্ধিমান্, প্রেমিক বৈষ্ণব এবং অতিশয় ভদ্র ছিলেন। চৌত্রিশ বৎসর বয়সে তাঁহার পরলোকপ্রাপ্তি হয়। সকলেই তাঁহাকে ভালবাসিত, শত্রু কেহ তাঁহার ছিল না।

কেশবচন্দ্র যাঁহার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন, তাঁহার অপূর্ব্ব চরিতকাহিনী দুই এক কথায় এখানে বলিয়া শেষ করা যায় না। ঈদৃশ উদার ভক্তিনিষ্ঠ সতী সাধ্বী দয়াবতী স্নেহময়ী মাতা জগতের পূজনীয়, তাহাতে আর কিছুমাত্র সংশয় নাই। পঁচিশ বৎসর বয়সে বিধবা হইয়া, তিনি তিনটী নাবালক পুত্র এবং কয়েকটী কন্যার সহিত যেরূপ কষ্ট সহিয়া, জীবনের মহত্ত্ব এবং স্বর্গীয় চরিত্র রক্ষা করিয়া আসিয়াছেন, তাহা শুনিলে হৃদয় বিগলিত হয়। সহজেই তিনি লজ্জাবতী সাধ্বী, তাহার উপর বৈধব্যের জ্বলন্ত ব্রহ্মচর্য্যের জ্যোতি। পরের জন্য জীবন ধারণ কাহাকে বলে, তদ্বিষয়ে তিনি এক আশ্চর্য্য দৃষ্টান্ত। কিন্তু সংসার সম্বন্ধে আজন্ম দুঃখিনী। সারদা সুন্দরী অল্প বয়সে বিধবা হইয়া সন্তানগণসহ ভয়ে ভয়ে অতি সাবধানে অভিভাবক-দিগের অধীনে কাল যাপন করিতেন। পূজা, আহ্নিক, ব্রত, উপবাস, তীর্থভ্রমণ, গঙ্গাস্নান, সাধুভক্তদর্শন, ভদ্রাভদ্র কুটুম্ব ও দুঃখী কাঙ্গাল জনের সেবা, সংসারের রন্ধনাদি কার্য্য তাবৎ

বিষয়েই তাঁহার চিরদিন সমান অনুরাগ প্রকাশ পাইয়াছে। পুত্রশোকে হৃদয় ভগ্ন চূর্ণ, শরীর জরাগ্রস্ত হইলেও ঐ সকল সৎকার্য্যে কিছুমাত্র উৎসাহ শিথিল হয় নাই। কাহারও সেবা তিনি লইতে চাইতেন না, কিন্তু আত্মপর সকলের সেবায় অতিশয় উৎসাহী, অনুরাগী ছিলেন।

এই সকল ধর্ম্মনিষ্ঠা এবং সাধু গুণের সহিত অতি আশ্চর্য্য উদারতা এবং বাৎসল্য মমতা তাঁহাতে বর্ত্তমান ছিল। খ্যাত-নামা ধর্ম্মসংস্কারক পুত্র কেশবের উপাসনা, প্রার্থনা, নামকীর্ত্তন এবং অপরাপর বহুবিধ ধর্ম্মানুষ্ঠানের তিনি প্রথম হইতে এক জন প্রধান সহায় ছিলেন। নিজে আচারনিষ্ঠ হিন্দু বিধবা ব্রহ্মচারিণী হইয়াও পুত্রের যাবতীয় অনুষ্ঠানে তিনি চিরদিন নির্ভয়ে অন্তরের সহিত যোগ দিয়া আসিয়াছেন। কেশবের স্বদেশ বিদেশস্থ সহচর অনুচরগণ যেন তাঁহার আপনার সন্তান। ব্রহ্মোপাসনা, ব্রহ্মোৎসব, নগরসঙ্কীর্ত্তন যেমন তাঁহার প্রিয় উপভোগ্য বিষয় ছিল, এমন আর আমরা কয় জনের দেখিতে পাই? তাঁহার মূর্ত্তিমতী মাতৃপ্রকৃতির দিব্য শ্রী স্মরণ করিলেও পুণ্যের সঞ্চার হয়। কেশবচরিত্র বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে অনেক স্থানে পাঠকগণ ইহাঁকে দেখিতে পাইবেন, এখানে আর আমরা সে বিষয়ে অধিক বলিব না।

বালক কেশব

(১৮৩৮ হইতে ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দ)

কলিকাতা নগরে এই উদারস্বভাব শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত ধনাঢ্য হিন্দুপরিবারে ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দে ১৯শে নবেম্বর প্রাতে কেশবচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। গৌরবর্ণ, শান্তশিষ্ট, প্রিয়দর্শন বালক কেশবকে দেখিলে দিব্যকান্তি এক স্বর্গদূতের ন্যায় মনে হইত। শরীরটী প্রথমে বড় কৃশ ছিল, কিন্তু গঠন সুপ্রণালীবদ্ধ, যেন একটী খোদিত মূর্ত্তি। প্রথম হইতেই তিনি বড় ধীর-প্রকৃতি, মিতভাষী, স্বাতন্ত্র্যপ্রিয়, গম্ভীর-স্বভাব। কিন্তু পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হইয়া ভদ্রবেশে সাজিয়া থাকিতে বড় ভাল বাসিতেন। আপনার বাক্স, ডেক্স এবং অন্যান্য মনোনীত পরিষ্কার দ্রব্যগুলি যত্নপূর্ব্বক যথাস্থানে সাজাইয়া রাখিতেন, তাহাতে কাহাকেও হাত দিতে দিতেন না। বাল্যাবস্থা হইতেই বুদ্ধি তাঁহার বড় প্রখর, কিছু অসাধারণ, এবং চরিত্রটী নির্ম্মল ছিল। এই অসাধারণ বুদ্ধিপ্রতিভা এবং সচ্চরিত্রতা তদীয় মহত্ত্বের এক প্রধান লক্ষণ বলিয়া ধরিতে হইবে। প্রথমে বাড়ীতে কিছু দিন গুরুমহাশয়ের নিকট বাঙ্গালা শিক্ষা করিয়া তিনি হিন্দু-কলেজে ভর্ত্তি হন। দশ বৎসর বয়সে পিতা প্যারীমোহন পরলোক গমন করেন, তদনন্তর তাঁহার বিদ্যাশিক্ষার ভার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা নবীনচন্দ্রের উপর পতিত হয়। ইহাঁরা তিন ভ্রাতা ;—

প্রথম নবীনচন্দ্র, দ্বিতীয় কেশবচন্দ্র, তৃতীয় কৃষ্ণবিহারী। নিম্নশ্রেণীতে যখন তিনি উক্ত কলেজে পড়িতেন, তখন বর্ষে বর্ষে একটী করিয়া, কখন বা দুইটী করিয়া পারিতোষিক পাইতেন। বার বৎসর বয়সের ক্ষুদ্র বালক কেশব পারিতোষিকের বড় বড় পুস্তক বহিয়া আনিতে পারিতেন না। দেখিতে নিতান্ত ছোট এবং নিরীহ, কিন্তু পাঠ অভ্যাসে অতি সুনিপুণ এবং সুদক্ষ। এ পর্য্যন্ত অঙ্কেতে তাঁহার কোন অপারকতা প্রকাশ পায় নাই, তাহার পরের সময়ে উচ্চতর গণিতে বিশেষ কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। কিন্তু যথেষ্ট পরিশ্রম, ধৈর্য্য ও মনোযোগ সহকারে পাঠ অভ্যাস এবং আয়ত্ত করিতেন। স্বাভাবিক প্রতিভা-শক্তি, যত্ন, চেষ্টা ও অধ্যবসায় দ্বারা ক্রমশঃ আরো পরিবর্দ্ধিত হইয়াছিল। পড়িতে পড়িতে এক দিন একাকী পুস্তক বুকে করিয়া ছাদের উপর ঘুমাইয়া পড়েন; বাড়ীর সকলে তাঁহাকে কোথাও না পাইয়া, অনেক অন্বেষণের পর, শেষে ঐ অবস্থায় দেখিতে পান।

কেবল শিক্ষা বিষয়ে তৎকালে তাঁহার বুদ্ধিপ্রতিভা প্রকাশ পাইয়াছিল তাহা নহে, অন্যান্য বহু বিষয়ে তিনি তাহার পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। মনুষ্যস্বভাব এবং বস্তুতত্ত্বের অভ্য-ন্তরে প্রবেশ করিবার তাঁহার এক আশ্চর্য্য শক্তি ছিল। অনুকরণ এবং নূতন সৃষ্টি উভয় বিষয়েই তাঁহার ক্ষমতা প্রকাশ পাইয়াছে। পূর্ব্বে বালকদিগের আমোদ চরিতার্থের জন্য হিন্দু কলেজে মাঝে মাঝে ম্যাজিক লণ্ঠন এবং বাজী

দেখান হইত। তাহা দেখিয়া অতি অদ্ভুত নিপুণতা সহকারে কেশব অল্প দিন পরে সেইরূপ বাজী তামাসা স্বীয় ভবনে আপনার বয়স্যগণকে দেখাইয়াছিলেন। পুরাতন সংবাদপত্রে ছবি আঁকিয়া ম্যাজিক, মোম বাতির ভিতর হইতে রুমাল, রঙ্গীন জলপূর্ণ গেলাস হইতে ফুল, বন্দুকের ভিতর ঘড়ী পূরিয়া আওয়াজ করিয়া পরে আবার সেই ঘড়ী পুতুলের গলায় দেখান, এইরূপ বাজী তামাসা প্রদর্শনপূর্ব্বক সকলকে তিনি চমৎকৃত করিয়াছিলেন। মাঝে মাঝে বাজারে গিয়া, সাহেবদের পুরাতন পোষাক কিনিয়া, তাহা পরিয়া বাজীকর সাহেব সাজিতেন। একবার এক জন ইংরাজ তাঁহার বাজী দেখিয়া মনে করিয়াছিল, তিনি যেন ইটালী দেশীয় কোন বাজীকর। কেশবের এই সকল আশ্চর্য্য ক্ষমতা কৌশল দর্শন করিয়া সহচর সমবয়স্কেরা অবাক হইয়া যাইত এবং তাঁহাকে ভয় ও সম্ভ্রম করিত। ক্রীড়াশীল বালক, অথচ এমনি গম্ভীর-স্বভাব ও স্বাতন্ত্র্যপ্রিয় যে, বয়স্য সহচরেরাও আপনাদিগকে তাঁহার সমকক্ষ কিম্বা বন্ধুস্থানীয় বলিয়া সাহস করিতে পারিত না! যদিও তের চৌদ্দ বৎসর বয়সের বালক, কিন্তু চরিত্রে বুদ্ধিতে যেন মহাবিজ্ঞ ব্যক্তি। তাঁহার বিশেষ প্রিয় এবং হৃদয়বন্ধু হইবার জন্য অনেকে প্রার্থী হইত, কিন্তু তিনি কাহাকেও সে বিষয়ে প্রশ্রয় দিতেন না। অথচ সর্ব্বদা বলিতেন, "সূর্য্যহীন পৃথিবী যেমন, তেমনি বন্ধুবিহীন মনুষ্য"। পুরাতন প্রচলিত বাল্যখেলা

কিম্বা অন্যকর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত কোন খেলায় তিনি কদাচিৎ যোগ দান করিতেন; কিন্তু নীরবে দূরে দাঁড়াইয়া মনোযোগপূর্ব্বক তাহা দেখিতেন। নিজের রচিত যে কোন নূতন খেলা নিজের কর্ত্তৃত্বাধীনে সকলকে লইয়া খেলিতে ভালবাসিতেন। নেতৃত্বের ভাব বাল্য খেলার মধ্যেও বিকাশ পাইয়াছিল। কোন সময় ডিস্পেন্‌সেরি করিয়া তাহাতে নিজে হইতেন ডাক্তার, অপর বালকেরা কেহ রোগী, কেহবা কম্পাউণ্ডার। কখন বা ডাকঘর প্রস্তুত করিয়া নীল চস্‌মা নাকে দিয়া তাহাতে পোষ্টমাষ্টার হইতেন, অন্যেরা হরকরার কার্য্য করিত। এইরূপে কখন বা ইংরাজি ব্যাণ্ড রচনা করিয়া, কোন বালকের স্কন্ধে জয়ঢাক দিয়া, নিজে সবলে তাহা বাজাইতেন। কখন বাড়ীর ভৃত্য এবং অধীনস্থ পোষ্য বালকদিগকে হনুমান ও রাক্ষস সাজাইয়া রামযাত্রার গান গাইতেন। তাহার পর ক্রমে ক্রমে লেখা পড়া শিক্ষার জন্য বাড়ীতে এক স্কুল করেন।

অতি বাল্যকালেই কেশব আপনার বিশেষ গুরুত্ব আপনি জানিতে পারিয়াছিলেন। তাঁহার স্বাধীন ইচ্ছাবলও অতি অসাধারণ ছিল। কেহ কখন তাঁহার সঙ্গে বিবাদ ঝগড়ায় পারিয়া উঠিত না। প্রথমে ধৈর্য্যের সহিত সকল সহ্য করিয়া, পরিণামে তিনি বিরোধীর উপর জয়লাভ করিতেন। আত্মমর্য্যাদা কিছুতেই তিনি ছাড়িতেন না। নিজে যাচিয়া কাহারো সঙ্গে কখন মিল করেন নাই, আপনার পদে আপনি স্থির অটল

থাকিতেন। বাল্যকালে বালকগণ যেরূপ পরস্পর মারামারি করে, রাগে, তৎপ্রভৃতিও তাঁহার বড় ঘৃণা ছিল। নিতান্ত শান্ত ধীর, কোনরূপ আড়ম্বর আস্ফালন নাই, অথচ শত্রু-দমন বিষয়ে দৃঢ়-সঙ্কল্প।

| ধর্ম্মবিষয়ে বাহ্য বেশভূষার প্রতি কেশবের অনুরাগ বাল্যকালে যথেষ্ট দেখা গিয়াছে। বয়স্যগণের সহিত কার্ত্তিক-পূজা এবং রথযাত্রায় অতিশয় উৎসাহ প্রকাশ করিতেন। গঙ্গাস্নান, গরদের যোড় পরিধান, শুভ্র উপবীত গুচ্ছ ধারণ, কপালে গণ্ডস্থলে হরিনামের ছাপ অঙ্কিত করা, এ সকলের প্রতি বড় অনুরাগ ছিল। তাহাতে যদিও অঙ্গরাগের প্রতি বালসুলভ বিলাস সৌন্দর্য্যানুরাগ প্রকাশ পাইত বটে, কিন্তু কে বলিতে পারে যে, তাহার ভিতর বালগোপাল শ্রীহরি বসিয়া কেশবাত্মাকে কি শিক্ষা দিতেন? | তাদৃশ অল্প বয়সে কোন রূপ অস্বাভাবিক ধর্ম্মভাণ দৃষ্টিগোচর হয় নাই। অবশ্য ইহা প্রকৃত ধর্ম্মের লক্ষণ বলিয়া গণ্য না হইতে পারে, কেন না, তাঁহার ধর্ম্মচরিত্রের বিকাশ স্বয়ং বিধাতার পরি-চর্য্যায় নৈসর্গিক নিয়মাধীনেই সুসম্পন্ন হইয়াছিল; কিন্তু কেশবের নীতি চরিত্র প্রথম হইতেই বড় বিশুদ্ধ ও নির্ম্মল। কোন দুশ্চরিত্র মন্দ বালক তাঁহার সঙ্গে মিশিতে সাহস করিত না। তিনি তাহাদের সাহায্যে বাল্যলীলা-ক্ষেত্রে নিজ অভিপ্রায় সাধন করিয়া লইতেন, অথচ তাহাদের সংসর্গ হইতে সর্ব্বদা সাবধানে দূরে থাকিতেন। এই খানেই আমরা

তাঁহার জীবনের স্বর্গীয় এবং বিশেষ মহত্ত্ব দেখিতে পাই। চারি দিকে মন্দচরিত্র বালক এবং তাহাদের কুদৃষ্টান্ত, কিন্তু কেশবচরিত্র তাহাদের মধ্যে থাকিয়াও নির্দ্দোষ পবিত্র। যে সকল দুষ্ট বালক ধর্ম্মের বেশভূষা পরিয়া তাঁহার প্রিয় হইবার চেষ্টা করিত, তিনি কদাপি তাহাদের মোহে প্রবঞ্চিত হইতেন না। ফলতঃ কেশব অন্য বালকদিগের মত কাহারো সহিত মন খুলিয়া বেশী কথাবার্ত্তা কহিতেন না, এবং গলা-গলি ভাবে কাহারো সঙ্গে মিশিতেনও না, আপনাতে আপনি থাকিতেন। এ জন্য তাঁহাকে অহঙ্কারী বলিয়া সকলে নিন্দা করিত, কিন্তু সেটা বুঝিবার ভুল। কেন না, তিনি অন্য দিকে আবার প্রেমিকহৃদয় সারবান ব্যক্তি ছিলেন। তদীয় বিশেষ অনুগত চিরসহচর বাল্যবন্ধু মহাত্মা প্রতাপচন্দ্র বলেন, "বাল্য-কালে তিনি এত দূর উচ্চে উঠিয়াছিলেন যে, আমরা সম-বয়স্কের দল তাঁহাকে শ্রদ্ধা ও ভক্তি না করিয়া থাকিতে পারিতাম না। মনে হইত, যেন তিনি আমাদের শিক্ষক।" তিনি নিজস্বভাবে স্বাধীন ভাবে স্বতন্ত্র থাকিতেন, অথচ সঙ্গীদিগের প্রতি কখন দয়াহীন ছিলেন না। রাগ করিতে কেহ তাঁহাকে দেখে নাই; প্রকৃতি অতি কোমল এবং বিনম্র ছিল। তিনি যে সহচর বয়স্যগণের কিম্বা অন্য কোন অপরিচিতের সহিত গলাগলি ভাব করিতেন না, তাহার এক প্রধান কারণ লজ্জাশীলতা। এক দিকে চতুর বুদ্ধিমান্ কৌশলী দৃঢ়ব্রত, অপর দিকে লজ্জাশীল বিনয়ী; এই দুই

বিপরীত গুণ তাঁহাতে চিরদিন বিদ্যমান ছিল। অন্যের সহিত ঘনিষ্ঠ ভাবে না মিশিবার আর এক কারণ, তিনি সহজে কাহাকেও বড় বিশ্বাস করিতেন না। পরজীবনে বলিয়াছেন, ভাল বলিয়া যতক্ষণ কেহ আমার নিকট সপ্রমাণিত না হয়, ততক্ষণ আমি তাহাকে বিশ্বাস করিতে পারি না। বস্তুতঃ সচরাচর বালকেরা প্রথম বয়সে দৃশ্যতঃ যেরূপ সরল-স্বভাব তরলহৃদয় অমায়িক বলিয়া মনে হয়, তদ্রূপ তিনি ছিলেন না। এই জন্যই আত্মীয় সহচরেরা তাঁহাকে গর্ব্বিত মনে করিত। কিন্তু তিনি বাড়ীর অপরাপর সকলের নিকট অতিশয় প্রেমবান্ প্রিয়তম বালক ছিলেন। পাছে কেহ তাঁহাকে কুপথে লইয়া যায়, এই ভয়ে স্বভাবতঃ তিনি সর্ব্বদা স্বতন্ত্র থাকিতে বাধ্য হইতেন। গ্রামে, পরিবারে, বয়স্যমণ্ডলীতে এবং বিদ্যালয়ে সর্ব্বত্রই তিনি সকলের প্রিয় ছিলেন।

কেশবের ভবিষ্য জীবনের পূর্ব্বাভাস এই বাল্য জীবনের স্বাভাবিক ক্রিয়ার মধ্যে সকলে দেখিতে পাইবেন। কিন্তু তখন কে ভাবিতে পারিত যে, এই সামান্য নীল চস্‌মা নাকে বালক কেশব যৌবনে এক দিন টাউন হলে দাঁড়াইয়া শত সহস্র শ্রোতাকে মনোমুগ্ধকর বাগ্মিতাপ্রভাবে স্তম্ভিত করিয়া রাখিবে? বাল্যকালে যিনি কৃত্রিম ডিস্পেন্‌সেরী করিয়া ডাক্তারবেশে রোগীর বেশধারী সহচরদিগকে ঔষধ বিতরণ করিতেন, তিনি যৌবনে পদার্পণ করিতে না করিতে শত শত

পাপরোগাক্রান্ত শিক্ষিত যুবকের দল যে তাঁহার বেদীর চারিপার্শ্বে বসিয়া স্বর্গীয় নববিধানের পবিত্র অমৃত পানের জন্য আশার সহিত প্রতীক্ষা করিবে, ইহাই বা কে কল্পনা করিতে পারিত ? সেই সুন্দর-মূর্ত্তি ক্ষীণশরীর বালক যৌবনে কি অসাধারণ কীর্ত্তি সকল স্থাপন করিয়া গেল, কিরূপ দ্রুতগতিতে অপ্রতিহতভাবে মানসিক আধ্যাত্মিক উন্নতির মঞ্চে আরোহণ করিল, তাহা ক্রমশঃ আমরা বর্ণন করিব। কেশবের ঈশ্বরদত্ত সাধুগুণ যাহা কিছু ছিল, তাহা আপনা আপনি প্রকাশিত হইয়াছে। তিনি বাস্তবিক যাহা নহেন, কৃত্রিম উপায়ে তাহা কখন দেখাইতে চেষ্টা করেন নাই; আপনার নিকট তিনি আপনি সরল অকপট সত্যপ্রিয় ছিলেন। আপনাকে আপনি কেমন করিয়া চিনিতে, শিখাইতে এবং শাসনে রাখিয়া কর্ত্তব্যের পথে পরিচালিত করিতে হয়, তাহা তিনি ভালই জানিতেন। কলুটোলাস্থ সেনপরিবারমধ্যে এরূপ কথা প্রচলিত আছে যে, যখন কেশবের বয়ঃক্রম দুই কিম্বা আড়াই বৎসর, তখন তাঁহাকে মাতৃক্রোড়ে ক্রীড়া করিতে দেখিয়া পিতামহ রামকমল বলিয়াছিলেন, "এই শিশু সন্তান আমার গদিতে বসিবার উপযুক্ত হইবে।" শিশুর বাল্যসৌন্দর্য্যের মধ্যে অবশ্য তিনি এমন কিছু মহৎ লক্ষণ দেখিয়া থাকিবেন, যদ্দর্শনে এই ভবিষ্যদ্বাণী তাঁহার মুখ হইতে বিনির্গত হয়। কেশবচন্দ্রের কোন সমবয়স্ক কুটুম্বের মুখে শুনা গিয়াছে, পূজা পার্ব্বণ উপলক্ষে তিনি অভিভাবকদিগের সহিত মধ্যে মধ্যে

গৌরিভা গ্রামে যাইতেন। সৎ বিষয়ে অনুকরণপ্রবৃত্তি তাঁহার যথেষ্ট পরিমাণে ছিল। বালক কেশব একদা বিজয়া দশমীর দিন বয়স্যদিগকে লইয়া এক নগর-কীর্ত্তন বাহির করেন। কলার খোলা যোড়া দিয়া তাহাতে কয়েক খানি খোল, বাতাবি লেবুর খোসায় কর্ত্তাল প্রস্তুত হইল; পরে যজ্ঞডুম্বরের মালা গাঁথিয়া গলায় দিয়া, ছেঁড়া ন্যাকড়া দ্বারা এক একটী টিকী রচনা করিয়া, এক দল বালক কেশবের সঙ্গে ঐরূপ খোল কর্ত্তাল বাজাইতে বাজাইতে পথে বাহির হইল। গানটী এই,—"বাবাজী মজা নিচ্ছে। হাতে হরিনামের মালা ঘুর ঘুর ঘুর ঘুরছে। মাথায় চৈতন্য চুট্‌কি ফুর ফুর ফুর উড়ছে।" এই বালক কীর্ত্তনীয়া দলের নেতা বালক কেশব যে এক দিন বঙ্গীয় শিক্ষিত সহস্র সহস্র যুবককে হরিপ্রেমে মাতাইবে, আপনি নাচিয়া হাসিয়া কাঁদিয়া ভদ্র সভ্য লোকদিগকে নাচাইবে, হাসাইবে, কাঁদাইবে এবং মহা নগরের পথে মহা নগরকীর্ত্তনের দল বাহির করিবে, তাহাই বা কে তখন ভাবিয়াছিল ?

কিশোর কেশব

(১৮৫২ হইতে ১৮৫৯)

কেশবচন্দ্র যাহা কিছু শিখিতেন, তাহা অপরকে শিক্ষা দিবার জন্য অতিশয় ব্যগ্র হইতেন; এই এক তাঁহার বিশেষ গুণ। বয়োবৃদ্ধি সহকারে এই গুণ তাঁহার জীবনে বৃদ্ধি হইয়া আসিয়াছিল। যে বিষয়টী মনে ভাল বলিয়া বোধ হইত, তাহা তৎক্ষণাৎ শিখিয়া কার্য্যে পরিণত করিয়া এবং অপরকে শিখাইয়া তবে তিনি নিশ্চিন্ত হইতেন। তিনি সচরাচর এইরূপ বলিতেন, "আমার অন্তরে ব্লটীং কাগজের মত এক পদার্থ আছে, তাহা দ্বারা অন্যের সদ্‌গুণরাশি আমি সহজে শোষণ করিয়া লইতে পারি।" মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ বলেন, "আমাদের মনে কোন ভাব আসিলে তাহা পরিষ্কাররূপে প্রকাশ করিতে পারি না। যদি বা প্রকাশ করিতে সমর্থ হই, তাহা কাজে করিয়া উঠিতে পারি না। যদিও বা কাজে করিতে পারি, কিন্তু তাহা অন্যের দ্বারা করাইয়া লইতে পারি না। কিন্তু কেশব এ সমুদায়গুলিই পারিতেন।" বাস্তবিক এই মহদ্‌গুণ তাঁহাতে বহু পরিমাণে বিদ্যমান ছিল। টাউনহলে যে কোন তামাসা বা ভোজবাজী দেখিয়া আসিতেন, বাড়ীতে বয়স্য সহচরগণের সঙ্গে তাহা নিজে আবার সম্পন্ন করিতেন। বিদ্যালয়ে শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে অন্যকে শিক্ষা দিবার জন্য তাঁহার মনে বিশেষ একটী ব্যাকুলতা জন্মে। অন্তঃপুরবাসিনী

মহিলাদিগকে গ্রন্থ পড়িয়া শুনাইতেন, স্বতন্ত্র ক্লাস খুলিয়া বালকদিগকে শিক্ষা দিতেন। নানাবিধ বাজী তামাসা দেখাইয়া সময়ে সময়ে বাড়ীর মেয়ে ছেলেদিগকে তিনি চমৎকৃত করিতেন।

বর্ত্তমান আলবার্ট হল নামক গৃহে পূর্ব্বে একটী সামান্য পাঠশালা ছিল। যথারীতি সেই খানে কেশবের বিদ্যাশিক্ষা আরম্ভ হয়। তার পরে তিনি হিন্দুকালেজে প্রবেশপূর্ব্বক তথায় সেকেণ্ড সিনিয়ার ক্লাস পর্য্যন্ত পড়েন। বিদ্যালয়ের শিক্ষকদিগের নিকট বিশেষ প্রিয়পাত্র ছিলেন, এবং প্রতিবর্ষে যথাযোগ্য পারিতোষিক লাভ করিতেন। তদনন্তর উহার কর্ত্তৃপক্ষের সঙ্গে নগরের কোন এক সম্ভ্রান্ত ধনীর মনান্তর হয়, সেই জন্য তিনি "হিন্দু-মেট্রপলিটন্ কলেজ" নাম দিয়া আর একটী স্বতন্ত্র বিদ্যালয় স্থাপন করেন। কিছু দিনের জন্য সেই হিন্দু-মেট্রপলিটন্ কলেজে কেশব পড়িয়াছিলেন। এই বিদ্যালয়টি তৎকালে গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে স্থাপিত হয়। অল্প দিন মাত্র তাহা জীবিত ছিল। সেখানে লেখা পড়া ভাল চলিত না। সুতরাং ছাত্রদিগের তাহাতে পাঠের অতিশয় ব্যাঘাত জন্মিয়াছিল। কারণ, ইহার কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা স্বীয় সঙ্কল্পে শীঘ্র শীঘ্র কৃতকার্য্য হইবাব জন্য, নিম্ন শ্রেণীর ছাত্রদিগকে উচ্চ শ্রেণীতে ভর্ত্তি করিতেন। তাহাতে বড় বড় গ্রন্থ যথা,—সেক্সপিয়র, মিল্টন, বেকন ইত্যাদি পাঠ্য ছিল। স্বাভাবিক নিয়মে যাহা তিন বৎসর পরে পাঠ করা উচিত, বাধ্য হইয়া কেশব তাহা এখন অসময়ে পড়িতে লাগিলেন। তাঁহার বুদ্ধি-প্রতিভা যথেষ্ট ছিল, এই

ঐ সকল উচ্চ সাহিত্য অতি যত্নের সহিত তিনি আয়ত্ত করিতে পারিয়াছিলেন ; কিন্তু শিক্ষাপ্রণালীর দোষে তাঁহার গণিত-শিক্ষার পক্ষে বিশেষ ব্যাঘাত জন্মে। সাহিত্যের প্রতি অধিক মনোযোগ দিতে হইত, সুতরাং দর্শন এবং উচ্চতর অঙ্কশাস্ত্র শিক্ষা বিষয়ে সমূহ ব্যাঘাত ঘটিল। পরিশেষে এই কারণে গণিত-শিক্ষা সম্বন্ধে এককালে তিনি ঔদাসীন্য ভাব অবলম্বন করেন।

মেট্রপলিটন্ কলেজ অর্থাভাবে যখন উঠিয়া গেল, তখন কেশবচন্দ্র সবান্ধবে পুনরায় ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে হিন্দু কলেজে ভর্ত্তি হইলেন। এত দিন এখানে থাকিলে অনায়াসে জুনিয়ার ছাত্র-বৃত্তি লাভ করিয়া উচ্চ শ্রেণীতে উঠিতে সক্ষম হইতেন এবং কলেজের শিক্ষা এবং পরীক্ষা বিষয়ে এক জন বিখ্যাত হইতে পারিতেন, কিন্তু অভিভাবকদিগের বিবেচনার ত্রুটিতে তাহা হইল না। অধিকন্তু চিরদিনের মত গণিত-শিক্ষার ক্ষমতা তাঁহার নষ্ট হইয়া গেল। যাহা হউক, পুনর্ব্বার হিন্দু কলেজে ভর্ত্তি হইয়া প্রচুর অধ্যবসায়েব সহিত তিনি পাঠ অভ্যাস করিতে লাগিলেন। অল্পকাল মধ্যে ইংরাজি সাহিত্যে সমধিক ব্যুৎপত্তি জন্মিল, ইতিহাসেও মন্দ নয়, মনোবিজ্ঞান এবং নীতিবিজ্ঞান ভাল রূপেই শিখিলেন। রসায়ন-শিক্ষার প্রতি তাঁহার বিশেষ অনুরাগ ছিল, তজ্জন্য অনেক টাকা দিয়া এক প্রস্থ যন্ত্রাদি ক্রয় করেন। তাঁহার হস্তলিপি তখন হইতেই অতি সুন্দর এবং পরিষ্কার।

১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে যে সময় কেশবচন্দ্র সিনিয়ার ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষার পাঠ্য (এখনকার আই এ, পাঠ্যের সমান) অধ্যয়নে নিযুক্ত ছিলেন, সেই কালে একটী দুর্ঘটনা উপস্থিত হয়, যাহাতে তিনি রীতিপূর্ব্বক অধ্যয়ন একবারে ছাড়িয়া দেন। পরীক্ষাপ্রহরী কোন শিক্ষক পরীক্ষার দিন পার্শ্বস্থ অন্য একটী ছাত্রের কাগজের সহিত তাঁহার কাগজ মিলাইতে দেখেন, তজ্জন্য তিনি কেশবকে ভৎর্সনা করেন এবং অবশিষ্ট পরীক্ষাদানের যোগ্যতা হইতে তাঁহার নাম কাটিয়া দিবার ভয় দেখান। এই নিয়ম-ভঙ্গ-দোষে অন্য ছাত্র ও তাঁর মধ্যে কে প্রথম অপরাধী, তাহার কোন নিশ্চয় মীমাংসা হয় নাই। যাহাই হউক, কেশব এ জন্য মনে বড় আঘাত পান। পরে যদিও তিনি ক্লাসে পুনঃ-প্রবেশের অনুমতি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু তাহাতে তাঁহার চিত্ত প্রসন্ন হয় নাই। সুতরাং কলেজের বিদ্যা উপাধি লাভের আশা পরিহারপূর্ব্বক, এই সময় হইতে তিনি তত্ত্বজ্ঞান উপার্জ্জনের জন্য নূতন পন্থা অবলম্বন করিলেন। ইহাতে সহাধ্যায়ী এবং শিক্ষক অধ্যাপক সকলেই বড় ক্ষুব্ধ হন; কেন না, কেশব সাধারণতঃ সকলেরই অতিশয় প্রিয় ছিলেন। অনন্তর পরীক্ষা-পাঠ্য বিশেষতঃ গণিত-শিক্ষা পরিত্যাগ করিয়া, অবশিষ্ট দুই বৎসর কাল তিনি তথায় কেবল বিজ্ঞান সাহিত্যাদি অধ্যয়নে নিযুক্ত থাকেন।

১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে কেশবের বিদ্যালয়ের অধ্যয়ন পরিসমাপ্ত হয়। ৫৬ সন হইতে ৫৮ সন এই দুই বৎসর কাল প্রধানতঃ

তিনি উক্ত কলেজের লাইব্রেরিতে বসিয়া কেবল মনোবিজ্ঞান এবং নীতিবিজ্ঞান পাঠ করিতেন। যাহা যখন তিনি করিতেন, তাহাতে সুচারু নিয়ম-শৃঙ্খলা থাকিত। তৎকালীন দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপক জন্ সাহেব তাঁহার জ্ঞানোন্নতি বিষয়ে বিশেষ সহায় ছিলেন, তজ্জন্য তাঁহার প্রতি তিনি সমধিক আনুগত্য প্রদর্শন করিতেন। অল্প বয়সে দর্শনবিজ্ঞানে অনুরাগী দেখিয়া অপর ছাত্রেরা তাঁহাকে এক জন বিজ্ঞানী পণ্ডিত মনে করিত। বাল্যকাল হইতেই কেশব বড় গম্ভীর-স্বভাব, এ সময়ে সে ভাব আরো কিছু পরিবর্দ্ধিত হয়। তাই সমবয়স্কেরা তাঁহাকে এই ভাবে দেখিত। ইতঃপূর্ব্বে যা কিছু সামান্য বালসুলভ চাঞ্চল্য এবং আমোদস্পৃহা তাঁহার ছিল, এখন তাহাও চলিয়া গেল। অতি অল্প বয়সেই তিনি মৎস্যভক্ষণ ত্যাগ করেন। বৈষ্ণব পরিবারের সন্তান, সুতরাং মাংসের সহিত কোন কালেই সংস্রব ছিল না। চতুর্দ্দশ বৎসর বয়সে একবার তাঁহার জলবসন্ত হয়, তাহাতে মৎস্যভক্ষণ নিষেধ; তদুপলক্ষে তিনি চিরকালের মত আমিষ-ভোজন ত্যাগ করেন। পরে ব্রতধারী সাধকের পক্ষে মৎস্য-মাংস-পরিহার নিতান্ত প্রয়োজন মনে করিতেন। এক্ষণে তিনি পূর্ব্বাপেক্ষা আরো চিন্তাশীল গম্ভীর এবং নির্জ্জনতা-প্রিয় হইলেন। যৌবনের প্রারম্ভে অধিক-বয়স্ক বিজ্ঞ জ্ঞানীদিগের সহবাস, বিজ্ঞানগ্রন্থ-পাঠ, নির্জ্জনচিন্তা, এই সকল তাঁহার বড় ভাল লাগিত। এই জন্য পৃথিবীর বিদ্যা উপাধি সম্মানের আশা এবং সুখবিলাস আমোদ

ক্রীড়া কৌতুক ভোগস্পৃহা পরিত্যাগ করতঃ, তিনি ক্রমশঃ নৈতিক-চরিত্র-সংগঠনে এবং তত্ত্বজ্ঞানান্বেষণে প্রবৃত্ত হইলেন।

তরুণ কেশব

বড় ঘরের ছেলেরা যৌবনে পদার্পণ করিয়া সচরাচর যেরূপ আমোদপ্রিয়, উন্মার্গগামী হইয়া অসৎসঙ্গে বিচরণ করে, দয়াময় ভক্তবিঘ্নহারী ভগবান্ ইঁহাকে প্রথম হইতেই সে সকল প্রলোভন হইতে দূরে রাখিয়াছিলেন। পাপ দুর্নীতির প্রতি এমন এক স্বাভাবিক ঘৃণার ভাব তাঁহার মনে ছিল যে, সে পথে গমন করিতে কখন ইচ্ছা হইত না। ঈদৃশ আন্তরিক পুণ্যানুরাগ বশতঃই তিনি শেষ দিন পর্য্যন্ত সমবয়স্ক সহচর ও ধর্ম্মবন্ধুগণের নিকট শ্রদ্ধা ভক্তি আকর্ষণ করিয়া গিয়াছেন। মিতাচারিতা তাঁহার চরিত্রের একটি বিশেষ গুণ। বিবেকের ইঙ্গিত শুনিয়া শুনিয়া সমস্ত কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে শিখিয়াছিলেন, এই কারণে স্বভাব চরিত্রে কোন গুরুতর দোষ স্পর্শ করিতে পারে নাই। তাঁহার আমোদ বিলাস, গৃহধর্ম্মপালন, গ্রন্থাধ্যয়ন সকলই ধর্ম্মপথের অনুকূল ছিল।

১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রেল মাসে, বালিগ্রামে, শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ মজুমদারের নবমবর্ষীয়া সুলক্ষণাক্রান্তা জ্যেষ্ঠা কন্যার সহিত কেশবচন্দ্রের বিবাহ হয়। নিজ ইচ্ছায় তিনি এ বিবাহ করেন নাই। তখন তিনি অভিভাবকদিগের অনুগত অধীন, তাঁহারা যাহা ভাল বুঝিয়াছেন, তাই করিয়াছেন। কিন্তু এই বাল্যবিবাহ এবং তৎপরবর্ত্তী তিন চারি বৎসরের বৈবাহিক জীবন যে তিনি হৃদয়ের সহিত সম্ভোগ করেন নাই, জীবনবেদের লিখিত তাঁহার স্বমুখবিনিঃসৃত উক্তিই তাহার সুস্পষ্ট প্রমাণ। বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া যে পর্য্যন্ত তিনি আপনার স্বাধীন ধর্ম্মমতানুসারে চলিতে আরম্ভ না করিয়াছেন, তত দিন অভিভাবকদিগের অধীনে, ইচ্ছায় হউক, অনিচ্ছায় হউক, তাবৎ কার্য্য কর্ত্তব্য-বোধে সম্পন্ন করিতেন। বিবাহের এক বৎসর পর তাঁহার মনে বৈরাগ্যের ভাব অতিশয় প্রবল হইয়া উঠে। ইহাতে বালিকা স্ত্রীর মনে অনেক দুঃখ অশান্তি হইয়াছিল, সন্দেহ নাই। কিন্তু এই অবস্থাটীকে কেশবের ভবিষ্যৎ ধর্ম্মজীবনের পত্তন-ভূমি বলিয়া জানিতে হইবে। জ্ঞান বিজ্ঞানের গভীর তত্ত্ব শিক্ষা করিয়া যাঁহাকে পবিত্র গার্হস্থ-বৈরাগ্যের নবীন দৃষ্টান্ত দেখাইতে হইবে, সাধারণ যুবার ন্যায় সুখপ্রিয় বিলাসী স্ত্রৈণ হইলে তাঁহার চলিবে কেন? বিবাহের পর কয়েক বৎসর ধরিয়া তাঁহার মনে বিশুদ্ধ নীতির এমন এক প্রবল উচ্ছ্বাস উঠিয়াছিল যে, তাহা তিনি কিছুতেই অতিক্রম করিতে পারিতেন না। তদীয় সহোদর, আত্মীয়গণ ঈদৃশ পরিবর্ত্তন

দর্শনে উপহাস এবং তর্ক বিতণ্ডা করিতেন, কিন্তু কেহই কেশবকে সঙ্কল্পভ্রষ্ট করিতে পারেন নাই। যে কালে যুবকদল ইন্দ্রিয়বিলাসে মত্ত হইয়া মানব-জীবনের উচ্চ লক্ষ্য বিস্মৃত হয় এবং অন্ধের ন্যায় সংসারের দিকে বেগে দৌড়িতে থাকে, সেই কালে কেশবচন্দ্র পৃথিবীর দিকে বিমুখ হইয়া স্বর্গাভিমুখে জীবনগতি ফিরাইয়াছিলেন। অথবা যে বিশেষ কার্য্যের জন্য তাঁহার জন্ম, স্বয়ং বিধাতা হস্তধারণপূর্ব্বক সে জন্য তখন তাঁহাকে প্রস্তুত করিতেছিলেন।

কেশবচন্দ্রের প্রথম জীবন নীতিপ্রধান ছিল, অর্থাৎ নৈতিক বিশুদ্ধতা ও সচ্চরিত্রতার প্রতি তিনি বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়া চলিতেন। কিন্তু তাঁহার সে নীতি ধর্ম্মবিশ্বাসবিহীন কিম্বা উপাসনাবিহীন নহে। ধর্ম্মহীন আধুনিক সভ্য নীতির প্রতি কোন সময়েই তাঁহাব আস্থা ছিল না; বরং নীতিপ্রধান ধর্ম্মের প্রতি টান চিরদিন তিনি দেখাইয়া গিয়াছেন। ধর্ম্মশিক্ষা এবং ধর্ম্ম-দীক্ষাব পূর্ব্বে স্বভাবতঃ প্রার্থনাশীলতা এবং নীতিপরায়ণতা এই দুইটী দেবলক্ষণ তাঁহার চরিত্রে ফুটিয়া উঠিয়াছিল। এক স্থানে তিনি বলিয়াছেন, "যথার্থ ধর্ম্ম কোন্‌টী, প্রকৃত ধর্ম্ম-সমাজ কাহাকে বলে, তাহা আমি জানিতাম না। কেন আমি প্রার্থনা করি, তাহাও জানিতাম না। কিন্তু যখন প্রথমে আদেশালোক আমার নিকট আসিল, আমি এই বাণী শুনিলাম,—প্রার্থনা কর! প্রার্থনা কর! প্রার্থনা বিনা অন্য গতি নাই।"

আর এক স্থানে এইরূপ বলিয়াছেন,—"বৈরাগ্যের ভাব লইয়া আমি সংসারে প্রবেশ করি।' ঈশ্বরের গৃহে কঠোর নৈতিক শাসনাধীনে আমার দাম্পত্যপ্রেমোৎসব অতিবাহিত হয়।" এ কথায় বাস্তবিকই কিছু মাত্র অত্যুক্তি নাই। যৌবনে পদার্পণ করিয়া প্রথমে তিনি চারি বৎসর কাল ক্রমাগত তিনি বৈরাগী ঋষির ন্যায় একাকী ধর্ম্মচিন্তা এবং শাস্ত্রানুশীলনে রত ছিলেন। সদা সর্ব্বদা প্রায় নির্জ্জনবাস করিতেন। বয়স্থ সহচরবৃন্দের সঙ্গ ভাল লাগিত না। তাহাদের সঙ্গে মিশিয়াও অধিক কথাবার্ত্তা কহিতেন না। এমন কি, সে অবস্থায় বিবাহিতা ধর্ম্মপত্নীর সঙ্গেও ভাল করিয়া দেখা সাক্ষাৎ কিংবা বাক্যালাপ ঘটিত না। তাঁহার সমবয়স্ক বন্ধুগণ এ সব কথার সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছেন। বৃথা আলাপ, বেশী কথাবার্ত্তায় বিরত দেখিয়া সহচর যুবকগণ মনে করিত, কেশব বড় অহঙ্কারী। অধিক শিষ্টাচার লৌকিকতা ছিল না বলিয়া এই অপবাদ তাঁহাকে চিরদিন বহন করিতে হইয়াছে। কোন কোন পদস্থ ব্যক্তি দেখা করিতে আসিয়া হঠাৎ তাঁহার অন্তরে প্রবেশ করিতে পারিতেন না, সে জন্য তাঁহারা কিছু বিরক্ত হইতেন। বস্তুতঃ শান্তস্বভাব এবং গাম্ভীর্য্য বশতঃ তাঁহার লৌকিক আচার ব্যবহার অপরিচিত স্থলে সাধারণতঃ কোন কালেই বড় প্রীতিকর ছিল না। কিন্তু ভবিষ্যৎ মহজ্জীবনের পক্ষে এরূপ চিন্তাশীল মিতভাষী হওয়া তখন যে নিতান্ত সঙ্গত, তাহা আর কে অস্বীকার করিবে? হৃদয়ের মধ্যে বৈরাগ্যের নবানুরাগ

যখন অঙ্কুরিত হয়, তখন বাহ্যাড়ম্বর সহজেই কমিয়া আইসে। তরুণ বয়সে এরূপ গাম্ভীর্য্য অবশ্য দেখিতে আপাততঃ অস্বাভাবিক বলিয়া মনে হইতে পারে। কিন্তু যাহার ভিতরে দেবাসুরের সংগ্রাম চলিতেছে, সেই কেবল জানে, কেন সে অধিক কথা কয় না। যে মহাব্রত তিনি পবজীবনে পালন করিয়া গিয়াছেন, তাহার পক্ষে এ প্রকাব কঠোর সংযম নিতান্ত স্বাভাবিক। এই জন্যই তিনি সচরাচর বলিতেন, "একবার সন্ন্যাসী না হইলে গৃহধর্ম্ম কেহ প্রতিপালন করিতে পারে না। শ্মশানের ভিতর দিয়া না গেলে কৈলাসশিখরে আবোহণ করা যায় না।"

জীবনবেদের চতুর্থ অধ্যায়ে আর এক স্থানে তিনি নিজমুখে ব্যক্ত করিয়াছেন ;—"চতুর্দ্দশ বৎসরেই বৈরাগ্যের প্রথম সঞ্চার হইল। যখন ধর্ম্ম বৃদ্ধি হইতে লাগিল, উপাসনা আরম্ভ হইল, ঈশ্বরের পদতলে আশ্রয় পাইলাম, তখন পূর্ব্বকার মেঘ যাহা অঙ্গুলীর মত জীবনাকাশে দেখা দিয়াছিল, যাহা কেবল মৎস্য-পরিত্যাগেই পরিসমাপ্ত ছিল, সেই মেঘ ঘনীভূত হইল।"

অতি অল্প বয়সেই এইরূপে ধর্ম্মে মতি হওয়াতে পাপ প্রলোভন তাঁহার কিছু করিতে পারে নাই। যে সময় মত্ত হস্তীর ন্যায় প্রবল রিপুগণ জীবদিগকে লইয়া ক্রীড়া করে, সেই কালেই তিনি বৈরাগ্যের পথ ধরেন ; সুতরাং বিলাসপ্রিয় যুবাদিগের ন্যায় তাঁহাকে কখনই কলঙ্কিত হইতে হয় নাই। লোকের অজ্ঞাতসারে ভগবান্ এই ভাবে তাঁহার প্রিয় দাসকে

তিনি নিজকার্য্যে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন। অষ্টাদশবর্ষীয় যুবার এরূপ অসাধারণ ধর্ম্মানুরাগ, বৈরাগ্যনিষ্ঠা দেখিয়া পরিবারস্থ অভিভাবকগণ নানা কথা আলোচনা করিতে লাগিলেন। কিন্তু ভগবান্ যাহাকে স্বহস্তে ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকের কার্য্যের জন্য গঠন করিতেছেন, অসার লোকগঞ্জনায় তাহার কি করিবে? দেখিতে দেখিতে স্বর্গের জ্যোতি ক্রমে জ্বলিয়া উঠিল। পৃথিবীর বহু-লোক যে পথে চলে, তাহা ছাড়িয়া কেশবচন্দ্র সঙ্কীর্ণ দ্বার দিয়া এক নূতন পথে চলিতে আরম্ভ করিলেন। কেহ গুরু হইয়া তাঁহাকে সৎ শিক্ষা দেয় নাই কেবল তাহা নহে, বরং বাধা দিয়া সৎ পথ হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিবার জন্য অনেকে যথা-শক্তি চেষ্টা পাইয়াছে। তথাপি দৈবের কি নির্ব্বন্ধ, বিধাতার কি বিচিত্র লীলা, আপনাপনি তিনি দ্রুতপদে বিধিনিয়োজিত পথে অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

এই অবস্থায় কেশবচন্দ্র মনোযোগপূর্ব্বক ধর্ম্মগ্রন্থসকল পাঠ করিতেন, এবং তদ্বিষয়ে গভীর গবেষণায় মগ্ন থাকিতেন। চিন্তা ও অধ্যয়ন করিতে করিতে সুখবিলাস ও আমোদ বিহারের প্রতি উত্তরোত্তর অতিশয় উপেক্ষা জন্মিল। তখন তাঁহাকে সর্ব্বদা বিষণ্নমনা অপ্রফুল্ল-চিত্তের ন্যায় দেখা যাইত। মনের গতি এ পৃথিবী ছাড়িয়া যেন আর এক নূতন রাজ্যে বিচরণ করিত। গ্রন্থপাঠ অপেক্ষা আত্মচিন্তার ভাগ তাঁহার অনেক বেশী ছিল। অতঃপর এক দিকে পার্থিব ভোগবাসনা, ধন-মান-সম্ভ্রমলালসা, অপর দিকে প্রবল ধর্ম্মপিপাসা, স্বর্গীয় উচ্চাভি-

লাষ; এই উভয় দলে ঘোরতর সংগ্রাম বাধিল। এই কারণে যুবক কেশবচন্দ্রের মুখচন্দ্র ম্লান, ব্যবহার আচরণ ব্রতধারী সাধকের ন্যায় দৃষ্ট হইত। পূর্ব্বকালে আর্য্যগণ গুরুগৃহে কঠোর ব্রত সাধনপূর্ব্বক বিদ্যা শিক্ষা করিয়া পরে গৃহাশ্রমে ফিরিয়া আসিতেন, ভগবান্ স্বয়ং গুরু হইয়া কেশবচন্দ্রকে সেই প্রণালীর ভিতর দিয়া আনিয়াছেন। ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ এবং আত্মচিন্তা করিতে করিতে তিনি ধর্ম্মজীবনে প্রবেশ করেন।

নিজের বিশেষ চিহ্নিত ধর্ম্মদীক্ষা এবং ধর্ম্ম-প্রচারে প্রবৃত্ত হওয়ার পূর্ব্বে, কতিপয় ক্ষুদ্র সভা এবং জ্ঞান ও নীতি শিক্ষা-দানার্থ একটি বিদ্যালয় তিনি নিজভবনে স্থাপন করিয়াছিলেন।

রেভারেণ্ড ডাল, উড্র এবং লং সাহেবের সহানুভূতি ও সাহায্যে সাহিত্য ও বিজ্ঞান আলোচনার জন্য কেশব প্রথমে হিন্দু কলেজ থিয়েটরগৃহে "ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসায়েটী" নামে একটী সভা স্থাপন করেন। কলেজের জনৈক অধ্যাপক সাহেব তাহার সভাপতি ছিলেন। এখানে সময়ে সময়ে ধর্ম্মবিষয়েও তর্ক ও আলোচনা হইত। ডাল সাহেব ও লং সাহেব তদুপলক্ষে ঘোরতর-রূপে মতামত লইয়া বিবাদ করিতেন। এ সভার আলোচ্য বিষয় কেশবই সমস্ত ঠিক করিয়া দিতেন। ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে জ্ঞান বিতরণ এবং নীতি শিক্ষা দিবার জন্য যে দাতব্য নৈশবিদ্যালয় কলুটোলার সেনভবনে সংস্থাপিত হয়, তাহা এই সভারই কার্য্যফল। এখানে কেশব ছিলেন রেক্টর; তাঁহার অধীনে প্রতাপচন্দ্র মজুমদার প্রভৃতি কয়েক জন শিক্ষক প্রতিবাসী বিদ্যার্থীদিগকে

জ্ঞান এবং নীতি শিক্ষা দিতেন। রেক্টর স্বয়ং উচ্চতর ইংরাজি সাহিত্য শিখাইতেন এবং মাঝে মাঝে ধর্ম্মোপদেশ দিতেন। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগকে পারিতোষিক দিবার সময় সম্ভ্রান্ত ইংরাজদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনা হইত।

সেক্সপিয়ার পড়ার প্রথা এ সময় বড় প্রচলিত ছিল। ক্যাপ্টেন রিচার্ডসন্ এই রুচির প্রথম প্রবর্ত্তক। কেশব কেবল ইহা পড়িতেন না, মধ্যে মধ্যে ইহার নাট্যাভিনয়ও প্রদর্শন করিতেন। একবাব নিজে হ্যামলেট সাজিয়া পৈতৃক বাস গৌরিভা গ্রামে অভিনয় করেন। চিত্রপট, রঙ্গমঞ্চ সমস্ত তাঁহার নিজ-কৃত। তাদৃশ অল্প বয়সে সুবিখ্যাত কবিবরের রচিত নাটকের অভিনয় সম্পাদন করা সামান্য ক্ষমতার কার্য্য নহে। এ সম্বন্ধেও তাঁহার উৎসাহ ও নিপুণতা যথেষ্ট ছিল। নাট্যাভিনয়ের উপকারিতা তিনি নবসংহিতায় পর্য্যন্ত লিখিয়া গিয়াছেন। আমোদ উপলক্ষেও যাহাতে লোকে জ্ঞান ধর্ম্ম নীতির উৎকর্ষ সাধন করিতে পারে, তদ্বিষয়ে তাঁহার অনেক উপদেশ আছে। উক্ত নীতিবিদ্যালয় তিন বৎসর কাল ছিল, তাহাতে বেশ কাজ হইত। নিঃস্বার্থভাবে পরসেবায় কিরূপে আত্মত্যাগ করিতে হয়, তাহার দৃষ্টান্ত কেশব প্রথমে এই খানে প্রদর্শন করেন। তাঁহার এই সাধু দৃষ্টান্ত যুবক সহচর বন্ধুগণ ক্রমাগত অনুসরণ করিয়া আসিয়াছেন। ধর্ম্মপ্রচারব্রতের তিনিই এ যুগের প্রথম প্রতিষ্ঠাতা। পরে এই স্কুলের উচ্চ শ্রেণীর ছাত্র এবং শিক্ষকদিগকে লইয়া ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে ধর্ম্মালোচনার জন্য "গুড্ উইল্ ফ্রেটার্নিটী"

নামক সভা হয়। এই খানে প্রথমে কেশব মুখে মুখে ইংরাজি বক্তৃতা দিতে অভ্যাস করেন। মধ্যে মধ্যে ধার্ম্মিক গ্রন্থকারদিগের পুস্তক হইতে প্রত্যাদেশ ইত্যাদি প্রবন্ধ পাঠও করিতেন। পড়িবার কিম্বা বলিবার সময় তাঁহার চক্ষে এবং মুখমণ্ডলে যেন জ্বলন্ত উৎসাহের জ্যোতি প্রতিভাত হইত। সময়ে সময়ে বক্তৃতা করিতে করিতে গলা ভাঙ্গিয়া যাইত। অনেক ক্ষণ ধরিয়া বড় বড় লম্বা বক্তৃতা করিতেন। তখন জলের মত অনর্গল ইংরাজি শব্দ সকল তাঁহার মুখ দিয়া বাহির হইত।

এই সময় অর্থাৎ ব্রাহ্ম হইবার পূর্ব্বে তিনি আর ছয়টী সমবয়স্ক সঙ্গীকে লইয়া বাড়ীর এক দ্বারবদ্ধ নির্জ্জন গৃহে এক দিন প্রার্থনার সভা করেন। অন্ধকার ঘর, দরজা বন্ধ, একটি প্রদীপ মিট মিট করিয়া জ্বলিতেছে; সভয়ে তন্মধ্যে বসিয়া প্রতিজনে গম্ভীর ভাবে এক একটি প্রার্থনা করিলেন। পরে কেশব কিছু বলিলেন। তাঁহার কথা শুনিয়া সঙ্গী যুবকেরা কাঁদিতে লাগিল এবং উচ্ছ্বসিত হৃদয়ে অস্ফুট স্বরে, কেহ বা উচ্চ রবে তাহাতে সায় দিতে লাগিল। এইরূপে প্রথম প্রার্থনা-সভার আশ্চর্য্য ফল ফলিয়াছিল। ইহা যে কি এক স্বর্গীয় জীবন্ত ধর্ম্মের অনুষ্ঠান, তাহা আমরা তাঁহার পরজীবনের উপাসক-মণ্ডলীর ভাব স্মরণ করিয়া কতকটা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি।

দুই বৎসর কাল "গুড্ উইল্ ফ্রেটার্নিটী" সভা ছিল। তাহাতে কেশবচন্দ্রের মুখে নবানুরাগপূর্ণ ইংরাজি মৌখিক

বক্তৃতা শুনিয়া যুবকেরা উৎসাহে মাতিয়া উঠিত। ইহা বৃথা বাক্য মাত্র নয়, তদ্দারা বিশ্বাস বৈরাগ্য বিবেকের তেজ অন্য জীবনে সংক্রামিত হইত।

এই সভায় মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ সহসা এক দিন উপস্থিত হইয়া সভ্যদিগকে উৎসাহিত করিয়া যান। তিনি তৎকালে যৌবন-সম্পন্ন সুন্দর সতেজ পুরুষ। সভ্যদিগের মধ্যে কেহ তখন ব্রাহ্মসমাজের বিষয় ভাল জানিতেন না। পরে সংগোপনে ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে অঙ্গীকার-পত্রে স্বাক্ষর করিয়া কেশবচন্দ্র ব্রাহ্মসমাজের সভ্য হন। তখন মহর্ষি সিমলা পর্ব্বতে ছিলেন। এই দীক্ষা-গ্রহণে কেবল এই মাত্র ব্যক্ত ছিল,—"আমি ব্রাহ্মধর্ম্মের মূল সত্য স্বীকারপূর্ব্বক তাহাতে বিশ্বাস প্রকাশ করিলাম।" এক স্থানে তিনি বলিয়াছেন, "দর্শনশাস্ত্রানুশীলন দ্বারা সর্ব্বাগ্রে আমি অন্তর্দৃষ্টি এবং চিন্তাশক্তি লাভ করি এবং বাহির হইতে অন্তর্মুখে অগ্রসর হই। এইরূপে নিজের অবস্থা, চরিত্র এবং নিয়তি অধ্যয়ন বিষয়ে আমার প্রবৃত্তি জন্মে।" বস্তুতঃ তিনি এ সময় গ্রন্থপাঠে সর্ব্বদা নিমগ্ন থাকিতেন। প্রতিদিন ১১টা হইতে সন্ধ্যা ৫টা পর্য্যন্ত মেট্‌কাফ্ হল পাবলিক্ লাইব্রেরীতে গিয়া গভীর একাগ্রতা সহকারে ক্রমাগত পড়িতেন। ধর্ম্ম-বিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান, বিশেষরূপে দার্শনিক ইতিহাস-পাঠে তাঁহার বড় আনন্দ জন্মিত। মিল্টন্, ইয়ং, সর্ব্বোপরি সেক্স-পিয়র্ কেশবের অতীব প্রিয়পাঠ্য ছিল। কিন্তু গল্প, উপন্যাস পাঠে তিনি বড় ঘৃণা প্রকাশ করিতেন। মনোবিজ্ঞানবিদ্ সার্

উইলিয়ম্ হ্যামিল্টন্, ভিক্টর্ কুজিন্, মোরেল্ এবং ম্যাক্স্, পার্কার, মিস্ কব্, ইমার্শন্ প্রভৃতির গ্রন্থ সে সময়ে তাঁহার নিত্য পাঠ্য ছিল। ব্রাহ্মধর্ম্ম-গ্রহণের পূর্ব্বে তিনি বাইবেল্ এবং ইংরাজি দর্শন, বিজ্ঞান ও উপদেশ-পাঠে একেশ্বরবাদে বিশ্বাসী হন। তদনন্তর রাজবল্লভ পণ্ডিত নামক জনৈক পুরাতন ব্রাহ্মের সাহায্যে ব্রাহ্ম-সমাজের দুই খানি বাঙ্গালা পুস্তক পাঠ করিয়া দেখিলেন যে, উহা তাঁহার মত ও বিশ্বাসের অনুরূপ। এক অদ্বিতীয় নিরাকার ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা ভিন্ন পরিত্রাণ নাই, এই প্রত্যাদেশ-বাণী তিনি ইতঃপূর্ব্বেই প্রাপ্ত হন। তদনন্তর গোপনে উক্ত অঙ্গীকার-পত্রে স্বাক্ষর করেন।

দেবেন্দ্র বাবু যখন শুনিলেন, কেশব ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া-ছেন, তখন তাঁহার মনে আশাতীত আনন্দ লাভ হইল। পরে কেশবেব সহাধ্যায়ী সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মুখে তদীয় গুণগ্রামের বিশেষ পরিচয় তিনি প্রাপ্ত হন। অতঃপর দুই জনে ক্রমশঃ নিকটতর ঘনিষ্ঠযোগে এক সঙ্গে ব্রাহ্মসমাজের কার্য্য করেন।

ধর্ম্মজীবনের উন্মেষ

কেশবচন্দ্রের গ্রন্থপাঠ বিদ্যার জন্য নহে, ধর্ম্মের জন্য। অপরাপর পাঠ্য পুস্তকের সঙ্গে বাইবেলের সহিত তাঁহার পরিচয় হয়। এই বাইবেল্ তাঁহার যে কিরূপ প্রিয় গ্রন্থ ছিল, তাহা আর বলা যায় না। তিনি মনে করিতেন, এবং স্পষ্ট

বলিতেন, বাইবেল না হইলে মানুষের চলে না। বাস্তবিক খ্রীষ্টধর্ম্মী না হইয়া এমন আশ্চর্য্যরূপে বাইবেল পাঠ এবং ব্যাখ্যা করে এবং তাহার রসে মজিয়া যায়, এমন লোক আমরা কোথাও দেখি নাই। তিনি যে খ্রীষ্টধর্ম্মের প্রকৃত তাৎপর্য্য বুঝিয়া তাহার গূঢ় আধ্যাত্মিক অর্থ প্রচার করিয়া গিয়াছেন, এ কথা খ্রীষ্টভক্তদিগকে এক দিন স্বীকার করিতেই হইবে। ইতিপূর্ব্বে কিছু দিন পাদরী বারন্ তাঁহাকে গ্রীক্ ভাষা হইতে অনুবাদ করিয়া উক্ত ধর্ম্মগ্রন্থ পড়াইয়া যাইতেন। তদ্ব্যতীত পাদরী ডাল্, লং এবং উড্রর সহিত তাঁহার পূর্ব্ব হইতেই বিশেষ আলাপ পরিচয় ছিল। কিন্তু তাঁহারা কেহই তাঁহাকে খ্রীষ্টিয়ান ধর্ম্মমতে বিশ্বাসী করিতে পারেন নাই। বৈষ্ণবপরিবারমধ্যে বসিয়া পাদরীর নিকট বাইবেল্ শিক্ষা করাতে আত্মীয়বর্গের মনে ভয় হইয়াছিল, বুঝি বা কেশব খ্রীষ্টান হইয়া যান। ইহা লইয়া অনেকে কাণাকাণি করিত। কেশবচন্দ্রের ধর্ম্মপ্রকৃতি বিশুদ্ধ চরিত্র হরিভক্তের ন্যায় স্বভাবতঃই দেশীয় ধর্ম্মভাবের মধ্যে স্বয়ং ভগবানের হস্তে বিকসিত হয়; কিন্তু ধর্ম্মমত, পরমার্থতত্ত্ব তিনি খ্রীষ্টধর্ম্মগ্রন্থ ও ইংরাজি বিজ্ঞান ইতিহাসাদিতে শিখিয়াছিলেন। পৌত্তলিক পরিবারে সাকার দেবদেবীপূজা মহোৎসবের মধ্যে বাল্য জীবন অতিবাহিত হইলেও, তৎসংক্রান্ত কুসংস্কার, কল্পনা, ভ্রান্তি এবং ভাবান্ধতা তাঁহাকে কখন আশ্রয় করিতে পারে নাই। এখনকার সময়ে ইংরাজি পড়িয়া শুনিয়া কাহারই বা দারু প্রস্তর বা মৃন্ময়ী মুর্ত্তির দেবত্বে বিশ্বাস থাকে? বিশেষতঃ বাইবেল্

ইত্যাদি গ্রন্থ যে পাঠ করিয়াছে, উপধর্ম্মের প্রতি তাহার সহজেই বীতরাগ জন্মে। সুতরাং একেশ্বরবাদ, নিরাকারোপাসনাতত্ত্ব অবগত হওয়া কেশবচন্দ্রের পক্ষে কিছু কঠিন কার্য্য হয় নাই। কিন্তু বিশুদ্ধ জ্ঞান, বিচারে নিপুণ হইয়াও তিনি দেশীয় সদাচার এবং জাতীয় ধর্ম্মভাবের চিরদিন পক্ষপাতী ছিলেন। ইংরাজিশিক্ষিত কৃতবিদ্যদলের মধ্যে এরূপ সামঞ্জস্যের ভাব অতীব বিরল দৃষ্ট হয়, সন্দেহ নাই। কেশবের মত স্বদেশানুরাগী স্বজাতিপক্ষপাতী হিন্দু ভারতবর্ষে বর্ত্তমান সময়ে নিতান্ত দুর্ল্লভ বলিয়া মনে হয়।

অদ্বিতীয় নিরাকার ঈশ্বরের জীবন্ত শক্তিতে বিশ্বাস এবং প্রার্থনাতত্ত্ব তাঁহার জীবনের ভিত্তিভূমি ছিল। স্বভাবতঃ এই দুইটি মহামূল্য সত্য তিনি ঈশ্বরপ্রসাদে লাভ করেন। আজ কালের দিনে একেশ্বরবাদ মতের উপর শিক্ষিতদলের যেরূপ আস্থা, তাহার প্রতি তিনি বিন্দুমাত্র গুরুত্ব প্রদান করিতেন না। কারণ, অধিকাংশ ব্যক্তি ঈশ্বরকে কেবল ন্যায়শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত মনে করিয়া কার্য্যতঃ নিরীশ্বরবাদীর ন্যায় কাল হরণ করে। মহাযোগী ঈশার ঈশ্বর যেমন জীবন্ত প্রত্যক্ষ, কেশবচন্দ্রের ঈশ্বর তেমনি। তিনি ভগবানের জীবন্ত বিধাতৃত্ব-শক্তির উপর প্রথম হইতে বিশ্বাসী ছিলেন। ঈশ্বর প্রার্থনার উত্তর দেন, আদেশ প্রেরণ করেন, ইহা তিনি স্পষ্টরূপে অনুভব করিতেন। বিশ্বাসের অর্থ তাঁহার অভিধানে দর্শন, ধর্ম্ম মানে ঈশ্বরাজ্ঞা-শ্রবণ।

কিরূপে তিনি বিশ্বাসী হইলেন, তৎসম্বন্ধে এক স্থানে এইরূপ বলিয়া গিয়াছেন ;—"যখন কেহ সহায়তা করে নাই, যখন কোন

ধর্ম্মসমাজের সভ্যরূপে প্রবিষ্ট হই নাই, ধর্ম্মজীবনের সেই উষা-কালে 'প্রার্থনা কর,' এই ভাব, এই শব্দ হৃদয়ের ভিতরে উত্থিত হইল। আদেশের মত বড় তখন ভাবিতাম না। প্রার্থনা করিলে উত্তর পাওয়া যায়, এই জানিতাম। বুদ্ধি এমনই পরিষ্কার হইল, প্রার্থনা করিয়া যেন দশ বৎসর বিদ্যালয়ে ন্যায়শাস্ত্র, বিজ্ঞানশাস্ত্র, কঠোর শাস্ত্র সকল অধ্যয়ন করিয়া আসিলাম। আমাকে ঈশ্বর বলিলেন, 'তোর বইও নাই, কিছুই নাই, তুই কেবল প্রার্থনা কর।' প্রার্থনা করিয়া আদেশের জন্য প্রতীক্ষা করিতাম।"

এই প্রার্থনা এবং আদেশতত্ত্ব শিক্ষা করিয়া, তিনি দূরস্থিত ব্যবধানের ঈশ্বরকে লোকের অব্যবহিত সন্নিধানে আনিয়া দিয়া গিয়াছেন। ইহা দ্বারা মধ্যবর্ত্তিত্বের ভ্রান্ত মত বিনষ্ট হইয়াছে। পৃথিবীতে শত সহস্র ধর্ম্মমত ধর্ম্মপিপাসু ব্যক্তিকে চারি দিক্ হইতে যেন টানাটানি করে, কাহার পথে সে চলিবে বুঝিতে পারে না। এরূপ স্থলে ঈশ্বরাদেশ ভিন্ন মনুষ্যের আর অন্য কোন উপায় নাই। আচার্য্য কেশবচন্দ্রের সমস্ত জ্ঞান শক্তি বিদ্যা বুদ্ধি ক্ষমতা এই আদেশ হইতে প্রসূত। ঠিক জায়গাটি তিনি ধরিয়া বসিয়া ছিলেন। বিবেকের ইঙ্গিতকেই তিনি ঈশ্বর-বাণী বলিয়া জানিতেন।

অনন্তর বাইবেল্ পাঠের পর মহর্ষি জন্ ও সাধু পলের এবং সর্ব্বোপরি ঈশার পবিত্র চরিত্রের জ্যোতি যখন তাঁহার অন্তঃকরণে প্রবিষ্ট হইল, তখন তাঁহার মুখের প্রসন্নতা চলিয়া গেল,

হৃদয়াভ্যন্তরে অনুতাপের অগ্নি জ্বলিয়া উঠিল। কিছু দিন এইরূপ দুঃখ বিষাদের পর শেষে নবজীবনের স্রোত উন্মুক্ত হয়; তখন ব্রহ্মকৃপা স্বর্গদূতের ন্যায় অবতীর্ণ হইয়া তাঁহাকে ধর্ম্মাচার্য্যের পদে অভিষিক্ত করে। তৎকালে তিনি যে অবস্থায় আদেশবাণী প্রাপ্ত হন, সে সম্বন্ধে এইরূপ বর্ণিত আছে।

"এমনই হইল যে, দিবসে শান্তি পাওয়া যায় না, রাত্রিতে শয্যাও শান্তিকর হয় না। যত প্রকার সুখভোগ যৌবনে হয়, তাহা বিষবৎ ত্যাগ করিলাম। আমোদকে বলিলাম, 'তুই সয়তান্! তুই পাপ!' বিলাসকে বলিলাম, 'তুই নরক! যে তোর আশ্রয় গ্রহণ করে, সেই মৃত্যুগ্রাসে পড়ে।' শরীরকে বলিলাম, 'তুই নরকের পথ! তোকে আমি শাসন করিব। তুই মৃত্যুমুখে ফেলিবি?' তখন ধর্ম্ম জানিতাম না, জানিতাম, সংসারী হওয়া পাপ। স্ত্রৈণ হওয়া পাপ। পৃথিবীতে যাহারা মরিয়াছে, তাহাদের বিষয় মনে হইল। ভিতর হইতে তাই শব্দ হইল, 'ওরে, তুই সংসারী হোস্ না, সংসারের নিকট মাথা বিক্রয় করিস না। কলঙ্ক, পাপ এ সব ভারি কথা, আপাততঃ আমোদ ছাড়; আমোদের সূত্র ধরিয়াই অনেকে নরকে যায়।' সংসারের প্রতি ভয় জন্মিল। স্ত্রী বলিয়া যে পদার্থ, তাহাকে ভয় হইত। সহসা বদন বিমর্ষ হইল। মন বলিল, 'তুমি যদি হাস, পাপী হইবে।' ক্রমে মৌনী হইলাম। অল্পভাষী হইলাম। বন ছিল না, বনে গেলাম না। গৈরিক বস্ত্রের ভাব ছিল না, তাহাও পরিলাম না। কোন প্রকারে শরীরকে কষ্ট দিতে অস্বাভাবিক উপায়ও

অবলম্বন করিলাম না। টাকা কড়ির মধ্যে থাকিয়াও সামান্য বস্ত্র পরিয়া দিন কাটাইতাম। কাঁদিতাম না, কিন্তু হাস্যবিহীন মুখে অবস্থান করিতাম। তখনকার প্রধান বন্ধু কে, তা জান? ইংরাজ কবিদিগের মধ্যে যিনি এই ভাব ভাল চিত্রিত করিতে পারিতেন, তিনি। তাঁহারই 'রাত্রিচিন্তা' পড়িতাম। এই সকল হইল কখন? আঠার, উনিশ, কুড়ি বৎসরে। স্ত্রী আসিতেছেন, সংসার আরম্ভ করিতে হইবে। 'সংসার-বিলাসে তুমি সুখলাভ করিবে? স্ত্রীর কাছে তুমি বসিয়া থাকিবে? এ সকল বিষয় তোমাকে সুখী করিবে?' ঠিক আমার মনের ভিতর এই সকল কথা কে বলিতে লাগিল। আমি ভাবিলাম, উচ্চ পদার্থ জীবাত্মা, ইহাকে আমি স্ত্রীর অধীন করিব? সংসারের অধীন করিব? প্রতিজ্ঞা করিলাম, এ জীবনে স্ত্রীর অধীন হইব না।"

এইরূপ সুদৃঢ় প্রতিজ্ঞা সহকারে যখন তিনি গভীর দুঃখের ভার স্ব ইচ্ছায় বহন করিতেছিলেন, পাছে চিত্তবিকার উপস্থিত হয়, এই ভয়ে একাকী জড়ের মত অন্ধকারে বসিয়া থাকিতেন, তখন ঈশ্বরের করুণা তাঁহাকে কিরূপ আশ্চর্য্য কৌশলে শান্তি দান করিল, তাহা এই ভাবে উল্লিখিত হইয়াছে।

"আমি কোন পুস্তক বা ধর্ম্মাচার্য্যের উপদেশের জন্য অপেক্ষা করিলাম না। সেই গভীর পাপ-বেদনার মধ্যে আমি আপনার সহিত পরামর্শ করিলাম। আত্মা হইতে অতি সরল ভাষায় এই আদেশটি প্রাপ্ত হওয়া গেল ;—'যদি পরিত্রাণ চাও, তবে প্রার্থনা কর ; ঈশ্বর ভিন্ন পাপীকে আর কেহই রক্ষা করিতে পারে না।'

তখন আমার উদ্ধত গর্ব্বিত মন বিনম্র হইল। সেই দিন অতি সুখের দিন। অতি বিনীতভাবে গোপনীয় স্থানে প্রাতে এবং রজনীতে প্রার্থনা করিতে লাগিলাম। পাছে কেহ আমাকে উপহাস করে, সেই জন্য আমি ইহা আত্মীয় সহচরগণের নিকট প্রকাশ করিতাম না। কারণ, আমি জানিতাম, প্রকাশ হইলে তাহারা আমাকে এই সদনুষ্ঠান হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিবে। অনন্তর দিবসের পর দিবস প্রার্থনা করিতে করিতে অল্প দিনের মধ্যে দেখিলাম, যেন একটি আলোকের প্রবাহ আমার হৃদয়ের গভীরতম প্রদেশে প্রবিষ্ট হইয়া আত্মার অন্ধকার সকল বিদূরিত করিতেছে। অহো! দিগন্তব্যাপী সেই ভয়ঙ্কর পাপান্ধকারমধ্যে ইহা কি উল্লাসকর চন্দ্রালোকের প্রবাহ! তখন আমি অত্যন্ত শান্তি এবং অনির্ব্বচনীয় সুখ অনুভব করিলাম। তখন আমি আনন্দের সহিত পান ভোজন করিতে সক্ষম হইলাম। বন্ধুগণের সহবাস, শয়নের শয্যা আমার নিকট শান্তিপ্রদ হইল। প্রার্থনাই আমার মুক্তি-লাভের প্রথম উপায় হইয়াছিল। ইহা দ্বারা নীত হইয়া আমি সত্যান্বেষণে প্রবৃত্ত হই। এই প্রার্থনাই আমাকে ধর্ম্মশাস্ত্র ও ধার্ম্মিক মনুষ্যগণের সঙ্গে পরিচিত করিয়া দিয়াছে এবং ইহার ভিতর দিয়া পিতার কৃপায় সাধনের উপায় সকল লাভ করিয়া এত দূর আসিয়াছি।”

জলাভিষেকের পর মহাবীর ঈশা যেমন চল্লিশ দিবস পাপপুরুষের সঙ্গে যুদ্ধ করেন এবং পরিণামে জয়ী হইয়া স্বর্গরাজ্য-

স্থাপনার্থ ধর্ম্মপ্রচারে ব্রতী হন, কেশবচন্দ্র সেইরূপ আন্তরিক রিপুগণের উপর জয় লাভ করিয়া, জীবনের মহাব্রত-পালনে অগ্রসর হইলেন। অনুতাপের বিষাদান্ধকার চলিয়া গেল, বৈরাগ্যের তীব্র অনল-শিখার উপরে শান্তিজল পড়িল। মূর্ত্তিমতী শান্তিদেবী স্বহস্তে তাঁহার পরিচর্য্যা করিলেন; স্বর্গের পানীয় এবং ভোজ্য তাঁহার মুখে তুলিয়া দিলেন। দেবলোকবাসী অমরবৃন্দ ভক্তদাস কেশবের ললাটে জয়পত্র বাঁধিয়া তাঁহাকে নববিধানের দৌত্যকার্য্যে অভিষেক করিলেন। প্রার্থনায় শান্তি এবং সামর্থ্য লাভ করিয়া, আচার্য্য কেশবচন্দ্র একবারে কার্য্যক্ষেত্রে আসিয়া অবতীর্ণ হন। তাঁহার সাধন এবং প্রচার, উপার্জ্জন এবং বিতরণ সঙ্গে সঙ্গেই আরম্ভ হইয়াছিল। যে কোন সদুপদেশ তিনি ঈশ্বরের নিকট হইতে প্রাপ্ত হইতেন, তাহা অভ্রান্ত এবং মানবসাধারণের চির-কল্যাণপ্রদ বলিয়া বুঝিতেন। সুতরাং সাধ্যমত তাহা প্রচারের জন্য তাঁহার মন উৎসাহিত হইত। আপনি যাহাতে শান্তি পাইলেন, তাহা অন্যের পক্ষেও শান্তিপ্রদ হইবে, এই আশায় হৃদগত বিশ্বাস জনসমাজে প্রচার করিবার জন্য কিছু কিছু চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

প্রথমতঃ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাগজে "হে পথিকগণ! এ পৃথিবীতে শান্তি নাই, তোমরা কি চিন্তা করিতেছ?" "মৃত্যুকে স্মরণ কর!" ইত্যাদি বাক্য স্বহস্তে লিখিয়া রাত্রিকালে গোপনে গোপনে তাহা বাটীর নিকট পথপার্শ্বস্থ দেওয়ালে লাগাইয়া রাখিতেন। সত্যের জয় হইবে, এ সম্বন্ধে তাঁহার ধ্রুব বিশ্বাস ছিল।

মনে করিতেন, যে কোন ব্যক্তি এই রচনা পাঠ করিবে, তাহার মনে তৎক্ষণাৎ অমনি বৈরাগ্যের আগুন জ্বলিয়া উঠিবে। অন্তরের ব্যগ্রতা বশতঃ কখন কখন ঐ কাগজ উল্‌টো বসান হইত। সঙ্গিগণ এবং পাড়ার লোকেরা মনে করিতে লাগিল, কোন খ্রীষ্টান পাদরী বুঝি এই রূপ করিয়া থাকে। কিন্তু তাহাদের ঘরের মধ্যে যে কেশবপাদরী স্বর্গের সুসমাচারবাহক হইয়া জন্মিয়াছেন, তাহা কেহ জানিতে পারিল না। বয়স্থ সহচরগণ এ জন্য তাঁহাকে উপহাস ও বিদ্রূপ যথেষ্ট করিত; তথাপি তাহাতে তাহাদের বন্ধুর গাম্ভীর্য্য এবং ধৈর্য্য বিনষ্ট হইত না। বরং তিনি আশার সহিত এই রূপ বিশ্বাস করিতেন যে, এ সকল মনঃ-পরিবর্ত্তনের পূর্ব্বাভাস। কেন না, ধর্ম্মবিষয় লইয়া প্রথমে যাহারা উপহাস করে, তাহারাই আবার শেষে ঈশ্বরের দ্বারে ভিখারী হয়। এই ভাবিয়া তিনি নীরব থাকিতেন।

"গুড্ উইল ফ্রেটারনিটী" সভাই কেশবের প্রথম প্রচার-ক্ষেত্র। এখানে তিনি এক বার "প্রত্যেক সভ্যের প্রার্থনা করা উচিত" এই বিষয়ে একটি প্রস্তাব করেন। এ প্রস্তাবে পাদরী সাহেবদের মন বড় বিস্মিত হইয়াছিল। ইহার পূর্ব্বে তিনি অত্যন্ত লজ্জাশীল ও অল্পভাষী ছিলেন, চপলস্বভাব চতুর যুবকদিগের ন্যায় লোকের সমক্ষে অধিক কথাবার্ত্তা কহিতে পারিতেন না; কিন্তু উপরি উক্ত সভাস্থাপনের পর হইতে ক্রমে ক্রমে বক্তা হইয়া উঠেন। সহাধ্যায়ী বন্ধুদিগকে নিজমতে আনিবার জন্য এইরূপে নানাবিধ উপায় অবলম্বন করিতে

লাগিলেন। তাঁহার মতের সঙ্গে আর সকলের মতের একতা হউক বা না হউক, কার্য্যেতে কেহ যোগ না দিয়া থাকিতে পারিতেন না। বাল্যক্রীড়া হইতে ধর্ম্মপ্রচার পর্য্যন্ত সমস্ত বিষয়ে উদ্ভাবনী শক্তি তাঁহার এত অধিক দেখা গিয়াছে যে, তাহা আর বলিয়া শেষ করা যায় না। এই চিরনূতনত্ব তাঁহাকে এবং তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে ভারতকে বহুকাল পর্য্যন্ত জাগাইয়া রাখিয়াছিল। দল বাঁধিয়া তাহার নেতৃত্ব করিবার ক্ষমতা তাঁহার বাল্যজীবনেই প্রকাশ পাইয়াছে। ভগবান্ তাঁহাকে মানুষ ধরার মন্ত্র শিখাইয়া দিয়াছিলেন।

ইংরাজি ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের শেষ ভাগে কিংবা ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দের প্রথমে কেশবচন্দ্র ব্রাহ্মসমাজের সহিত মিলিত হন। ভগবান্ তাঁহাকে স্বহস্তে ধর্ম্মপথে চালিত করিয়া, স্বয়ং ধর্ম্ম শিক্ষা দিয়া, প্রচারকার্য্যে নিযুক্ত করেন; পরে তিনিই আবার তাঁহাকে যথাসময়ে ব্রাহ্মসমাজের সহিত মিলাইয়া দেন।

ও জয়লাভ (১)

বিপুল বিঘ্নরাশির মধ্যে কেশবচন্দ্রের হৃদয়ে সত্যধর্ম্মের বীজ সকল ক্রমে অঙ্কুরিত হইতে লাগিল। কিন্তু তখন তিনি একজন তরুণ-বয়স্ক যুবা, আত্মীয় অভিভাবকগণের অধীন এবং সামাজিক ও সাংসারিক বন্ধনে বন্দীভূত। যাঁহার হস্তে তাঁহার প্রতিপালনের ভার, তিনি এক জন ঊনবিংশ শতাব্দীর

হিন্দু এবং গম্ভীর-প্রকৃতি ও তেজস্বী পুরুষ; যে স্থানে বাস, তাহা হিন্দুধর্ম্মের দুর্গস্বরূপ; বয়স্য সহচরগণ সাহস-বীর্য্যবিহীন, বাহিরের অবস্থা সমূহ প্রতিকূল; ইহারই ভিতরে তাঁহার অন্তরে অভিনব ধর্ম্মের অগ্নি জ্বলিয়া উঠিল। ভগবানের কি অলৌকিক মহিমা! সামান্য অগ্নিকণা যেমন নিবিড় অরণ্যানীকে দগ্ধ করিয়া ফেলে, ধর্ম্মসংস্কারের অন্তরনিহিত ব্রহ্মতেজ তেমনি জনসমাজের অন্তস্তল ভেদ করিয়া নূতন রাজ্য সংস্থাপনের জন্য অগ্রসর হয়। কেশবের আত্মার মধ্যে যে দৈবশক্তি সঞ্চারিত হইয়াছিল, তাহার প্রতিকূলে পৃথিবীর কোন প্রতিবন্ধকতাই তিষ্ঠিতে পারে না। বাধা বিঘ্ন কেবল তাহাকে বলশালিনী করিবার এক একটি উপলক্ষ মাত্র। দৈবের কার্য্য কিরূপ অপ্রতিবিধেয়, তাহা এই মহাত্মার জীবনগতি অনুধাবন করিলে স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়।

এই সময়ে প্রচলিত ধর্ম্মবিধি অনুসারে তাঁহাকে মন্ত্র দিবার জন্য বাড়ীতে গুরুঠাকুর আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা কেশবকে দীক্ষিত করিবার নিমিত্ত এবার অতিশয় আগ্রহান্বিত। কারণ, এরূপ স্বাধীন-প্রকৃতির যুবাদিগকে বশীভূত করিবার পক্ষে বিবাহ, গুরুমন্ত্র এবং চাকরী এই তিনটি বিশেষ ঔষধ। কিন্তু ইহার কোনটীই ধর্ম্মবীর কেশবাচার্য্যকে বশ করিতে পারে নাই। বিবাহ বৈরাগ্য উদ্দীপন করিল, ধনোপার্জ্জনস্পৃহা অকালে নিবৃত্ত হইয়া গেল, পৌত্তলিক গুরুমন্ত্র কর্ণের নিকট আসিবার অবসরই পাইল

না। চাকরী তাঁহাকে পৃথিবীর দাস্যকর্ম্মে একবার বাঁধিয়াছিল বটে, কিন্তু সে কেবল অল্প দিনের জন্য। তাঁহাকে মন্ত্র দিবার জন্য বাড়ীর সকলে মিলিয়া যত্ন এবং অনেক পীড়াপীড়ি করিয়াও কিছু করিয়া উঠিতে পারেন নাই।

মহাযোগী ঈশাকে পাপপুরুষ রাজ্য ঐশ্বর্য্যের লোভ দেখাইয়া কতই না কুমন্ত্রণা দিয়াছিল! কিন্তু তিনি "দূর হ সয়তান!" বলিয়া এক কথায় তাহাকে বিদায় করিয়া দেন। কেশবকে অবাধ্য দেখিয়া বয়োজ্যেষ্ঠ আত্মীয়গণ ক্রোধ ও অভিমানে উত্তপ্ত হইলেন এবং বারংবার তাঁহাকে মন্ত্র-গ্রহণের জন্য আদেশ করিতে লাগিলেন; কিন্তু তিনি অটল শৈলের ন্যায় স্থিরপ্রতিজ্ঞ হইয়া তাহা প্রত্যাখ্যান করিলেন। প্যারীমোহন সেনের মৃত্যুর পর কেশবজননী তিন চারিটি অপগণ্ড সন্তান লইয়া অতি দীনভাবে অবস্থিতি করিতেন। নাবালক সন্তানের বিধবা মাতারা পৃথিবীতে অপর জ্ঞাতিগণের দ্বারা যেরূপ উৎ-পীড়িত হয়, তাহা ভাবিয়া তিনি সর্ব্বদা শঙ্কিত থাকিতেন। কেশব যদি প্রাচীন ধর্ম্মকর্ম্ম না মানেন, তাহা হইলে গৃহ হইতে তাড়িত হইতে হইবে, এই ভয় তাঁহার বড় ছিল। এই জন্য তিনি আগ্রহসহকারে মন্ত্র-প্রদানের আয়োজন করেন। ইহার পূর্ব্ব হইতে কেশবচন্দ্র দেবেন্দ্র বাবুর গৃহে প্রায় প্রতিদিন যাতায়াত করিতেন। মন্ত্র দিবার উদ্যোগ দেখিয়া সে দিন আর তিনি বাড়ীতে আসিলেন না। দ্রব্য সামগ্রী সকল প্রস্তুত করিয়া জননী অপেক্ষা করিতেছেন, লোকজন খাইবে তাহারও

আয়োজন হইয়াছে, কিন্তু যাঁহার উপলক্ষে এই সমস্ত আয়োজন, তিনি উপস্থিত নাই। সমস্ত দিন অতিবাহিত করিয়া রাত্রি দশটার সময়ে কেশব বাড়ী ফিরিলেন। তজ্জন্য গুরুঠাকুর নিরাশ এবং মাতাঠাকুরাণী অতিমাত্র দুঃখিতা হইলেন; কিন্তু তাঁহাকে কেহ আর কিছু বলিলেন না। অতঃপর মন্ত্রদানের চেষ্টা বিফল হইয়া গেল। পর দিন কেশবচন্দ্র ব্রাহ্মসমাজের কয়েক খানি পুস্তক জননীর নিকট ফেলিয়া দিয়া চলিয়া গেলেন। মাতা তাহা পড়িয়া দেখেন যে, দিব্য সার সার কথা সকল তাহাতে লেখা রহিয়াছে। উহা বোধ হয়, সঙ্গীতের পুস্তক। জননীর ধর্ম্মানুরাগ অতিশয় প্রবল। ভাল কথা পড়িয়া তাঁহার মন আকৃষ্ট হইল। তিনি শুনিয়াছিলেন, কেশব ব্রহ্মজ্ঞানী হইবেন, গুরুর নিকট মন্ত্র লইবেন না। কাহাকে ব্রহ্মজ্ঞানী বলে, কোথায় ব্রাহ্মসমাজ, এ সকল সংবাদ তিনি বিশেষ কিছুই অবগত নহেন। নিতান্ত সরল-প্রকৃতির স্ত্রীলোক, তাহাতে ধর্ম্মানুরাগিণী; ব্রাহ্মসমাজের পুস্তক পড়িয়া ভাবিলেন, এত খুব ভাল কথা। তদনন্তর সেই পুস্তক গুরুঠাকুরের নিকট দিয়া বলিলেন, "এই দেখুন, কেশব কি ধর্ম্ম পাইয়াছে। আমিত কিছু বুঝিতে পারিলাম না।" গুরুদেব উহা পাঠে সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন, "এ ধর্ম্মত খুব ভাল দেখিতেছি; কিন্তু যদি পালন করিতে পারেন, তবে হয়। যা হউক, মা, তুমি ভাবিত হইও না। যে পথ কেশব ধরিয়াছেন, তাহাতে মঙ্গল হইবে।" গুরুবাক্যে জননীর চিত্ত সন্তোষ লাভ করিল। অনন্তর তিনি

ইচ্ছাপূর্ব্বক পুত্রের নিকট ঐ সকল কথা পুনঃ পুনঃ শুনিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে অপর মহিলাগণ বলিতেন, "ওর মাই ওকে নষ্ট করিল। মায়ের আদর পেয়ে ছেলে যেন ধিঙ্গী হয়ে নেচে বেড়াচ্চেন।"

কেশবের প্রথম জীবনে জননী একজন তদীয় ধর্ম্মপথের উত্তরসাধিকা ছিলেন। মাতা বলেন, "কেশব আমার শিশুকাল হইতে ভক্ত। কখন তাঁহার শরীর অপরিষ্কার অনাচারী থাকিত না। শৈশবসুলভ যে সকল মলিনতা অপর সন্তানগণকে অপবিত্র করিয়া রাখিত, কেশব তাহা হইতে মুক্ত ছিলেন। গরদের চেলি পরিয়া, নাকে তিলক, অঙ্গে ছাপ, গলায় মালা দিয়া ভক্ত সাজিতে তিনি বড় ভাল বাসিতেন।" কেশব বড় হইয়া একটা কাণ্ড কারখানা করিবে, এ কথা জ্যেষ্ঠতাত হরিমোহন সেনও বলিয়াছিলেন। কেশবচন্দ্র সেই বৃহৎ হিন্দুপরিবার মধ্যে তখন কেবল জননীকে ধর্ম্মপথের এক মাত্র সহায় প্রাপ্ত হন। মাতা যখন সন্তানের ধর্ম্মভাবের সহিত সহানুভূতি করিতে লাগিলেন, তখন কেশব কয়েকটী প্রার্থনা স্বহস্তে লিখিয়া তাঁহাকে দিয়া বলিলেন, "মা, তুমি প্রতিদিন ইহা পাঠ করিও।" ঐ কাগজ জননীর গৃহভিত্তিতে সংলগ্ন করিয়া দিয়াছিলেন। হাতের লেখা গুলি এমনি সুন্দর যেন ছাপার লেখা। মাতা তাহা প্রতিদিন পাঠ করিতেন। এক দিন জ্যেষ্ঠতাত হরিমোহন সেনের চক্ষে তাহা পতিত হইল। তিনি ক্রোধান্বিত হইয়া বলিলেন, "কে ইহা লিখিয়া রাখিয়াছে! হাঁ, বুঝিয়াছি, এ

কেশবের কাজ!” এই বলিয়া তাহা তিনি খণ্ড বিখণ্ড করিয়া ফেলিয়া দিলেন। পুনরায় জননী অনুরোধ করেন যে, আর এক খানি কাগজে আমাকে সেগুলি লিখিয়া দাও। কেশব গম্ভীর হইলেন এবং নির্ব্বাক্ হইয়া রহিলেন। আর তাহা লিখিয়া দিলেন না। যখন অভিভাবকগণ তাঁহাকে মন্ত্রগ্রহণের জন্য তাড়না করেন এবং ভয় দেখান, তখন তিনি কেবল “না!” শব্দ ব্যবহার করিয়াছিলেন। যত বার অনুরোধ করা হইল, তত বার “না! না! না!” এই বলিয়া সমস্ত আয়োজন তিনি ব্যর্থ করিয়া দিলেন। যে পরিমাণে অনুরোধ, সেই পরিমাণে প্রতিরোধের তেজও বাড়িয়া উঠিল। কেন তিনি এরূপ অসম-সাহসিকতার কার্য্য করিলেন, তাহা অন্তর্য্যামী ভগবান্ ভিন্ন আর কেহ জানে না। ইহাতে পরিবারস্থ আত্মীয়বর্গের দুঃখ অভি-মানের আর সীমা রহিল না। এক জন বিংশতিবর্ষীয় যুবা বিজ্ঞ অভিভাবকদিগের কথা রাখে না, ইহা অসহ্য। কিন্তু উপায় কি? কেশবচন্দ্রত সামান্য যুবা নহে; সে যে নিজে হরিমন্ত্র দিয়া লোকদিগকে নববিধানে দীক্ষিত করিতে আসিয়াছে, পৃথিবীর গুরুজনের কথায় জগদ্‌গুরু পরমেশ্বরের আদেশ লঙ্ঘন কবিলে তাহার চলিবে কেন? পরিশেষে কেশবের গুরুত্ব গুরু-গোষ্ঠীরাও স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। এই ঘটনার পর হইতে তিনি স্বজনবর্গের নিকট অত্যন্ত অপ্রিয় হইয়া উঠেন। কিন্তু ইহা দ্বারা তাঁহার বীরত্ব প্রতিষ্ঠিত হইল এবং নবজীবনের স্রোত খুলিয়া গেল। এই হইতে কলুটোলার সেন-পরিবারের

যুবকেরা আর কেহ গুরুমন্ত্র গ্রহণ করে নাই। বরং অনেকেই কেশবপ্রবর্ত্তিত নবধর্ম্মের অনুবর্ত্তী হইয়াছে। প্রাচীন প্রাচীনারাও সে পথে পদার্পণ করিয়াছেন। কনিষ্ঠ ভ্রাতা কৃষ্ণবিহারী, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার পুত্র নন্দলাল, প্রমথ লাল কেশব-জীবনবৃক্ষের তিনটী অতি অপূর্ব্ব সুপক্ক ফল। কে জানে, এই ফলের বীজে ভবিষ্যতে আবার কত কত ফলবান্ ধর্ম্মচবিত্র উৎপন্ন হইবে ?

মন্ত্র-গ্রহণের পূর্ব্বে কেশব তাঁহার ইতিকর্ত্তব্যতা বিষয়ে মহর্ষি দেবেন্দ্র নাথের পরামর্শ জিজ্ঞাসা করেন। মহর্ষি জানিতেন, হিন্দুপরিবারে থাকিয়া মন্ত্র গ্রহণ না করা একটী গুরুতর পরীক্ষা। সেই জন্য তিনি স্পষ্ট করিয়া কিছু বলিতে সাহস করিলেন না। কিন্তু কেশব তাঁহার অন্তরের অভিপ্রায় ভালরূপই জানিতেন। পর দিনে মহর্ষি স্বীয় পুত্র সত্যেন্দ্রনাথকে এই সংবাদ লইবার জন্য কলুটোলায় পাঠাইয়া দেন। যখন তিনি কেশবের বিশ্বাসের জয়বার্ত্তা অবগত হইলেন, তখন তাঁহাকে প্রমুক্ত হৃদয়ে অভিনন্দন করিলেন। এই ঘটনা কেশবের ব্রাহ্ম হওয়ার প্রথম বৎসরেই সংঘটিত হয়। পৌত্তলিকতা এবং প্রচলিত কুসংস্কারমূলক ধর্ম্মবিশ্বাসের বিরুদ্ধে তাঁহার এই প্রথম জয়লাভ। ইহা তৎকালে এক অসাধারণ বীরত্বের পরিচায়ক, সন্দেহ নাই।

ব্রাহ্মসমাজে যোগদান

মহর্ষি দেবেন্দ্র নাথের সহিত কেশবচন্দ্রের আলাপ পরিচয়ের কথা আমরা ইতিপূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। যখন পরিবারমধ্যে পীড়ন এবং শাসন আরম্ভ হইল, তখন উভয়ের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধির এক উত্তম সুবিধা ঘটিল। এই মিলন পৃথিবীর ধর্ম্মসংস্কারের পথ উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছে। প্রথম মিলন কালে ইহাঁরা উভয় উভয়কে কি যে এক শুভদৃষ্টিতে দেখিয়াছিলেন, তাহার ভাব আমরা কতক হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি, কিন্তু বর্ণন করিতে পারি না। বৃদ্ধ অদ্বৈতের সঙ্গে যুবক শ্রীগৌরাঙ্গের প্রথম সাক্ষাতের কথা এখানে মনে পড়ে। দুই জনের গূঢ় ধর্ম্মপ্রকৃতি নীরবে পরস্পরের সহিত আলাপ করিয়াছিল। এই ভক্তযুবা এবং ঋষিবৃদ্ধের সম্মিলনে যে স্বর্গীয় তেজ এবং মধুব ভাবের উদ্গম হয়, উভয়ের বিকসিত বদনকমল এবং বিস্ফারিত প্রেমদৃষ্টি তাহার কবিতা রচনা করিয়াছে। সে স্বর্গীয় ভাব আর কাগজে লিখিয়া আমরা রসভঙ্গ করিতে চাহি না, ভাবুক পাঠক ভাবে বুঝিয়া লউন। প্রধান আচার্য্য তখন ধর্ম্মযৌবনে পরিপূর্ণ, সুতরাং সুলক্ষণাক্রান্ত যুবক কেশবচন্দ্রের সমাগম অতীব আশাজনক শুভকর ঘটনা বলিয়া তাঁহার বিশ্বাস জন্মিল। উভয়ের বয়সের যে তারতম্য ছিল, তাহাও ধর্ম্মেতে সমতা প্রাপ্ত হইল। বৃদ্ধ মহর্ষি পরীক্ষা ও উৎপীড়নের কথা শুনিয়া কেশবকে যথেষ্ট সহানুভূতি

দেখাইলেন এবং তাঁহার সুমিষ্ট বচনে, সুখকর সহবাসে সান্ত্বনা পাইয়া, কেশবের চিত্ত সমধিক উৎসাহ এবং শান্তি লাভ করিল। এইরূপে ক্রমে ক্রমে মহর্ষি দেবেন্দ্রের সহিত ব্রহ্মানন্দ কেশবের ধর্ম্মবন্ধুতা সুমিষ্ট ও গাঢ় হইয়া উঠে।

সমাজে যোগদানের পর কিছু দিনের জন্য কেশবচন্দ্র বিধবা-বিবাহ নাট্যাভিনয়ে ব্যাপৃত থাকেন। অভিনয়ের অধ্যক্ষতা-কার্য্যে তাঁহার একটু বিশেষ ক্ষমতা ছিল। ধর্ম্মসংস্কারের কার্য্যের সঙ্গে নাট্যাভিনয়ের সৌসাদৃশ্য তিনি সময়ে সময়ে বর্ণন করিতেন। প্রত্যেক সভ্য আপনাপন অংশ উৎকৃষ্ট রূপে অভিনয় করিলে যেমন নাট্যাভিনয় সুচারুরূপে সম্পাদিত হয, ধর্ম্মবিধানের কার্য্যও ঠিক তদ্রূপ। রঙ্গভূমির কার্য্য সকল যথানিয়মে নির্ব্বাহ বিষয়ে তাঁহার যে স্বাভাবিক প্রতিভাশক্তি ছিল, তাহা "নববৃন্দাবন" অভিনয়ে সুন্দররূপে প্রতিপন্ন হইয়াছে। বিধবাবিবাহ নাটকে তিনি ক্রমাগত বৎসরাবধি বহু পরিশ্রম করেন। বিদ্যাসাগর প্রভৃতি বড়লোকেরা তাহা দেখিয়া অতীব সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। নববৃন্দাবন নাটক কলিকাতা নগরকে যেরূপ আন্দোলিত করে, বিধবাবিবাহ নাটক সে সময় তদ্রূপ করিয়াছিল। কিন্তু কেশব যে তাহার প্রধান পৃষ্ঠপোষক, তাহা কে জানিত? জানিলেই বা তখন সে অল্পবয়স্ক যুবককে কে চিনিত?

ব্রহ্মবিদ্যালয়, নাট্যাভিনয়, নৈশবিদ্যালয় এবং "গুড্ উইল ফ্রেটারনিটি" এই চতুর্ব্বিধ কার্য্য তিনি এক সঙ্গেই

চালাইয়াছেন। এক দিকে বৈরাগ্যনিষ্ঠা, অপর দিকে আমোদ, একদিকে ধর্ম্মজ্ঞান অধ্যয়ন অধ্যাপন, অপর দিকে সৎকার্য্যানুষ্ঠান ; এইরূপ বিপরীত বিষয়ের সামঞ্জস্য প্রথম হইতে তাঁহাতে দেখা গিয়াছিল। কেশব যেন কার্য্যের অবতার। তাঁহার এই নাট্যাভিনয়ের উদ্দেশ্য সমাজসংস্কার ভিন্ন আর অন্য কিছু নহে। ইহাকে তিনি পাপ হইতে বাঁচিবার একটী উপায়ও মনে করিতেন।

সিন্দুরিয়াপটিস্থ মৃত গোপাল মল্লিকের ভবনে অভিনয়ের রঙ্গভূমি ছিল। উক্ত প্রশস্ত ভবনে আবার ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে ২৪শে এপ্রেল কেশবচন্দ্র সেন যুবকদিগের ধর্ম্মশিক্ষার নিমিত্ত ব্রহ্মবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করেন। যাঁহারা পূর্ব্বে নৈশবিদ্যালয়ের ছাত্র ও শিক্ষক, পরে "গুড্ উইল ফ্রেটারনিটি" সভার সভ্য ছিলেন, এবং এক্ষণে যাঁহারা অভিনয়কারী হইলেন, তন্মধ্যে কতকগুলি সদুৎসাহী যুবা প্রথমে ব্রহ্মবিদ্যালয়ের ছাত্র হন। কিছুদিন পরে আবার তাঁহাদিগকেই সঙ্গত-সভা ও ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের প্রধান সভ্য এবং প্রচারকপদে আমরা দেখিতে পাই। প্রধান আচার্য্যের সহায়তা এবং উৎসাহে ব্রহ্মবিদ্যালয় স্থাপিত হইল। কেশবচন্দ্র তথায় ইংরাজিতে ধর্ম্ম-বিজ্ঞান শিক্ষা দিতে লাগিলেন। তাঁহার অভিনয়-ক্ষেত্রের উৎসাহ ও অনুরাগ ব্রহ্মবিদ্যালয়ের অঙ্গ পরিপুষ্ট করিল। প্রথমে দুই একবার ইহার কার্য্য কলুটোলার মধ্যে পূর্ব্বোক্ত নৈশবিদ্যালয়ের বাটীতে হয়, পরে উপরি উক্ত

মল্লিকভবনে, কিছুদিন পরে আদি সমাজের দ্বিতল গৃহে হইত। এই বিদ্যালয়ে প্রতি সপ্তাহে দেবেন্দ্র বাবু বিশুদ্ধ বাঙ্গলা ভাষায় ঈশ্বরতত্ত্ব এবং ব্রাহ্মধর্ম্মের মত ও বিশ্বাস, এবং কেশব বাবু ইংরাজিতে ধর্ম্ম-বিজ্ঞান বিষয়ে বক্তৃতা করিতেন। কেশবচন্দ্রের তাৎকালিক ইংরাজি বক্তৃতা পুস্তকাকারে মুদ্রিত হইয়া, অনেক ধর্ম্মপিপাসু যুবাকে ব্রাহ্মসমাজে আনয়ন করিয়াছে। তাঁহার সঙ্গে যখন ব্রাহ্মসমাজের যোগ হইল, তখন কলেজ স্কুলের ছাত্রদিগের মধ্যে ব্রাহ্মধর্ম্ম সম্বন্ধে মহা আন্দোলন চলিতে লাগিল। খ্রীষ্টধর্ম্মগ্রহণের দ্বার এই সময় প্রায় বন্ধ হইয়া যায়। যে সকল যুবা হিন্দুধর্ম্ম মানিত না, অথচ খ্রীষ্টধর্ম্মেও বিশ্বাস করিতে পারিত না, তাহারা কেশবের অনুবর্ত্তী হইয়া অবিশ্বাস ও নাস্তিকতার কালগ্রাস হইতে রক্ষা পাইয়াছে। এদেশে খ্রীষ্টধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব কমাইবার জন্য, ব্রাহ্মসমাজ ইতিপূর্ব্বে অনেক প্রকার আয়োজন করিয়াছিলেন; এমন কি, প্রাচীন ব্রহ্মজ্ঞানীরা এজন্য খ্রীষ্টীয়ান পাদ্রিদিগের উপর আক্রমণের নিমিত্ত, বেতন দিয়া এক জন ইংরাজ লেখক নিযুক্ত করেন। কিন্তু যিশুদাস কেশব সেরূপ প্রণালী কখন অবলম্বন করেন নাই।

কেশবচন্দ্র ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, ব্রাহ্মধর্ম্মের মূলে কোন যুক্তিসঙ্গত বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নাই। যাঁহাকে পৃথিবীর কৃতবিদ্য সুশিক্ষিত সভ্যসমাজে সার্ব্বভৌমিক নববিধান প্রচার করিতে হইবে, তিনি কেবল ধর্ম্মভাবমাত্র

অথবা গুটিকতক বুদ্ধিগত যৌক্তিক মত অবলম্বন করিয়া কিরূপে সন্তুষ্ট থাকিবেন? ইতিপূর্ব্বে যে সকল ব্যক্তি সমাজের প্রধান পদে অভিষিক্ত ছিলেন, তাঁহারা ধর্ম্মের বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব সম্বন্ধে কোন স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারেন নাই। কেহ বলিতেন, বেদ বেদান্ত প্রভৃতি কোন ধর্ম্মগ্রন্থ অভ্রান্ত আপ্তবাক্য নহে, বুদ্ধি যুক্তিই এ পথের একমাত্র সহায়; কেহ বা উপনিষদাদির ব্রহ্মজ্ঞানোপদেশকে আশ্রয় করিয়া, ঈশ্বরের করুণা এবং মঙ্গল ভাব ও মহত্ত্ব ব্যাখ্যা করত পরমার্থ-চিন্তনে আনন্দানুভব করিতেন। কেশব ব্রাহ্মসমাজের কোন্ স্থানে উপবিষ্ট, তাহা এখন সকলে বুঝিতে পারিবেন। একেশ্বরবাদ বা ব্রহ্মবাদের ভিত্তিভূমি কি, তাহা তাঁহাকে সর্ব্বপ্রথমেই আবিষ্কার করিতে হইয়াছিল। ব্রাহ্মধর্ম্মের শাস্ত্র এবং মতামত সকল কিরূপে আবিষ্কৃত হইয়া সর্ব্বাবয়বসম্পন্ন নববিধানকে গঠন করিয়াছে, তাহা এই মহাত্মার জীবনচরিত পাঠ করিলেই ক্রমে জানা যাইবে। রামমোহন রায় কেবল বেদান্তপ্রতিপাদ্য এক নিরাকার অদ্বিতীয় ব্রহ্মকে সমস্ত নরনারীর উপাস্য মাত্র জানিয়া সমাজের কার্য্য আরম্ভ করেন। পরে মহর্ষি দেবেন্দ্র নাথ উপনিষদের ধর্ম্মভাব এবং ব্রহ্মজ্ঞান দ্বারা তাহাতে কিয়ৎ পরিমাণে সামাজিক উপাসনার রুচি সংযোগ করিলেন। ইহা ভিন্ন তত্ত্বশাস্ত্র, সাধনপ্রণালী এবং মতামতের চরমসিদ্ধান্ত বিষয়ে তৎকালে কোন মীমাংসা হয় নাই। কেশবচন্দ্রের উপর সে গুরুভার

ন্যস্ত হইল। এই জন্য তিনি সর্ব্বাগ্রে সাধারণ সহজজ্ঞানভূমির অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন। সহজজ্ঞান বলিয়া যে শব্দ এখন ব্যবহৃত হয়, কেশবই তাহার প্রচারক। তিনি উক্ত অভাব মোচনের জন্য কলিকাতা পাবলিক্ লাইব্রেরিতে গিয়া ধর্ম্মবিজ্ঞানগ্রন্থ সকল অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন। নদীর মূল প্রস্রবণ আবিষ্কার করিয়া পরে তাহার জল পান করিব, এরূপ মতি তাঁহার হয় নাই; অগ্রেই সে জল পান করিয়া তৃপ্ত হইয়াছিলেন, তদনন্তর তাহার উৎপত্তিস্থান অনুসন্ধান জন্য এক জন বিশ্বাসী ভক্তের ন্যায় বহির্গত হয়েন। দৈব যাঁহার পরিচালক, তাঁহার আর জ্ঞানের অভাব কোথায়? বিধাতা তাঁহার হস্তে এমন কয়েক খণ্ড পুস্তক আনিয়া দিলেন, যাহা পাঠে সহজেই তিনি সহজজ্ঞানকে ধর্ম্মমূল বলিয়া বুঝিতে পারিলেন। মোরেল্, কুজীন, হ্যামিণ্টন্ প্রভৃতির কয়েক খানি বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ এবং পার্কার, নিউম্যান্, মিস্ কবের রচিত একেশ্বরবাদ মতের সমালোচনা কতক পরিমাণে তাঁহাকে এ বিষয়ে সাহায্য করিয়াছিল। একদিকে তিনি ঐ সকল গ্রন্থ পড়িতেন, আর অপর দিকে ব্রহ্মবিদ্যালয়ে আসিয়া তাহার ব্যাখ্যা করিতেন। তথায় প্রত্যাদেশ, প্রায়শ্চিত্ত, পরকাল, মুক্তি, প্রার্থনা প্রভৃতি ধর্ম্মতত্ত্ব সমুদায় তিনি বৈজ্ঞানিক যুক্তি সহকারে সকলকে বুঝাইয়া দেন। অনেক কৃতবিদ্য উপাধিধারী ব্রাহ্ম যুবা তাঁহার নিকট রীতিপূর্ব্বক ধর্ম্ম শিক্ষা করিয়া পরীক্ষা দিয়াছেন।

এইটি কেশবচরিত্রের বৈজ্ঞানিক সময়। তাঁহার এ সময়কার রচনা এবং উপদেশে আত্মতত্ত্ব, মনোবিজ্ঞানের দুর্ব্বোধ্য শব্দবিন্যাস ও বিচার-নৈপুণ্যের বহুল আড়ম্বর লক্ষিত হয়। তখন তিনি এমন সকল বড় বড় শব্দ ব্যবহার করিতেন, যাহা অন্যের মুখে সহজে উচ্চারিত কিংবা মনের মধ্যে প্রবিষ্ট হইত না। এই বিদ্যালয়ের কোন সুবিজ্ঞ প্রধান ছাত্র বলেন, "আমরা তখন অল্প শিক্ষিত, সুতরাং কেশবের প্রদত্ত শিক্ষার মর্ম্ম আমরা বুঝিতে পারিতাম না; কিন্তু তাহাতে আমাদের ভাবের সহানুভূতি এত অধিক ছিল যে, তদ্দারা জ্ঞানের অভাব পূর্ণ হইয়া যাইত; হৃদয় এবং মন উত্তেজিত হইত।" এইরূপে পাঁচ বৎসর কাল তিনি ব্রহ্মবিদ্যালয়ে বিশুদ্ধ জ্ঞান ও ধর্ম্ম-নীতি বিস্তার করেন। গ্রন্থপাঠ বিষয়ে কেশবচন্দ্রের যে কিছু অনুরাগ, তাহা এই সময়েই ছিল, পরে আর এরূপ কখনও দেখা যায় নাই। এই ব্রহ্মবিদ্যালয়দ্বারা ব্রাহ্মধর্ম্মের মত ও বিশ্বাস সকল অটল সার্ব্বভৌমিক মূল সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত হইল। এখানে পরীক্ষার্থ যে সকল কঠিন বৈজ্ঞানিক প্রশ্ন দেওয়া হইত, তাহা দেখিয়া প্রেসিডেন্সি কলেজের কোন অধ্যক্ষ বলিয়াছিলেন, উহা এম, এ, ক্লাসের উপযুক্ত।

এই সময় পড়িয়া পড়িয়া পরিশ্রম করিয়া শরীর শীর্ণ হইল, চক্ষু ক্ষীণদৃষ্টি হইয়া গেল, তথাপি অনুরাগ কমিল না। তখন তিনি অতি ক্ষীণকায় দুর্ব্বল ছিলেন। দৃষ্টিশক্তি হ্রাস হওয়াতে চস্মা

ব্যবহার করিতেন। সে সময়কার ব্রাহ্ম যুবকদিগের মধ্যে অনেক সাত্ত্বিক আচরণ লক্ষিত হইত।• নস্যগ্রহণ, মৎস্যমাংস-পরিত্যাগ, মোটা চাদর, চস্মা ও চটি জুতার ব্যবহার প্রচলিত হইয়াছিল। প্রতি কথায় "বোধ হয়" "চেষ্টা করিব" শব্দ অনেকে ব্যবহার করিতেন। সকলেই অধ্যাপক ভট্টাচার্য্যের ন্যায় গম্ভীর মূর্ত্তি ধারণ করিয়া থাকিতেন। অল্পবয়স্ক বালকেরা পর্য্যন্ত ধর্ম্ম ও মনোবিজ্ঞানের বড় বড় কথা কহিত। হিন্দু-পর্ব্বাদিতে যোগদান, পৌত্তলিক দেবমূর্ত্তি দর্শন, যাত্রার গান শ্রবণ, পৌত্তলিক ক্রিয়াস্থানে গমন, তাসখেলা ইত্যাদি আমোদ-জনক বিষয়ে তাঁহাদের ভয়ানক ঘৃণা জন্মিয়াছিল। যার তার নাকে চস্মা দেখিয়া কোন এক সুরসিক ব্যক্তি বলিয়াছিল, "এদের চস্‌মা যেন খড়ের ঘরের সার্সি; আর কেশববাবুর চস্‌মা চূণকাম করা পাকা ঘরের সার্সির মত।" এ সকল বিজ্ঞোচিত ব্যবহার আচরণ দর্শনে তৎকালে অনেকে বিরক্ত হইতেন; কিন্তু ইহার ভিতরে আমরা কেশবচরিত্রের নৈতিক প্রভাব দেখিতে পাই। ধর্ম্ম এবং দেশাচার সম্বন্ধীয় দূষিত রীতি নীতি, ভ্রান্তি কুসংস্কার ও পাপ-পরিত্যাগ বিষয়ে যুবাদলের মধ্যে তিনি এমন এক উৎসাহের আগুন জ্বালিয়া দিয়াছিলেন যে, পরে তাহা হইতে একটি নূতন রাজ্য স্থাপিত হইয়াছে। কুসংস্কারসেবী ভিন্নধর্ম্মাবলম্বীদিগের সঙ্গে তখন ব্রাহ্মযুবাদিগের ভয়ানক তর্কবিতর্ক হইত। সত্য সত্যই কেশবের দৃষ্টান্তপ্রভাবে এ দেশে একটি নূতন মনুষ্যবংশ জন্মগ্রহণ করিয়াছে।

যে বয়সে যুবক সাধারণেরা সচরাচর সংসারের উন্নতি, আত্মীয় পরিজনের মনস্তুষ্টি এবং ভোগ-সুখেচ্ছায় প্রমত্ত হইয়া অর্থের অন্বেষণ করে, সেই বয়সে কেশবচন্দ্র কেবল ধর্ম্মশাস্ত্র অধ্যয়ন, ভগবৎপ্রসঙ্গ এবং ধর্ম্মজ্ঞান-প্রচারে ব্যাপৃত থাকিতেন। সুতরাং তাঁহাকে পৃথিবীর প্রচলিত পথে আনিবার জন্য আত্মীয় অভিভাবকগণের বিশেষ চেষ্টা হইল। তাঁহাদিগের উত্তেজনা এবং কৌশলে বাধ্য হইয়া এই বৎসর ১লা নবেম্বরে বেঙ্গলব্যাঙ্কে তিনি ত্রিশ টাকা বেতনের এক চাকরী স্বীকার করেন। কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া যথারীতি অতি নিপুণতার সহিত কর্ত্তব্য সম্পাদন করিতে লাগিলেন। কিন্তু অবসর কালে কার্য্যালয়ে বসিয়া ছোট ছোট ইংরাজি পুস্তিকা রচনা করিতেন। ইংরাজি হস্তাক্ষর তাঁহার বড় সুন্দর ছিল। ডেপুটী সেক্রেটারী কুক্ সাহেব তদ্দর্শনে অতিশয় সন্তুষ্ট হন এবং পঞ্চাশ টাকা বেতনের এক কার্য্যে তাঁহাকে নিযুক্ত করেন। "বঙ্গীয় যুবা, ইহা তোমারই জন্য" নামক পুস্তিকা ও অন্যান্য পুস্তিকাবলী এই খানে বসিয়া তিনি লিখিয়াছিলেন। ব্রাহ্মধর্ম্মের বিজ্ঞানশাস্ত্র-রচনায় প্রবৃত্ত হইয়া তৎকালে যে কয়েকখণ্ড ক্ষুদ্র পুস্তিকা তিনি প্রকাশ করেন, ইহা তাহার মধ্যে এক খানি। এই পুস্তিকা সেক্রেটারী ডিক্সন্ সাহেব দেখিয়া লেখকের সঙ্গে তদ্বিষয়ে অনেক কথাবার্ত্তা কহেন। বিষয়ক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া এইরূপে তিনি প্রধান কর্ম্মচারীদিগের শুভদৃষ্টিতে পতিত হন। যখন হাতে কোন কাজ থাকিত না, তখন ধর্ম্মসম্বন্ধীয় ঐরূপ প্রবন্ধ সকল

রচনা করিতেন। ইহা দেখিয়া উক্ত সাহেব তাঁহাকে দিন দিন ভালবাসিতে লাগিলেন।

বেঙ্গলব্যাঙ্কের এক নিয়ম আছে যে, সেখানকার গুপ্ত কথা বাহিরে কেহ প্রকাশ করিতে পারিবে না। এ জন্য একবার কর্ম্মচারীদিগের নিকট হইতে অঙ্গীকার-পত্র লওয়া হয়। সকলেই সে পত্রে স্বাক্ষর করিলেন, কেবল কেশব এবং তদ্দৃষ্টান্তে প্রতাপ সম্মত হইলেন না। ব্যাঙ্কের দেওয়ান তাঁহার কোন আত্মীয় ভয় দেখাইয়া সে বিষয় অনেক করিয়া বুঝাইয়াছিলেন, তথাপি তাঁহার বিবেক ইহাতে সায় দেয় নাই।

পরে দেওয়ানজী মহাশয় নিজ দায়িত্ব ক্ষালনের জন্য উক্ত যুবকদ্বয়কে সেক্রেটারী সাহেবের ঘরে পাঠাইয়া দিলেন। সাহেবের প্রকৃতি অতি গম্ভীর। তিনি অঙ্গীকার-পত্র স্বাক্ষর না করার কারণ জিজ্ঞাসা করায়, কেশব শান্ত ও বিনম্র ভাবে অথচ নির্ভয়ে বলিলেন, "ব্যাঙ্কে কাজ করিব, অথচ এখানকার কোন কথা কাহাকেও বলিব না, ইহা হইতেই পারে না।" এই সরল সত্য বাক্য শুনিয়া সাহেব মনে মনে কেশবের প্রতি বড় শ্রদ্ধাবান্ হন, এবং অঙ্গীকার-পত্রে স্বাক্ষর বিষয়ে তাঁহাকে অব্যাহতি প্রদান করেন। অনন্তর পৃথিবীর দাসত্ব-ব্রত উদ্‌যাপন করিয়া, ১৮৬১ খৃষ্টাব্দের ১লা জুলাই তারিখে বিষয়কর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক, তিনি ঈশ্বরের চিরদাসত্বে জীবন উৎসর্গ করিলেন। যখন চাকরী পরিত্যাগে কৃতসংকল্প হন, তখন সেক্রেটারী ডিক্‌সন্ বলিয়াছিলেন, তুমি কার্য্য পরিত্যাগ করিও না, তোমাকে এক শত টাকা বেতন

দিব। কেশবচন্দ্র তাহার উত্তরে বলিলেন, "না! পাঁচ শত টাকা দিলেও আর না।"* চাকরী ছাড়িয়া সর্ব্বতোভাবে জ্ঞান-ধর্ম্ম-প্রচারব্রতে জীবন উৎসর্গ করিবার জন্য তাঁহার প্রাণ বড়ই ব্যাকুল হইল।

অতঃপর আপনি চাকুরী ছাড়িয়া, তৎসঙ্গে কতকগুলি ধর্ম্মবন্ধু সহচর যুবাকেও তিনি ক্রমে নিজপথের পথিক করিলেন। এই রূপে মনুষ্য এবং সংসারের দাসত্ব হইতে আপনাকে এবং বন্ধু-দিগকে মুক্ত করিয়া, এই বর্ত্তমান যুগে তিনি এক হরিদাসের বৈরাগিবংশ সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাকে ঈশ্বরসেবায় জীবন উৎসর্গ করিতে দেখিয়া অনেকে প্রচারব্রত-গ্রহণে উৎসাহিত হন। কেশবচন্দ্র পাদরির কার্য্যের পথ-প্রদর্শক এবং ব্রাহ্মধর্ম্ম-প্রচারকের স্রষ্টা। ইতিপূর্ব্বে মহাত্মা রামমোহন, তৎপরে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ স্ব স্ব বিষয়-কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া ধর্ম্মপ্রচার করেন, কিন্তু বিষয়কার্য্য পরিত্যাগপূর্ব্বক বৈরাগ্যব্রত লইয়া বিনা বেতনে কেহ তাঁহাদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করেন নাই। এই জন্য আমরা কেশবকে ব্রাহ্মধর্ম্ম-প্রচারকের স্রষ্টা বলিয়া অভিহিত করিলাম।

কেশবচন্দ্র আত্মীয় অভিভাবকদিগের কথা না শুনিয়া, ব্যাঙ্কের কর্ত্তৃপক্ষের প্রদর্শিত আশা ও প্রলোভনের প্রতি দৃকপাত না করিয়া, বিষয়কর্ম্ম ছাড়িয়া দিলেন। যে কার্য্যে সিকি পয়সা লাভের প্রত্যাশা ছিল না, অধিকন্তু যাহা মানসিক এবং শারীরিক বহুশ্রমসাপেক্ষ, তাহাতেই এখন তিনি আত্মোৎসর্গ করিলেন। ভারতোদ্ধারের জন্য ইহার ভিতর মঙ্গলময় বিধাতার হস্ত কেমন

উজ্জ্বল, তাহা আমরা স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছি। যুবকগণ সচরাচর হয় বিষয়মায়ায়, না হয় ইন্দ্রিয়সুখ-প্রলোভনে, অথবা যশঃ-প্রশংসা-লাভের প্রত্যাশায় ধর্ম্মপথ ছাড়িয়া দেয়; কিন্তু কেশব-চন্দ্র ধর্ম্মের অনুরোধে তাদৃশ আশাজনক ভাল চাকরী, প্রশংসনীয় নাট্যাভিনয়ের কার্য্য এবং অপরাপর ভোগস্পৃহা একবারে পরি-ত্যাগ করিলেন। কে তাঁহাকে এ পথে আনিল? চারিদিকের অবস্থা, দৃষ্টান্ত, নিজের জীবন যৌবন বিদ্যা বুদ্ধি সম্ভ্রম সমস্তই বৈরাগ্যধর্ম্মের প্রতিকূল ছিল। অবশ্য ইহা স্বয়ং বিধাতার গূঢ় অভিপ্রায়ের একটি বিশেষ কার্য্য।

ধর্ম্মপ্রচারারম্ভ

কেশবচন্দ্রের জীবন এবং ধর্ম্মপ্রচার একই বিষয়। ইহা একটি ভীষণ তরঙ্গান্দোলিত মহাসমুদ্র বিশেষ। এই ঘোর তুফানের মুখে আমরা এক্ষণে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। এ সমুদ্রের গভীরতা ও প্রশস্ততা এবং তাহার বিপুল তরঙ্গলহরী দেখিলে হতবুদ্ধি হইতে হয়। কি লিখিব, কি ছাড়িব, তাহা বুঝিয়া ঠিক করিতে পারি না। পঞ্চবিংশতি-বর্ষব্যাপী এই মহা উদ্যমশীল অগ্নিময় ধর্ম্মজীবনে সুবহু সৎকার্য্য অনুষ্ঠিত হইয়াছে। তাঁহার রসনাবিনিঃসৃত যে সকল অমৃত বচন লিপিবদ্ধ আছে, তাহা সেই অব্যক্ত জীবনজলধির গুটিকতক উচ্ছ্বসিত তরঙ্গ মাত্র, তদ্দ্বারা আমরা তাঁহার আত্মার অব্যক্ত গভীরতার অতি অল্পই

পরিচয় পাইয়াছি। কিন্তু যাহা দেখিয়াছি, শুনিয়াছি এবং যাহা লিপিবদ্ধ আছে, তাহারও অন্ত পাওয়া যায় না। এক একটি উপদেশ ও প্রার্থনার ভিতর যেন অনন্ত তত্ত্বের ভাণ্ডার লুক্কায়িত রহিয়াছে।

একটী প্রার্থনায় তিনি বলিয়াছেন, "ছেলেখেলা করিতে করিতে প্রকাণ্ড ব্যাপার হইয়া উঠিল! আমরা পুকুরে স্নান করিতেছিলাম, করিতে করিতে দেখিলাম মহাসমুদ্র। দুইটা চারিটা ফুল লইয়া তোড়া বাঁধিতেছিলাম, তার পর দেখি, স্বর্গের পুষ্পোদ্যানে বসিয়া আছি। তুমি আমাদিগকে খেলাঘর করিতে ডাকিয়া আনিয়া শেষ কোথায় ফেলিয়াছ!" বাস্তবিক কেশবের বাল্যজীবনের সেই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সভার সহিত যখন তাঁহার যৌবনের মহা মহা সভা এবং তাঁহার বাল্যকালের সেই বালক কীর্ত্তনীয়া দলের সহিত যৌবনেব মহা মহা কীর্ত্তনের লোকসমারোহের তুলনা করি, তখন উল্লিখিত কথাগুলির গভীর তাৎপর্য্য কতক হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি।

অনেক লোক ধর্ম্মপ্রচার করে, বক্তৃতা করিয়া বেড়ায়, পুস্তক ও পত্রিকা লেখে; কিন্তু কয় জন লোক ইহা বলিতে পারে যে,—"আমি দুটীতে সুখ চাই,—পিতাতে এবং পুত্রেতে। আমি যখনই ফল খাই, আধখানা করে; পূরো ফল খাই না। যাহাতে সকলে মজার মজার খবর পায়, সেই সকল আমার কাছে আছে। আমাকে সকলে বলে না কেন, কি নূতন জিনিষ আনিয়াছিস্, আমাদের দে। তুই একলাই কি সব নিবি? মা, এই জন্য কেবল দুঃখ হয়।"

শিশুকে স্তন্য পান করাইতে না পারিলে মাতার স্তন যেমন টন্ টন্ করে, কেশবহৃদয় ঈশ্বরের পুত্র কন্যাগণকে স্বর্গের সুসমাচার শুনাইবার জন্য তেমনি ব্যাকুল হইয়া উঠিত। ধর্ম্ম-প্রচারের তাঁহার এইরূপ প্রণালী ছিল ঃ—(১) প্রাত্যহিক সজন উপাসনা প্রার্থনা, (২) প্রকাশ্য সভায় ইংরাজি ও বাঙ্গালা উপদেশ ও বক্তৃতা, (৩) ইংরাজি ও বাঙ্গালাতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুস্তিকা এবং সাময়িক পত্রিকা প্রণয়ন, (৪) কথোপকথন। গত পঁচিশ বৎসর কাল অবিরাম প্রতিদিন যাহা কিছু তিনি লিখিয়াছেন এবং বলিয়াছেন, তাহা একত্র সংগ্রহ করিলে বহু শত গ্রন্থ প্রস্তুত হয়। তাঁহার অনেকানেক সারগর্ভ উপদেশ এবং কথোপকথন লিপিবদ্ধ হয় নাই। কিন্তু যাহা কিছু হইয়াছে, তাহা পূর্ব্ব পূর্ব্ব ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তকগণের অপেক্ষা অনেক বেশী।

কেশবচন্দ্রের ধর্ম্মপ্রচারবৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত বর্ণনা করা অতিশয় কঠিন কার্য্য। গুরুতর ঘটনাগুলির কেবল আমরা এখানে উল্লেখ কবিব। এক্ষণে পাঠকগণ আসুন, আমরা এই ধর্ম্মবীরের সুবিস্তৃত কর্ম্মক্ষেত্রে তাঁহার জীবনসংগ্রামের সম্মুখ ভাগে অল্লে অল্লে অগ্রসর হই।

১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে প্রথমে কেশবচন্দ্র সেন "বাঙ্গালী যুবক, ইহা তোমারই জন্য" (Young Bengal, this is for you) নামক ইংরাজি প্যামফ্লেট বাহির করেন। পরে আরো দশ বার খানি এইরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুস্তিকা প্রচারিত হয়। এই সমস্ত পুস্তিকায় ধর্ম্মের মূল গতগুলি বৈজ্ঞানিক যুক্তি সহকারে তিনি সকলকে

শিক্ষা দেন। এ দেশে বিদ্যালয়ের ধর্ম্মবিশ্বাসহীন শিক্ষার দোষে কিরূপ বিষময় ফল ফলিতেছে, তাহা দেখাইবার জন্য তিনি প্রথম পুস্তিকায় বলিতেছেন;—"কেবল যে ব্যক্তিবিশেষ সম্বন্ধে মন্দ ফল ফলিতেছে, তাহা নহে; তদ্দ্বারা লক্ষ লক্ষ লোকের সামাজিক, পারিবারিক, জ্ঞান ও নৈতিক উন্নতির ভয়ানক অন্তরায় উপস্থিত হইয়াছে। মানসিক উৎকর্ষের সঙ্গে সঙ্গে যদি ধর্ম্মোন্নতি হইত এবং আমাদের দেশের লোকেরা ধর্ম্মের জীবন্ত সত্য সকল যদি গ্রহণ করিতেন, তাহা হইলে স্বদেশহিতৈষণা কেবল বক্তৃতা এবং প্রবন্ধ-রচনায় বদ্ধ থাকিত না, কার্য্যে পরিণত হইত।" এইরূপে বিংশতিবর্ষীয় যুবক কেশব প্রথমে ধর্ম্মনীতি, জ্ঞান, সমাজ এবং পরিবার সংস্কারের মূলভিত্তি স্থাপন করেন। কত অল্প বয়সে তিনি ধর্ম্ম, জ্ঞান ও নীতির গভীর তত্ত্বের ভিতরে প্রবেশ করিয়াছিলেন! কি তাঁহার উৎসাহ এবং অনুরাগ! উপসংহারে বলিতেছেন, "ভ্রাতঃ! অগ্রসর হও, দক্ষিণে বামে কোন দিকে না চাহিয়া দৃঢ়তার সহিত অগ্রসর হও। অনেক পরীক্ষা প্রলোভন তোমাকে ভুলাইবার চেষ্টা করিবে; কিন্তু তুমি ঈশ্বরের ইচ্ছার উপর আত্মবিসর্জ্জনপূর্ব্বক উদ্যম ও সাহসের সহিত চলিতে থাকিবে। যিনি আমাদের আলোক, শক্তি, পিতা এবং বন্ধু, তাঁহার পানে স্থিরভাবে ভিখারীর ন্যায় সর্ব্বদা দৃষ্টি রাখিবে। তিনি তোমার মনকে মুক্তিপ্রদ জ্ঞান, হৃদয়কে সুমিষ্ট প্রেম, আত্মাকে পবিত্রতা এবং হস্তকে শক্তি ও সাহস দ্বারা পূর্ণ করিয়া দিবেন।"

তাঁহার দ্বিতীয় পুস্তিকায় ঈশ্বরের নিকট কিরূপে প্রার্থনা করিতে হয়, এবং তাহার স্বাভাবিকতা, আবশ্যকতা এবং ফলোপধায়িতা বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, "শরীর রক্ষার জন্য যেমন খাদ্য, আত্মার জন্য তেমনি প্রার্থনা। উভয় বিষয়ে অভাববোধই প্রার্থনার মূল।" এই তের খানি পুস্তিকায় তাঁহার প্রদত্ত ব্রহ্মবিদ্যালয়ের বক্তৃতার সার নিবদ্ধ আছে। ইহার বৈজ্ঞানিক এবং সার্ব্বভৌমিক মূল সূত্রগুলি স্বতঃসিদ্ধ সহজজ্ঞানমূলক। এক্ষণে এই স্বতঃসিদ্ধ সহজজ্ঞানের উপর তিনি ব্রাহ্মধর্ম্মকে স্থাপন করিলেন। অনেকানেক বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতের বচন দ্বারা তিনি সহজজ্ঞানের লক্ষণ বুঝাইয়া দেন। এই অটল ভিত্তির উপর এখনো ব্রাহ্মধর্ম্ম স্থিতি করিতেছে। একটী আশ্চর্য্যের বিষয় পাঠকগণ এ স্থলে দেখিতে পাইবেন, কেশবচন্দ্র বিশ বৎসর বয়সে ধর্ম্মের মূল তত্ত্বসম্বন্ধে যাহা বলিয়াছিলেন, শেষ দিন পর্য্যন্ত সেই সকলেরই বিকাশ সাধন করিয়া গিয়াছেন। যে আদেশবাদ লইয়া পরে অনেক আন্দোলন হয়, তাহার কথা তাঁহার "প্রার্থনাশীল হও" নামক দ্বিতীয় পুস্তিকায় এইরূপ উল্লেখ আছে ;—"যখন আমরা ঈশ্বরের নিকট উপনীত হই, তখন দুঃখ পাপ আর আমাদিগকে আক্রমণ করিতে পারে না। তখন আত্মা পবিত্রতার মধ্যে থাকিয়া ঈশ্বরের প্রদত্ত শান্তি ও আনন্দরূপ প্রসাদ সম্ভোগ করে। তখন সে আপনার দুর্ব্বলতা ভুলিয়া যায় এবং স্বর্গীয় অনলে ও মহোৎসাহে অনুপ্রাণিত হয়। এইরূপে প্রত্যাদিষ্ট ব্যক্তি অপরাজিত সাহস এবং দৃঢ়তার সহিত জীবনপথে চলিতে থাকে ;

সে পৃথিবীর সম্রাটকেও ভয় করে না ; কারণ, সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বর তাহার সহায়। কিন্তু সে সকলকে ভালবাসে, এবং অগ্নিময় বাক্যে ঈশ্বরের নাম মহিমান্বিত করে।”

কেশবের ব্রহ্মদর্শন ও ব্রহ্মস্পর্শ এবং ব্রহ্মবাণী-শ্রবণের যে বিশেষ প্রিয় মত সমস্ত ছিল, তাহারও আভাস তৃতীয় পুস্তিকায় পাওয়া যায়। “ব্রাহ্মের ব্রহ্মজ্ঞান কেমন জীবন্ত! তাহার ঈশ্বর চিরবর্ত্তমান এবং চিরজীবন্ত, যাঁহাকে দেখা যায় এবং স্পর্শ করা যায়। এই অনন্তদেবকে সম্মুকে দেখিয়া সে বিমোহিত হয়।” ইহার পূর্ব্বে ব্রাহ্মসমাজে এরূপ নূতন কথা কেহ শুনে নাই। সুতরাং কেশবচন্দ্র যে কেবল ব্রাহ্মধর্ম্মের বৈজ্ঞানিক মূলভিত্তি আবিষ্কার করিয়াছিলেন তাহা নহে, প্রার্থনা এবং দর্শন শ্রবণ স্পর্শযোগের প্রথমপ্রবর্ত্তকও তিনি। প্রায়শ্চিত্ত, মুক্তি, নবজীবন, পরকাল, স্বর্গ ইত্যাদি বিষয়ের বিশুদ্ধ বিজ্ঞানসঙ্গত আধ্যাত্মিক তত্ত্ব তিনি যাহা শেষাবস্থায় বিশেষরূপে ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন, তাহারও আভাস ঐ সকল ক্ষুদ্র গ্রন্থে প্রাপ্ত হওয়া যায়। নিরপেক্ষ ঐতিহাসিকের চক্ষে এ সকল সুস্পষ্ট প্রতিভাত হইবে।

এই ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সন্তানগণের সহিত কেশবচন্দ্র একবার কৃষ্ণনগর ভ্রমণে বহির্গত হন এবং তথায় রামলোচন ঘোষের গৃহে অবস্থিতি করেন। ধর্ম্মপ্রচার এই ভ্রমণের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। কৃষ্ণনগর ব্রাহ্মসমাজ বহু পুরাতন, কলিকাতার পরেই এখানে সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়। এখানকার

লোকেরা বুদ্ধিমান্, শিক্ষিত এবং ভদ্র বলিয়া অনেক দিন হইতে প্রসিদ্ধ। কেশবের প্রকাশ্য ইংরাজি বক্তৃতা এই খানে বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করে। তিনি বক্তৃতা করিবেন শুনিয়া স্কুল কলেজের ছাত্রগণ এবং নগরবাসী শিক্ষিতসম্প্রদায় মহা উৎসাহে মাতিয়া উঠিলেন। এই সময় ঐ অঞ্চলে খ্রীষ্টীয়ান ধর্ম্মের বড় প্রাদুর্ভাব ছিল। অনেক নীচ শ্রেণীর দুঃখী প্রজা খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করে। ভদ্রসন্তানদিগের মধ্যেও কেহ কেহ তাহাতে দীক্ষিত হইয়াছিল। কেশব খ্রীষ্টান পাদরীদের বিরোধী এবং তাঁহার নিকট যাহারা ধর্ম্ম শিক্ষা পায়, তাহারা আর খ্রীষ্টান হয় না, আত্মীয় বন্ধু পরিবার ছাড়ে না, এই সংস্কারে তত্রত্য হিন্দুগণ এবং নবদ্বীপেব ভট্টাচার্য্য মহাশয়েরা তাঁহার প্রতি যথেষ্ট উৎসাহ ও সহানুভূতি প্রদর্শন করেন। প্রথমে তাঁহার মুখে ইংরাজি বক্তৃতা শুনিয়া সকলে একবারে মোহিত হইয়া গেলেন। তিনিও সে সময় এমনি উৎসাহের সহিত ক্রমাগত তিন চারি ঘণ্টা ধরিয়া বড় বড় বক্তৃতা করিতেন যে, গলা ভাঙ্গিয়া না গেলে ক্ষান্ত হইতেন না। তাঁহার এরূপ মত্ততা দেখিয়া ডাক্তার কালীচরণ লাহিড়ী প্রভৃতি বিজ্ঞ ব্যক্তিরা ভয় পাইয়াছিলেন, কি জানি বা তাঁহার কোন অসুখ হয়।

কেশবচন্দ্রের বক্তৃতায় যখন নগর মাতিয়া উঠিল, তখন স্থানীয় পাদরী ডাইসন সাহেব আর নীরব থাকিতে পারিলেন না; প্রতিবাদস্বরূপ বক্তৃতা দান আরম্ভ করিলেন। ইহাতে কেশবের উৎসাহানল আরও শতধা হইয়া জ্বলিয়া উঠিল। নগরের

শ্রোতৃবর্গ সমস্ত তাঁহার পক্ষে; সুতরাং পাদরী সাহেব শেষ পরাজিত হইলেন। কিন্তু এই উপলক্ষে তাঁহারও নাম অনেকে জানিতে পারিল। ইহাব পর কলিকাতা নগরে ঐরূপ উত্তর প্রত্যুত্তরের কয়টী বক্তৃতা হইয়াছিল।

কৃষ্ণনগরের প্রচারবৃত্তান্ত তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। তদ্দর্শনে এক দিকে দেবেন্দ্র বাবু যেমন যুবক ভক্ত কেশবের প্রতি অনুরাগ প্রকাশ করিতে লাগিলেন, অপর দিকে তেমনি কয়েকটী পুরাতন ব্রাহ্মের হৃদয়ে ঈর্ষানল জ্বলিয়া উঠিল। তত্ত্ববোধিনীর উক্ত রচনা তাঁহারা আত্মগর্ব্বপ্রসূত বলিয়া ব্যাখ্যা করিলেন। এই হিংসা পরিণামে ঘোর বিচ্ছেদের কারণ হয়। খ্রীষ্টীয়ানদিগের সহিত ঐ সকল তর্ক বিতর্কের বক্তৃতার সার পরে তিনি পুস্তকাকারে প্রকাশ করেন। ইহা ব্রাহ্মধর্ম্মের বৈজ্ঞানিক ভিত্তি বলিয়া অদ্যাপি পরিগণিত আছে। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ কেশবের উৎসাহ উদ্যম কার্য্যদক্ষতা দেখিয়া তাঁহাকে এই সময় হইতে অধিকতররূপে ভালবাসিতে আরম্ভ করেন। ফলতঃ কেশবচন্দ্রের এই প্রথম প্রচারযাত্রায় আশাতীত ফল উৎপন্ন হইয়াছিল। তিনি নিজেও ইহা দ্বারা পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক উৎসাহী এবং সাহসী হইয়া উঠেন।

এই বৎসর উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে অতিশয় দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয় এবং তাহা নিবারণের জন্য পাদরীপ্রবর ডফ্ প্রভৃতি খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মযাজকগণ অর্থ-সংগ্রহে প্রবৃত্ত থাকেন। কেশবজীবন কেবল ধর্ম্মজ্ঞানের বক্তৃতায় সন্তুষ্ট থাকিবার নহে, সকল প্রকার

দেশহিতকর অনুষ্ঠানে এবং দাতব্য কার্য্যের প্রতি তাঁহার হৃদয় চির দিন প্রসারিত ছিল। অনন্তর কলিকাতা আদিব্রাহ্মসমাজে দেবেন্দ্র বাবুর সাহায্যে তিনি এই জন্য একটী সভা আহ্বান করেন। তথায় উপাসনান্তে অর্থ, তণ্ডুল, বস্ত্র, অলঙ্কারাদি সামগ্রী সংগৃহীত হয়। ঠাকুর বাড়ীর মহিলারা এবং কেশবচন্দ্রের সহচর বন্ধুবর্গ যিনি যাহা পারিয়াছিলেন, দান করিয়াছিলেন। কেশবচন্দ্রের বক্তৃতা কখন শূন্যে বিলীন হয় নাই; তাঁহার মুখের বাণী দরিদ্র অনাহারীদিগের জন্য অন্ন, পীড়িতদিগের জন্য ঔষধ, অজ্ঞানদিগকে জ্ঞান শিক্ষা দিবার জন্য প্রচুর অর্থ সংগ্রহ করিয়া দিত, এবং মোহান্ধ অবিশ্বাসীদিগকে সত্যের পথে ফিরাইয়া আনিত। ইহার পূর্ব্বে দেশের সাধারণ হিতোদ্দেশে ব্রাহ্মসমাজে ঈদৃশ দাতব্য কার্য্যের কোন রূপ অনুষ্ঠান ছিল না, কেবল জ্ঞান-ধর্ম্ম-বিস্তারের জন্য তথাকার কর্ত্তৃপক্ষ যাহা কিছু চেষ্টা করিতেন। এক্ষণে কার্য্যের অবতার-স্বরূপ কেশব এবং তদীয় যুবক সহযোগি-গণের আগমনে এইরূপ নূতনবিধ অনুষ্ঠান সকল হইতে লাগিল।

এই সময়ের কিছু পূর্ব্বে দেবেন্দ্র বাবু একবার সিংহল দ্বীপ ভ্রমণ করিতে যান। কেশবচন্দ্রও তাঁহার পথানুসরণ করেন। সমুদ্রে জাহাজারোহণের ঘটনা কলুটোলার সেনপরিবারে এই প্রথম। জাহাজে সমুদ্রপথে গমনাগমন তখন হিন্দুর চক্ষে ম্লেচ্ছাচার বলিয়া পরিগণিত ছিল। পাছে জাতিভ্রষ্ট সমাজচ্যুত হইয়া থাকিতে হয়, এই জন্য কেশবজননী অতিশয় দুঃখিতা এবং ভীতা হন। এ ভ্রমণ ধর্ম্ম-প্রচারের জন্য নহে; দেশ দেখা

উদ্দেশ্য। কতকটা দেবেন্দ্র বাবুর স্নেহের আকর্ষণেও বটে। বাড়ীর কাহাকেও কিছু না বলিয়া একদা ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে হঠাৎ গোপনে কেশবচন্দ্র তথায় প্রস্থান করেন। দ্বিতীয় শ্রেণীর আরোহী হইয়া, নিরামিষ ভোজন করিয়া, অতিশয় কষ্ট স্বীকারপূর্ব্বক, জনৈক বঙ্গীয় যুবকের সহিত তিনি বহির্গত হন। তখন তিনি বাড়ী হইতে দূরে এক বাগানবাটীতে বাস করিতেন। বালিকা স্ত্রী তৎকালে পীড়িতা। এক খানি চিঠি লিখিয়া চলিয়া যান, জাহাজ ছাড়িয়া গেলে তার পর সেই পত্র আত্মীয়দের হস্তগত হয়। এইরূপ গোপনে দূর দেশে পলায়ন আত্মীয়বর্গ, বিশেষতঃ মাতা এবং পীড়িতা বালিকা স্ত্রীর পক্ষে অতিশয় দুঃখ এবং ভয়ের কারণ হইয়াছিল এবং পরিবার ও সহচর বয়স্যবৃন্দের মধ্যে তজ্জন্য ক্রন্দনের রোল উঠিয়াছিল। কেশব বড় অবাধ্য এবং নিষ্ঠুর, এই বলিয়া তাঁহারা অনেক খেদ বিলাপ করেন। এই ভ্রমণোপলক্ষে কেশবের সহিত মহর্ষি দেবেন্দ্র নাথের প্রেম স্নেহ আনুগত্য বৃদ্ধি পাইল কেবল তাহা নহে, কেশবের ইহাতে সাহস ভরসাও অনেক বাড়িয়া গেল, জাতিভেদ ও কুসংস্কাবেব মূলে তিনি কুঠারাঘাত করিলেন। যদিও সিংহলযাত্রা সাক্ষাৎসম্বন্ধে ব্রাহ্মধর্ম্ম-প্রচারার্থ নহে, তথাপি ইহাদ্বারা তৎকালে সমাজের যথেষ্ট কল্যাণ সংসাধিত হয়। কেশবচন্দ্রের সিংহলভ্রমণের যে ডায়রি মুদ্রিত আছে, তাহাতে আমরা তাঁহার তৎকালকার মনের ভাব অনেক জানিতে পারি।

সঙ্গতসভা ।

প্রথমে কিছু দিন এইরূপে ধর্ম্মসংগ্রামে প্রবৃত্ত থাকিয়া পরে কতিপয় সৎসাহসী সত্যপ্রতিজ্ঞ যুবাকে লইয়া আচার্য্য কেশবচন্দ্র একটি দল বাঁধিলেন। ইহার নাম "সঙ্গত-সভা"। শিখসম্প্রদায় হইতে গৃহীত এই নাম অনুসারে স্বয়ং দেবেন্দ্রনাথ ইহার নামকরণ করেন। সঙ্গত-সভা একটি ক্ষুদ্র পল্টন বিশেষ। কলুটোলার বাড়ী তাহার কেল্লা। হিন্দুসাম্রাজ্য অধিকার করিবার জন্য এখানে কয়েকটী যুবক সৈন্য সংগৃহীত হইয়া শিক্ষাপ্রাপ্ত হয়। এতদিন পরে এখন হিন্দু মহাশয়েরা তর্জ্জন গর্জ্জন করিতেছেন, কিন্তু ব্রহ্মদাস কেশব সেনাপতির সৈন্যদল অনেক দিন পূর্ব্বে তাঁহাদের রাজ্য অধিকার করিয়া লইয়াছে। সৈন্যবৃন্দ হিন্দুদুর্গের অভ্যন্তরে "একমেবাদ্বিতীয়ং" নামের জয়-পতাকা উড়াইয়া সেখানে হরিসঙ্কীর্ত্তন করিতেছে।

ব্রাহ্মধর্ম্মের জ্ঞানকাণ্ড শিক্ষা দিবার জন্য ব্রহ্মবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। তদনন্তর কর্ম্মকাণ্ড শিক্ষা দিবার জন্য এই সঙ্গত-সভা। ইহাদ্বারা একটি নূতন জগতের সূত্রপাত হইয়াছে। বাঙ্গালীরা কোন কালে কখন যুদ্ধ করে নাই সত্য, ভবিষ্যতে কোন কালে যে করিতে পারিবে, তাহারো আশা নাই; কিন্তু তাহারা ধর্ম্মসমরে বীরত্বের দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছে। যাহারা এই জাতিকুলাভিমানী ব্রাহ্মণরাজ্যে বাস করিয়া সঙ্কর ও বিধবা

বিবাহ দিতে এবং তেত্রিশ কোটী দেবতাকে এক অখণ্ড সচ্চি-দানন্দে পরিণত করিতে পারে, তাহাদিগকে আমরা বীর উপাধি প্রদান করিলাম। এই নব্য সংস্কারকদিগকে বঙ্গদেশ এক দিন মহাযোদ্ধা বলিয়া নিশ্চয় স্বীকার করিবে।

কলুটোলার ভবনে নিম্নতল গৃহে এক ক্ষুদ্র কুটরীতে কয়েকটি ধর্ম্মবন্ধুকে লইয়া কেশবচন্দ্র ধর্ম্মালোচনা, চরিত্রোন্নতি এবং সমাজসংস্কার বিষয়ে কথোপকথন করিতেন। উপবীত-ত্যাগ, স্ত্রীশিক্ষা-দান, পৌত্তলিকতার উচ্ছেদ-সাধন, নৈতিক সদাচার অবলম্বন এই সভার ফল। ইহার অল্পকাল পরে প্রচারক-মণ্ডলী ও উন্নতিশীল ব্রাহ্মদল ধর্ম্মসংস্কার ও সমাজসংস্কার বিষয়ে যে এ দেশে একটী নবযুগের সূত্রপাত এবং একটী নূতন রাজ্য স্থাপন করেন, সঙ্গতসভা তাহার বীজভূমি। পূর্ব্বে যে কঠোর নৈতিক আচার ব্যবহারের কথা উল্লিখিত হইয়াছে, এই সঙ্গতসভাকে তাহার প্রসূতি বলা যাইতে পারে। দিবসের পর দিবস এখানে ধর্ম্ম ও নীতি সম্বন্ধে গভীর তত্ত্ব এবং অপরিহার্য্য অনুষ্ঠানের কথা আলোচিত হইতে লাগিল। সৎপ্রসঙ্গে কোন কোন দিন রাত্রি প্রায় প্রভাত হইত। এইরূপ রাত্রি জাগরণ দর্শনে পরিবারস্থা কোন প্রাচীনা মহিলা কেশবজননীকে বলিয়া-ছিলেন, "হ্যাঁ গা, তুমি ছেলেকে একটু দাবুতে পার না ? ও যে রাত্রে ঘুময় না, মারা যাবে যে !" তাঁহার মাতাঠাকুরাণী বলেন, "ছোট বেলা হইতে কেশব সর্ব্বদাই ব্যস্ত। কিছু করিবার জন্য যেন সে অস্থির হইয়া ঘুরিয়া বেড়ায়।" ক্ষেতু পাঁড়ে নামে

একজন দ্বারবান্ ছিল, সে বহির্দ্বার বন্ধ করিয়া রাখিত। দুইটা তিনটা রাত্রি পর্য্যন্ত প্রত্যহ কেই বা জাগিয়া থাকিতে পারে? সভাভঙ্গের পর যুবকগণ তাহার শরণাগত হইতেন। তাহাতেও কোন ফল হইত না, কেশব বাবু নিজে গিয়া দ্বার খুলিয়া দিয়া আসিতেন। নবানুরাগী ব্রাহ্মদলের ইহাতেই বা তখন কত আনন্দ! সঙ্গতের যুবক সভ্যগণ তৎকালে কেহ কলেজের ছাত্র, পিতা মাতার ভাবী আশার স্থল, কেহ আফীসের কেরাণী; কেহ কেহ বিবাহিত, কেহবা কুমার; ইঁহাদের মধ্যে বিষয়কর্ম্মে যাঁহারা ব্রতী ছিলেন, কেশবের দৃষ্টান্তে তাঁহারা কেহ কেহ চাকরী ছাড়িলেন, কেহবা চাকুরী ছাড়িবার জন্য উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। ইহাঁরা নিজেরাই যেন এক রাজ্য; ভয়ও নাই, ভাবনাও নাই; যাহা সত্য বলিয়া স্থিরীকৃত হইবে, তাহাই কার্য্যে পরিণত করিব, এই সকলের প্রতিজ্ঞা। পাপ স্বীকার ও পরিত্যাগ, প্রার্থনা, নিজদোষ আলোচনা, জীবনের উন্নতির গতি পর্য্যবেক্ষণ, ইহা লইয়াই সকলে মাতিয়া থাকিতেন। পদ মান উপাধি নাই, হিংসা দ্বেষও নাই; সকলে যেন একপ্রাণ, একহৃদয়।

অনন্তর কেহ কেহ বিষয়কর্ম্ম ছাড়িয়া প্রচারব্রতে জীবন উৎসর্গ করিলেন। যাঁহারা মৎস্য মাংস এবং তামাক চুরট খাইতেন, তাঁহারা সে সকল অভ্যাস ছাড়িয়া দিলেন। কেশব-চরিত্রের অনুকরণে বিবিধ সদ্গুণ সকলে শিক্ষা করিতে লাগিলেন। এই সভা দ্বারা হিন্দু যুবকদিগের অনেক কুরীতি সংশোধিত হইয়াছে কেবল তাহা নহে, পুরাতন ব্রাহ্মসমাজের ভীরুতা, অযথা

রক্ষণশীলতা ও স্লেচ্ছাচার চলিয়া গিয়াছে। এইজন্য সঙ্গতের দলকে আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্ম নাম দেওয়া হইয়াছিল। ধর্ম্মমত এবং জীবন এক করিবার জন্য ইহাঁরা যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেন। সত্যরক্ষা-সম্বন্ধে সকলের প্রাণগত যত্ন ছিল। পরে কেশবচন্দ্র যখন এই খান হইতে "ব্রাহ্মধর্ম্মের অনুষ্ঠান" নামক গ্রন্থ প্রচার করিলেন, তখন দেবেন্দ্র বাবুও উপবীত ফেলিতে বাধ্য হইলেন। তাঁহারই পরিবারে প্রথমে ব্রাহ্মধর্ম্মমতে ব্রাহ্ম বিবাহ অনুষ্ঠিত হয়। প্রধান আচার্য্যের এই সদ্দৃষ্টান্ত নব্যদিগের উৎসাহানলে আহুতি দান করিয়াছিল। এই সময় হিন্দুপরিবারবাসী অগ্রগামী ব্রাহ্মগণের বিরুদ্ধে ঘরে ঘরে পরীক্ষার অগ্নিও প্রজ্বলিত হইয়া উঠে। হিন্দু অভিভাবকগণ খ্রীষ্টীয়ানদিগের হস্ত হইতে রক্ষা পাইয়া, শেষ ব্রাহ্মদিগের সংস্কারচক্রে পতিত হইলেন। জাতি কুল রক্ষা করা তখন ভার হইয়া পড়িল। কোথাও পুত্রবধূকে ব্রাহ্মিকাসমাজে যাইতে দেখিয়া শাশুড়ী কাঁদিতেছেন, কোথাও বা সন্তানকে ছিন্নোপবীত দর্শনে পিতা 'হা হতোস্মি' কবিতেছেন, ঈদৃশ নূতনবিধ কাণ্ড সকল হইতে লাগিল। তজ্জন্য কেশবচন্দ্র হিন্দু পিতামাতাগণের ঘোর অভিসম্পাতে পড়িয়া গেলেন। তাঁহার সহচরদিগের দ্রুতপাদবিক্ষেপ দেখিয়া পরে আদিসমাজ এবং দেবেন্দ্র বাবুও ভীত হইলেন। তাঁহারা ভয় পাইয়া একটু পশ্চাতে গিয়া দাঁড়াইলেন। হিন্দুয়ানী গেলে আর ব্রহ্মধর্ম্ম এ দেশে প্রচার হইবে না, এই তাঁহাদের আশঙ্কা হইল। কিন্তু খ্রীষ্টসমাজ ইহাতে সন্তুষ্ট হইলেন। কালক্রমে ব্রাহ্মেরা তাঁহাদেরই দলভুক্ত হইবে, এইরূপ তাঁহাদের আশা জন্মিল।

সঙ্গত-সভা দ্বারা মহাত্মা কেশব এক দিকে যেমন সমাজসংস্কার-কার্য্যে সকলকে উৎসাহিত করিলেন, অপর দিকে তেমনি আধ্যাত্মিক উন্নতি, নৈতিকচরিত্র গঠন বিষয়েও বহুল সার তত্ত্ব আলোচনা করিতে লাগিলেন। তাঁহার চরিত্রের উৎপাদনী শক্তি কি জীবন্ত! তাঁহার আচরিত সদ্‌গুণরাশি অপর জীবনে সহজেই সংক্রামিত হইয়াছে। তিনি যে কার্য্য করিতেন, অনুবর্ত্তী বন্ধুদল তাহা আদর্শরূপে দেখিতেন। সাত্ত্বিক আহার পান পরিচ্ছদ, নিত্যোপাসনা, ধর্ম্মপ্রচার, বক্তৃতা, দেশের এবং নিজের উন্নতি, যাবতীয় বিষয়ে কেশবচন্দ্রের দৃষ্টান্ত তখন অনুকরণীয় হইয়াছিল। এই দলবন্ধন নববিধানের একটি প্রমাণ। দলপতি ভগবান্ ভক্তদলের দ্বারা আপনার বিধানকে স্থাপন করেন।

শেষাবস্থায় সঙ্গতের দ্বারা অনেক গূঢ় সাধনতত্ত্বের আবিষ্কার হইয়াছে। "ধর্ম্মসাধন" নামে এক খানি ক্ষুদ্র পত্রিকা বাহির হইত, তাহাতে এবং "ধর্ম্মতত্ত্ব" পত্রিকায় উহার আলোচিত বিষয় সকল লিপিবদ্ধ আছে। অনেক গভীর এবং কূট প্রশ্নের উত্তর তাহাতে প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই সভা কেশবচরিত্রের একটী অক্ষয় কীর্ত্তি, সন্দেহ নাই। স্ত্রীশিক্ষা, ব্রাহ্মিকাসমাজ, "বামাবোধিনী পত্রিকা" ইহারই সভ্যগণের চেষ্টার ফল। সঙ্গতের আলোচনায় আচার্য্যদেবের নিজসম্বন্ধীয় অনেক কথার মীমাংসা আছে। ইহার অনুকরণে মফস্বলস্থ ব্রাহ্মসমাজের সভ্যগণ এইরূপ সভা সংস্থাপন করেন। অদ্যাবধি স্থানে স্থানে ইহা দৃষ্ট হয়। কিন্তু কলু-টোলায় প্রথমে যেমন হইয়াছিল, তেমন আর কোথাও দেখা যায়

না। এই সঙ্গত-সভার কেশবপ্রমুখ যুবক সভ্যগণের এক সময় কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজে একাধিপত্য হইয়া উঠিয়াছিল। মহাত্মা দেবেন্দ্রনাথ এই উন্নতিশীল ধর্ম্মপিপাসু সাহসী আত্মত্যাগী ব্রাহ্মদিগকে পাইয়া অতিশয় প্রীত হন। পরে স্থিতিশীল কতিপয় প্রাচীন ব্রাহ্মের পরামর্শ এবং চেষ্টা যত্নে, ইহাঁরা তথায় অধিক দিন আর তিষ্ঠিতে পারেন নাই।

খ্রীষ্টীয়ানদিগের সহিত বাদানুবাদ।

ব্রাহ্মসমাজের, বিশেষতঃ উন্নতিশীল ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাস এবং কেশবচন্দ্র সেনের জীবনচরিত একই বিষয় বলিলে অত্যুক্তি হয় না। কেন এ কথা আমরা বলিতেছি, তাহা এখন কাহাকেও বুঝাইতে চাহি না, এই গ্রন্থপাঠে তাহা পরে প্রমাণিত হইবে। ধর্ম্মমতবিধিবদ্ধ, সমাজসংস্কার এবং সাধুচরিত্র সঙ্গঠন সম্বন্ধে যে সকল গুরুতর ঘটনা ব্রাহ্মসমাজে ঘটিয়াছে, নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে অনুসন্ধান করিলে, কেশবকে তাহার মূলে নিশ্চয়ই দেখিতে পাওয়া যাইবে। যে সময়ের কথা আমরা এখন লিখিতেছি, তখন সংগ্রাম এবং শত্রুজয়ের সময়। হিন্দু ও খ্রীষ্টধর্ম্মের দূষিত অংশের উচ্ছেদ সাধনোদ্দেশে তিনি এই সময় সম্মুখসমরে দণ্ডায়মান হন। অবশ্য কোন কালে কোন ধর্ম্মের শত্রু তিনি ছিলেন না। এ বিষয়েও তিনি প্রথম হইতে মিতাচারী। সমস্ত

বিষয়ের মধ্যভূমিই তাঁহার অবলম্বনীয় ছিল। বিশেষতঃ উপরিউক্ত দুইটি ধর্ম্মের প্রতি তাঁহার স্বাভাবিক আস্থা প্রথম হইতেই দেখা গিয়াছে। কেবল ভ্রান্তি, কুসংস্কার, পৌত্তলিকতা, জাতিভেদ, বাল্যবিবাহ প্রভৃতির প্রতিকূলে এক্ষণে তিনি বদ্ধপরিকর হইলেন। প্রথমে সংগ্রাম এবং বিনাশ, পরে নষ্টোদ্ধার এবং পুনর্গঠন। সর্ব্বাগ্রে ইহা মানিও না, উহা স্বীকার করিও না; পরে ইহা পালন কর, উহার অসার অংশ পরিত্যাগপূর্ব্বক সার ভাগ তুলিয়া লও; এইরূপ ব্যবস্থা হইয়াছে। সংসারে প্রবেশের পূর্ব্বে যেমন ত্যাগ-স্বীকার বৈরাগ্য বিরতি, শেষে পরিমিত ব্যবহার; সামাজিক রীতি, ধর্ম্মমত এবং অনুষ্ঠান সম্বন্ধেও, তেমনি ইদানীং কোন্ ধর্ম্মের ভিতরে কি ভাল আছে, তাহা গ্রহণের জন্য তাঁহার আগ্রহ ও ব্যাকুলতা জন্মিয়াছিল।

কেশবচন্দ্র যখন প্রচলিত উপধর্ম্ম সকলের প্রতিকূলে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন, তখন হিন্দুসমাজ তাঁহার বিপক্ষে অস্ত্রধারণ করে নাই। হিন্দুদিগের যাহা কিছু আক্রমণ, রাজা রামমোহন রায়ের উপর দিয়াই তাহা চলিয়া গিয়াছিল। তাঁহার লোকান্তর-গমনের পর ব্রাহ্মসমাজ খ্রীষ্টবিদ্বেষী হয়; সুতরাং হিন্দুসমাজের সহিত তৎসম্বন্ধে ইহার কিছু সহানুভূতি জন্মে। পাদরী সাহেব-দিগকে অপদস্থ করিবার জন্য পুরাতন ব্রাহ্মমহাশয়দিগের বিশেষ উৎসাহ ছিল। এ নিমিত্ত কিছুদিনের জন্য একজন ইংরাজ লেখককে নিযুক্ত করা হয়। অক্ষয় বাবুর যোগে তিনি খ্রীষ্টধর্ম্মের প্রতি ভয়ানকরূপে লেখনী পরিচালিত করিতেন। পূর্ব্ব হইতেই

এইরূপ বিবাদ চলিয়া আসিতেছিল, তদনন্তর কেশবচন্দ্র যখন ব্রাহ্মধর্ম্মকে সহজজ্ঞান-ভূমিতে স্থাপন করিলেন, তখন পাদরী মহাশয়দিগেব সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ ভাব জ্বলিয়া উঠিল। ব্রহ্মানন্দ ইতঃপূর্ব্বে ব্রহ্মবিদ্যালয়ে এবং অপরাপর প্রকাশ্য সভায় সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্মেব যে সকল বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব শিক্ষা দিয়াছিলেন, তাহা দ্বারা ধর্ম্মপুস্তকের অভ্রান্ততা, মধ্যবর্ত্তিবাদ, অনন্ত নরক, বাহ্য প্রায়শ্চিত্তবিধি, এ সমস্ত ভ্রান্তি বলিয়া প্রমাণিত হয়। জীবের সহিত ঈশ্বরের সাক্ষাৎসম্বন্ধ, সহজজ্ঞানই ধর্ম্মপুস্তক, অনুতাপই প্রায়শ্চিত্ত ইত্যাদি যুক্তিসঙ্গত মত যখন তাঁহারা শুনিলেন, তখন তাঁহারা এই বলিয়া উপহাস করিতে লাগিলেন যে, ব্রাহ্মধর্ম্মের কোন ভিত্তিভূমি নাই, ইহা শূন্যমার্গে দোদুল্যমান। কেশবের প্রচারিত ধর্ম্মমত যে ভিতরে ভিতরে খ্রীষ্টধর্ম্মের হৃদয়শোণিত শোষণ করিয়া লইতেছিল, সে দিকে তখন কাহারো দৃষ্টি পড়ে নাই।

প্রথমে পাদরী ডাইসেনের সঙ্গে কৃষ্ণনগবে বাদানুবাদ আরম্ভ হয়। পাদরী সাহেবদের সঙ্গে বঙ্গীয় যুবাকে ইংরাজি বাক্‌যুদ্ধে দণ্ডায়মান দেখিলে তখন হিন্দুরা বড় সন্তুষ্ট হইতেন। বিদ্যালয়ের ছেলেদের ত কথাই নাই। খ্রীষ্টীয়ানদিগের শত্রু বলিয়া কেশবের প্রতি হিন্দুসমাজের যথেষ্ট সহানুভূতি ছিল। তাঁহারা বলিতেন, এঁদের দ্বারা আর কিছু হউক না হউক, হিন্দুসন্তানগণের খ্রীষ্টীয়ান হওয়ার পথ বন্ধ হইয়া গিয়াছে। কেশবচন্দ্র একজন অসাধারণ বক্তা, সে জন্যও দেশের লোকের অনুরাগ তাঁহার প্রতি ইতঃপূর্ব্বেই যথেষ্ট বর্দ্ধিত হয়।

কেশবের মহা তেজস্বিনী বক্তৃতা শ্রবণে এবং তৎপ্রতি যুবকদলের প্রগাঢ় অনুরাগ দর্শনে এ দেশের পাদরিদল ক্রমে ভয় পাইতে লাগিলেন। মিসন স্কুলে যাহারা পড়ে, তাহারাও খ্রীষ্টীয়ান হইতে চাহে না, অধিকন্তু বাইবেলের কথার ভুল ধরে; তাহার অলৌকিক ক্রিয়া, সৃষ্টিপ্রকরণ হাসিয়া উড়াইয়া দেয়। মিসন ফণ্ডের রাশি রাশি অর্থ এবং পরিশ্রম এই সকল ব্যক্তির জন্য বৃথা ব্যয় হইতে লাগিল, ইহা কি আর কেহ সহ্য করিতে পারে? এইরূপ প্রবাদ আছে যে, সে সময়ে যে কোন ব্যক্তি খ্রীষ্টধর্ম্মের বিপক্ষে বক্তৃতাদি করিত, পাদরী ডফ্ সাহেব তাহাকে কোন একটী চাকরীর যোগাড় করিয়া দিয়া সরাইয়া দিতেন। নবীনচন্দ্র বসুকে না কি এইরূপে তিনি হাত করিয়া ছিলেন। কিন্তু কেশবের সম্বন্ধে সে কৌশল খাটিবার কোন সুযোগ ছিল না। তিনি পাদরী সাহেবদের উপর পাদরীগিরি করিতে লাগিলেন; তাহাতে ব্রাহ্মসমাজের শ্রীবৃদ্ধি হইতে লাগিল দেখিয়া, খৃষ্টবাদিগণের ঈর্ষানল জ্বলিয়া উঠিল। কেশবের বক্তৃতার স্থলে লোক ধরে না, কিন্তু পাদরিদের সভায় কেহ যাইতে চাহে না। এ সকল দেখিয়া শুনিয়া পাদরী লালবিহারী দে রঙ্গভূমিতে আসিয়া দাঁড়াইলেন। তিনি সে সময় "ইণ্ডিয়ান রিফর্ম্মার" নামক কাগজ লিখিতেন এবং কলিকাতা নগরে প্রচারের কার্য্য করিতেন। দে মহাশয় আমোদ পরিহাসে চিরকালই সুদক্ষ। তাঁহার ইংরাজি রচনা এ বিষয়ে বিখ্যাত। কিন্তু সার সত্যধর্ম্ম কি হাসি মস্কারামিতে নষ্ট হয়? কয়েক

বৎসর ধরিয়া তিনি যথাসাধ্য সংগ্রাম করিলেন, লোকদিগকে নানা রঙ্গরসে হাসাইলেন, বক্তৃতা এবং প্রতি বক্তৃতা দানে আসর গরম করিয়া তুলিলেন; পরিশেষে যোদ্ধৃদ্বয়ের কোন্ ব্যক্তি রণে ভঙ্গ দিলেন, তাহা সকলেই দেখিয়াছেন, বলিবার প্রয়োজন নাই। আদিসমাজের দ্বিতল গৃহে "ব্রাহ্ম-সমাজ সমর্থন" বিষয়ে কেশব একটী বক্তৃতা করেন, তাহাতে মহাত্মা ডফ্ উপস্থিত ছিলেন। বিদায় কালে তিনি বলিয়া গেলেন, "ব্রাহ্ম-সমাজ একটী মহাশক্তি।" তাহার পর আরও কয়েকটী উত্তর প্রত্যুত্তরের বক্তৃতা হইয়াছিল।

অতঃপর পাদরী সাহেবেরা ক্রমে রণে ভঙ্গ দিতে বাধ্য হইলেন, উপহাস ও বিদ্রূপের স্রোত শুকাইয়া গেল। ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম মধ্যাহ্ন সূর্য্যের ন্যায় মধ্য গগনে উদিত হইয়া চারিদিকে সত্যজ্যোতি বিকীর্ণ করিতে লাগিল। ইদানীন্তন খৃষ্টসম্প্রদায়ের সহিত কেশবের কেমন সৌহৃদ্য জন্মিয়াছিল, তাহা পরে প্রকাশ পাইবে। তিনি অনেক বার ভিতরের এবং বাহিরের বিপক্ষ-গণের বিরুদ্ধে ধর্ম্মযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, কিন্তু এতদুপলক্ষে কখন কোনরূপ অভদ্র রুচির পরিচয় দেন নাই। কেবল সুযুক্তি-বলে সত্যকে সমর্থন করিয়া বিপক্ষদলকে পরাস্ত করিতেন। বিবাদ মতভেদ বাদানুবাদ সত্ত্বেও, পাদরী সাহেবদিগের সহিত সদ্ভাব এবং বন্ধুতা তাঁহার চিরদিনই ছিল। ব্যক্তিগত সম্ভ্রম মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া, সদ্গুণের প্রতি শ্রদ্ধা রাখিয়া, ভ্রান্ত মত এবং দূষিত কার্য্যের প্রতিবাদ কিরূপে করিতে হয়, তাহা তিনি

ভালই জানিতেন। দেশস্থ লোকদিগকে তৎসম্বন্ধে সুরুচি শিখাইয়া গিয়াছেন। বিপক্ষের কোন্ স্থানে ভুল দোষ আছে, তাহা সুতীক্ষ্ণ সহজজ্ঞানে এমনি আশ্চর্য্যরূপে ধরিতে পারিতেন যে, তাহা দেখিয়া শত্রুরাও বিস্মিত হইত, এবং তজ্জন্য তাঁহাকে মনে মনে প্রশংসা করিত। ইহার পর খৃষ্টীয়ানদিগের সঙ্গে আর বাগ্‌যুদ্ধ হয় নাই। যাহা কিছু হইয়াছে, তাহা দ্বারা সকলে যথার্থ খৃষ্টধর্ম্ম শিক্ষা পাইয়াছেন। ইদানীং তিনি বাইবেলের কথা দিয়া আধুনিক খৃষ্টধর্ম্মকে আক্রমণ করিতেন। সুতরাং তাহাতেও তিনি জয়ী হইয়া গিয়াছেন। ঈশার শিষ্যগণ তাঁহার পরমাত্মীয় ছিল। কলিকাতা নগরে প্রকাশ্য স্থানে ধর্ম্মপ্রচার করায় যখন কয়েক জন পাদরীকে পুলিসে সমর্পণ করা হয়, তখন তাঁহাদিগের জরিমানার টাকা দিবেন বলিয়া কেশবচন্দ্র এক শত টাকা সঙ্গে করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন। মুক্তিফৌজ-দিগকে গবর্ণমেণ্টের অত্যাচার হইতে রক্ষা করিবার জন্য তাঁহার যে যত্ন প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা সকলেই অবগত আছেন। মধ্যে মধ্যে ধার্ম্মিক পাদরী বন্ধুদিগকে নিজ ভবনে তিনি দেশীয় প্রণালীতে নিরামিষ ভোজ্য ভোজন করাইতেন। ফলে শেষ জীবনে খ্রীষ্টীয় সমাজের সহিত তাঁহার এক প্রকার বেশ বন্ধুতা জন্মিয়া গিয়াছিল। এমন কি, ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার দিন খ্রীষ্টভক্ত বাবু কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে তিনি কাপড় সন্দেশ ফুলমালা উপহার পাঠাইয়া দিতেন। উভয় দলের মধ্যে সময়ে সময়ে পান ভোজন ও সভা সমিতিতে সামাজিক ঘনিষ্ঠ ব্যবহার দৃষ্ট হইয়াছে।

পরীক্ষা ও জয়লাভ (২)

সে সময়ে ব্রাহ্মসমাজে যোগ দেওয়া, দেবেন্দ্র বাবুর গৃহে গমনাগমন এবং আহারাদি করা মহা পরীক্ষার বিষয় ছিল। কলুটোলার সেনপরিবার ঘোর বৈষ্ণব, ঠাকুরগোষ্ঠী ঘোর শাক্ত এবং পিরালী অপবাদগ্রস্ত ; অধিকন্তু তাহার উপর আবার ব্রহ্মজ্ঞানী ; সুতরাং উভয় পরিবারের মিলন হিন্দুসমাজের চক্ষে অতীব ঘৃণাকর। দেবেন্দ্র বাবুর গৃহে আহারাদি সম্বন্ধে চিরদিনই বিজাতীয় রীতি অবলম্বিত হইয়া আসিয়াছে। ব্রাহ্মসমাজের অনেক লোক তথায় গিয়া হিন্দুর নিষিদ্ধ মাংসাদি ভোজন করিতেন। প্রথম আলাপ পরিচয়ের পর প্রধান আচার্য্য মহাশয় কেশব বাবুকে এক দিন নিজালয়ে ভোজনের নিমন্ত্রণ করেন। কেশব কলেজে ইংরাজি শিখিয়া ব্রহ্মজ্ঞানী হইয়াছে, অবশ্য আহারাদি বিষয়ে তাহার কোন কুসংস্কার নাই, এই সংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া তিনি সে দিন বিশেষ যত্নের সহিত বিবিধ প্রকার সামিষ ভোজ্য বস্তুর আয়োজন করেন। সকলেই ভোজনে বসিল এবং চর্ব্য চোষ্য মাংসাদি ভোজন করিতে লাগিল। কেশবের পাতে যাহা আনে, তাহাই তিনি বলেন, খাই না। কোন বস্তুই তিনি ভোজন করিলেন না দেখিয়া, দেবেন্দ্র বাবু ক্ষুব্ধ এবং বিস্মিত হইতে লাগিলেন। পরিশেষে বাড়ীর ভিতর হইতে রোগীর জন্য প্রস্তুত কিঞ্চিৎ সামান্য নিরামিষ ভোজ্য ছিল, তাহা আনিয়া তাঁহাকে

দেওয়া হয়। চতুর্দ্দিকে মাংসাশী ব্রাহ্মদল, মধ্যে এক জন নিরামিষভোজী, দৃশ্যটি নিতান্ত অসুখকর হইল। তাহা দর্শনে এক জন বলিলেন, "হংসমধ্যে বকো যথা।"

কেশবচন্দ্রের ধর্ম্মানুরাগ ও অসাধারণ কার্য্যপটুতা দর্শনে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ অতিশয় মুগ্ধ হইয়া পড়েন। এমন কি, পুত্র অপেক্ষাও তাঁহাকে ভাল বাসিতেন। একদিকে পরিবার মধ্যে তাঁহার প্রতি যেমন উৎপীড়ন, অন্য দিকে প্রধান আচার্য্যগৃহে তেমনি আদর সম্মান। ১৮৬২ খৃষ্টাব্দের ১৩ই এপ্রেল, কেশবচন্দ্রকে কলিকাতা সমাজের আচার্য্যপদে বরণ করা হয়। এই উপলক্ষে দেবেন্দ্র বাবু তাঁহাকে "ব্রহ্মানন্দ" উপাধি এবং এক খানি সনন্দ পত্র প্রদান করেন। গুণগ্রাহী মহর্ষি কেশবকে যেমন চিনিয়াছিলেন, তেমন আর তাঁহাকে কে চিনিতে পারিত? এই উপলক্ষে তিনি নিজভবনে দিব্য এক মহোৎসবের আয়োজন করেন। সুরুচি সহকারে বহির্ব্বাটীব প্রশস্ত প্রাঙ্গণ পত্রপুষ্প, পতাকা এবং দীপমালা দ্বারা অতি সুন্দর রূপে সাজাইয়াছিলেন। আহারাদিরও প্রচুর ব্যবস্থা হইয়াছিল। কেশব বিধিনিয়োজিত আচার্য্য, সুতরাং এই অভিষেক-ক্রিয়ার মধ্যে বিধাতার মঙ্গল হস্ত দেখিয়া তিনি সমধিক কৃতজ্ঞ এবং উল্লসিত হইলেন। তাঁহার বন্ধুবর্গ এবং তিনি সে দিন নিজ নিজ সহধর্ম্মিণীকে উপাসনার স্থানে লইয়া যাইবার জন্য কৃতসঙ্কল্প হন। কেশব এ জন্য নিজে শ্বশুরালয়ে গিয়া পত্নীকে আনয়ন করেন। এ সময় স্ত্রীশিক্ষার প্রতি যুবক ব্রাহ্মগণের বিশেষ কর্ত্তব্যজ্ঞান সমুদিত হইয়াছিল।

আপনাপন সহধর্ম্মিণীকে লেখা পড়া শিখাইয়া তাঁহাদিগকে ধর্ম্মভাগিনী করিবার জন্যও এই সময় হইতে চেষ্টা আরম্ভ হয়। কিন্তু এই আনন্দজনক পবিত্র অনুষ্ঠানে সস্ত্রীক উপস্থিত থাকিবার সঙ্কল্প করাতে একটি বড় ক্লেশকর ঘটনা ঘটিয়াছিল। উক্ত দিবসে প্রাতঃকালে কেশবচন্দ্র সপরিবারে প্রধান আচার্য্যের গৃহে যাইবার জন্য উদ্যোগী হইলেন। ইহাতে পরিবারবর্গের স্বভাবতঃই মহাক্রোধ জন্মিল। পূর্ব্ব রাত্রে জননীর নিকট তিনি বলেন যে, আমি সস্ত্রীক কল্য সমাজে যাইব। একে জননীর অন্তঃকরণ নিতান্ত সরল, তাহাতে পুত্রের প্রতি প্রগাঢ় স্নেহ মমতা, তদ্ব্যতীত কেশবের ধর্ম্মভাবের প্রতিও তাঁহার আন্তরিক সহানুভূতি জন্মিয়াছিল, সুতরাং সহজেই তদ্বিষয়ে তিনি অনুমতি দিলেন। কেশবের দৃঢ়তা ও একাগ্রতা দর্শনে তিনি কোন কার্য্যে আর তাঁহাকে বাধা দিতে সাহসও করিতেন না। পাছে আমার ছেলে আত্মহত্যা করে, এই বড় তাঁহার ভয় ছিল। সমাজে যাইবাব পূর্ব্ব রাত্রিতে তাঁহাকে পুরবাসিনী কোন নারী বলিলেন, "কেশবের বউকে সেতখানার মধ্যে বন্ধ করিয়া রাখা যাউক, নতুবা জাতি কুল সকলি নষ্ট হইবে।" মাতা সে কথা শুনিলেন না। পুরবাসীরা কিছুতেই তাঁহাকে যাইতে দিবেন না, এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিলেন। গৃহস্বামী হরিমোহন সেনের আদেশে দ্বারবান্ বহির্দ্বারে অর্গল বন্ধ করিয়া তাহাতে তালা লাগাইয়া দিল। অপর লোক জন দাস দাসী সকলে দলবদ্ধ হইয়া তাঁহাকে তিরস্কার করিতে লাগিল। একে পিরালী পরিবারে গমন, তাহাতে অল্পবয়স্কা

ভার্য্যা সঙ্গে, কিরূপ সাহসের কার্য্য, তাহা আর এখানে বিশেষ করিয়া বলিবার প্রয়োজন রাখে না। চারিদিকে বয়োজ্যেষ্ঠ অভিভাবকগণ, মধ্যে ধর্ম্মবীর কেশবচন্দ্র। তিনি শান্ত-প্রকৃতি কোমল-স্বভাব যুবক হইলেও এ সময়ে অসাধারণ বীরত্ব প্রদর্শন করিতে বাধ্য হইলেন। সহধর্ম্মিণীকে বলিলেন, "হয় আমার সঙ্গে অগ্রসর হও, নতুবা পরিবারস্থ গুরুজনের পশ্চাতে গমন কর, এই সময়!" এই কথা বলিয়া তিনি মহাবিক্রম সহকারে সবেগে বদ্ধদ্বারের সন্নিধানে উপস্থিত হইলেন। সে ধর্ম্মবলের নিকট আর কোন প্রকার প্রতিবন্ধকতা তিষ্ঠিতে পারিল না। "খোল দরজা!" বলিয়া এমন এক ধমক দিলেন যে, তাহা শুনিয়া দ্বারবান্ সভয়ে তৎক্ষণাৎ দ্বার উন্মোচন করিল। অমনি তিনি বাহির হইলেন, তাঁহার সহধর্ম্মিণীও সাহসপূর্ব্বক পশ্চাৎ অনুসরণ করিলেন। তাহা দেখিয়া বাটীর এক জন প্রাচীন ভৃত্য বলিল, "আ রে! তুমি ভদ্রলোকের মেয়ে, তুমি কোথা যাও?" আর কোথা যাও, বলিতে বলিতে দুই জনে বাহির হইয়া চলিয়া গেলেন। দর্শকবৃন্দ অবাক্ এবং হতবুদ্ধি হইয়া রহিল। বাড়ীর কাছেই পাল্কীর আড্ডা, এক খানি পাল্কীতে স্ত্রীকে উঠাইয়া, তিনি আপনি তাহার সঙ্গে হাঁটিয়া, কলুটোলা হইতে যোড়াসাঁকো চলিয়া গেলেন। ইহার পূর্ব্বে থানায় সংবাদ দিবার জন্য এক পত্র লিখিয়া রাখেন, তাহা আর পাঠান হয় নাই। এই ঘটনায় এ দেশে হিন্দুপরিবার মধ্যে স্ত্রীস্বাধীনতার পথ উন্মুক্ত হইয়া গিয়াছে। নারীজাতিকে অন্তঃপুর-কারামুক্ত করিতে হইলে যে অসামান্য সাহসিকতার

প্রয়োজন, তাহাও কেশবচন্দ্র দেখাইয়াছেন। কিন্তু ইহা তিনি কেবল ধর্ম্মের অনুরোধেই করিয়াছিলেন। তিনি প্রথম হইতে একাকী কখন ধর্ম্মাচরণ করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিতেন না। একটী বন্ধুদল অর্থাৎ ব্রাহ্মপরিবার, আর নিজের পরিবার, এই দুইটির ধর্ম্মোন্নতি সাধনের জন্য তাঁহার চিরদিন সমান আগ্রহ যত্ন প্রকাশ পাইয়াছে। "স্ত্রীর প্রতি উপদেশ" নামক ক্ষুদ্র পুস্তিকা এই সময়ের লিখিত। ইহাতে সংক্ষেপে সরল ভাষায় স্ত্রীর কর্ত্তব্য সকল বর্ণিত আছে। ধর্ম্মবিশ্বাসে আত্মাকে স্বাধীন করাই তাঁহার স্ত্রীস্বাধীনতার অর্থ ছিল। সামাজিক বাহ্য স্বাধীনতার তিনি বিরোধী ছিলেন। কেবল ধর্ম্মের জন্যই স্ত্রীকে অন্তঃপুর-কারামুক্ত করেন।

এই অপরাধে তাঁহাকে কয়েক মাস কাল নির্ব্বাসন-দণ্ড ভোগ করিতে হয়। প্রথমে কিছু দিন সপরিবারে দেবেন্দ্র বাবুর গৃহে অবস্থান করেন। বাড়ীর অন্যান্য ছেলেদের মধ্যে তিনিও একজন ছেলের মত হইয়া তথায় ছিলেন। দেবেন্দ্র বাবু স্বয়ং তাঁহাকে পুত্রনির্ব্বিশেষে এবং পরিবারস্থ অপর সকলে তাঁহাকে ভ্রাতৃনির্ব্বিশেষে যত্ন ও স্নেহ করিতেন। এইরূপে তথায় কিছু কাল বাস করিয়া, পরে কোন উৎকট পীড়ানিবন্ধন নিজ বাস-ভবনের সমীপবর্ত্তী এক ক্ষুদ্র বাটীতে সস্ত্রীক অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। সমাজচ্যুত জাতিভ্রষ্ট কেশবকে তখন আর কেহ ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করে না। আত্মীয়গণ পর হইয়া গেল। কিন্তু তাঁহার পুত্রবৎসলা জননী দেবী এক দিনের জন্যও সন্তানের

প্রতি উদাসীন হইয়া থাকিতে পারেন নাই। সেই ঘোর বিপদের দিনে তিনি কাহারও কথা না শুনিয়া স্নেহপূর্ণ মধুর ব্যবহারে তাঁহার তাপিত হৃদয় শীতল করিতেন। প্রধান আচার্য্য মহাশয়ও সর্ব্বদা সংবাদ লইতেন এবং যথোচিত সাহায্য বিধান করিতেন।

কেশবচন্দ্র এখন নিরাশ্রয়, নিঃসম্বল এবং পরিত্যক্ত। যাঁহার হস্তে পৈতৃক সম্পত্তি, তিনি একজন ক্ষমতাশালী বুদ্ধিমান্ লোক। ইচ্ছাপূর্ব্বক অর্থ বিত্ত ফিরাইয়া না দিলে, সহজে তাঁহার কেহ কিছু করিতে পারে না। ধর্ম্ম এবং সামাজিক আচার ব্যবহার বিষয়ে তাঁহার কথা অমান্য করা হইয়াছে; সুতরাং তদবস্থায় তাঁহার প্রসন্নতা লাভ করা এক প্রকার অসম্ভব। এরূপ নিরাশ্রয়তার মধ্যে আবার এক বিষম রোগ কেশবচন্দ্রকে শয্যাশায়ী করিল। এমন এক দুরারোগ্য ক্ষত হয়, যাহার বেদনায় এবং আসুরিক চিকিৎসায় তিনি মৃতপ্রায় হইয়াছিলেন। আট দশ বাব অস্ত্র-চিকিৎসার পর শেষে অতি কষ্টে আরোগ্য লাভ করেন। দারিদ্র্য এবং বোগ উভয়ে মিলিয়া তাঁহাকে ঘোর পরীক্ষায় ফেলিয়াছিল। তৎকালে তিনি যে আশ্চর্য্য সহিষ্ণুতা এবং ধৈর্য্য দেখাইয়াছিলেন, তাহা ধর্ম্মবিশ্বাসের একটি জ্বলন্ত প্রমাণ। ঈশ্বরে আত্মনির্ভরের ভাব তাঁহার সকল মহত্ত্বের নিদান।

অনন্তর পিতা ভগবান্ যথাকালে আপনার প্রিয় পুত্রকে পরীক্ষানল হইতে কোলে তুলিয়া লইলেন। বিপদের মেঘ সকল ক্রমে অপসারিত হইল, রোগ সারিয়া গেল, স্বাস্থ্য ফিরিয়া

আসিল, প্রথম পুত্র করুণাচন্দ্র জন্মগ্রহণ করিল, পৈতৃক ধনসম্পত্তি হস্তগত হইল; তখন পরিবারস্থ ভ্রাতা বন্ধুগণও তাঁহাকে হাত ধরিয়া ঘরে তুলিয়া লইলেন।

যে বাসভবন হইতে তিনি ধর্ম্মের জন্য তাড়িত হন, সেই খানেই আবার অনতিবিলম্বে পরব্রহ্মের বিজয় নিশান উড়িল। সমুদয় বিপদ্ পরীক্ষা হইতে উত্তীর্ণ হইয়া, ধর্ম্মসংগ্রামে জয়লাভ করিয়া, কেশবচন্দ্র যখন তদীয় জ্যেষ্ঠ পুত্রের জাতকর্ম্ম ব্রাহ্মধর্ম্ম অনুসারে সম্পন্ন করিবার জন্য কৃতসঙ্কল্প হইলেন, তখন সেই বহুজনপূর্ণ কলুটোলার ভবন একেবারে শূন্য হইয়া গেল। চারিদিক হইতে দলে দলে ব্রাহ্ম যুবকেরা আসিতে লাগিলেন, উপাসনা ও আহারের আয়োজন হইতে লাগিল, গুড় গুড় নাদে নহবতের ডঙ্কা বাজিয়া উঠিল। সেই ডঙ্কা যেন ব্রহ্মের জয়ডঙ্কা। তাহার ধ্বনি শ্রবণে বাড়ীর কর্ত্তা পবাস্ত হইয়া বলিলেন, "ও হে ভাই! ক্ষান্ত হও, একটু অপেক্ষা কর।" এই বলিয়া তিনি স্ত্রী পুত্র বালক বালিকা দাস দাসী সকলের সহিত বাগানে চলিয়া গেলেন। কর্ত্তা পরিণত-বয়স্ক, বিষয়বুদ্ধিতে সুনিপুণ, কিন্তু তাহা হইলে কি হয়; যুবক কেশবচন্দ্রেব নিকট তাঁহাকে পরাজয় স্বীকার করিতে হইল। যাহা কিছু পৈতৃক ধন তাঁহার নিকট গচ্ছিত ছিল, তাহা ইতঃপূর্ব্বেই রাজদ্বারে অভিযুক্ত হইয়া তিনি বাহির করিয়া দিতে বাধ্য হন; এক্ষণে ব্রহ্মজ্ঞানী যুবাদিগের দৌরাত্ম্যে উক্ত অনুষ্ঠান দিবসে তাঁহাকে বাড়ী পরিত্যাগ করিতে হইল। এ অনুষ্ঠানে সপুত্র মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ

উৎসাহের সহিত যোগ দান করিয়াছিলেন। হিন্দুধর্ম্মের দুর্গমধ্যে মহাসমারোহে জাতকর্ম্ম সুসম্পন্ন হইল। এই দ্বিতীয় পরীক্ষায় কেশবচন্দ্র নিজ পরিবার মধ্যে প্রথমে জয়লাভ করেন। এই দিন হইতে তাঁহার প্রতি বাড়ীর কেহ আর অত্যাচার করে নাই, বরং দিন দিন সকলে তাঁহার সাহায্য এবং অনুগমন করিয়াছে। বাড়ীর সমস্ত লোক যে দিন বাগানে চলিয়া যান, সে দিনও কেশবজননী অনুষ্ঠানক্ষেত্রে উপস্থিত ছিলেন। এমন উদারচরিত্র হিন্দুধর্ম্মপরায়ণা নারী অতি অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়। লোকের গঞ্জনা সহ্য করিয়া তিনি চিরদিনই পুত্রের সদনুষ্ঠানে যোগ দিয়া আসিয়াছেন। উপাসনা, উৎসব ইত্যাদিতে তাঁহার অনুরাগ নিষ্ঠা ভক্তি উৎসাহ ব্রাহ্মপত্নীদিগকে লজ্জা দান করিয়াছে। অথচ তিনি এক জন হিন্দুধর্ম্মাবলম্বিনী। যাঁহারা প্রাচীন পিতা মাতার ভয়ে পৌত্তলিকতা ও জাতিভেদ ছাড়িতে পারেন না, তাঁহারা কেশবচন্দ্রের সুদৃঢ় অথচ সুকোমল ব্যবহার দেখিয়া শিক্ষা করুন। ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশপূর্ব্বক তিনি অনেক সৎসাহসের দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছেন।

ব্রাহ্মসমাজে আধিপত্য।

কেশবচন্দ্র যখন ব্রাহ্মসমাজে প্রথম প্রবেশ করেন, তখন তিনি একটি নিরীহ শান্তমূর্ত্তি যুবামাত্র। কলিকাতা নগরের প্রসিদ্ধ হিন্দুপরিবারস্থ এক জন কৃতবিদ্য উৎসাহী যুবা ব্রাহ্ম-সমাজকে অলঙ্কৃত করিল, এই ভাবিয়া দেবেন্দ্র বাবু অতিমাত্র আহ্লাদিত হইলেন। ক্রমে কেশবের জীবনকুসুম যত বিকসিত হইতে লাগিল, তাহার মধুর আঘ্রাণে প্রধান আচার্য্য মহাশয় ততই মোহিত হইতে লাগিলেন। এমনি তাঁহার প্রগাঢ় বাৎসল্য ও প্রীতি যে, তাহা বর্ণন করা যায় না। প্রতি রজনীতে উভয়ে মিলিত হইয়া কত গূঢ় ধর্ম্মকথার আলোচনাই করিতেন! আর আর সমস্ত লোক কথাবার্ত্তা কহিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিয়াছে, রাত্রি দুই প্রহর বাজিয়াছে, তথাপি ইহাঁদের প্রসঙ্গ ফুরায় না! বিচ্ছেদের ভয়ে বৃদ্ধ মহর্ষি কেশবকে সময় জানিতে দিতেন না। কেশব যেন তাঁহার নয়নের পুতুল হইয়াছিলেন। যুবা বৃদ্ধে এরূপ প্রণয় পৃথিবীতে অতি বিরল দৃশ্য। এক সঙ্গে পান ভোজন, উপাসনা, ধর্ম্মপ্রসঙ্গ এবং প্রচার প্রভৃতি বিবিধ কার্য্যে উভয়ের মধ্যে প্রেম দিন দিন প্রগাঢ় হইতে লাগিল। আচার্য্যদেবের মুখে শুনিয়াছি, ধর্ম্মালাপ করিয়া এমন আনন্দ আর তিনি কাহারো নিকট কখন পান নাই। দুই জন সাধুর আন্তরিক ধর্ম্মভাবের সংঘর্ষণে অনেক

গূঢ় সত্যের বিকাশ হইয়াছে। ইঁহাদের হৃদয়যুগল সে সময় ঈশ্বরপ্রেমে যেরূপ মজিয়াছিল, তাহার বিবরণ শুনিলেও মনে প্রীতি জন্মে। সমাজগৃহে উপাসনাকালে কেশব সম্মুখে না বসিলে বৃদ্ধ মহর্ষির ভাব খুলিত না, ভাল বক্তৃতা বাহির হইত না। তাঁহার হৃদ্‌গত ধর্ম্মবিশ্বাসের গভীর মর্ম্ম ভাবের ভাবুক পথের পথিক কেশব ভিন্ন আর কে তখন বুঝিতে পারিত? অনন্তর তাঁহাকে তিনি যথাকালে ব্রহ্মানন্দ উপাধি দিয়া আচার্য্যের আসনে বসাইলেন। যে আসন এত কাল উপবীতধারী ব্রাহ্মণদিগের নির্ব্বিবাদ সম্পত্তি ছিল এবং অনতিকাল পরে যাহাতে ব্রাহ্মণেরই আধিপত্য স্থাপিত হইয়াছে, সেই আসন বৈদ্য কেশব কেবল ধর্ম্মবল দ্বারা লাভ করিলেন। স্বয়ং বিধাতাই তাঁহাকে সে আসনের অধিকারী করিয়াছিলেন। এইরূপে ক্রমে ক্রমে তিনি উন্নত হইতে লাগিলেন। এ সম্বন্ধে কেশবের কেহ প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল না। প্রধান আচার্য্য মহাশয় উপযুক্ত পাত্রে সমাজের আধ্যাত্মিক এবং বৈষয়িক যাবতীয় কার্য্যভার অর্পণ করিয়া সুখী এবং নিশ্চিন্ত হইলেন।

কেশবচন্দ্র সহজেই উদ্যমশীল ক্ষমতাবান্ পুরুষ, তাহাতে যুবকদল সহায়, কাজেই অল্পকাল মধ্যে দেশে বিদেশে তাঁহার গৌরব আধিপত্য বিস্তার হইল। ব্রহ্মানন্দের এবং তদীয় সহচরবৃন্দের যোগে প্রাচীন ব্রাহ্মসমাজ এক নবীন মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিল। কাজ কর্ম্মের শ্রীবৃদ্ধি হইল। দুর্ভিক্ষ মহামারী বিষয়ে সাহায্য সংগ্রহ, কলিকাতা কালেজ নামক বিদ্যালয় স্থাপন, মিরার

পত্রিকা প্রকাশ, পুস্তক পত্রিকা প্রণয়ন এবং ধর্ম্ম প্রচার, ইংলণ্ডের ব্রহ্মবাদী ও ব্রহ্মবাদিনীদিগের সহিত পত্র লেখালিখি, নানা স্থানে বক্তৃতা দান এই সমস্ত কার্য্যে কেশবচন্দ্র ক্রমশঃ স্বীয় মহত্ত্বের পরিচয় দিতে লাগিলেন। নানাবিধ সৎকর্ম্মে প্রবৃত্ত হওয়াতে তাঁহার সম্মান মর্য্যাদা বাড়িতে লাগিল, তাহাতে ব্রাহ্মসমাজও নবজীবন পাইল। পশ্চিমাঞ্চলের দুর্ভিক্ষ এবং বর্দ্ধমান প্রদেশের মারিভয় নিবারণার্থ তিনি যে বক্তৃতা এবং পরিশ্রম করেন, তাহাতে সমাজের সভ্যগণের চরিত্রে দেশ-হিতৈষণা প্রজ্বলিত হয়। এ সম্বন্ধে তাঁহার বক্তৃতা বিশেষ ফলোপধায়িনী হইয়াছিল।

বৃদ্ধ সম্রাট্ যেমন প্রাপ্তবয়স্ক পুত্রকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া আপনি লোকচক্ষুর অন্তরালে অবস্থিত করে, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ সেই ভাবে এক্ষণে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। গুরুতর কার্য্যের ভার সমস্ত কেশবের উপর রহিল, নিজে কেবল উপাসনাদি আধ্যাত্মিক ব্যাপারে নিযুক্ত থাকিতেন। সময়ে সময়ে প্রচারার্থ বাহিরেও যাইতেন। কেশবের কাজ, তাঁহার নিজের বলিয়া মনে হইত। বৃদ্ধ হইয়াও যুবকের সহবাসে তখন তিনি যুবস্বভাব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। আহা! কত সুখের কল্পনাই তখন তাঁহার হৃদয়মধ্যে বিচরণ করিত! কি আশা উদ্যমেই তখন তিনি কাল কাটাইতেন! এই সময় ব্রাহ্মসমাজের কথা সমুদ্রপারে ইংলণ্ড আমেরিকা পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়া পড়ে, এবং ব্রহ্মবাদী নিউম্যান প্রভৃতির সহিত কেশব

বাবুর পত্রাদি লেখালেখি আরম্ভ হয়। তাঁহার যোগে সভ্য সমাজের সহিত যে ব্রাহ্মসমাজের নিকট যোগ সম্পাদিত হইয়াছে, বোধ হয়, তাহা কেহই অস্বীকার করিবেন না।

এ দেশের শিক্ষাপ্রণালীর সংস্কারের বিশেষ প্রয়োজনীয়তা কেশবচন্দ্র অতি অল্প বয়স হইতেই উপলব্ধি করিয়াছিলেন। যৎকালে ইংলণ্ডের ব্রহ্মবাদী ফ্রান্‌সিস নিউম্যান এবং ব্রহ্মবাদিনী কুমারী পাউয়ার কবের সহিত তাঁহার পত্র লেখালেখি আরম্ভ হইল, তখন তিনি অন্যান্য বিষয়ের সহিত স্বতন্ত্র স্কুল কলেজ স্থাপন এবং তাহাতে নীতিশিক্ষা-দান বিষয়ে নিউম্যানের নিকট প্রস্তাব করিলেন। শেষোক্ত মহোদয় এ সম্বন্ধে এক সুদীর্ঘ আবেদন-পত্র মুদ্রিত করিয়া ইংরাজসমাজে প্রচারিত করেন। এই দুইজনের রচিত একেশ্বরবাদ-প্রতিপাদক কয়েক খানি সদ্‌গ্রন্থ উভয়ের মধ্যে ঘনিষ্ঠ পরিচয়েব উপলক্ষ হয়। নিউম্যানের প্রেরিত পত্র সকল যুবকগণ তখন অতিশয় আগ্রহের সহিত পড়িতেন এবং প্রোৎসাহিত হইতেন।

অতঃপর কেশবচন্দ্র আদিসমাজের দ্বিতীয় তল গৃহে এক প্রকাশ্য সভায় উক্তরূপ শিক্ষা-বিস্তারের জন্য একটী বক্তৃতা করেন। সেই বক্তৃতার জ্বলন্ত প্রভাব শ্রোতৃবর্গকে জাগ্রৎ করিয়া দিয়াছিল। কেশব যখন যে বিষয়ে হাত দিতেন, তাহা কার্য্যে পরিণত না করিয়া ছাড়িতেন না। তাঁহার বক্তৃতাসকল কার্য্যানুষ্ঠানের বীজ লইয়া প্রসূত হইত। এই বক্তৃতার ফল "ইণ্ডিয়ানমিরার" নামক পত্রিকা এবং "ক্যালকাটা

কলেজ” নামক বিদ্যালয়। মিরার প্রথমে পাক্ষিক হইয়া জন্মগ্রহণ করে, তদনন্তর কেশবচন্দ্র বিলাত যাইবার পূর্ব্বে ইহাকে সাপ্তাহিক করিয়া যান, তাহার পর ইহা এ দেশের প্রথম দৈনিক ইংরাজি সংবাদপত্র হইয়া শিক্ষিত বঙ্গসমাজের গৌরব ঘোষণা করে। যদিও মিরার শেষে স্থিতিশীল আধুনিক হিন্দু-সমাজের মুখপত্র হয়, যদিও তাহাতে সম্পূর্ণরূপে কেশবচন্দ্রের মতামত তখন প্রতিবিম্বিত হইত না, কিন্তু এক সময় ইহা উন্নতিশীল ব্রাহ্মদলের উন্নত বিশুদ্ধ মতামত সকল নির্ভয়ে ও অকপটে প্রচার করিত। পরলোকগত বারিষ্টার মনোমোহন ঘোষ প্রথমে ইহার এক জন প্রধান সহকারী ছিলেন। মিরারের ইংরাজি ভাষা “হিন্দুপেট্রিযট” অপেক্ষা অনেক বিশুদ্ধ বলিয়া এক সময় পরিগণিত ছিল। এই মিরার কেশবচন্দ্রের স্বহস্তরচিত ধর্ম্মনীতি, রাজনীতি এবং সমাজনীতি বিষয়ক অনেকানেক সারগর্ভ নবভাবপূর্ণ সুন্দর প্রবন্ধ দ্বারা স্বদেশের লোকদিগকে সৎ শিক্ষা দান করিয়াছে। মিরার যখন কেশবের হস্তের এক খানি শাণিত অস্ত্র-স্বরূপ হইল, তখন তাঁহার প্রভাব এবং আধিপত্য আরো বাড়িয়া গেল।

তদনন্তর উচ্চতর জ্ঞান-শিক্ষা এবং নীতি-শিক্ষার জন্য ক্যাল-কাটা কলেজ স্থাপন। ইংরাজদিগের কাছে সাহায্যের প্রত্যাশা না করিয়া, কেশব নিজেই এ কার্য্যে বদ্ধপরিকর হইলেন। ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে ইহা স্থাপিত হয়। কেশবের কনিষ্ঠ ভ্রাতা কৃষ্ণবিহারী এবং দেবেন্দ্র বাবুর কোন কোন পুত্র ইহাতে

পড়িয়াছেন। দেবেন্দ্র বাবু প্রথমে ইহার ব্যয়ের জন্য অনেক টাকা দেন, পরে কেশব নিজদায়িত্বে ইহার সমস্ত ব্যয়ভার বহন করেন। তাঁহার কোন কোন সহযোগী বন্ধু বিনাবেতনে এখানে পড়াইতেন। বিদ্বেষপরতন্ত্র বিরোধী পক্ষ এ কার্য্যকে তখন সামান্য বলিয়া হাস্য করিত; কিন্তু কেশব জানিতেন, কি সুমহৎ পবিত্র উদ্দেশ্য সাধনের জন্য উহা হইয়াছিল। বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগকে সাক্ষাৎসম্বন্ধে ধর্ম্মমত শিক্ষা দিবার পক্ষপাতী তিনি কোন কালেই ছিলেন না, কিন্তু তাহাতে প্রথম হইতে নীতিশিক্ষা প্রদান এবং ধার্ম্মিক সচ্চরিত্র শিক্ষকদিগের সদ্দৃষ্টান্তের আবশ্যকতা তিনি চিরদিন স্বীকার করিতেন। পরবর্ত্তী সময়ে তাঁহার এই সাধু সঙ্কল্প কিয়ৎ পরিমাণে আলবার্ট কলেজ দ্বারা সংসাধিত হইয়াছে। ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে ক্যালকাটা কলেজ জন্ম গ্রহণ করিয়া প্রায় ছয় বৎসর কাল জীবিত ছিল। পরিশেষে অর্থাভাবে ইহা উঠিয়া যায়। ইহাতে কেশবচন্দ্রকে অনেক পরিশ্রম করিতে হইত এবং ঘর হইতে অনেক টাকাও তিনি দিয়াছিলেন।

এইরূপে বিবিধ সৎকার্য্যের যোগে ব্রাহ্মসমাজ ক্রমে একটী মহাশক্তিরূপে দণ্ডায়মান হইল। এক দিকে কেশবের অদম্য উৎসাহ, অধ্যবসায় ও কর্ম্মশীলতা, অন্য দিকে স্থির বুদ্ধি, গভীর ধর্ম্মভাব ও কর্ত্তব্যনিষ্ঠা দর্শন করিয়া, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ক্রমশঃ মুগ্ধ হইয়া পড়িলেন। তাঁহাকে তিনি বলিতেন, "সাত রাজার ধন মাণিক।" প্রথম যৌবনে যাহার এরূপ অগ্নিময় ধর্ম্মভাব,

বয়োবৃদ্ধির সহিত, না জানি, সে কত বড় মহৎ লোক হইবে, এই ভাবিয়া মহর্ষি বিস্মিত হইতেন। একটী পৌরাণিক গল্প প্রচলিত আছে যে, রাজা দুষ্মন্ত যৎকালে স্বর্গারোহণ করেন, তখন তিনি দেখিলেন, স্বর্গের দ্বারদেশে একটী ক্ষুদ্র শিশু একটা সিংহের মুখের ভিতর হাত দিয়া তাহার দন্তপাঁতি গণনা করিতেছে। পরে সেই শিশু সন্তানের পরিচয় লইয়া জানিলেন, সে তাঁহার পরিত্যক্তা বনিতা শকুন্তলার গর্ভজাত সন্তান। দুষ্মন্ত রাজার বীরলক্ষণাক্রান্ত এই শিশু পুত্রের মত কেশবের জীবন, দেবেন্দ্র বাবুর চক্ষে এইরূপ প্রতিভাত হইয়াছিল। মহর্ষি যেমন পিতার ন্যায় কেশবকে ভালবাসিতেন, তিনিও তেমনি ধর্ম্মপুত্রের ন্যায় তাঁহাব আজ্ঞা পালন করিতেন। হায়! এই অসার জগতে এমন সুখের স্বর্গীয় প্রণয়ও পরিণামে অসার রূপে প্রতীয়মান হয়। অকৃত্রিম প্রেমের পদে পদে শত্রু।

অনন্তর মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে একযোগে ছয় বৎসর কাল কার্য্য করিয়া, যখন তিনি রক্ষণশীলতার সীমা অতিক্রম করিলেন, সঙ্কর ও বিধবা বিবাহ দিয়া ব্রাহ্মণতনয়দিগের উপবীত ধরিয়া টানাটানি করিতে লাগিলেন, তখন উভয়ের মধ্যে প্রভেদ-রেখা লক্ষিত হইল। মহর্ষি নিজে উপবীত ত্যাগ করিয়া, ব্রাহ্মধর্ম্মমতে স্বীয় কন্যার বিবাহ দিয়া ক্রমে অগ্রসর হইতেছিলেন, এমন সময় যুবকদলের দ্রুতপাদবিক্ষেপ আরম্ভ হইল; তদ্দর্শনে তিনি গতি সংযত করিয়া লইলেন। যদিও তিনি নিজ পরিবার হইতে উপধর্ম্ম পৌত্তলিকতা উঠাইয়া দিয়াছিলেন, কিন্তু একটি

নূতন সমাজ স্থাপন-পূর্ব্বক আমূল সংস্কারে প্রবৃত্ত হইতে তাঁহার কখন ইচ্ছা জন্মে নাই। এই কারণে, যখন কেশবানুচরেরা অসবর্ণ বিবাহ ও বিধবা-বিবাহের সংবাদ তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় প্রকাশ করেন, তখন তাঁহার মন বিরক্ত এবং ভীত হয়।

/ ১৮৬২ খৃষ্টাব্দের ২রা আগষ্ট তারিখে প্রথম সঙ্কর-বিবাহ এ দেশে প্রচলিত হইয়াছে। পার্ব্বতীচরণ গুপ্ত নামক জনৈক শিক্ষিত বৈদ্য যুবা এক বাল-বিধবা বৈষ্ণবকন্যার পাণিগ্রহণ করেন। ইহার পূর্ব্বে সমাজচ্যুত অজ্ঞাত-কুলশীল দুইটী যুবক যুবতী ব্রাহ্মধর্ম্মমতে পরিণয়পাশে বদ্ধ হয়। পার্ব্বতীবাবুর বিবাহে সমাজের মধ্যে বিরোধের অগ্নি জ্বলিয়া উঠে। কেশবচন্দ্র নিজব্যয়ে বস্ত্র অলঙ্কারাদি আনিয়া এই বিবাহে সাহায্য করিয়াছিলেন। এক্ষণে কত গণ্ডায় গণ্ডায় অসবর্ণ বিবাহ হইয়া যাইতেছে, কে কোন্ জাতির লোক, তাহা আর কেহ জিজ্ঞাসা করিতেও চাহে না; কন্যা স্ত্রী এবং বর পুরুষ জাতি কি না, এই মাত্র কেবল অনুসন্ধান করে। এ দেশে ভদ্র হিন্দুসমাজে কেশব এই এক নূতন কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। অবশ্য এরূপ সামাজিক কার্য্যে অধিক বিদ্যা বুদ্ধির দরকার হয় না, কেবল সাহস থাকিলেই চলে। ব্রাহ্ম যুবকদলের এ সম্বন্ধে সাহস বীরত্ব যথেষ্ট প্রকাশ পাইয়াছিল। কেশব বাবু ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে অসবর্ণ-বিবাহপ্রথা ও বিধবা-বিবাহ-প্রথা প্রবর্ত্তিত করিবার প্রধান নায়ক বটেন, নিজ কন্যাকেও তিনি ভিন্ন জাতির হস্তে দিয়াছেন সত্য, কিন্তু এ সকল কাজে তাঁহার বিশেষ উৎসাহ ছিল না; কারণ,

সমাজসংস্কার তাঁহার ধর্ম্মসংস্কারের আনুষঙ্গিক একটী গৌণকার্য্য মাত্র ছিল। একটী ভক্ত সাধক ঋষি যোগী বংশ কিরূপে এই বর্ত্তমান যুগে উৎপন্ন হয়, ইহাই কেবল তিনি ভাবিতেন। যাই হউক, উক্তরূপ দুই একটি অভিনব অভূতপূর্ব্ব ঘটনা দর্শনে প্রাচীন ব্রাহ্মদলের মনে ভয়ের সঞ্চার হইল। তাঁহারা ভাবিলেন, এ সকল যুবাপ্রকৃতি তরলমতি লোক, ইহারা জাতি কুল নাশ করিয়া কোন্ দিন কি সর্ব্বনাশ উপস্থিত করিবে, অতএব এ কার্য্যে বাধা দেওয়া কর্ত্তব্য। এই ভাবিয়া তাঁহারা দেবেন্দ্র বাবুকে উত্তেজিত করিতে লাগিলেন। কেশবের উপর সমাজের কর্ত্তৃত্ব-ভার থাকাতে, ইতিপূর্ব্বেই তিনি প্রাচীনদলের নিকট কিছু অপ্রিয় হন। অধিকন্তু প্রধান আচার্য্যের অত্যধিক আদর সম্মান অনেকেরই চক্ষুঃশূল হইয়া পড়ে। পরিশেষে উপরিউক্ত কার্য্যের দ্বারা প্রচ্ছন্ন প্রভেদ-রেখা স্পষ্টীকৃত হইল। প্রাচীনেরা দেবেন্দ্র বাবুর সমীপে এই অভিযোগ করিলেন যে, তরলমতি যুবা কেশবের হস্তে সমাজের কর্ত্তৃত্বভার থাকিলে মহা অনিষ্ট ঘটিবে। মহর্ষি নিজেও তৎসম্বন্ধে আশঙ্কা করিতেছিলেন। তদনন্তর উপবীতধারী উপাচার্য্যগণ কেন বেদীচ্যুত হইবেন, এই আন্দোলন উত্থিত হইল। দেবেন্দ্র বাবু পূর্ব্ববৎ উপবীতধারী ব্রাহ্মণদিগকে বেদীতে বসিবার অনুমতি দিলেন। তাহাতে সমাজ দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া গেল। ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে এই ঘটনা সংঘটিত হয়। এ সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ ব্রাহ্মসমাজের ইতিবৃত্তে বর্ণিত আছে।

ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন

এক্ষণে আমরা মহাভাগ কেশবচন্দ্রের স্বাধীন কার্য্যক্ষেত্রে আসিয়া উপনীত হইলাম। প্রায় ছয় বৎসর কাল মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সহিত একযোগে বিবিধ সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া তিনি মুক্তভাবে উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। যে সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্ম এবং বিশুদ্ধ ধর্ম্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য তাঁহার আগমন, তাহার কার্য্য পুরাতন ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে সমাবেশ হইল না। সুতরাং সেখানে থাকিয়া, যত দূর সম্ভব, তাহা সমাধা করিয়া, যথাসময়ে তিনি "ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ" স্থাপন করিলেন।

পুরাতন ভাঙ্গিয়া নূতন গড়িতে গেলেই কিছু গণ্ডগোল উপস্থিত হয়। জনসাধারণ যে অবস্থায় স্থিতি করে, তাহার সীমা অতিক্রম করিলেই স্থিতিশীল লোকেরা তাহাকে মন্দ বলে। হিন্দুধর্ম্মের সংস্কারের জন্য রামমোহন রায় এবং দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর যেমন প্রাচীন হিন্দুদিগের নিকট নিন্দনীয় হইয়াছিলেন, কেশবচন্দ্র এক্ষণে পুরাতন ব্রাহ্মদিগের নিকট তদ্রূপ অপরাধী সাব্যস্ত হইলেন। প্রচলিত বিধি ব্যবস্থার সংস্কার এবং পুনঃসংস্কার জন্য, তাহার প্রতিকূলে জনহিতৈষী অগ্রগামী দেশসংস্কারকেরা যদি এইরূপ সাহসের কার্য্যে ব্রতী না হন, তাহা হইলে যেখানকার পৃথিবী সেই খানেই পড়িয়া থাকে। প্রাকৃতিক নিয়মে উন্নতির গতি এইরূপেই চিরকাল শেষপরিণতির

দিকে অগ্রসর হইয়া আসিতেছে। এ স্থলে ঘাত প্রতিঘাত অবশ্যম্ভাবী। কেশবচন্দ্র প্রভৃত সাহস সহকারে যখন পাপ, কুসংস্কার, জাতিভেদ, পৌত্তলিকতা, সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতা এবং অন্যান্য যাবতীয় দূষিত আচারের মূলদেশে কুঠারাঘাত করিলেন, তখন সমস্ত হিন্দুসমাজ কাঁপিয়া উঠিল, প্রাচীন ব্রাহ্মসমাজও ভীত এবং সঙ্কুচিত হইল। বৃদ্ধেরা ভাবিলেন, এ কি বিষম বিভ্রাট! আগে জানিলে যে এমন লোককে সমাজে আসিতে দিতাম না! ঘরের ঢেঁকি কুমীর হইয়া, বুঝি, এই রূপেই মানুষকে খাইয়া ফেলে! তখন উদরস্থ ভুক্ত বস্তুর ন্যায়, দুষ্পাচ্য কেশবচন্দ্রকে উদ্গীরণ করিতে পারিলে বাঁচি, এইরূপ মনে হইতে লাগিল। তিনিও আপনার উদার ভাব স্বভাব লইয়া আর সেখানে থাকিতে পারিলেন না, বাহির হইয়া পড়িলেন। এই ত্যাগস্বীকার এবং অসমসাহসিকতার কার্য্যে কেশবের প্রকৃত মহত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। যদিও ইতিপূর্ব্বে তিনি ছয় বৎসর কাল ক্রমাগত বক্তৃতা, উপদেশ ও সৎকার্য্য দ্বারা জগতে পরিচিত হইয়াছিলেন, কিন্তু প্রকাণ্ড সাগর সমান হিন্দুসমাজের মধ্যে তিনি একটি বিন্দু ভিন্ন আর কিছুই নহেন। বিশেষতঃ যে সমাজের সাহায্যে এত দিন অপেক্ষাকৃত গণ্য এবং প্রতিপত্তিশালী হইলেন, তাহার সহিতও বিচ্ছেদ ঘটিয়া গেল। সহায় সম্বল কিছুই নাই, অথচ পৃথিবীর ধর্ম্মসংস্কারের ভার মস্তকে। আন্তরিক ধর্ম্মবিশ্বাস আর কতিপয় যুবক সহচর মাত্র সঙ্গের সম্বল ছিল। এই লইয়া তিনি পৃথিবীর পথে দাঁড়াইলেন।

মতভেদ এবং কার্য্যভেদ নিবন্ধন যৎকালে তিনি পুরাতন ব্রাহ্মদল হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়েন, তখনকার অবস্থা অতীব দুঃখজনক। যিনি ধন এবং জনবলে বলীয়ান্, ধর্ম্মসম্ভ্রমেও সাধারণের শ্রদ্ধার পাত্র, তাঁহার বিরুদ্ধে এক জন অপরিণত-বয়স্ক যুবা কি করিতে পারে? কিন্তু ধর্ম্মরাজ্যে চিরকাল বিশ্বাসেরই জয় দেখা গিয়াছে। কেশব যে সামান্য যুবা নহে, তাহা অল্প কাল মধ্যেই সকলে বুঝিতে পারিলেন। সেরূপ ঘোর পরীক্ষায় পড়িয়াও তিনি ভগবানের জয়নিশান উড়াইয়া গিয়াছেন। পারিবারিক পরীক্ষা অপেক্ষাও এটি তাঁহার পক্ষে কঠিন পরীক্ষা হইয়াছিল। দেবেন্দ্র বাবুর ন্যায় ব্যক্তির বিপক্ষে দাঁড়াইয়া সংগ্রাম করা কি সাধারণ কথা? কিন্তু কেশবের বিশ্বাস সাহস কি অপরিসীম! অসহায় নিঃসম্বল হইয়াও তিনি ব্রহ্মকৃপাবলে শূন্যের মধ্যে এক দিব্যরাজ্য রচনা করিয়া ফেলিলেন।

আদিসমাজে কোন রূপ অধিকার না পাইয়া মহাত্মা কেশব "ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ" এবং এক স্বতন্ত্র ব্রহ্মমন্দির প্রতিষ্ঠার জন্য বদ্ধপরিকর হন। বিচ্ছেদের কিছু পূর্ব্বে "ধর্ম্মতত্ত্ব" নামক মাসিক পত্রিকা বাহির হয়। উন্নতিশীল ধর্ম্মমত সকল তৎকালে উহাতে প্রচারিত হইত। "ইণ্ডিয়ান মিরার" ও "ক্যালক্যাটা কলেজ" নামক বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃত্বভার তাঁহার হস্তে ছিল। এতদ্ব্যতীত নিজ অর্থে তিনি একটি মুদ্রাযন্ত্র ক্রয় করেন, তাহাতে ঐ সমস্ত পত্রিকাদি মুদ্রিত হইত। এই কয়েকটি বাহ্য উপায়

এবং কতিপয় অনুগত ধর্ম্মবন্ধু পাইয়া, পরিশেষে তিনি এত বড় মহৎ ব্যাপার সমাধান করিয়া গিয়াছেন।

ধর্ম্মসংস্কারকেরা বাস্তবিকই ঈশ্বর হইতে এক নূতন জগৎ সৃষ্টি করিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হন। তাঁহারা পুরাতন ভাঙ্গিয়া তাহাকে এক অভিনব আকার দান করিতে পারেন। কেশব সত্যের বীজ বপন করিয়া জীবদ্দশাতেই তাহার ফলভোগে কৃতকার্য্য হইয়া গিযাছেন। সৃষ্টির পূর্ব্বে অনন্ত আকাশব্যাপী তরল ধূমরাশি যেমন আকারবিহীন হইয়া অবস্থিতি করিত, সর্ব্বাঙ্গসুন্দর নববিধান-ধর্ম্ম তৎকালে ভ্রূণের ন্যায় তেমনি তাঁহার হৃদয়াধারে অবস্থিতি করিতেছিল। প্রথম জীবনে তিনি যে পরিশ্রম করেন, তাহার ফলে কতিপয় উন্নতিশীল আত্মত্যাগী যুবক তাঁহার আনুগত্য স্বীকার করে। এইরূপ আনুগত্যই নূতন ধর্ম্মসমাজের ভিত্তিভূমি। কেশবচন্দ্র ধর্ম্মবন্ধুগণের সহায়তা পাইয়া স্বীয় ব্রত-পালনে সফলকাম হইয়াছেন। রাজ্য স্থাপন করিয়া তাহাতে কিরূপে প্রজা বসাইতে হয়, বিপক্ষদলের নিকট হইতে নিজপ্রাপ্য ন্যায়সঙ্গতরূপে কি প্রকারে হস্তগত করিতে হয়, তাহার উপযোগী সুবুদ্ধি তাঁহার ছিল। মণ্ডলীসংগঠন ও তাহার বিধি ব্যবস্থা প্রণালী স্থাপন ইত্যাদি বিষয়ে তাঁহাকে এক জন সুনিপুণ রাজমন্ত্রী বলিয়া মনে হয়। এ সম্বন্ধে সময়ে সময়ে বিপদ সঙ্কটের কালে তিনি যেরূপ বিচক্ষণতা এবং সূক্ষ্মদর্শিতার পরিচয় দিয়াছেন, তাহা দেখিয়া প্রখরবুদ্ধি উকীল ও রাজনীতিজ্ঞদিগেরও আশ্চর্য্য বোধ হইত। সহজজ্ঞানে তিনি

সহজে এ সমস্ত গূঢ় তত্ত্ব বুঝিতে পারিতেন। এই জন্য লোকে তাঁহাকে চতুর বলিয়া ভয় করিত। কিন্তু ঈশ্বরেচ্ছাধীনে তিনি বুদ্ধি বিদ্যা খাটাইতেন।

আদিসমাজের ট্রাষ্টী প্রধান আচার্য্য মহাশয় যখন স্বহস্তে তথাকার সমস্ত কার্য্যভার গ্রহণ করিলেন, তখন কেশবচন্দ্র সবান্ধবে তথা হইতে বিদায় লইলেন, এবং প্রকাশ্যরূপে ভয়ানক আন্দোলন আরম্ভ করিলেন। মিরারের অগ্নিময় প্রবন্ধাবলী এবং প্রকাশ্য সভার বক্তৃতাগুলি পাঠ করিলে সে সময়ের অবস্থা কিছু কিছু বুঝা যায়। এই আন্দোলনে তাঁহার দিকে স্বাধীন-প্রকৃতি কৃতবিদ্য সভ্যসমাজের সহানুভূতি আকৃষ্ট হইল। এ সম্বন্ধে তিনি শেয়ালদহ ষ্টেসনে এবং সিন্দুরিয়াপটিস্থ মৃত গোপাল মল্লিকের ভবনে দুইটী সুদীর্ঘ বক্তৃতা করেন। শেষোক্ত স্থানে "ব্রাহ্মসমাজে স্বাধীনতা এবং উন্নতির জন্য সংগ্রাম" এইটী বক্তৃতার বিষয় ছিল। সভাস্থলে বহু লোকের সমাগম হয়। রাজা দিগম্বর মিত্র ইহাতে উৎসাহ দিয়াছিলেন।

বিপদ আপদের সময় কেশবের ধীশক্তি যথেষ্ট স্ফূর্ত্তি লাভ করিত। খরস্রোতা বেগবতী নদী সম্মুখে বাধা পাইলে যেমন তর্জ্জন গর্জ্জন করে, কেশবের বক্তৃতা এইরূপ আন্দোলনের সময় তেমনি মহাপ্রভাবশালিনী হইত। ব্যক্তিগত গূঢ় চরিত্র লইয়া তিনি রাগদ্বেষ প্রকাশ করিতেন না, কিন্তু অসত্য অধর্ম্মের বিরুদ্ধে বহুজনসমাকীর্ণ সভাস্থলে যখন দাঁড়াইতেন, তখন চক্ষু হইতে যেন অগ্নিকণা বহির্গত হইত। তাঁহার বক্তৃতার উপর

মুখ খুলিতে পারে, এমন লোক দেখি নাই। মহাযোদ্ধা বীরাগ্রগণ্য সেনানায়কের সহস্র সহস্র আগ্নেয় আয়ুধ অপেক্ষা তাঁহার মুখবিনিঃসৃত মহাবাণী সকল তেজস্বিনী ছিল।

পরীক্ষা বিপদ উপস্থিত হইলে সাধারণতঃ লোকে হতবুদ্ধি হয়, কিন্তু গুণসাগর কেশবের সে অবস্থায় নব নব উপায় উদ্ভাবনের শক্তি আরো উন্মেষিত হইত। ধীবরদিগের ন্যায় প্রথমে তিনি মানবসমাজ-সরোবরের চতুঃপার্শ্ব একবার আলোড়িত করিলেন, তদনন্তর জাল পাতিলেন। সেই আন্দোলনে কতকগুলি মৎস্য আসিয়া জালে পড়িল। ঈশার ন্যায় ইনিও মানুষধরা মন্ত্র জানিতেন। ১৮৮৬ শকের ১৬ই ফাল্গুন, তাড়িত ব্রাহ্মদলকে লইয়া রীতিপূর্ব্বক একটী সাধারণ সভা সংগঠন করিলেন। তৎসঙ্গে একটি প্রচারকার্য্যবিভাগও প্রতিষ্ঠিত হইল। সাধারণের অর্থে এবং সাধারণের সমবেত অভিপ্রায়ে উহার কার্য্য সম্পন্ন হইতে লাগিল। ব্যক্তি বিশেষের একাধিপত্য না থাকে, সকলে মিলিয়া কার্য্য নির্ব্বাহ করা হয়, এই উদ্দেশ্যে উক্ত সভা স্থাপন করিলেন। ইহার কিছু দিন পরে অর্থাৎ ইংরাজি ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দের ১১ই নবেম্বর দিবসে "ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ" স্থাপিত হয়।

এই "ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ" নববিধানের বিচিত্র লীলার জন্মভূমি। এখানকার ব্রাহ্মধর্ম্ম নববিধানের ব্রাহ্মধর্ম্ম। পূর্ব্ব-প্রচলিত ব্রাহ্মধর্ম্মের সহিত নববিধানের কি প্রভেদ, তাহা এই স্থানে অনুসন্ধান করিলেই বুঝিতে পারা যাইবে। দেবেন্দ্র বাবুর "ব্রাহ্মধর্ম্ম" গ্রন্থ, আর কেশব বাবুর "শ্লোকসংগ্রহ" উক্ত প্রভেদের

সুস্পষ্ট নিদর্শন। হিন্দুসীমায় আবদ্ধ সঙ্কীর্ণ ব্রাহ্মধর্ম্মের গর্ভে জগদ্ব্যাপী বিশ্বজনীন নববিধান এই সময় জন্ম গ্রহণ করে, কিন্তু তখন সে ভূমিষ্ঠ হয় নাই। কালসহকারে তাহার সমুদায় অঙ্গ প্রত্যঙ্গ যখন বর্দ্ধিত হইল এবং সে নির্দ্দিষ্ট আকার ধারণ করিল, তখন তাহার নাম হইল, শ্রীমান্ নববিধান। ইহা পুরাতন ব্রাহ্মধর্ম্মেরই যে ক্রমবিকাশ, তাহা আর বলিবার প্রয়োজন রাখে না। কারণ, এক অদ্বিতীয় আদি পুরুষ ব্রহ্মের জ্ঞানলাভ এবং তাঁহার উপাসনার জন্যই রাজা রামমোহন রায় ব্রহ্মোপাসনালয় স্থাপন করেন। তাহা হইতে পরে ব্রাহ্মধর্ম্ম এবং ব্রাহ্মসমাজ নাম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এক ব্রহ্ম বস্তুই যাবতীয় উন্নতির আদি বীজ। সুতরাং বীজের সহিত ফলফুলে শোভিত বৃক্ষের যে প্রকৃতিগত ঘনিষ্ঠ যোগ আছে, তাহা আর কে অস্বীকার করিবে ? কিন্তু তাহা হইলে কি হয়, উভয়ের মধ্যে জ্ঞানে, সাধনে এবং কার্য্যে এত প্রভেদ দাঁড়াইয়াছে যে, এখন আর দুইটিকে এক বলিতে পারা যায় না। মূলেতে এবং অনেক বিষয়ে একতা আছে, এই মাত্র। বীজের সহিত ফুলফলে শোভিত বৃক্ষের যেরূপ স্বতন্ত্রতা, সেইরূপ স্বতন্ত্রতা ইহার ভিতর লক্ষিত হয়। পুরাবৃত্ত-পাঠক মহাশয়েরা নববিধানের সহিত ব্রাহ্মধর্ম্মের একতা এবং স্বতন্ত্রতা কিরূপ পরিষ্কার, এই স্থানে তাহা অনায়াসে বুঝিতে পারিবেন।

ঔদার্য্য ও পবিত্রতা, স্বাধীনতা এবং প্রেমের মিলনভূমি এই সভা যে দিন স্থাপিত হইল, সেই দিন নানা শ্রেণীর লোক ইহার

সভ্যপদে মনোনীত হইলেন। প্রথমে কিছু দিন প্রধান আচার্য্য মহাশয়ও ইহার সভ্যশ্রেণী-ভুক্ত ছিলেন। প্রতি মাসে দশ টাকা করিয়া তিনি চাঁদা দিতেন। বিস্তীর্ণ সাগরবক্ষে বালুকাকণা সকল সংহত হইয়া যেমন ক্রমে ক্রমে দ্বীপ, মহাদ্বীপপুঞ্জ নির্ম্মাণ করে, ভারতের পৌত্তলিকতা এবং ভ্রান্তি কুসংস্কারসাগরে তেমনি এই নবীন সমাজ সামান্য একটি দ্বীপ রূপে মস্তক উত্তোলন করিল। ইহা আদি সমাজের ত্রুটি অপূর্ণতা মোচনের জন্য, বিনাশের জন্য নহে। প্রাচীন হিন্দু পিতার সঙ্গে নব্য উন্নতিশীল ব্রাহ্মের যেরূপ সম্বন্ধ, এই দুইটি সমাজ সেইরূপ চিরসম্বন্ধে আবদ্ধ।

ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ স্থাপনের পর কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজ আদিসমাজ নামে অভিহিত হয়। এই ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের নিয়মাবলী, ইহার উদার প্রশস্ত সহজজ্ঞানসঙ্গত মত বিশ্বাস এবং পবিত্র অনুষ্ঠান সকল শিক্ষিত অশিক্ষিত নরনারী মাত্রের হৃদয় স্বতঃই আকর্ষণ করে। সম্রাট আকবর এক সময় ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীদিগের শাস্ত্রীয় মতামত শ্রবণ কবিয়াছিলেন মাত্র, কার্য্যতঃ তাহাতে হস্তক্ষেপ করেন নাই ; কেশবচন্দ্র মতে, বিশ্বাসে ও কার্য্যে সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয়ের দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। ঈশা মুশা মহোম্মদ শাক্য জনক যাজ্ঞবল্ক্য চৈতন্য নানক কনফুস যোরোয়েস্তার প্রভৃতি মহাজন এবং বেদ উপনিষদ্ ভাগবত গীতা কোরাণ বাইবেল ললিতবিস্তর জেন্দাভেস্তা গ্রন্থসাহেব প্রভৃতি মূল ধর্ম্মপুস্তক সমুদয়কে তিনি জাতিনির্ব্বিশেষে প্রত্যেক

নরনারীর শ্রদ্ধা ও আদরের সামগ্রীরূপে প্রতিপন্ন করিয়া গিয়াছেন। ইহাই তাঁহার নববিধান।

ব্রহ্মরাজ্যবিস্তার

ব্রাহ্মধর্ম্মই কেশবচন্দ্রের জীবন, এবং ব্রাহ্মসমাজই তাঁহার কার্য্যক্ষেত্র, সেই জন্য ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাসে আর তাঁহার জীবনচরিতে অতি অল্পই পার্থক্য দৃষ্টিগোচর হয়। কারণ, তাঁহার চরিত্রের প্রভাব ইহার প্রত্যেক সভ্যের জীবনকে উন্নতির পথে চালিত করিয়াছে। ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ স্থাপনের পর হইতে এই ব্যক্তিত্বপ্রভাব বহু পরিমাণে সমাজের মধ্যে বিস্তৃত হইয়া পড়ে। ইহার বিস্তৃত বিবরণ ইতিবৃত্তে অবগত হওয়া যাইবে। এ স্থলে কেবল কেশবচন্দ্রের ব্যক্তিগত বিশেষ বিশেষ সদ্‌গুণ ও সদনুষ্ঠানের উল্লেখ করিয়া আমরা ক্ষান্ত হইব।

আচার্য্য ব্রহ্মানন্দ ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বেই যে ধর্ম্মপ্রচারে অনুরাগী ছিলেন, তাহা আমরা তাঁহার প্রথম জীবনের ইতিহাসেই বিবৃত করিয়া আসিয়াছি। ক্রমে ধর্ম্মভাব এবং বিশ্বাস যত বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, শ্রোতা ও অনুবর্ত্তীর সংখ্যা যত বাড়িতে লাগিল, প্রচারের ইচ্ছা ততই বলবতী হইয়া উঠিল। বিধাতার বিধান পালন এবং প্রচার তাঁহার সকল মহত্ত্বের নিদান। প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞান বিশ্বাস উদ্যম এবং ক্ষমতা ক্রমশঃ বৃদ্ধি

প্রাপ্ত হয়। তেইশ বৎসর বয়ঃক্রমে ভবানীপুর ব্রাহ্মসমাজে "মানবজীবনের উদ্দেশ্য" বিষয়ে যে বক্তৃতা তিনি করেন, তাহাতে বর্ণিত আছে যে, "প্রত্যেক মনুষ্য প্রচারক এবং ঈশ্বরের ক্রীত দাস।" ভবিষ্য জীবনে যে যে বিষয় বিস্তারিতরূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহার সূত্র সকল প্রথম জীবনেই প্রচার করেন। উক্ত বক্তৃতায় তিনি আপনার ভাবী মহত্ত্বের অনেক পরিচয় দিয়াছিলেন। একটি সারবান্ উন্নতিশীল সাধুচরিত্র স্বাভাবিক নিয়মে কেমন বিকসিত হয়, কেশবচন্দ্রের জীবন তাহার দৃষ্টান্ত। মনুষ্যমণ্ডলীকে ধর্ম্মপথে আনিবার জন্য তাঁহার কি আগ্রহই ছিল! পরম প্রভুর সেবায় তিনি কখন শ্রান্তি অনুভব করিতেন না। কথা কহিতে কহিতে মস্তক ঘূর্ণায়মান হইত, তথাপি ক্ষান্ত হইতেন না। পিপাসু জিজ্ঞাসু পাইলে আহ্লাদের সীমা থাকিত না। চারি পাঁচ ঘণ্টা কাল অবিশ্রান্ত অতি নিগূঢ় বৈজ্ঞানিক বিষয় লইয়া আলাপ করিতে দেখা গিয়াছে। রবিবারের দিন সমস্ত সময়, রাত্রি দশটা পর্য্যন্ত উপাসনা এবং ধর্ম্মপ্রসঙ্গে নিযুক্ত থাকিতেন। মানবপরিবারের ভাবী কল্যাণ কামনা, জীবের মুক্তি কামনা তাঁহার জীবনের অন্ন পান স্বরূপ ছিল।

প্রথমতঃ কিছু দিন কেবল কলিকাতা, ভবানীপুর, চুঁচুড়া, শ্রীরামপুর প্রভৃতি স্থানে তিনি প্রচারকার্য্যে ব্রতী ছিলেন। চুঁচুড়ায় যখন প্রচার করিতে যাইতেন, অনেক সময় মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ তাঁহার সঙ্গে থাকিতেন। তথাকার কলেজের

জনৈক উচ্চ শ্রেণীর বুদ্ধিমান্ ছাত্র—পরে যিনি এক জন উচ্চ-পদস্থ সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি হইয়াছিলেন—তিনি বলিয়াছিলেন, "এক দিন আমি কেশবের বক্তৃতার স্থলে উপস্থিত ছিলাম। তিনি এই ভাবে বলিতেছিলেন যে, 'ঈশ্বরের নামে হস্ত প্রসারণ কর, ব্রহ্মবলে লৌহ কবাট উদ্‌ঘাটিত হইয়া যাইবে।' তখন তিনি নিতান্ত যুবা, কিন্তু কথাগুলি যেন জ্বলন্ত অগ্নির ন্যায় প্রভাব-শালী।" অল্প দিনের মধ্যে কেশব সেনের বক্তৃতা একটী অভূতপূর্ব্ব শ্রোতব্য বিষয় হইয়া পড়িল। বিদ্যালয়ের ছাত্রেরা তাহা শুনিবার জন্য যেন একেবারে পাগল হইত। বাঙ্গালির মুখে ইংরাজি বক্তৃতা এমন আর কেহ কখন শুনে নাই। এক সময় রামগোপাল ঘোষ রাজনীতি সম্বন্ধে কয়েকটী বক্তৃতা করিয়াছিলেন, তাহার পর এ পথে আর কেহ পদার্পণ করেন নাই। কেশব হইতেই মুখে মুখে বক্তৃতা করিবার প্রথা এ দেশে বিশেষরূপে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। আজ কাল যে সে বক্তৃতা করিতেছে। ব্রাহ্মসমাজের আবাল বৃদ্ধ বনিতা এ কার্য্যে বড়ই তৎপর। বেদীতে বসিয়া স্ত্রীলোকে পর্য্যন্ত বক্তৃতা করে, ইহা অপেক্ষা আর আশ্চর্য্যের বিষয় কি আছে। অনেক নর নারী এখন দেশীয় বিদেশীয় ভাষায় বক্তৃতা করিতে শিখিয়াছেন; কিন্তু কেশব সেনের মত কাহারো হইল না। সে এক অসাধারণ শক্তি, ইংরাজেরা পর্য্যন্ত শুনিয়া অবাক হইয়া যাইত। এ সম্বন্ধে কেশবচন্দ্র অদ্বিতীয় ক্ষমতাশালী ছিলেন। দয়াময় বিধাতা পুরুষ তাঁহাকে যেমন এক আশ্চর্য্য

জগদ্ব্যাপী "নববিধান" ধর্ম্ম দিয়াছিলেন, তেমনি তাহা বিস্তারের জন্য তাঁহাকে অসামান্য বাগ্মিতা-ভূষণে ভূষিত করিয়াছিলেন। সত্য সত্যই কেশবকণ্ঠে বেদমাতা বাগ্দেবী নিত্য বিরাজ করিতেন। যেমন মধুর গম্ভীর সুশ্রাব্য স্পষ্ট স্বর, তেমনি প্রত্যাদিষ্ট মহান্ অর্থযুক্ত ভাবময়ী কথা। প্রকাণ্ড টাউনহলের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত সে ধ্বনি বংশিধ্বনির ন্যায় নিনাদিত হইত। তিন চারি সহস্র লোক মন্ত্রমুগ্ধ সর্পের ন্যায় নীরবে তাহা শ্রবণ করিত। যে সভায় তিনি কিছু না বলিতেন, সেখানকার শ্রোতৃবর্গের মন পরিতৃপ্ত হইত না। অপরের বক্তৃতা শুনিতে শুনিতে কর্ণ শ্রান্ত হইয়াছে, সময় অতীত হইয়া গিয়াছে, তথাপি কেশব কি বলেন, শুনিবার জন্য সকলে প্রতীক্ষা করিত। যখন যেখানে যাহা কিছু তিনি বলিতেন, তাহার ভিতর কিছু না কিছু নূতন ভাব থাকিত। মহর্ষি ঈশার অমৃত বচন শ্রবণে যেমন কেহ কেহ বলিয়াছিল, 'এমন আর কোথাও শুনি নাই।' সাধারণের মধ্যে কেশবের কথা তেমনি প্রভাবশালিনী ছিল। যে সকল লোক অন্যান্য বিষয়ে তাঁহার বিরোধী ছিল, তাহারাও বক্তৃতা শুনিয়া মুগ্ধ হইত। হায়! টাউনহল্ আর সে দৃশ্য দেখিবে না! সে অলৌকিক কণ্ঠরব আর শুনিতে পাইবে না! এই বলিয়া কত লোক এখন খেদ করিতেছে। কত ব্যক্তি তাঁহার মুখবিনিঃসৃত কবিত্বরসপূর্ণ গম্ভীর ভাবযুক্ত সুললিত ইংরাজি মুখস্থ করিয়া রাখিয়াছে। তাহা শ্রবণে এবং উচ্চারণে এখনো মন উত্তেজিত হয়।

তিন চারি বৎসর ক্রমাগত বক্তৃতা দ্বারা স্বদেশ মাতৃভূমিকে জাগাইয়া, ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দের ৯ই ফেব্রুয়ারিতে তিনি মাদ্রাজ এবং বোম্বাই প্রেসিডেন্সীতে প্রচারার্থ গমন করেন। দূরদেশে এই তাঁহার প্রথম প্রচার। উভয় স্থানেই তিনি সাদরে পরিগৃহীত হন। সেই সময় হইতে উক্ত প্রদেশে ধর্ম্মের আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছে। কেশবের বক্তৃতা শ্রবণে উৎসাহী হইয়া তত্রত্য অধিবাসিগণ ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন করেন। সে সময় তাঁহাকে ঐ সকল অঞ্চলের লোকেরা সুবক্তা এবং বিদ্বান্ বলিয়া আদর সম্মান প্রদান করিত, ধর্ম্মের দিকে তখন কাহারো তত দৃষ্টি পড়ে নাই। মাদ্রাজে যে ধর্ম্মবীজ তিনি রোপণ করিয়াছিলেন, তাহা ক্রমে অঙ্কুরিত হইয়াছে। শ্রীধর স্বামী নাইডু নামে তথাকার জনৈক ব্যক্তি ব্রাহ্মধর্ম্মের বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন।

বোম্বাই নগরেও তাঁহার অভ্যর্থনা এবং বক্তৃতার জন্য কয়েকটী প্রকাশ্য সভা হয়। কেশব বাবু টাউনহলে মৌখিক বক্তৃতা করিবেন শুনিয়া তত্রত্য প্রসিদ্ধ বিদ্বান্ ডাক্তার ভাওদাজী বলিলেন, "এমন সাহস করা কি উচিত?" পরে বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া তিনি অবাক্ হইয়া যান। এই খানে পাদরী উইলসন সাহেবের আলয়ে রঞ্জিতসিংহের পুত্র দলীপ সিংহের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। যুবা দলীপ সিংহ তখন নবীন খ্রীষ্টীয়ান। তিনি এ দেশের সমস্ত লোককে এবং নিজের পূর্ব্ব পুরুষদিগকে অনন্ত নরকের যাত্রী বলিয়া ঘৃণা করিতেন।

যুবকের দুর্দ্দশা দেখিয়া কেশবচন্দ্র বড় দুঃখিত হন। তৎকালে সার বার্টেল ফ্রিয়ার তথাকার গবর্ণর ছিলেন। তিনি এই নবীন ধর্ম্মসংস্কারকের বুদ্ধি, ক্ষমতা এবং সদ্‌গুণের যথেষ্ট সমাদর করেন। ইহার অব্যবহিত পরে বোম্বাই প্রার্থনাসমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়। এক্ষণে তথায় শত শত সম্ভ্রান্ত উচ্চপদস্থ কৃতবিদ্য ব্যক্তি এক নিরাকার ব্রহ্মের উপাসনা করিয়া থাকেন। ইহা ব্যতীত পুনা, সেতারা, আহমদাবাদ প্রভৃতি নগরেও এই রূপ ধর্ম্মসমাজ স্থাপিত হইয়াছে। প্রথমাবস্থায় কেশবচন্দ্র কেবল নৈতিক কর্ত্তব্য, শুদ্ধতা, সমাজসংস্কার, প্রার্থনা, উৎসাহোদ্দীপন, দেশহিতৈষণা এই সকল বিষয়ে বক্তৃতা করিতেন। যোগ বৈরাগ্য ধ্যান সমাধি ভক্তি প্রেম দর্শন শ্রবণ সাধুভক্তির নামও তখন ছিল না।

আদিসমাজে থাকা কালে আচার্য্য কেশবচন্দ্র উপরি উক্ত দুই নগরে এবং কলিকাতা ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী কতিপয় নগরে ধর্ম্ম প্রচার করেন। তদনন্তর ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ স্থাপনপূর্ব্বক যথারীতি দেশ দেশান্তরে সবান্ধবে প্রচার করিতে লাগিলেন। আপনি যেমন জীবনের সমস্ত ভার বিধাতার হস্তে সমর্পণ করিয়া জগতের হিতসাধনে ব্রতী হন, তেমনি সঙ্গত-সভার কতিপয় উৎসাহী সভ্য তদীয় সাধু দৃষ্টান্তের অনুসরণ করেন। ভারতক্ষেত্রে হিন্দু জাতির মধ্যে এ প্রণালীতে ধর্ম্ম-প্রচার একটি নূতন ব্যাপার সন্দেহ নাই। বৌদ্ধ সন্ন্যাসী এবং খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মযাজকগণ এ পথ দেখাইয়া গিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু

হিন্দুসমাজে হিন্দুপরিবারে বাস করিয়া নিঃস্বার্থভাবে বিশুদ্ধ অপৌত্তলিক ধর্ম্ম কেহ কোন দিন এ দেশে প্রচার করে নাই। পরম বৈরাগী ঈশা এবং তৎপথাবলম্বী প্রেরিত মহাত্মাগণের জীবন্ত বিশ্বাসের নিদর্শন এই দলের মধ্যে প্রত্যক্ষগোচর হইয়াছে। ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের প্রচারকদল প্রথম শতাব্দীর খ্রীষ্টধর্ম্ম-বিশ্বাসী বৈরাগী দলের প্রতিবিম্ব স্বরূপ বলিলে অত্যুক্তি হয় না।

কেশবচন্দ্র স্বয়ং চিরদিন সুখবিলাসসেবিত সম্ভ্রান্ত পরিবারে বাস করিয়াও, কিরূপে বৈরাগীদল প্রস্তুত করিলেন, ইহা এক কঠিন প্রহেলিকা। যে ভাবে তিনি বাহ্য জীবন অতিবাহিত করিতেন, তাহা দেখিয়া সহসা কেহ বিশ্বাস করিতে পারিত না যে, এ ব্যক্তির চরিত্রে কিছু মাত্র বৈরাগ্য-লক্ষণ আছে। অথচ তাঁহার জীবনের গূঢ় স্থানে মহাবৈরাগ্য অবস্থিতি করিত। সেই স্বর্গীয় বৈরাগ্যবলে এই সর্ব্বত্যাগী প্রচারকদল সংগঠিত হইয়াছে। মর্কট বৈরাগ্য তিনি ঘৃণা করিতেন। বলিতেন, যদি কোন বিষয়ে কপট ব্যবহার করিতে হয়, তবে ভিতরে বৈরাগী হইয়া বাহিরে বিষয়ীর রূপ ধারণ করতঃ, বৈরাগ্য সম্বন্ধে কপটাচরণ করিবে। কেশবচন্দ্রের চরিত্রে যদি কোন স্বর্গীয় মহত্ত্ব থাকে, তবে তাহা এই দলসংগঠনে প্রকাশ পাইয়াছে। কোন প্রলোভন নাই, বরং তদ্বিপরীত যাহা কিছু সমস্তই বিদ্যমান ছিল ; তথাপি এই ঊনবিংশ শতাব্দীতে একটি সুন্দর ভক্তদল তাঁহার পথের পথিক হইয়াছে। যে দৈবাকর্ষণে পিটার জন্

মথি ঈশার,—আলি ওমর মহোম্মদের,—কাশ্যপ বিম্বসার আনন্দ প্রভৃতি শাক্যের পশ্চাদ্বর্ত্তী হন, ইঁহার ভিতরেও সেই আকর্ষণ ছিল, সন্দেহ নাই। সাংসারিক অবস্থার ইতর বিশেষ সত্ত্বেও তাহা ছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর অন্তে পিটার পল্ জনের জীবন-চরিত এবং কার্য্য-প্রণালী যেমন রমণীয় হইয়াছে, সুদূর ভবিষ্যতেও ধর্ম্মপিপাসুদিগের চক্ষে কেশবানুচরগণের জীবন সেইরূপ রমণীয় বলিয়া এক দিন নিশ্চয় প্রতীত হইবে। কিরূপ কৃচ্ছ্রসাধ্য সাধন-বিধিতে এই দল প্রস্তুত হইয়াছে এবং কিরূপ দুশ্চর নিয়মাধীনে ইহা অদ্যাপি জগতে ঈশ্বরের আদেশ পালন করিতেছে, তাহা ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাসপাঠকের নিকট অবিদিত নাই।

ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ, প্রচারকার্য্যালয় এবং প্রচারকদল-সংগঠন দ্বারা ব্রাহ্মধর্ম্মের রাজ্য দেশ দেশান্তরে বিস্তার পাইতে লাগিল। প্রচারকগণ নানা দেশ ভ্রমণপূর্ব্বক বহু লোককে আপনাদের দলভুক্ত করিলেন। নূতন ব্রহ্মমন্দির-নির্ম্মাণের আবেদন-পত্র প্রচারিত হইল, এবং তাহার জন্য সর্ব্বত্র অর্থ সংগৃহীত হইতে লাগিল। এইরূপ জীবন্ত উৎসাহের সহিত কার্য্য আরম্ভ করিয়া ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সাধারণের বিশ্বাসপাত্র হইলেন। তিনি মফস্বলস্থ ব্রাহ্মবন্ধুগণের সাহায্য এবং সহানুভূতি পাইয়া আরও উৎসাহী হইয়া উঠিলেন। তাঁহার কাজ কর্ম্ম দেখিয়া এবং ক্ষমতা শক্তির পরিচয় পাইয়া, দেশের অপর সাধারণ লোকেও তাঁহাকেই বর্ত্তমান যুগের ধর্ম্মসংস্কারকের পদে

আদরপূর্ব্বক বরণ করিল। তিনিও ব্রাহ্মসাধারণের প্রতিনিধি হইয়া কার্য্য করিতে লাগিলেন। ইহাতে অবশ্য পুরাতন ব্রাহ্ম-সমাজের নেতা ও সভ্যগণের সহিত পদে পদে তাঁহার ঘাতপ্রতিঘাত উপস্থিত হইয়াছিল। তাঁহাদের মত এবং অনুষ্ঠানগত দোষ দুর্ব্বলতার উপর কেশবচন্দ্র ভয়ানকরূপে খড়্গাঘাত করিয়া-ছিলেন। এ প্রকার ধর্ম্মযুদ্ধে মনুষ্যের নিদ্রিত ক্ষমতা সকলের বিকাশ হয়। প্রথমে বাঁশতলা ষ্ট্রীটে একটী সামান্য বাটীতে তাড়িত যুবাদলের কার্য্যালয় ছিল। কলিকাতা কালেজের এক ক্ষুদ্র গৃহে সাপ্তাহিক উপাসনা হইত, সমবেত প্রাত্যহিক উপাসনা তখন আরম্ভ হয় নাই। উপাসনা, বক্তৃতা, পত্রিকা-প্রচার, দেশের সর্ব্বত্র প্রচারক-প্রেরণ দ্বারা কেশবচন্দ্র অল্পকাল মধ্যে সাধারণের নিকট খ্যাতনামা হইয়া উঠিলেন। আদি-সমাজ বহু চেষ্টা করিয়াও এই দুর্দ্দমনীয় যুবাকে কিছুতেই দাবাইয়া রাখিতে পারেন নাই। কোন কোন প্রাচীন ব্রাহ্মের দৃঢ় সংস্কার এই যে, কেশব বড়লোক হইতে চান। বাস্তবিক ঈশ্বর তাঁহাকে সেই জন্যই পাঠাইয়াছিলেন, সুতরাং তিনি বড় না হইয়া কি করিবেন? ধর্ম্মরাজ্যে ফাঁকি দিয়া কেহ বড় হইতে পারে না। ফলতঃ কেশবের অভাবে আদিসমাজকে নিতান্ত হীনপ্রভ হইতে হইয়াছিল। মাতা যেমন সন্তান প্রসব করিয়া কালবশে আপনি ক্ষীণা এবং দুর্ব্বলা হন, কিন্তু প্রসূত সন্তান দিন দিন স্বাস্থ্য ও যৌবনে বলশালী হইয়া উঠে, কেশবকে প্রসব করিয়া আদিসমাজের অবস্থা তাহাই হইল। তথাপি

তিনি প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়াও, চির দিন ভক্ত পুত্রের ন্যায় তাঁহাকে ভক্তির চক্ষে দেখিয়া আসিয়াছেন। মতের এবং কার্য্যের বিভিন্নতা সত্ত্বেও এখানে ব্যক্তিগত সম্বন্ধের মধুরতা হ্রাস হয় নাই।

১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে মহাত্মা কেশব অল্প কয়েক দিনের জন্য টাকশালের দেওয়ানী কার্য্য করেন। এ পদে বহুদিন হইতে তাঁহার পরিবারস্থ আত্মীয়গণ কাজ করিয়া আসিয়াছেন। হরি-মোহন সেনের পুত্র যদুনাথ সেন যখন সে পদ পরিত্যাগ করেন, সেই সময় ভ্রাতৃগণেব অনুরোধে তিনি উহাতে ব্রতী হইয়া-ছিলেন। ইহা দেখিয়া নব্য ব্রাহ্মেরা ভীত এবং বিরক্ত হন। কিন্তু রাজরাজেশ্বরের দাসত্ব-পদে যিনি মনোনীত, তাঁহার পক্ষে এ কাজ কি কখন ভাল লাগে? আত্মীয়বর্গের অনুরোধ রক্ষা ভিন্ন তাঁহার অন্য কোন উদ্দেশ্য ছিল না।

ব্রাহ্মসমাজ দুই ভাগে বিভক্ত হইবার পর কিছু দিনান্তে অর্থাৎ ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দের ৬ই মে তারিখে, মেডিকেল কলেজ থিয়েটরে "যিশুখ্রীষ্ট, ইয়োরোপ এবং এসিয়া" এই বিষয়ে তিনি এক বক্তৃতা করেন। তাহাতে বহুলোকের সমাগম হয়। ব্রাহ্মের মুখে ঈশার প্রশংসাসূচক বক্তৃতা তৎকালে মহা বিস্ময়কর ব্যাপার মনে হইয়াছিল। খ্রীষ্টভক্ত ভিন্ন তেমন বক্তৃতা বাস্তবিকই অন্যের মুখে শোভা পায় না। ব্রহ্মবাদী কেশবচন্দ্র যে যিশুর এত ভক্ত, তাহা পূর্ব্বে কেহ জানিত না। কাজে কাজেই তাহা লইয়া দেশের মধ্যে এক মহা

আন্দোলন উপস্থিত হইল। পাদরী মহাশয়েরা ভাবিলেন, কেশব বাবুর খ্রীষ্টান্ হইতে আর বিলম্ব নাই, একটু জল-সিঞ্চন কেবল বাকী। হিন্দু এবং পুরাতন ব্রাহ্মসমাজও সেই ধূয়া ধরিয়া নিন্দা ও উপহাস করিতে লাগিলেন। কিন্তু সেই বক্তৃতার পর এ দেশে শিক্ষিতদলের মধ্যে ঈশার গৌরব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কেশবচন্দ্রও তদ্দ্বারা সুসভ্য খ্রীষ্টজগতে বিশেষরূপে পরিচিত হন। তখন ব্রাহ্ম যুবকগণ ঈশাচরিতামৃত পান করিতে লাগিলেন। বাইবেলের মান বাড়িল। ঐ বক্তৃতা পুস্তকাকারে মুদ্রিত হয় এবং খ্রীষ্টভক্তগণ অতি আগ্রহ সহকারে তাহা ক্রয় এবং বিতরণ করেন। সার জন্ লরেন্স তখন ভারতের রাজপ্রতিনিধি। সংবাদপত্রে ইহার বিবরণ পড়িয়া তিনি অতীব আহ্লাদিত হন। তাঁহার সহকারী গর্ডন সাহেব সিমলা পর্ব্বত হইতে বক্তাকে এইরূপ লিখিলেন যে, লাট সাহেব কলিকাতায় ফিরিয়া গিয়া আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিবেন। এই হইতে বৃদ্ধ লরেন্স তাঁহাকে অত্যন্ত স্নেহ করিতে লাগিলেন। কিছু দিন পরে মিস্ কার্পেণ্টার এ দেশে আসেন। তিনি লাট সাহেবের বাড়িতে ছিলেন। তিনিই প্রথমে কেশবকে গবর্ণমেণ্ট হাউসে নিমন্ত্রণ করিয়া লইয়া যান। তদুপলক্ষে লরেন্সের সহিত তাঁহার বন্ধুতা স্থাপিত হয়। সে দিন উভয়ে নিভৃতে অনেক বিষয়ের আলোচনা করেন। পূর্ব্বোক্ত বক্তৃতায় ছিল, ইংরাজেরা বাঘ আর বাঙ্গালীরা খ্যাক-শেয়ালী। লরেন্স বাহাদুর এই উপমা অতি সুসঙ্গত মনে

করিয়াছিলেন। লর্ড রিপণও জিত ও জেতা জাতির মধ্যে জাতিগত বিদ্বেষ এবং প্রভেদ উক্ত উপমা দ্বারা প্রমাণ করিতে চাহিয়াছিলেন। ধর্ম্মবিষয়ে লরেন্স কখন কোন কথা কহিতেন না, কিন্তু ভিতরে ভিতরে কেশবকে তজ্জন্য যথেষ্ট শ্রদ্ধা করিতেন, এবং মধ্যে মধ্যে ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠাইয়া দিতেন। সেই সময় লর্ড বাহাদুর একবার তাঁহার বক্তৃতা শুনিবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। লরেন্সই তাঁহাকে উচ্চশ্রেণীব রাজপুরুষ এবং দেশীয় রাজন্যবর্গের সহিত পরিচিত করিয়া দিয়াছেন। যোগিবর যিশু স্বয়ং যেন তাঁহাকে আপনার শিষ্যমণ্ডলীর মধ্যে হাত ধরিয়া লইয়া গেলেন। তাহার পর যে কয়জন বড় লাট ও ছোট লাট এবং প্রধান রাজপুরুষ এ দেশে আসিয়াছেন, সকলেই তাঁহাকে রাজা, নবাব ও রোহিসদিগের (জমীদার) সঙ্গে উচ্চাসনে বসাইতেন। এক বক্তৃতা তাঁহাকে একেবারে আকাশে তুলিয়া দিয়াছে। ক্রমে রাজদ্বারে তাঁহার মর্য্যাদা প্রধানদিগের সঙ্গে সমান হইয়া আসিয়াছিল। কোন কোন বিষয়ে তিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া গণ্য হইতেন। লর্ড নর্থব্রুক স্বদেশে প্রত্যাগমন কালে, এ দেশের লোকের মধ্যে কেবল রমানাথ ঠাকুর এবং কেশবচন্দ্রের ছবি তুলিয়া লইবার আদেশ করেন।

অনন্তর ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দের ২৮শে সেপ্টেম্বর, তিনি "মহাপুরুষ" (Great Men) বিষয়ে টাউনহলে আর এক বক্তৃতা করেন। ইহাতে স্বদেশ বিদেশের যাবতীয় ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক মহাজনগণের প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা প্রকাশিত হয়। খ্রিষ্টধর্ম্মীরা ইহা শ্রবণে

আশাহত এবং বিরক্ত হইলেন। তাঁহারা মনে করিলেন, কেশব বাবু খ্রিষ্টীয়ান বলিয়া অপবাদগ্রস্ত হইবার ভয়ে আপনার মত গোপন করিয়াছেন। শেষোক্ত বক্তৃতায় তাঁহাদের আশা ভঙ্গ হইয়া গিয়াছিল। বিচারপ্রিয় ভক্তিবিরোধী ব্রাহ্মগণও তখন তাহাতে সন্তুষ্ট হইতে পারেন নাই। তাঁহাদের মনে হইল, এ সকল বক্তৃতায় ব্রাহ্মসমাজে পুনরায় অবতারবাদ প্রবেশ করিবে। কিন্তু ভক্ত ব্রাহ্মমাত্রেরই এই সময় হইতে ঈশা চৈতন্য প্রভৃতি মহাত্মাগণের প্রতি ভক্তি বৃদ্ধি হয়। তখন বাইবেল এবং চৈতন্যলীলার গ্রন্থ অনেকে আগ্রহের সহিত পড়িতে লাগিলেন। কেহ কেহ খ্রিষ্টের জন্মদিন উপলক্ষে বিশেষ উপাসনা এবং উপবাসাদি করিতেন। গৌরলীলা-বিষয়ক সঙ্গীত তখন অনেকের প্রিয় হইয়াছিল।

উক্ত বৎসরের শেষ ভাগে কেশবচন্দ্র ঢাকা, ফরিদপুর, মৈমনসিংহ প্রভৃতি স্থানে প্রচারার্থ বহির্গত হন। তাঁহার সমাগমে সে দেশে ভয়ানক আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছিল। তত্রত্য উন্নতিশীল যুবক ব্রাহ্মদল ইহাতে যথেষ্ট উপকার লাভ করেন। সেই আন্দোলনে হিন্দুসমাজও জাগিয়া উঠিল। প্রধান হিন্দুগণ "হিন্দুধর্ম্মরক্ষিণী" সভা স্থাপন করিলেন। এক খানি সংবাদপত্র প্রকাশ দ্বারা ব্রাহ্মগণকে নিন্দা করিতে লাগিলেন। কিছু দিন এইরূপে বিশ্বাসীদিগকে পরীক্ষা করিয়া, পরে সে সভা মৃত্যুগ্রাসে পতিত হয়। রাজা রাধাকান্ত দেব যেমন রামমোহন রায়ের বিরুদ্ধে ধর্ম্মসভা করিয়াছিলেন, কেশবের

প্রবল প্রতিভা দর্শনে বঙ্গদেশের হিন্দুগণও এই সময় তেমনি নানা স্থানে ঐরূপ সভা স্থাপন করেন। ব্রাহ্মসমাজ ধ্বংস করিবার জন্য হিন্দুদিগের এই দ্বিতীয় সংগ্রাম। কিন্তু ব্রাহ্মসমাজের বিরোধী হইলেও, ঐ সকল সভার কার্য্যপ্রণালীতে অজ্ঞাতসারে ব্রাহ্মধর্ম্মপ্রভাব অনুপ্রবিষ্ট হইয়া গিয়াছে। তাঁহাদের বক্তৃতা, ব্যাখ্যান, সংবাদপত্র-প্রকাশ, এ সমস্তই ব্রাহ্মদিগের অনুকরণ-ফল। সেরূপ সভা এক্ষণে আর দেখা যায় না, কিন্তু হরিসভা এবং আর্য্যসভা অনেক দৃষ্ট হয়। ইঁহারাও ব্রাহ্মসমাজের নিকট বহু পরিমাণে ঋণগ্রস্ত।

কেশবচন্দ্র ঢাকা অঞ্চলে যখন প্রচার করিতে যান, তখন হিন্দুসমাজের শাসন সে দেশে অত্যন্ত প্রবল। ভৃত্য ও পাচক অভাবে তাঁহাকে বৈষ্ণবদিগের আখড়ার কদর্য্য অন্নব্যঞ্জন দ্বারা জীবন ধারণ করিতে হইয়াছিল। এক জন কুলি তাহা মাথায় করিয়া বহিয়া আনিত। সাধু অঘোরনাথ এবং পণ্ডিত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী তাঁহার সঙ্গী ছিলেন। আহার এবং বাসস্থান সম্বন্ধে বহু কষ্ট পাইয়াও, ভক্ত কেশবচন্দ্র প্রভুর কার্য্য করিলেন। সেই কারণে মস্তকের পীড়া এবং জ্বর হইল। অতি মলিন দুর্গন্ধময় বাটীতে অবস্থিতি এবং সামান্য বৈরাগীদিগের ভোজ্য আহার, কিরূপেই বা সহ্য হইবে? তথাপি কেশবের আশা উদ্যম কমিল না। হিন্দুরা তাঁহার বক্তৃতা শুনিয়া মোহিত হইলেন, প্রশংসা করিলেন, সমাদরও যথেষ্ট দেখাইলেন; কিন্তু তাঁহাদের প্রিয় সেবকের আহার পানের সুব্যবস্থা কেহ করিলেন

না। ঈশা যেমন বলিতেন, "আমার পিতার ইচ্ছাপালনই আমার পান ভোজন", যিশুদাস কেশবেরও সেইরূপ পান ভোজনের ব্যবস্থা ছিল। যুবকদিগের ধর্ম্মোৎসাহ এবং অনুরাগ দর্শনে তিনি বাহ্য কষ্ট সকল ভুলিয়া গেলেন। "প্রকৃত বিশ্বাস" (True Faith) নামক অদ্বিতীয় পুস্তক এই সময়ের রচনা। পথে নৌকায় যাইতে যাইতে ইহা লিখিয়াছিলেন। সে আজ কত দিনের কথা! কিন্তু তখনই তাঁহার বিশ্বাস বৈরাগ্য আত্মার কোন্ গভীর স্থানে গিয়া পৌঁছিয়াছিল, তাহা এক্ষণে আমরা কিছু কিছু বুঝিতে পারিতেছি। পূর্ব্ব দিকে সূর্য্যোদয় হইয়া যেমন পশ্চিমগগনকে আলোকিত করে, প্রকৃত বিশ্বাস তেমনি পূর্ব্ববাঙ্গালার নদীবক্ষে জন্মগ্রহণ করিয়া পরিশেষে সভ্য ইয়োরোপ আমেরিকা পর্য্যন্ত জ্যোতি বিস্তার করিয়াছে। ইহা বিলাতে পুনর্মুদ্রিত এবং ভাষান্তরিত হইয়া তদ্দেশীয় ধর্ম্মাত্মাগণকে বিশ্বাসের শাস্ত্র শিক্ষা দিয়াছে।

পূর্ব্ববঙ্গে সত্যের বিজয়নিশান উড়াইয়া, পর বৎসরের প্রথম ভাগে তিনি হিন্দুস্থান এবং পাঞ্জাবে গমন করেন। ইতঃপূর্ব্বে উক্ত প্রদেশের উপনিবাসী বাঙ্গালীগণ কর্ত্তৃক প্রাচীন নগর সকলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্রাহ্মসমাজ স্থাপিত হয়। কেশবের উপস্থিতিতে তাহার শ্রীবৃদ্ধি হইল। যেরূপ কষ্ট স্বীকার করিয়া কয়েক জন সহচরসঙ্গে তিনি ভ্রমণ করিতেন, তাহা আলোচনা করিলে তাঁহার প্রগাঢ় বৈরাগ্য এবং ব্রহ্মনিষ্ঠার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। যেখানে সেখানে ভোজন, যথা তথা শয়ন, অর্থকষ্টও

তখন অত্যন্ত ছিল। সিন্ধুপাঞ্জাব রেলরোড সে সময় প্রস্তুত হয় নাই। লাহোরে উপস্থিত হইলে তথাকার অধিবাসী শিক্ষিত ভদ্র ব্যক্তিরা তাঁহাকে সসম্ভ্রমে গ্রহণ করিলেন। অনন্তর দুই একটী ইংরাজি বক্তৃতা শুনিয়া সকলে তাঁহার প্রতি একবারে আসক্ত হইয়া পড়িলেন। ম্যাক্‌লিওড সাহেব তখন সেখানকার গবর্ণর ছিলেন। তিনি আগন্তুকের প্রতি শ্রদ্ধাবান্ হইয়া, নিজ ভবনে তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করতঃ, নিরামিষ ভোজের আয়োজন করেন। ইহা দেখিয়া তাঁহার প্রতি পাঞ্জাবীদের শ্রদ্ধা সম্মান আরো বাড়িয়া গেল। দেশের লাট সাহেব যাঁহাকে আদর করেন, তাঁহাকে কেহ সামান্য লোক মনে করিতে পারে না। কেশবচন্দ্র প্রচারার্থ যখন যে দেশে গিয়াছেন, তখনই স্থানীয় প্রধান রাজপুরুষ ও রাজা মহারাজগণ কর্ত্তৃক মহা সমাদর লাভ করিয়াছেন। কেশবচন্দ্রের ইংরাজি বক্তৃতা সব দেশের লোকের নিকটই এক আশ্চর্য্য স্বর্গীয় বস্তু মনে হইত। রাজ্যের সম্রাট্ কেবল নিজ প্রজাসাধারণের মধ্যেই সম্মানভাজন, কিন্তু হরিদাসের মান গৌরব সকল স্থানেই সমান।

পঞ্জাব হইতে ফিরিয়া আসিয়া আচার্য্য ব্রহ্মানন্দ সেই বৎসর আদিসমাজের সহিত এক যোগে মাঘোৎসব করেন। তাহাতে নব্যদলের ব্রাহ্মিকারাও উপস্থিত ছিলেন। “বিবেক বৈরাগ্য” শীর্ষক একটী বাঙ্গালা প্রবন্ধ পঠিত হয়। ইহার পূর্ব্বে বাঙ্গালা বক্তৃতা তাঁহার মুখে প্রায় শুনা যাইত না। আদিসমাজে যখন আচার্য্যের কার্য্য করিতেন, তৎকালকার বাঙ্গালা উপদেশ

অতিশয় কঠোর ছিল। পুরাতন ব্রাহ্মগণের কর্ণে তাহা সুশ্রাব্য বলিয়া বোধ হইত না। কারণ, কেশবচন্দ্রের ধর্ম্ম তখন বিবেক-বৈরাগ্যপ্রধান। তিনি তখন নীতিবাদী, কর্ত্তব্যপরায়ণ, জ্ঞানী ব্রাহ্ম ছিলেন; প্রেম ভক্তির ফুল তখন হৃদয়ে প্রস্ফুটিত হয় নাই। শ্রোতৃমণ্ডলীকে সন্তুষ্ট করিতে না পারিয়া তিনি আপনাকে অকৃতার্থের ন্যায় বোধ করিতেন। এমন কি, আচার্য্যের পদ পরিত্যাগ করিতে প্রস্তুত হইয়াছিলেন। প্রধান আচার্য্যের উৎসাহ সে সময় তাঁহাকে পশ্চাদ্‌গামী হইতে দেয় নাই। শেষে অল্পকাল মধ্যে বাগ্‌দেবী স্বয়ং কণ্ঠে অধিষ্ঠিত হইয়া তাঁহার সে অভাব বিমোচন করেন।

সম্মুখে যে সময়ের মধ্যে আমরা এক্ষণে প্রবেশ করিতেছি, তাহাতে ভক্তিনদী, আনন্দের লহরী এবং প্রেমের উদ্যান দেখিতে পাইব। সেখানে কবিত্বরসপূর্ণ সুমধুর বাঙ্গালা উপদেশাবলী এবং ভক্তিরসরঞ্জিত হরিসঙ্কীর্ত্তন শুনিয়া আহ্লাদিত হইব। প্রস্তরময় ঘোর মরুভূমির ভিতর দিয়া কেশবচন্দ্র কিরূপে সরস ভক্তির রাজ্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন, তদ্বৃত্তান্ত পাঠ করিলে তাপিত হৃদয় শীতল হয়।

ভক্তিবিকাশ

আমরা পূর্ব্বে যেমন বলিয়াছি, উন্নতিশীল ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাস এবং কেশবচন্দ্রের জীবন একই বিষয় ; তেমনি আরো বলিতেছি, ব্রাহ্মধর্ম্ম বা নববিধানের শাস্ত্র এবং তাহার সাধনতত্ত্ব কেশবচরিত্রের সহিত অভেদ্য। ব্রাহ্মসমাজে বাস্তবিকই ইতঃপূর্ব্বে বিধিবদ্ধ শাস্ত্র বা সাধনপ্রণালী ছিল না, কেশব-চরিত্রের উন্নতি এবং বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে উহা বিকসিত এবং পরিণত হইয়া উঠিয়াছে। এক স্থানে তিনি বলিয়া গিয়াছেন, "আমি ধারে ব্যবসায় চালাই নাই, নগদ কারবার করিয়াছি।" অর্থাৎ আগে তাঁহার জীবন, পরে মত এবং উপদেশ। যাহা নির্জ্জন সাধনে জীবনে উপলব্ধি করিতেন, তাহাই পরে শাস্ত্ররূপে জগতে প্রচারিত হইত। স্বয়ং ঈশ্বরই যে তাঁহার গুরু এবং আত্মাই শাস্ত্র, তাহা তাঁহার নিজমুখবিনিঃসৃত জীবনবেদে বিস্তৃতরূপে বর্ণিত আছে। ব্রাহ্মধর্ম্ম কঠোর জ্ঞানের শুষ্ক ধর্ম্ম, ইহাতে সাধারণ নরনারীর হৃদয় তৃপ্ত হইতে পারে না, এক দিকে এই সংস্কার ; অপর দিকে ব্রহ্মজ্ঞানীরা সাধনভজনবিহীন, স্বেচ্ছাচারী, ম্লেচ্ছাচারী, তাহারা যার তার হাতে যাহা ইচ্ছা তাহা খায়, এই অপবাদ ; কেশবচন্দ্র নিজ জীবনের দৃষ্টান্তে এই দুইটী খণ্ডন করিয়া দিয়াছেন। নিরাকার ব্রহ্মোপাসনায় ভক্তি চরিতার্থ হইতে পারে না, এই বদ্ধমূল সংস্কার তাঁহা কর্ত্তৃক অপসারিত হইয়াছে। ভক্তিসম্বন্ধে তিনি বলিয়াছেন, "আগে আমার বিবেক বিশ্বাস

বৈরাগ্য ছিল, তাহার পর ভক্তি হইয়াছে।” আদিসমাজে থাকা কালে জ্ঞান ও নীতি বিষয়ে অধিক চর্চ্চা করিতেন। ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের প্রথম ভাগে কর্ম্মকাণ্ড এবং অনুতাপ, প্রার্থনা ও ইন্দ্রিয়শাসনের প্রাধান্য লক্ষিত হয়। পরে তিনি ভক্তিপ্রেমে মজিয়া হরিলীলাতরঙ্গে জীবন বিসর্জ্জন করেন। ব্রাহ্মসমাজে ভক্তিদেবী কিরূপে সমাগত হইলেন, তাহার আনুপূর্ব্বিক বিবরণ ইতিবৃত্তে লিখিত আছে। এখানে কেবল তাহার সারভাগ উল্লেখ করা যাইতেছে।

তাড়িত ব্রাহ্মদল যে সময় ধর্ম্মকার্য্য করিতে করিতে শ্রান্ত হইয়া পড়িলেন, দারিদ্র্য কষ্ট পরীক্ষা নির্য্যাতনে যখন তাঁহাদের শরীর শীর্ণ, হৃদয় শুষ্ক হইল, উপাসনা প্রার্থনা নীরস হইয়া আসিল, সেই ঘোর দুর্দ্দিনে জননী ভক্তিদেবী দর্শন দিয়া সকলকে কৃতার্থ করিলেন। তিনি যদি সে সময় আগমন না করিতেন, তাহা হইলে এত দিন ব্রাহ্মসমাজ শুষ্ক মরুভূমিতে পরিণত হইত। কেশবের হৃদয়ে যে ব্রহ্মতেজ ছিল, তাহারই দ্বারা শুষ্ক বৌদ্ধভাব সমাজ হইতে বিদূরিত হইল। সেই স্বর্গের আলোক তাঁহাকে সদলে চিরদিন উন্নতির পথে অগ্রসর করিয়া দিয়াছে। তাঁহার ভিতর দিয়া যে ভক্তিনদী উৎসারিত হয়, তাহারই প্রভাবে এখন ব্রাহ্মসমাজে হরিনামের রোল, খোলের গণ্ডগোল, রামশিঙ্গার ধ্বনি এবং করতালি শ্রবণ করিতেছি।

জীবনবেদের সপ্তম অধ্যায়ে তিনি বলিয়াছেন, “অন্তর বাহিরে কেবল বিবেক সাধন, বিশ্বাস বৈরাগ্য সাধন, অল্প পরিমাণে প্রেম

ছিল। মরুভূমির বালি উড়িতে লাগিল। কত দিন এরূপ চলিবে ? তখন বুঝিলাম, ইহাত ঠিক নয় ; অনেক দিন এইরূপে কাটান গেল, আর চলে না। মনে হইল, খোল কিনিতে হইবে। যত দিন অন্তরে তত বৈষ্ণবভাব ছিল না, ঈশ্বর তত দিন কেবল বিবেকের ভিতর দিয়া দেখা দিতেন। ভক্তির ভাব দেখা যাইতে না যাইতে, কিরূপে ও কেমন গুপ্তভাবে এক জন ভিতর হইতে রসনাকে ভক্তের ঠাকুরের দিকে টানিলেন ! পরিবর্ত্তন হইল। বুঝিলাম, যাহা না থাকে, তাহাও পাওয়া যায়।”

সত্য সত্যই এক সময় প্রাণ যায় যায় হইয়াছিল। নিরাশ ভগ্নোৎসাহী ব্রাহ্মগণ তখন নানা বিষয়ে তর্ক বিতর্ক করিতেন। তদনন্তর ১৭৮৯ শকের ভাদ্র মাস হইতে আচার্য্য কেশবচন্দ্র স্বীয় কলুটোলাস্থ ভবনে প্রাত্যহিক উপাসনা আরম্ভ করিলেন। তাঁহার ধর্ম্মশিক্ষা, সাধন, প্রচার সমস্তই দল লইয়া ; দলগত তাঁহার জীবন ছিল। সেই উপাসনা হইতে এক্ষণকার প্রচলিত শাস্ত্র-বিধি, সাধন ভজন বাহির হইয়াছে। বিশেষ অনুরাগ ও উৎসাহের সহিত এক সঙ্গে সকলে প্রতিদিন উপাসনা করিতে লাগিলেন। ভক্তির প্রস্রবণ উন্মুক্ত করিবার জন্য প্রত্যেকের হৃদয় ব্যাকুল হইয়া উঠিল। কিন্তু তখনও হরিনামের আদর হয় নাই ; সে নাম পৌত্তলিকতা বলিয়া গণ্য হইত। প্রথম যুগের সেই বেদান্ত-প্রতিপাদ্য পুরাণ ব্রহ্ম দ্বিতীয় যুগে ঈশার পিতারূপে আবির্ভূত হন, তিনিই আবার তৃতীয় যুগে ভক্তবৎসল হরিরূপ ধারণ করতঃ

তৃষিতচিত্ত ভক্তগণের ভক্তিপিপাসা দূর করেন। চতুর্থ যুগে নববিধানলীলা এবং আনন্দময়ী মায়ের সঙ্গে ভক্ত পুত্রগণের খেলা।

যে উপাসনাপ্রণালী এক্ষণে ব্রাহ্মসাধক মাত্রেরই অবলম্বনীয় হইয়াছে, তাহা এই সময় প্রস্তুত হয়। "সত্যং জ্ঞানমনন্তং" আরাধনার শ্লোকের শেষ ভাগে তিনি "শুদ্ধমপাপবিদ্ধম্" স্বরূপ সংযোগ করেন। পূর্ব্বে ছয়টি স্বরূপ সংস্কৃত ভাষায় উচ্চারিত হইত, কিন্তু কোন্‌টির কি অর্থ, জীবনের সহিত প্রত্যেকটির সম্বন্ধ কেমন নিকট, তদ্বিষয়ে ব্যাখ্যান ছিল না। চরিত্রশোধন বিষয়ে দৃষ্টি না থাকাতে ঈশ্বরের পবিত্র স্বরূপের মহিমাও অনুভূত হইত না। খ্রীষ্টীয়নীতি আর্য্যের ব্রহ্মজ্ঞানের সহিত মিলিয়া, এই সপ্তসমুদ্রবৎ সাতটি স্বরূপ এখন আরাধিত হইতে লাগিল। এই সাতটি প্রস্রবণ উন্মুক্ত করিয়া দিয়া, শ্রীমৎ ব্রহ্মানন্দ স্বামী উপাসকদিগকে তাঁহার সঙ্গে চিরপ্রেমে বাঁধিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। সপ্ত স্বরূপে গ্রথিত সর্ব্বাঙ্গসুন্দর আরাধনাতত্ত্ব এইরূপে ব্রাহ্ম-সাধারণের মধ্যে প্রচলিত হইল। এই স্বরূপ কয়েকটির ভিতর যে গভীর বিজ্ঞান আছে, তাহা এ পর্য্যন্ত সম্যক্‌রূপে অনেকের হৃদয়ঙ্গম হয় নাই। ইহা দ্বারা ঈশ্বরের নির্গুণ এবং সগুণ তত্ত্ব এবং মানবজীবনের সহিত তাঁহার নিগূঢ় সম্বন্ধের শাস্ত্র কেশবচন্দ্র আবিষ্কার করিলেন। ব্রহ্মের নিত্য নির্ব্বিকল্প সত্তা এবং লীলা-বিলাস ইহার ভিতর অবস্থিতি করিতেছে। কেশবপ্রবর্ত্তিত উপাসনাপ্রণালী তদীয় ধর্ম্মবিদ্যালয়ের ছাত্রগণের পক্ষে এক

অভিনব বেদ বিশেষ। কেশবের মণ্ডলী অধ্যাত্ম বিজ্ঞান শিক্ষার একটি বিদ্যালয় স্বরূপ। এখানকার ছাত্রেরা ধর্ম্মসম্বন্ধীয় যেরূপ উচ্চতর বৈজ্ঞানিক শিক্ষা লাভ করিয়াছেন, পুরাকালের বিজ্ঞান-বিশারদ্ ঋষিগণের নিকট তাহা প্রাপ্ত হওয়া যায় না। প্রাত্যহিক উপাসনায় ব্রহ্মতত্ত্ব, মানবতত্ত্ব এবং উভয়ের পরস্পর সম্বন্ধতত্ত্ব শিক্ষা ও পরীক্ষা এক সঙ্গেই হইয়া গিয়াছে। সপ্ত স্বরূপের আরাধনার পর ধ্যান, পরিশেষে প্রার্থনা এবং কীর্ত্তন হইত। প্রতিদিন ইহা সাধন করিতে করিতে কেশবচন্দ্রের হৃদয়ে এক প্রকাণ্ড চিন্ময় রাজ্য প্রকাশ হইয়া পড়িল। দীর্ঘ উপাসনা, ধর্ম্মপ্রসঙ্গ ইত্যাদি উপায়ে সাধকবৃন্দের হৃদয ক্রমে দ্রবীভূত হইতে লাগিল। এইরূপ প্রাত্যহিক উপাসনার সঙ্গে সঙ্গে সাধকবৃন্দ কিছু দিন নিয়মিতরূপে মহর্ষি দেবেন্দ্র নাথের নিকট ব্রহ্মদর্শন-শিক্ষার্থ গমন করিতেন। বৈকালে আদি সমাজের বেদীর তলে বসিয়া তিনিও অতি আগ্রহ সহকারে জিজ্ঞাসুদিগকে দর্শনযোগের গূঢ় তত্ত্ব শিখাইতেন। সূর্য্যালোকে অনুরঞ্জিত আকাশের উপলব্ধি যেমন সহজসাধ্য, ব্রহ্মদর্শন ইঁহার বিশ্বাসানুসারে তেমনি সহজ। কোন্ মহাজনের নিকট কি রত্ন পাওয়া যায়, কেশবচন্দ্র যেমন বুঝিয়াছিলেন, তেমন আর কে বুঝিতে সক্ষম? প্রত্যেক সাধু মহাপুরুষের দ্বারা জগতে এক একটী বিশেষ সত্য প্রচারিত হয়; সেই সেই সত্য কিরূপ, দেশ কাল পাত্রসম্বন্ধে তাহাদের উপযোগিতা কি প্রকার, ইহার বিশদ ব্যাখ্যান তিনি করিয়া গিয়াছেন।

অতঃপর মৃদঙ্গ করতালের সহিত ভক্তিরসের সংকীর্ত্তন গান করিতে করিতে ভক্তিদেবী মূর্ত্তিমতী হইয়া দেখা দিলেন। তখন নয়নে জলধারা বহিল, হৃদয় বিগলিত হইল, বিনয় বৈরাগ্য ভাবুকতা বাড়িল। এই সময় একবার সবান্ধবে কেশবচন্দ্র শান্তিপুর নগরে গমন করেন। তথায় ভক্তি বিষয়ে তাঁহার এক বাঙ্গালা বক্তৃতা হয়। নগরবাসী গোস্বামী পণ্ডিত ভট্টাচার্য্য অনেকেই তাহা শুনিতে আসিয়াছিলেন। ভক্তির বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে কেশবচন্দ্রের বাঙ্গালা বক্তৃতার মিষ্টতা ক্রমে উন্নতি লাভ করিয়াছে। তাঁহার গভীর ভাবব্যঞ্জক সরল বাঙ্গালা জাতীয় সাহিত্য-ভাণ্ডারের এক অমূল্য সামগ্রী। যে সকল লোক বিদ্বান্ এবং নিরীশ্বরবাদী বলিয়া বিখ্যাত, এমন লোকের মধ্যেও কেহ কেহ তাঁহার সুললিত বাঙ্গালা উপদেশের প্রশংসা করেন। গভীর চিন্তা, সূক্ষ্মতম আধ্যাত্মিক ভাব তিনি সহজে সরল ভাষায় অনর্গল বলিতে পারিতেন। তদনন্তর উক্ত বর্ষের ৯ই অগ্রহায়ণ, তিনি এক নববিধ ব্রহ্মোৎসবের সৃষ্টি করিলেন। প্রাতঃকাল হইতে রজনী দশ ঘটিকা পর্য্যন্ত সঙ্গীত সঙ্কীর্ত্তন, ত্রিকালীন উপাসনা, ধ্যান আলোচনা পাঠ নৃত্যগীত, এই কয়েকটি উৎসবের অঙ্গ। প্রাগুক্ত উপাসনা-পদ্ধতি এবং এই উৎসব-প্রণালী কেশবচন্দ্রের আধ্যাত্মিক মহত্ত্ব এবং গভীরতার বিশেষ পরিচায়ক। সাধক যে পরিমাণে সাধনে কৃতকার্য্য হইবেন, সেই পরিমাণে ইহার সারত্ব এবং মাধুর্য্য উপলব্ধি করিতে পারিবেন। ভাবী বংশের মুমুক্ষু সাধকদিগের জন্য

এই এক অমূল্য সামগ্রী তিনি রাখিয়া গিয়াছেন। যোগবিমুখ আর্য্যগৌরবচ্যুত হিন্দুসন্তানেরা যে দিন পৈতৃক ধনে পুনরায় অধিকারী হইবে, সেই দিন যোগিশ্রেষ্ঠ কেশবকে কৃতজ্ঞ হৃদয়ে প্রণিপাত না করিয়া থাকিতে পারিবে না। এক্ষণে সর্ব্বত্র কেশবপ্রবর্ত্তিত এই সাধনপ্রণালীর সমাদর এবং আধিপত্য লক্ষিত হয়। কেহ কেহ ইহার সঙ্গে দুই একটি নূতন শব্দ মিশাইয়া একটু নূতন করিয়া লইতে চেষ্টা করেন বটে, কিন্তু তথাপি কেশবকে তাহা হইতে প্রচ্ছন্ন বা বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখিতে পারেন না। যে যে উপায়, প্রণালী, শব্দ, সংজ্ঞা ও ভাবরসের দ্বারা তিনি উপাসনা সরস করিয়া গিয়াছেন, ক্রমে ক্রমে সে গুলি সমস্তই জয়-লাভ করিয়াছে। ভক্তিবিরোধীর হৃদয়মধ্যেও অলক্ষিতভাবে তাহা এখন খেলা করিতেছে। ঈশ্বরের সত্য এইরূপেই জয়লাভ করে।

যে বৎসর ভক্তি এবং সঙ্কীর্ত্তনরসে কঠোর ব্রাহ্মধর্ম্ম ভক্তি-রসাভিষিক্ত হইল, সেই বৎসর মাঘ মাসে অদ্ভুতকর্ম্মা কেশব আপনার সমাজে সাম্বৎসরিক মাঘোৎসব আরম্ভ করিলেন। প্রথমে প্রস্তাব হয়, আদিসমাজের সঙ্গে একযোগে উৎসব হইবে; শেষ তাহা কার্য্যে পবিণত না হওয়াতে, তিনি স্বতন্ত্ররূপে উৎসব করিতে বাধ্য হন। তদুপলক্ষে মহা সমারোহের সহিত রাজপথে নগরসঙ্কীর্ত্তন বাহির হইয়াছিল। সে এক অভূতপূর্ব্ব নূতন দৃশ্য। শত সহস্র কৃতবিদ্য সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি দলবদ্ধ হইয়া নগরের রাজপথে ব্রহ্মনাম গান করিতে লাগিলেন। কেহ ব্রহ্মনামাঙ্কিত নিশান লইয়া রণবীরের ন্যায় অগ্রে অগ্রে চলিতেছে, কেহ নাম-

ধ্বনিতে গগন বিদীর্ণ করিতেছে, কেহ বা পাদুকাবর্জ্জিত পদে ঊর্দ্ধনয়নে কৃতাঞ্জলিপুটে চলিতেছে; কৃতবিদ্য ভক্তযুবকগণের কি অপূর্ব্ব শোভাই তাহাতে হইয়াছিল! কোথায় বা তখন সভ্যতার অভিমান, কোথায় বা পদের গৌরব, ব্রহ্মনামরসে সকলে যেন উন্মত্ত! শত শত ধনী, জ্ঞানী, বালক বৃদ্ধ যুবা ইতর ভদ্র তাহাতে যোগ দান করিল। রাজপথ লোকে ভরিয়া গেল। শিক্ষিত যুবকেরা খালিপায়ে প্রকাশ্য রাজপথে মৃদঙ্গ করতালসহ বিভুগুণ গান করিবে, ইহা আর কাহারো মনে ছিল না; কিন্তু কেশব সে পথ দেখাইয়া গিয়াছেন। তথাপি সে সময়ে হরিসঙ্কীর্ত্তনের মত্ততা আসে নাই। ভদ্রবেশে গম্ভীর-ভাবে কীর্ত্তন হইল। উদ্দণ্ড নৃত্য, প্রেমোন্মত্ততা তখন দেখা যায় নাই। সঙ্কীর্ত্তনের পর নূতন ব্রহ্মমন্দিরের ভিত্তি স্থাপিত হয়। নিজের দায়িত্বে তিন হাজার টাকা ঋণ করিয়া মন্দিরের জন্য তিনি স্থান ক্রয় করিয়াছিলেন। পরে সন্ধ্যাকালে সিন্দুরিয়া-পটিস্থ মৃত গোপাল মল্লিকের ভবনে কেশবচন্দ্র "নবজীবনপ্রদ বিশ্বাস" বিষয়ে এক বক্তৃতা করেন। তাহাতে সার জন্ লরেন্স সস্ত্রীক, টেম্পল্, মিওর, পাদরী ম্যাকলাউড্ প্রভৃতি অনেক বড় লোক উপস্থিত ছিলেন। ইহা দ্বারা বক্তা প্রচলিত ধর্ম্মের সহিত স্বর্গের জীবন্ত ধর্ম্মের পার্থক্য দেখাইয়া দেন। কি উচ্চতম পুণ্য-ভূমিতে তাঁহার ধর্ম্মজীবন প্রতিষ্ঠিত ছিল, তাহা এই বক্তৃতায় প্রকাশ পাইয়াছে। ম্যাকলাউড্ ইহা শ্রবণে চমৎকৃত হইয়া, টাউনহলে প্রকাশ্য সভায় বক্তার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা প্রকাশ করেন।

ধর্ম্মবীর কেশব ধর্ম্মপ্রচারের জন্য যে সকল উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে বর্ষে বর্ষে এইরূপ মহোৎসব দ্বারা বিশেষ উপকার হইত। প্রথমে এক দিন, শেষে এক মাস ক্রমাগত উৎসব হইয়া আসিয়াছে। টাউনহলে, বিডন গার্ডেনে, মাঠে মাঠে ইংরাজি বাঙ্গালা বক্তৃতা, উপাসনা সঙ্কীর্ত্তন, প্রচার-যাত্রা প্রভৃতিতে প্রকাণ্ড কলিকাতা নগরকে যেন তিনি কাঁপাইয়া তুলিতেন। আগে ছিলেন ঈশামসি সহায়, পরে যখন ভক্তির স্রোত প্রমুক্ত হইল, তখন প্রমত্ত মাতঙ্গ শ্রীগৌরাঙ্গ দেব আসিয়া তাঁহার সঙ্গে যোগ দিলেন। চন্দ্র সূর্য্যের মিলন হইল। এই দুই মহাপুরুষের সাহায্যে কেশবের এক গুণ ধর্ম্মশক্তি দশ গুণ বাড়িয়া উঠিল। যাহার পর যেটী প্রয়োজন, বিধাতা তৎসমুদায় তাঁহাকে যোগাইয়া দিলেন। ইহা ভগবানের মহালীলা, মানুষের ইহাতে কোন কর্তৃত্ব নাই।

এই ভক্তির ভাব এখানে নিরাপদে প্রবেশ করিতে পারে নাই। ইহা লইয়া অনেক বাদানুবাদ বিবাদ কলহ হইয়া গিয়াছে। যে মৃদঙ্গ, করতালবাদ্য এবং ভক্তি প্রেমের সঙ্গীত এখন ভক্ত ব্রাহ্মগণের কর্ণে সুধা বর্ষণ করে, প্রথমে তাহা উপহাস ও বিরক্তির কারণ ছিল। অনেক নিন্দা কুৎসা আন্দোলনের পর এক্ষণে লোকের ইহাতে রুচি জন্মিয়াছে। এখন খোল করতাল ও কীর্ত্তনাঙ্গের গীত শিক্ষিত যুবকদলেও আদর লাভ করিয়াছে। কেশবচন্দ্র ধর্ম্মপ্রকৃতির গভীর মর্ম্ম, জাতীয় স্বভাবের নিগূঢ় রহস্য ভালই বুঝিতেন। জাতিভেদ,

পৌত্তলিকতা, ভ্রম কুসংস্কার পরিত্যাগের সময় যেমন তাঁহার পরাক্রম ও সাহস প্রকাশ পাইয়াছিল, সঙ্কীর্ত্তন, দেশীয় ধর্ম্মভাব এবং সুপ্রথা পুনর্গ্রহণেও তাঁহার তেমনি নির্ভীকতা প্রকাশ পাইয়াছে। পৌত্তলিক পিতা মাতা বা প্রতিবাসীর শাসন উপেক্ষা করিয়া এক জন ব্রাহ্ম হইতে পারে, কিন্তু ব্রাহ্মের ভয়ে সে সহজে হরিভক্ত হইতে সাহসী হয় না। পাছে কেহ তাহাকে অব্রাহ্ম বলে, এই ভয়। কেশবচন্দ্র এই উভয়বিধ শাসনই অতিক্রম করিয়াছিলেন। তিনি লাট, নবাব, রাজা, জমিদার ও বিদ্বান্‌দলে মিশিতেন, আবার অনাবৃত পদে পথে পথে দুঃখী কাঙ্গালদের সঙ্গে হরিনাম গাইয়া বেড়াইতেন। একাধারে বহুগুণের সমাবেশ হইয়াছিল। তিনি যদি ভক্তিপথে পদার্পণ না করিতেন, তাহা হইলে এ যুগের ভদ্রসন্তানেরা সভ্যতার ভয়ে কাষ্ঠ পাষাণের মত নীরস হইয়া শুকাইয়া মরিত। হরিপ্রেমে মাতিয়া তিনি সকলকে মাতাইলেন।

নিরাকার ঈশ্বরে ভক্তি চরিতার্থ হয় না, প্রাচীন ভক্তিশাস্ত্র এই কথাই চিরদিন বলিয়া আসিয়াছে। কেন না, স্পর্শনীয় দেবমূর্ত্তি না হইলে তাহার চলে না। কিন্তু ভক্ত কেশবের জীবন এত দিন পরে সে কথার প্রতিবাদ করিল। শেষ জীবনে তিনি ভক্তিরসে মাতিয়া হাসিয়াছেন, নাচিয়াছেন, এবং গলদশ্রুলোচনে সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ-মূর্ত্তি দর্শন করিয়াছেন। ভক্তির সমস্ত লক্ষণই নিরাকারবাদীর হৃদয়ে দেখা গিয়াছে। তদীয় অনুচরবৃন্দ এ কথার সাক্ষ্য প্রদান করিবেন।

পরীক্ষা ও জয়লাভ (৩)

পৃথিবীতে যে একটু বেশী ভক্ত হয়, বিশেষতঃ ক্ষমতাশালী বলিয়া দশ জনে যাহাকে মানে, সে সহজেই অবতার-শ্রেণীমধ্যে গণ্য হইয়া পড়ে। ভক্তির বেগ যখন একটু বৃদ্ধি হইল, এবং তজ্জন্য ব্রাহ্মগণের কিঞ্চিৎ মত্ততা জন্মিল, ভগবদ্ভক্ত কেশবচন্দ্র তখন তরলমতি ভাবুকদিগের কল্পনাচক্রে পতিত হইলেন। সৌভাগ্যের বিষয় এই যে, তিনি দশ জনের প্রশংসা স্তুতিবাদে বড় লোক হন নাই, স্বাভাবিক দৈবশক্তির গুণে বিখ্যাত হইয়াছিলেন। বরং তাঁহার নাম সম্ভ্রম শ্রেষ্ঠত্ব চিরদিন তাঁহার ক্ষমতা শক্তি ও সাধুগুণের অধোদেশেই অবস্থিতি করিয়াছে। যাহা হউক, প্রথম সাম্বৎসরিক উৎসবের পর মুঙ্গের নগরে গিয়া তিনি এক নূতন বিধ পরীক্ষায় নিপতিত হইলেন।

উৎসবান্তে সপরিবারে তিনি মুঙ্গেরে গিয়া কিছু দিন থাকেন। পরে তথা হইতে দ্বিতীয় বার বোম্বাই প্রদেশে প্রচারার্থ গমন করেন। সে যাত্রায় লেখক তাঁহার সঙ্গী ছিলেন। ধর্ম্ম-প্রচারার্থ বিদেশে পথে যাইবার কালে কত কষ্টই তিনি সহিতেন! অর্থের অসঙ্গতি নিবন্ধন সে সময় অতি দীন বেশে তৃতীয় শ্রেণীর গাড়ীতে সামান্য লোকদিগের সঙ্গে তিনি দূরদেশ ভ্রমণ করিতেন। গ্রীষ্মের প্রারম্ভে আমরা দুই জনে এলাহাবাদ হইতে বাহির হইলাম। জব্বলপুরে একজন বাঙ্গালী বাবুর বাসায় অতি কষ্টে দিন কাটান গেল। পরে ডাক গাড়ীতে পর্ব্বত ও অরণ্যময়

সুদীর্ঘ দুর্গম পথ অতিক্রম করিয়া আমরা নাগপুরে পৌঁছিলাম। তথা হইতে এক সঙ্কীর্ণ তৃতীয় শ্রেণীর শকটে বোম্বাই নগরে যাইতে হইল। রাত্রিকালে না নিদ্রা, না আহার; তথাপি সেই অবস্থায় সোণার কেশব সামান্য লোকদিগের পদতলে শুইয়া রহিলেন। একটু তন্দ্রা আসে, আর যাত্রিগণ গায়ের উপর ঝুঁকিয়া পড়ে, কেহ বা পদ দ্বারা দলন করে। অতি কষ্টে গম্য স্থানে তিনি পৌঁছিলেন। সেখানে এমন সহৃদয় পথের পথিক বন্ধু কেহ ছিল না যে সমাদরে গ্রহণ করে। আপনি আপনার পথ করিয়া লইতে হইল। কেইবা তখন তাঁহার মর্য্যাদা ভাল বুঝিত! নিজে বাড়ী বাড়ী ঘুরিয়া পাঁচ জনের সঙ্গে আলাপ করিলেন, তিন চারিটী প্রকাশ্য বক্তৃতা দিলেন, শেষ বাড়ী আসিবার পথখরচ কে দেয়, তাহারও ঠিক নাই। কার্শনদাস মাধোদাসের সাহায্যে দেশে ফিরিয়া আসেন। এখনত সেখানে দুই পাঁচ জন উপাসনাশীল লোক পাওয়া যায়, একটি ব্রহ্মমন্দিরও হইয়াছে, তখন কিছুই ছিল না বলিলে হয়। কেশব জঙ্গল কাটিয়া নগর বসাইয়াছেন। তাঁহার রোপিত বীজ হইতেই এক্ষণে একটী বৃক্ষ জন্মিয়াছে।

বোম্বাই হইতে পুনরায় মুঙ্গেরে আসেন এবং তথায় কয়েক মাস সপরিবারে অবস্থিতি করেন। সেই সময় উক্ত নগরে আচার্য্যের বাসায় প্রাত্যহিক উপাসনা ব্যতীত কয়েকটি ব্রহ্মোৎসব হয়, তাহাতে অনেকগুলি বঙ্গীয় যুবক ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রতি অনুরাগী হন। ভক্তির অনেক বিচিত্র ব্যাপার এই স্থানে

দেখা গিয়াছে। তৎকালে অতি দুশ্চরিত্র সংসারাসক্ত ব্যক্তি-দিগের মনেও ধর্ম্মভাব স্ফূর্ত্তি পাইয়াছিল। অনেকে উপহাস করিতে আসিয়া শেষে কাঁদিয়া গিয়াছে। লোকসমারোহ, নৃত্য-কীর্ত্তন, ক্রন্দনের রোল, সাধন-ভজনানুরাগ, মত্ততা, ভক্তসেবা এত অধিক হইয়াছিল যে, দুর্ব্বলমনা বিষয়াসক্ত ব্রাহ্মেরা ভয় করিত, পাছে মুঙ্গেরে গেলে পাগল হইয়া যাই। কয়েক বৎসরের জন্য মুঙ্গের বাস্তবিকই একটি তীর্থস্থান হইয়া পড়িয়াছিল। অনেকে কেল্লার পথ দিয়া হাঁটিত না। বলিত যে, কেশব সেন যাদু করিয়া ফেলিবে। "দয়াময়" নাম, প্রকৃতির মধ্যে ঈশ্বরদর্শন, ভক্তসেবা প্রভৃতি সাধনের প্রতি লোকের তখন বিশেষ অনুরাগ জন্মিয়াছিল। তখন ভক্তিতে মাতিয়া কেহ চাকরী ছাড়িয়া গৃহত্যাগী হয়, কেহ গান বাঁধে, কেহ নাচে, কেহ শঙ্খধ্বনি করে, কখন বা দল বাঁধিয়া সকলে মিলে দুই প্রহর রৌদ্রে পথে পথে কীর্ত্তন করে, পাহাড়ে গিয়া রাত্রি জাগে। এবম্বিধ বহুতর লীলা খেলা হইয়াছিল। এই খানে ভাই দীননাথ মজুমদারের স্কন্ধে খোল ঝুলাইয়া দিয়া কেশবচন্দ্র তাঁহাকে বাদকের পদে নিযুক্ত করেন।

মুঙ্গেরবাসীদিগকে ভক্তির স্রোতে ভাসাইয়া মহাত্মা কেশব বিবাহবিধি পাস করাইবার জন্য, সপরিবারে কতিপয় বন্ধুর সহিত সিমলা পর্ব্বতে গমন করেন। ইহার কিছু পূর্ব্বে বাঁকিপুরে লর্ড লরেন্সের সহিত ব্রাহ্মবিবাহ-বিধির সম্বন্ধে তাঁহার অনেক কথাবার্ত্তা হয়। লাট বাহাদুর এই নিমিত্ত তাঁহাকে সিমলা

যাইতে বলেন, এবং যথাকালে তাঁহাকে তথায় গ্রহণ করেন। থাকিবার জন্য একটী বাড়ী, ব্যয়-নির্ব্বাহের জন্য পাঁচ শত টাকা দেন। কিন্তু লাট সাহেবের অতিথি হইলে কি হইবে, ঘরে অন্নের সংস্থান নাই, সঙ্গে পোষ্য অনেকগুলি, অগত্যা বিদেশস্থ বন্ধুগণের সাহায্যে দিন নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। লাট সাহেবের বাড়ী হইতে চা আসিল, কিন্তু তাহা পানের উপকরণাভাব। সেই রাজপ্রসাদের সম্মানার্থ এক দিন সকলে মিলিয়া পিতলের ঘটিতে তাহা সিদ্ধ করিলেন, তাহাতে গুড় মিশাইলেন, এবং কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ পান কবিলেন। সভা হইবে, তাহাতে রাজপ্রতিনিধি এবং তদীয় মন্ত্রিগণ আসিবেন, কেশবের ছিন্নকন্থাধারী কাঙ্গাল সহচরগণ তাহার মধ্যে গিয়া উচ্চাসনে বসিলেন। অতঃপর লরেন্স বাহাদুরের অনুগ্রহে বিধানকর্ত্তা মেইন সাহেব বিবাহ-বিধির পাণ্ডুলিপি মন্ত্রিসভায় উপস্থিত করেন। প্রায় মাসাবধি কাল পর্ব্বতে থাকিয়া, কয়েকটী বক্তৃতা করিয়া, প্রধান প্রধান বাজপুরুষদিগের সঙ্গে মিশিয়া, তাঁহাদের সহানুভূতি লাভ করত, শেষ কেশবচন্দ্র কলিকাতায় প্রত্যাগত হন। সিমলা গমনে তাঁহার যে কেবল রাজকীয় মান সম্ভ্রম বৃদ্ধি হইল তাহা নহে, ধর্ম্মানুরাগী বন্ধুগণসঙ্গে একত্র সাধন ভজন করিয়া তিনি যোগানন্দও সম্ভোগ করিলেন। সমাজসংস্কার, ধর্ম্মোন্নতি এবং প্রচার সমস্ত বিভাগের কার্য্য তাঁহার এক সঙ্গে চলিত।

হিমালয় পর্ব্বতে যাইবার এবং আসিবার কালে, কানপুর, লক্ষ্ণৌ, এলাহাবাদ প্রভৃতি স্থানে ভক্তির যথেষ্ট আন্দোলন

হইয়াছিল। পুরাতন ব্রাহ্মধর্ম্মের ভিতরে সরস ভক্তির আবির্ভাব-দর্শনে, তখন অনেক শুষ্কহৃদয় নিরাশাগ্রস্ত ব্যক্তি আচার্য্য কেশবের পদতলে পড়িয়া বালকের ন্যায় ক্রন্দন করিতেন। তাঁহাদের সরল ব্যাকুলতা দর্শনে মনে হইত, যেন ভারতে এক নবীন যুগধর্ম্মের অভ্যুদয় হইয়াছে। তৃষিতচিত্ত ব্রাহ্ম যুবকগণের এতাদৃশী ব্যাকুলতাই শেষ কেশবচন্দ্রের পরীক্ষার কারণ হইল। তাঁহার মুখের প্রার্থনা উপদেশাদি শ্রবণে তাঁহারা মোহিত হইয়া এমন সকল কথা বলিতেন, যাহা নরপূজা বলিয়া কাহারো কাহারো মনে সন্দেহ জন্মিত। প্রথমে এই আন্দোলন এলাহাবাদে আরম্ভ হয়। তথায় একদা ব্রহ্মোৎসবক্ষেত্রে ভাই প্রতাপচন্দ্র মজুমদার আচার্য্য সম্বন্ধে এমন কয়েকটি ভক্তিসূচক শব্দ ব্যবহার করেন, যাহা শ্রবণে বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী এবং যদুনাথ চক্রবর্ত্তী প্রচারকদ্বয় উত্তেজিত হন। পরে তৎসম্বন্ধে নানা তর্ক বিতর্ক হইল। ক্রমে বিরোধের অগ্নি জ্বলিয়া উঠিল। তদনন্তর মুঙ্গেরস্থ ব্রাহ্মগণের ভক্তির আতিশয্য দর্শন করত তাঁহারা সংবাদপত্রে লিখিয়া দিলেন যে, "কেশব বাবু অবতার হইয়াছেন। অন্ধবিশ্বাসী ব্রাহ্মেরা তাঁহাকে পরিত্রাতা বলিয়া সম্বোধন করে, তথাপি তিনি তাহাতে বাধা দেন না।" এইরূপ নানা কথার আন্দোলন উঠিল। কেশবের বক্তৃতা শুনিতে লোকের যেমন আগ্রহ, তাঁহার নিন্দাপবাদ শুনিবার জন্যও তেমনি সকলের উৎসাহ ছিল। অল্প দিনের মধ্যে দেশ দেশান্তরে এই নরপূজার অপবাদের কথা বিস্তৃত হইয়া পড়িল। কেশবচন্দ্র

কুণ্ঠিত এবং দুঃখিত হইয়া সে জন্য কত কাঁদিলেন, প্রার্থনা কালে বিনয় করিয়া কত বলিলেন, তাঁহার অশ্রুধারা দর্শনে পাষাণ ফাটিয়া গেল, তবু কেহ সে কথা শুনিল না। তিনি বলেন, আমি প্রভু নহি, সকলের দাস; পবিত্র নহি, মহাপাপী; কিন্তু বন্দীভূত চৌরের কৃত্রিম রোদনের ন্যায় তাহা লোকে মনে করিতে লাগিল। সে সময় বিরোধী প্রচারকদ্বয়কে তিনি এই পত্রখানি লিখিয়াছিলেন, "সত্যের জয় হইবেই হইবে, সেজন্য ভাবিও না। ঈশ্বর তাঁহার মঙ্গলময় ধর্ম্মরাজ্য স্বয়ং রক্ষা করিবেন। তোমাদের নিকট কেবল এই বিনীত প্রার্থনা, যেন বর্ত্তমান আন্দোলনে তোমাদের হৃদয় দয়াময়ের চরণে স্থির থাকে এবং কিছুতেই বিচলিত না হয়। অনেক দিন হইতে আমার হৃদয়ের সঙ্গে তোমরা গ্রথিত হইয়া রহিয়াছ, তোমাদের যেন কিছুতে অমঙ্গল না হয়, এই আমার আন্তরিক ইচ্ছা। অনেক দিন হইতে আমি তোমাদের সেবা করিয়াছি; এখন আমাকে অতিক্রম করিয়া যাহা বলিতে চাও বল, যেরূপ ব্যবহার করিতে চাও কর, কিন্তু দেখ যেন আমার দয়াময় পিতাকে ভুলিও না। এ আন্দোলন সম্বন্ধে আমার যাহা বলিবার, তাহা তিনি জানেন। তিনি তাঁহার সত্য রক্ষা করিবেন, এই বিশ্বাস আমার প্রাণ। তাঁহার চরণে, তাঁহার মধুময় নামে আমার হৃদয় শান্তি লাভ করুক।" কিছুতেই কিছু হইল না, দাবাগ্নির ন্যায় অপবাদের স্রোত চারি দিকে বহিতে লাগিল। প্রচারক দুই জন গ্লানি ঘোষণা করিয়া, প্রচারকার্য্য

পরিত্যাগপূর্ব্বক বিষয়কার্য্যে পুনঃপ্রবেশ করিলেন। সময় সকল বিবাদের মীমাংসক। ক্রমে বিবাদ পুরাতন হইয়া আসিল, যে যাহার নিজ নিজ কার্য্যে ব্রতী হইল। নরপূজা কি অবতারবাদ এ সমস্ত মিথ্যা, কেবল জন কয়েক তরলমতি যুবকের ভাবান্ধতা মাত্র ইহার মূল, শেষ ইহাই দাঁড়াইল। বাবু ঠাকুরদাস সেন এ সম্বন্ধে গুটি কয়েক প্রশ্ন করিয়া এক খানি পত্র লেখেন, কেশবচন্দ্র তাহর উত্তর দান করেন।

এইরূপ আন্দোলন ও অপবাদের সময় অবিশ্বাসী হইয়া কেহ কিছু জিজ্ঞাসা করিলে, কেশবচন্দ্র তাহার উত্তর দিতেন না। অগ্রে দণ্ড দিয়া পরে বিচার করাকে তিনি অন্যায় মনে করিতেন। বলিতেন, যে ব্যক্তি আমার চরিত্রে অবিশ্বাসী, আমার কথায় তাহার কিরূপে বিশ্বাস হইবে? কিন্তু ভদ্রভাবে সরল মনে কেহ কিছু জানিতে চাহিলে তাহার উত্তর প্রদান করিতেন। উপরিউক্ত পত্রের উত্তরে বলিলেন, "যাঁহাদিগকে মনের কথা ও হৃদয়ের প্রীতি উম্মুক্ত করিয়া দিয়াছিলাম, তাঁহারা আমাকে মহা ভয়ানক ও সর্ব্বাপেক্ষা হৃদয়বিদারক অপরাধে সাধারণের নিকট অপরাধী করিতে চেষ্টা করিলেন। একমাত্র পরিত্রাতা ঈশ্বরকে ভক্তির সহিত উপাসনা, যাহা আমার বিশ্বাস ও জীবনের লক্ষ্য, তাহা বিলোপ করিবার দোষ আমার প্রতি আরোপ করা হইল। নিকটস্থ বন্ধুরা আমাকে এত দিনের পর অহঙ্কারী, কপট, পিতার প্রভুত্বা-পহারক, পৌত্তলিকতার প্রবর্ত্তক ও আত্মপূজাপ্রচারক বলিয়া অভিযোগ করিলেন। বন্ধুদিগের নিকট এই ভয়ানক দোষ

খণ্ডন করিতে প্রবৃত্তি হয় না। \ ঈশ্বরের নিকট আমি এ বিষয়ে নিরপরাধ আছি, এই আমার যথেষ্ট। উক্ত ভ্রাতাদিগেয় নিকট আমার এই মাত্র অনুরোধ, তাঁহারা যেন মনে না করেন যে, আমার প্রতি নির্দ্দয় ব্যবহার করাতে আমি রাগ বা ঘৃণা করিয়া তাঁহা-দিগকে পরিত্যাগ করিয়াছি। আমার মত ও চরিত্র সম্বন্ধে তাঁহাদের ঐরূপ সরল বিশ্বাস আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধ হইলেও, সরল বিশ্বাসের প্রতি আমার শ্রদ্ধা রাখা কর্ত্তব্য। প্রথমতঃ তাঁহাদিগের নিকট আমি চিরকৃতজ্ঞতা-ঋণে আবদ্ধ। দ্বিতীয়তঃ তাঁহাদের এবং তাঁহাদের পরিবারের সেবা করিবার ইচ্ছা আমার হৃদয়ের সঙ্গে গ্রথিত আছে। ঈশ্বর একমাত্র পাপীর পরিত্রাতা। মনুষ্য বা জড় জগৎ পরিত্রাণপথে সহায় হইতে পারে। মনুষ্যকে মনুষ্য-জ্ঞানে যত দূব ভক্তি করা যায়, তাহাতে কিছু মাত্র দোষ হইতে পারে না। গুরু বা সাধুকে পূর্ণ ব্রহ্ম অথবা ঈশ্বরের সমান অথবা তাঁহার একমাত্র অভ্রান্ত অবতার-জ্ঞানে ভক্তি করা ব্রাহ্মধর্ম্মবিরুদ্ধ। আমি মধ্যবর্ত্তী হইয়া প্রার্থনা করিলে, ঈশ্বর যে আমাব অনুরোধে বা আমার পুণ্যগুণে অপরকে ক্ষমা অথবা পরিত্রাণ করিবেন, আমার কখন এরূপ ভ্রম হয় নাই। তবে ইহা আমি বিশ্বাস করি যে, সরলভাবে পরস্পরের মঙ্গলের জন্য ঈশ্বরের নিকট আমাদের সকলেরই প্রার্থনা করা কর্ত্তব্য। এবং সে প্রার্থনা ভক্তিসম্ভূত হইলেই দয়াময় পিতা তাহা সুসিদ্ধ করেন। যে প্রণালীতে আমার কোন কোন ভ্রাতা আমাকে সম্মান করিয়া থাকেন, আমি কখনই তাহা অনুমোদন করি না। কেন না,

প্রথমতঃ আমি উহার উপযুক্ত নহি। লোকে যেরূপ আমাকে সাধুবাদ দান করেন, আমার হৃদয় সেরূপ নহে, ইহা আমি সর্ব্বদাই অনুভব করিতেছি। বন্ধুরা আমার নিকট যে সকল উপকার লাভ করিয়াছেন, তাহাতে আমার অপবিত্র মনের গৌরব কিছুমাত্র নাই, ঈশ্বরই তাহার মূল কারণ। কেন না, তিনি সামান্য নিকৃষ্ট উপায় দ্বারাও অনেক সময় জগতের হিত সাধন করেন। আমায় অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, আমার ব্রাহ্মভ্রাতাদিগের মধ্যে অনেকের ঈশ্বরভক্তি ও সাধুতা আমার অপেক্ষা অধিক, এবং তাহা আমার পরিত্রাণের একটি বিশেষ উপায়। দ্বিতীয়তঃ বাহ্যিক সম্মানের আড়ম্বর আমার বিবেচনায় অন্যায় ও অনাবশ্যক। প্রকৃত শ্রদ্ধা ভক্তি আন্তরিক ; বাহ্যিক লক্ষণের হ্রাস হইলে উহার বিশেষ ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা নাই। কিন্তু পক্ষান্তরে শ্রদ্ধা-প্রকাশের আতিশয্য হইলে, অপরেব অনেক অনিষ্ট হইতে পারে; এজন্য উহা যত পরিহার করা যায়, ততই ভাল। উল্লিখিত সম্মান সম্বন্ধে আমার অমত এবং সঙ্কোচ আমি বার বার বন্ধু-দিগের নিকট প্রকাশ করিয়াছি। অপরের স্বাধীনতার উপর আমার হস্তক্ষেপ করিবার অধিকার নাই। বন্ধুদিগকে অধীন করিয়া, অনুরোধ আদেশ দ্বারা আমার মতের দিকে আনয়ন করা, আমার প্রবৃত্তি ও ধর্ম্মসংস্কার উভয়েরই বিরুদ্ধ। ব্রাহ্মধর্ম্ম-বীজে বিশ্বাস থাকিলেই আমার নিকট সকলে ব্রাহ্ম বলিয়া পরিগণিত ও সমাদৃত হন ; তদতিরিক্ত বিষয়ে কাহারো ভ্রম বা অবিশ্বাস থাকিলে আমার ত্যাগ করিবার অধিকার নাই, বরং

নিকটে রাখিয়া ক্রমে তাঁহাকে সত্যের পথে আনিতে হইবে। নির্দ্দয়রূপে এমন ভ্রাতাদিগকে বিদায় কারিলে আমি ঘোর অপরাধে অপরাধী হইব।”

অনন্তর কিছু দিনান্তে বিজয়কৃষ্ণ নিজ অপরাধ স্বীকারপূর্ব্বক পুনরায় প্রচাবকদলে ভর্ত্তি হন। যদুনাথ আর সে কার্য্যে প্রত্যাগমন করেন নাই। তথাপি উদারাত্মা কেশবচন্দ্র তাঁহাকে প্রীতিদানে কখনই কুণ্ঠিত ছিলেন না। যদুনাথ বিরোধী হইলেও, কেশবচন্দ্রের নিকট তিনি আদর সম্মান এবং সাংসারিক উপকারিতা পাইয়াছেন।

উল্লিখিত পরীক্ষাটী কেশবের পক্ষে সামান্য নহে। লোক-সমাজে তাঁহাকে এককালে অপদস্থ করিবার বিলক্ষণ যোগাডটি হইয়াছিল। যখনই তাঁহার সম্বন্ধে কোন অপবাদ ঘোষিত হইত, তাহা লইয়া দেশে বিদেশে হুল স্থূল পড়িয়া যাইত। ইহা অবশ্য তাঁহার মহত্ত্বের একটি প্রমাণ। নতুবা তাঁহার দোষ শুনিয়া পৃথিবী এত আনন্দ প্রকাশ কেন করিবে? নিন্দা এবং প্রশংসার দুইটি প্রবল স্রোত সমভাবে ক্রমাগত চলিয়া আসিয়াছে। একটু দোষ পাইলেই, হিন্দু, খ্রীষ্টান এবং আদিব্রাহ্মসমাজ সকলে মিলিয়া অদম্য কেশবকে যেন চারিদিক্ হইতে চাপিয়া ধরিত। কিন্তু তিনি নির্ভয়ে সমরক্ষেত্রে বিচরণ করিতেন। বাস্তবিক কেশব বড় বাহাদুর ছেলে। বাজীকরেরা যেমন হস্তপদবন্ধনপূর্ব্বক কোন ব্যক্তিকে সিন্ধুকে পূরিয়া রাখে, অথচ তাহার কিছুই করিতে পারে না, পূর্ব্ববৎ মুক্তভাবে সে গান করে, বাজনা বাজায়,

হরিভক্ত কেশবকে সাধারণ জনসমাজ সময়ে সময়ে তেমনি বাঁধিয়া ফেলিত, আর তিনি ব্রহ্মাস্ত্রে সমুদয় বন্ধন কাটিয়া বাহির হইতেন। সংবাদপত্র সকল দশদিক্ হইতে তাঁহাকে জালের ন্যায় ঘেরিয়া ফেলিত, কিন্তু ভক্ত প্রহ্লাদের মত 'হরিবোল হরিবোল' বলিয়া হাসিতে হাসিতে তিনি উঠিয়া আসিতেন। তখন মেঘোন্মুক্ত শশধরের ন্যায় কেশবচন্দ্র নবীন শোভা ধারণ করিতেন। বিদ্বান্ ধনী, ছোট বড় সকলে মিলিয়া বারংবার এইরূপে তাঁহাকে ডুবাইবার চেষ্টা করিয়াও কেহ কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই। এই জন্য বলি, কেশবের ন্যায় বাহাদুর ছেলে এ দেশে আর দেখি নাই। আদিসমাজের কোন এক জন সরলহৃদয় ভগ্নমনোরথ ব্যক্তি বলিয়াছিলেন, "অনেক বার অনেক প্রকারে দেখা গেল, কিন্তু কেশবেব কিছু করিতে পারিলাম না। মনে করিয়াছিলাম, এইবার লোকটা ডুবিবে, আর উঠিতে পারিবে না; শেষ দেখিলাম, সমস্ত ব্যর্থ হইল। যেমন লোকসমারোহ জাঁক জমক, তেমনি রহিয়া গেল, কমিল না"। সত্যই তিনি বিশ্বাসবলে অলৌকিক কার্য্য করিতেন। প্রকৃত বিশ্বাসীকে যে কেহ পরাস্ত করিতে পারে না, তাহা এখানে স্পষ্ট দেখা গিয়াছে। চারিদিকে মহাগণ্ডগোল, লোকের কাছে কাণ পাতা যায় না, কিন্তু কেশবের মুখকান্তি তথাপি ম্লান নহে। যখনই উহা একটু ম্লান হইত, তাহার পরক্ষণেই অমনি ভিতর হইতে যেন শতধা হইয়া উৎসাহাগ্নি জ্বলিয়া উঠিত। জীবন্ত বিশ্বাসবলে জীবন্ত ঈশ্বরের নিকট কেবল তিনি প্রার্থনা করিতেন,

অমনি হাতে হাতে তাহার ফল পাইতেন। পরীক্ষা বিপদে লোকগঞ্জনায় তাঁহার একগুণ বিশ্বাস ভক্তি দশগুণ হইত। কি প্রভূত পরাক্রম! কি অপরাজিত ধর্ম্মসাহস!

ব্রহ্মমন্দির-প্রতিষ্ঠা

আমরা প্রধানতঃ ব্রাহ্মসমাজের উন্নতির ঘটনাদ্বারা এখন কেশবচরিত্র অঙ্কিত করিয়া যাইতেছি। কিন্তু ব্রাহ্মসমাজের বহির্ভাগেও তাঁহার জীবন-প্রভাব বিস্তারিত হইয়াছিল। অপরাপর সম্প্রদায়ের সঙ্গে মিশিয়া তিনি বহুবিধ দেশহিতকর কার্য্য করিয়াছেন। তৎসমুদায় কার্য্য তাঁহার ধর্ম্মজীবনেরই একটি অংশ। যে উদার ধর্ম্মের প্রশস্ত ভূমিতে তিনি দণ্ডায়মান ছিলেন, সেখানে সকল শ্রেণীর লোকেরই সমাগম হইত। মানবজাতি, বিশেষরূপে স্বজাতির প্রতিনিধি বলিয়া লোকে তাঁহাকে বিশ্বাস এবং শ্রদ্ধা করিত। এই কারণ বশতঃ নিন্দাকারী বিরুদ্ধপক্ষীয়েরা তাঁহার সামাজিক সম্ভ্রম মর্য্যাদার কখন কোন হানি করিতে পারে নাই। দেশের বড় বড় অনুষ্ঠানক্ষেত্রে শিক্ষিতসম্প্রদায় ধনী মানী দশ জনের মধ্যে কেশবচন্দ্র এক জন আছেনই আছেন। জনহিতৈষী লোকমিত্রদিগকে সম্প্রদায়বিশেষের বিদ্বেষ আক্রমণে কিছু করিতে পারে না। বিপক্ষীয়েরা নিন্দা করিয়া শেষ আপনারাই শ্রান্ত হইয়া পড়িত। নরপূজার আন্দোলনের

ঝড় তুফান মাথার উপর দিয়া চলিয়া গেল, কেশব-চরিত্র আবার চিরতুষারমণ্ডিত ধবল গিরির ন্যায় সূর্য্যালোকে দীপ্তি পাইতে লাগিল।

১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দের শেষ ভাগে হিমালয় এবং পশ্চিম প্রদেশ হইতে গৃহে আসিয়া, ভক্তিপূর্ণ উপাসনা দ্বারা তিনি নীরস ব্রাহ্ম-ধর্ম্মে নবজীবন সঞ্চার করেন। নরপূজাপবাদের আন্দোলনের ভিতরে ভক্তিস্রোত ক্রমে বাড়িয়া গিয়াছিল। তাহাতে কতক-গুলি পুরাতন লোকের অনিষ্ট হইল বটে, কিন্তু নূতন নূতন লোক আসিয়া তাঁহাদের অভাব কিয়ৎ পরিমাণে পূর্ণ করিল। কেশব যদি কোন প্রকার অলৌকিক শক্তির ভাণ করিতেন, তাহা হইলে ঐ সকল ব্যক্তিকে তিনি দলে রাখিতে পারিতেন; কিন্তু তাঁহার ধর্ম্ম স্বভাবের সরল পথ কোন দিন অতিক্রম করে নাই। অতঃপর কলুটোলার ভবনে প্রতিদিন প্রাতে উপাসনা কীর্ত্তন, সন্ধ্যায় সঙ্গত এবং সৎপ্রসঙ্গ ভারি জমাট বাঁধিতে লাগিল। তৎকালকার সেই সকল মঙ্গল চিহ্ন দেখিলে মনে হইত, যেন স্বর্গরাজ্য দ্বারদেশে আসিয়া উপনীত হইয়াছে। পূর্ব্ব এবং পশ্চিম বঙ্গের অনেকগুলি বুদ্ধিমান্ ছাত্র এই সময় সমাজে যোগদান করেন। ধর্ম্মপিপাসু উপাসকগণের তাদৃশ ব্যাকুলতা নৃত্য কীর্ত্তন দর্শনে কেশবজননী একদা ভক্তিবিগলিত-চিত্তে গদ্‌গদ্ কণ্ঠে বলিয়াছিলেন, "কেশব, হায় আমার গতি কি হইবে! আহা! আমার ইচ্ছা হয়, এই সকল লোকের চরণ-ধূলিতে আমি গড়াগড়ি দিই।"

দেখিতে দেখিতে আবার দ্বিতীয় সাম্বৎসরিক মাঘোৎসব নিকটবর্ত্তী হইল। তখন নূতন ব্রহ্মমন্দিরের চতুঃপার্শ্বস্থ ভিত্তি-মাত্র কেবল নির্ম্মিত হইয়াছে, ছাদ হয় নাই। তদবস্থায় কেশবচন্দ্র উহাকে একবার প্রতিষ্ঠিত করেন ও সেই উপলক্ষে এই কয়েকটী কথা বলেন;—"যত সত্য পৃথিবীতে প্রচলিত ছিল, আছে, তাহার প্রতি শ্রদ্ধা রাখিবার জন্য এই গৃহ প্রতিষ্ঠিত হইতেছে। কলহ বিবাদ জাত্যভিমান যাহাতে বিনষ্ট হয়, ভ্রাতৃভাব স্থাপিত হয়, তাহার জন্য এই মন্দির। যে সকল আচার্য্য এখানকার বেদী হইতে উপদেশ দিবেন, তাঁহাকে পাপী বলিয়া সকলে বিবেচনা করিবে। তিনি উপদেশ দিতে পারেন বলিয়া তদ্বিষয়ে ভার পাইয়াছেন। এখানে ঈশ্বরের উপর যে সকল নাম ও ভাষা আরোপ করা হয়, তাহা মনুষ্যের উপর আরোপ করা হইবে না। ঈশ্বরপ্রসাদে ব্রাহ্ম ও অপরাপর ভ্রাতাদিগের সাহায্যে এই গৃহের সূত্রপাত হইয়াছে। যদিও সম্পূর্ণ হয় নাই, ঈশ্বরের করুণায়, ভ্রাতাদিগের যত্নে ইহা সম্পন্ন হইবে। এই যে গৃহ সংস্থাপিত হইতেছে, সকলের গোচর করিতেছি, ইহা কোন ব্যক্তিবিশেষের অর্থসাহায্যে হয় নাই। যাঁহারা সাহায্য দান করিয়াছেন, তাঁহারা ধন্য! যাঁহারা ইহার নির্ম্মাণে শারীরিক মানসিক পরিশ্রম করিয়াছেন, তাঁহারা ধন্য! এই গৃহের ইষ্টক যেমন পরস্পরে একত্রিত, ব্রাহ্মগণ তেমনি মিলিত থাকিবেন। যাহাতে এ দেশ হইতে কুসংস্কার তিরোহিত হয়, ভিন্ন ভিন্ন জাতিকে ভ্রাতৃভাবে একত্র করিয়া ঈশ্বরের নিকট

আনা হয়, এইজন্য মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইল। মহাত্মা রামমোহন এবং প্রধান আচার্য্য মহাশয়কে ধন্যবাদ। ইহা তাঁহাদের যত্নের ফল।”

এইরূপে প্রতিষ্ঠা এবং তৎসঙ্গে উৎসব করিলেন। নগর-সঙ্কীর্ত্তনে আবার কলিকাতা মাতিল। এই বৎসর টাউনহলে “ভবিষ্যদ্ধর্ম্মসমাজ” বিষয়ে বক্তৃতা হয়। তাহাতে ছোট লাট গ্রে সাহেব উপস্থিত ছিলেন। ভবিষ্যদ্ধর্ম্মের একতা সম্বন্ধে সেই সভা নিদর্শন স্বরূপ প্রতীয়মান হইয়াছিল। নানাজাতীয় লোকে একত্রে ঈশ্বরের গুণগান করিয়াছিলেন। উৎসবের আনন্দ কোলাহলে এবং লোকসমারোহে বিঘ্ন বিপদ সমস্ত কাটিয়া গেল। প্রতিবারের মহোৎসবে এইরূপ নবজীবনের সঞ্চার হইত। কেশবচন্দ্র জাতীয় স্বভাবের ধাতু বুঝিতে পারিয়াছিলেন। মানবপ্রকৃতির মর্ম্ম-স্থানকে স্পর্শ করিতেন, অমনি তাহার প্রাণতন্ত্রী ঝঙ্কার নাদে বাজিয়া উঠিত। নব্য সভ্যদলের লোকেরা সচরাচর খোল কর্ত্তালের বাজনা শুনিলে কাণে হাত দিত, কিন্তু কেশব যাই তাহাতে হাত দিলেন, অমনি নিদ্রিত সিংহ যেন জাগিয়া উঠিল। ধর্ম্মোন্মত্ত যুবকেরা উৎসাহ উদ্যম প্রকাশের অবকাশ পাইল। যাহারা চলিত না, তাহারা নাচিতে লাগিল। কখনও যে মুখ খুলে নাই, সেও চীৎকার স্বরে গান ধরিল। ঠিক যেন প্রেমের ভেল্কী লাগিয়া গেল। গদ্যপ্রিয় ব্রাহ্মসমাজ পদ্যপ্রিয় হইল।

অসম্পূর্ণ অবস্থাতে ব্রহ্মমন্দির একবার প্রতিষ্ঠিত হয়।

তাহার পর কিছু দিনের জন্য সেখানে উপাসনার কার্য্য বন্ধ থাকে। এই মন্দির কেশবচন্দ্রের এক অপূর্ব্ব কীর্ত্তিস্তম্ভ। কিছুই সংস্থান ছিল না, কিন্তু বিশ হাজার টাকা ব্যয়ে উহা সুসম্পন্ন হইল। অর্থাভাব বশতঃ প্রথমে তিন হাজার টাকা নিজ নামে ঋণ করিয়া তদ্দ্বারা তিনি কলিকাতা মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীটে ঝামা-পুকুর পল্লীতে কয়েক কাঠা ভূমি ক্রয় করিলেন। যথা সময়ে তথায় ঈশ্বরের নামে ভিত্তি স্থাপিত হইল। অতঃপর ক্রমে চারিদিক্ হইতে টাকা আসিতে লাগিল। এমনি কয়েকটি সহ-যোগী বন্ধুও ভগবান্ তাঁহাকে মিলাইয়া দিয়াছিলেন যে, সে বিষয় ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। তাঁহারা এক এক জন এক এক কার্য্যের অবতার স্বরূপ। শত শত মুদ্রা বেতন দিয়াও কেহ এমন কার্য্যক্ষম সহকারী পাইতে পারে না। বিধাতা যে সময়ে সময়ে পৃথিবীতে ধর্ম্মবিধান প্রেরণ করেন, এইরূপ নিঃস্বার্থ আত্মত্যাগী ভক্তদল তাহার এক প্রমাণ। দেশ দেশান্তরে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া তাঁহারা রাশি রাশি অর্থ সংগ্রহ করিলেন। এক জন প্রচারক মন্দির-নির্ম্মাণ-কার্য্যে কয়েক বৎসরের জন্য জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন। কার্য্যে অগ্নি, ধর্ম্মপ্রচারে অগ্নি, উপাসনা কীর্ত্তনে অগ্নি, সমস্ত বিভাগে একেবারে যেন আগুন জ্বলিয়া উঠিল। এই সময় পাক্ষিক "ইণ্ডিয়ান মিরার" সাপ্তাহিক হয়।

উৎসবান্তে মহাত্মা কেশবচন্দ্র জনৈক বন্ধু সমভিব্যাহারে ঢাকা নগরে নর্ব্বার গমন করেন। তাহার পর ১৮৬৯

খ্রীষ্টাব্দের ২২শে আগষ্টে যথারীতি ব্রহ্মমন্দিরের দ্বার উন্মুক্ত হয়। নির্ম্মাণকার্য্য শেষ হইতে না হইতে সংবাদপত্রে উৎসবের বিজ্ঞাপন বাহির হইল। তাঁহার কার্য্য-সাধনের এক নূতন প্রণালী ছিল। যে কোন গুরুতর কার্য্য হউক, অগ্রে তাহার দিন স্থির করিয়া ফেলিতেন। নির্দ্দিষ্ট সময়ের ভিতর যেমন করিয়াই হউক, অবশিষ্ট কার্য্য শেষ করিতেই হইবে, এই প্রতিজ্ঞা। সুতরাং কর্ম্মকর্ত্তাদিগের সমস্ত উৎসাহ উহার মধ্যে ঘনীভূত হইয়া যাইত। মন্দির উৎসর্গের এক সপ্তাহ অগ্রে কাজের এমনি তাড়াতাড়ি ও ব্যস্ততা পড়িয়া গেল যে, রাত্রি দিন আর বিশ্রাম নাই। মশাল ধরিয়া লোকেরা রাত্রিকালে সকল কর্ম্ম সমাধা করিয়া ফেলিল।

এই মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান প্রধান আচার্য্য মহাশয় দ্বারা যাহাতে সম্পন্ন হয়, তজ্জন্য কেশবচন্দ্র চেষ্টা করিলেন এবং তাঁহাকে নিমন্ত্রণ পত্র পাঠাইলেন। প্রথমতঃ তিনি সম্মত হন, কিন্তু পরিশেষে তাহা কার্য্যে পরিণত হইল না। এ কার্য্যে দেবেন্দ্র বাবু অর্থ কিংবা উৎসাহ দিয়া কোনরূপে সাহায্য করেন নাই। অগত্যা কেশবচন্দ্র নিজেই সমস্ত কার্য্য নির্ব্বাহ করিলেন। সে দিন নূতন মন্দিরে নবানুরাগী ব্রাহ্মযুবকদলের মুখমণ্ডলে স্বর্গীয় ভাব যিনি দর্শন করিয়াছেন, তিনি আর তাহা জন্মে ভুলিতে পারিবেন না। এ প্রকার মহদনুষ্ঠানে আচার্য্যদেব স্বর্গ মর্ত্ত্য, ইহ পরলোক, ভূত ভবিষ্যৎ, দূর নিকট সব এক স্থানে মিলাইয়া দিতেন। সুর এবং নরলোকবাসী সাধু মহাত্মাদিগের সহিত

একহৃদয় হইয়া তিনি দেবমন্দির প্রতিষ্ঠা করিলেন। এত দিন নিরাশ্রয় হইয়া পাথারে ভাসিতেছিলেন, এক্ষণে উপাসনার একটি স্থান পাইলেন। ঘরে আর লোক ধরে না। চারিদিক হইতে যাত্রিদল আসিতে লাগিল। এই উপলক্ষে অনেকগুলি বি, এ, এম, এ, উপাধিধারী যুবা ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত হন। আনন্দমোহন বসু, কৃষ্ণবিহারী সেন, ক্ষীরোদচন্দ্র রায় চৌধুরী, শিবনাথ শাস্ত্রী, রজনীনাথ রায়, জগচ্চন্দ্র দাস প্রভৃতি ইহার ভিতরে ছিলেন। এইরূপে মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইলে প্রতি রবিবারে তথায় বহুলোকের সমাগম হইতে লাগিল। নিত্য নূতন উপদেশ শ্রবণ করিয়া শ্রোতৃবর্গের আশা অনুরাগ বাড়িতে লাগিল। শ্মশানের মধ্যে স্বর্গ অবতীর্ণ হইল। ব্রাহ্মদিগেরত কথাই নাই, বাহিরের ভদ্র বিশিষ্ট শিক্ষিত এবং পদস্থ লোকের সমাগমে ঘর পূরিয়া যাইত, স্থান সমাবেশ হইত না। কলুটোলা এবং অপর স্থানের বৈদ্য পরিবারের প্রাচীনা হিন্দু মহিলাগণ পর্য্যন্ত এ বিষয়ে উৎসাহী হইয়াছিলেন। তাঁহারা বলিতেন, "কেশব কি নূতন মন্দির করিয়াছে, আমরা দেখিব।" উপাসনা এবং উৎসবকালে তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ কাঁদিয়া আকুল হইতেন। এবম্বিধ নানা কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া কেশবচন্দ্র ১৮৭০ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে ইংলণ্ডে গমন করেন।

ইংলণ্ডে ভ্রমণ

ইংরাজজাতির সহিত ভারতের সৌহৃদ্য-স্থাপন এবং ব্রাহ্মধর্ম্ম-বিস্তারের জন্য আচার্য্য কেশবচন্দ্র ইংলণ্ডে গমন করেন। ইতঃপূর্ব্বেই তদ্দেশীয় উন্নতমনা নরনারীগণের সহিত পত্রদ্বারা তাঁহার আলাপ পরিচয় হয়। কেহ কেহ তাঁহাকে তথায় যাইবার জন্য আহ্বানও করিয়াছিলেন। লরেন্স বাহাদুর স্বদেশপ্রত্যাগমন-কালে এ বিষয়ে উৎসাহ দিয়া যান। তিনি এ দেশ হইতে যাইবাব সময় লর্ড মেওর সঙ্গে তাঁহার আলাপ করিয়া দিয়া গিয়াছিলেন। লরেন্সের পর ভারতে যে কয়জন রাজপ্রতিনিধি আসিয়াছেন, কেহই কেশবের সঙ্গে বন্ধুতা-স্থাপনে ত্রুটি করেন নাই। বিলাত যাইবার সময় লর্ড মেও তাঁহাকে ইণ্ডিয়া আফিসের বড় বড় রাজপুরুষদের নামে পত্র দেন। ইহা ব্যতীত আরও কয়েকখানি পত্র তদ্দেশীয় প্রধান ব্যক্তিদিগের নামে তিনি পাইয়াছিলেন।

ইংলণ্ডে যাইবেন, কিন্তু হস্তে অর্থের সংস্থান নাই। টাউন-হলে এক সভা করিলেন। তথায় "ভারতের সহিত ইংলণ্ডের সম্বন্ধ" বিষয়ে এক বক্তৃতা করিয়া সকলের নিকট ভিক্ষা চাহিলেন। তাহাতে প্রায় পাঁচ শত টাকা সংগৃহীত হইল। অবশিষ্ট নিজ সঞ্চিত সম্বল হইতে লইয়া জাহাজে আরোহণ করিলেন। কয়েকটি ব্রাহ্মবন্ধু বিদ্যা ও ধন উপার্জ্জনের জন্য তাঁহার সঙ্গী হন। বিদায় দিবসে মুচিখোলার ঘাটে এক অপূর্ব্ব

দৃশ্য হইয়াছিল। তাঁহার বিলাতগমনে দেশের বড় লোকেরা কেহ সহানুভূতি প্রকাশ করেন নাই, বরং অনেকে বিরুদ্ধ ভাব প্রকাশ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহাতে দৃঢ়সঙ্কল্প কেশব ভীত হইবার নহেন। ব্রাহ্মসমাজের উন্নতিশীল সভ্যগণ ইহাতে যথেষ্ট উৎসাহ এবং সাহায্য দান করিয়াছিলেন। বহুলোক তাঁহাকে বিদায় দিবার জন্য জাহাজের ঘাটে গমন করে। বাষ্পীয় তরণী ভাগীরথীবক্ষে কেশবকে লইয়া যখন ভাসিল, তৎকালকার শোভা এখনও অনেকের নয়নপথে জাগিতেছে। বন্ধুদিগের প্রেম-বিস্ফারিতনয়ন একদৃষ্টে জাহাজের দিকে চাহিয়া রহিল, এবং বিচ্ছেদসূচক অশ্রুজল বর্ষণ করিতে লাগিল। এইরূপে ভারতের সৎপুত্র সভ্যতম ইংলণ্ডে ব্রহ্মনাম-ঘোষণার্থ বহির্গত হইলেন। যে দেশ হইতে পাদরী সাহেবেরা আসিয়া ভারতসন্তানদিগকে খ্রীষ্টান করেন, সেই পাদরিরাজ্যে কেশবচন্দ্র ধর্ম্ম শিখিতে এবং শিখাইতে চলিলেন। যে দেশের লোকেরা পৌত্তলিক অজ্ঞানান্ধ বলিয়া হিন্দুদিগকে ঘৃণাব চক্ষে দেখে, সেই দেশের লোকদিগকে কেশব বিশুদ্ধ খ্রীষ্টতত্ত্ব ও পরমার্থ ব্রহ্মজ্ঞান শিক্ষা দিবার জন্য যাত্রা করিলেন।

বিলাতগমনের পূর্ব্বে সঙ্গত এবং উপাসকমণ্ডলীর সভায় নিম্নলিখিত কয়েকটী গুরুতর কথা তিনি বলিয়া যান। "ধর্ম্মপথে গুরু সহায়, কিন্তু লক্ষ্য নহে। ব্যক্তিবিশেষ সম্পূর্ণ গুরু হইতে পারে না। তাঁহার জীবন এবং উপদেশ যে পরিমাণে ধর্ম্মপথে সহায়তা করে, সেই পরিমাণে তিনি গুরু। জীবিত গুরু সম্বন্ধে

বলিতে গেলে আমার নিজের বিষয় আসিয়া পড়ে। আমার নিকট যাঁহারা উপকার পাইয়াছেন বোধ করেন, তাঁহারা আমাকে শ্রদ্ধা করিবেন। অন্য প্রচারক সম্বন্ধেও তদ্রূপ করিবেন। আমি যে কিছু উপদেশ দিয়াছি, দিতেছি, কিংবা দিব, তাহাতে মনের সহিত কাহাকেও সম্পূর্ণ শিষ্য বলিতে পারি না। এটি আমার পক্ষে বিশেষ গৌরবের বিষয়। আমাদের মধ্যে ঠিক গুরু-শিষ্যের সম্বন্ধ হইতে পারে না। আমাকে কেহ সম্পূর্ণ গুরু বলিলে, তাঁহার পরিত্রাণের পথে সম্পূর্ণ ব্যাঘাত ঘটিতে পারে। যিনি আমার মনোগত ভাবের অনুবর্ত্তী হয়েন, তিনিই আমার শিষ্য হইতে পারেন। এবং তাহা হইলে তাঁহাকে বিশ্বাস করিতে হইবে যে, আমি তাঁহার গুরু নহি, ঈশ্বরই তাঁহার একমাত্র গুরু। আমার দুই পাঁচটী কথা শুনিয়া কেহ আমাকে গুরু বলিলে অসত্য হয়; কারণ, আমার সম্পূর্ণ জীবনতো সেরূপ নয়। কেহ যদি ঈশ্বর অপেক্ষা আমাকে অধিক ভক্তি করেন, সে তাঁহার মতেরই দোষ। আমি কাহাকেও ধর্ম্মের একটী কথা শিখাই, এরূপ মনে করি না। আমার জীবনের উদ্দেশ্য, ভ্রাতাদিগকে ঈশ্বরের নিকট আনিয়া দিব; তিনি স্বয়ং শিক্ষা দিবেন, আমি যেন ব্যবধান না হই। যিনি আমার উপদেশে সাক্ষাৎসম্বন্ধে ঈশ্বরের নিকট সকল প্রশ্নের উত্তর লন, তিনিই আমার শিষ্য। যাঁহারা আমাকে প্রীতি করেন বলেন, অথচ আমি যে ভাইগুলিকে আনিয়া দিয়াছি, তাঁহাদিগকে প্রীতি করেন না, তাঁহারা মিথ্যা বলেন।"

"যে যে কারণে উপাসকগণের মধ্যে বিবাদ হইবার সম্ভাবনা, আমি থাকিতে থাকিতে সে সকল ভঞ্জন করা উচিত। কতকগুলি মতে আমাদের পরস্পরে প্রভেদ থাকিতে পারে। যথা (১) ঈশ্বর মহাপুরুষ প্রেরণ করেন কি না? (২) বিশেষ কৃপা। (৩) ভক্তি ভিন্ন মুক্তি হয় না। (৪) অনুতাপ ভিন্ন ধর্ম্মসাধনে চেষ্টাও বিফল। (৫) গুরুভক্তি। (৬) বৈরাগ্য। এ সকল বিষয়ে প্রভেদ আছে এবং থাকাও আবশ্যক; কিন্তু তাহা অগ্রে জানিয়া রাখা উচিত। যিনি এ সকল বিষয়ে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করেন, তিনি ব্রাহ্ম; যিনি সম্পূর্ণ অবিশ্বাস করেন, তিনিও ব্রাহ্ম। এরূপ প্রভেদ সত্ত্বেও সাধারণ বিষয়ে একমত থাকিবার অঙ্গীকার করিতে হইবে। মূল মতে যত দিন বিশ্বাস থাকিবে, একত্রে তত দিন ব্রহ্মমন্দিরে উপাসনা করিব। আমার মত সম্পূর্ণ প্রকাশিত হয় নাই। যিনি যাহা বলেন, তাহা অনেক নিজের। ঈশ্বরকে মঙ্গলস্বরূপ না বলিয়া নিষ্ঠুর বলিলে মূল মতের প্রভেদ হয়। এরূপ স্থলে ঐক্য থাকিতে পারে না। সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম মতে পরস্পরের স্বাধীনতার উপর কেহ হস্তক্ষেপ করিবেন না। মন্দিরের দেনা শোধ না হইলে ইহার লেখা পড়া হইতে পারে না।"

উদ্ভিদাহারী কেশবচন্দ্র জাহাজে চড়িয়া আমিষগতপ্রাণ ইংরাজরাজ্যে চলিলেন। পথে আলু ডাল এবং রক্ষিত দুগ্ধ এবং ভাত খাইয়া প্রাণ ধারণ করিতেন। যাইবার সময় সমুদ্রবক্ষে পোতের যাত্রীদিগকে লইয়া এক দিন উপাসনা বক্তৃতা করিয়া-

ছিলেন। অনন্তর যথাকালে লণ্ডন নগরে গিয়া উপনীত হন। প্রথমে একটী বাসা ভাঁড়া করেন। তথায় মাসাবধি থাকিতে হইয়াছিল। এ সময়ের মধ্যে প্রধান প্রধান ব্যক্তিদিগের সঙ্গে আলাপ করিলেন। লর্ড লরেন্স স্বয়ং তত্রত্য সম্ভ্রান্ত রাজপুরুষ-দিগের সহিত তাঁহার আলাপ করিয়া দেন। তিনি কেশবকে অতিশয় ভাল বাসিতেন। মহারাণী এবং অন্যান্য মান্য গণ্য ব্যক্তিদিগের সহিত তাঁহার মিলনের প্রধান উপায় বৃদ্ধ লরেন্স বাহাদুর। এক মাস পরে প্রকাশ্যরূপে তিনি সাধারণের সমক্ষে দণ্ডায়মান হইলেন। তিনি লণ্ডনে পৌঁছিলে রিউটারের টেলিগ্রামে সংবাদ আসিল যে, "কেশব বাবু এখানে উপস্থিত হইয়াছেন, ১২ই এপ্রেল হ্যানোবার স্কোয়ার রুমে তাঁহার অভ্যর্থনার জন্য মহাসভা হইবে।" তথায় পৌঁছিবার অল্প দিন পরেই সার জন্ বাউয়ারিং, ডাক্তার মার্টিনো এবং ইউনিটেরিয়ান সম্প্রদায় কর্ত্তৃক তিনি নিমন্ত্রিত হন। শেষোক্ত সম্প্রদায়স্থ লোকদিগের যত্নেই অভ্যর্থনার সভা আহূত হয়। এ প্রকার উদারভাবের সভা পৃথিবীতে আর কখন হইয়াছে কি না সন্দেহ। কাথলিক্ সম্প্রদায় ব্যতীত যত প্রকার খ্রীষ্টসম্প্রদায় সে দেশে আছে, সভাস্থলে তাঁহাদিগের প্রতিনিধিগণ উপস্থিত ছিলেন। মহারাণীর পুরোহিত ডিন্ ষ্ট্যান্লী এবং অনেকানেক প্রসিদ্ধ বিদ্বান্ ব্যক্তি এক একটী বক্তৃতা দ্বারা কেশবচন্দ্রকে সাদরে গ্রহণ করিলেন। সভাস্থ ব্যক্তিগণের উৎসাহ এবং সহানুভূতি পাইয়া, আমাদের বন্ধু কৃতজ্ঞহৃদয়ে রাজজাতির প্রতি শ্রদ্ধা প্রীতি জানাইলেন এবং একটী

বক্তৃতা করিলেন। প্রথম দিনের সেই বক্তৃতাতেই চারিদিকে তাঁহার নাম বাহির হইল। তদনন্তর পথে পথে প্লাকার্ড, দোকানে দোকানে ফটোগ্রাফ, কাগজে কাগজে বিজ্ঞাপন এবং সমালোচনা, গ্রাফিক পত্রিকায় ছবি ও জীবনবৃত্তান্ত, পাঞ্চ পত্রিকায় আমোদজনক কবিতা দেখিয়া অল্পকালমধ্যে সমস্ত ইংলণ্ড কেশবচন্দ্রের গুণগ্রামের পরিচয় পাইল। ইহার আমূল বিবরণ শ্রেণীবদ্ধরূপে পুস্তকাকারে মুদ্রিত আছে। কেশবচন্দ্র যে ঈশ্বরপ্রেরিত, মানবসাধারণের প্রতিনিধি, তাহা চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেই স্বীকার করিতেন। উল্লিখিত মহাসভা দ্বারা তাহা বিলক্ষণরূপে প্রতিপন্ন হইয়াছে। নতুবা পরস্পরবিরোধী সম্প্রদায়ের লোক মিলিত হইয়া কেন তাঁহাকে আদর করিবেন? তথাপি সে সময় এ দেশের কত লোক বলিয়াছিল, "কে তাঁহাকে প্রতিনিধি নিযুক্ত করিয়াছে?" কিন্তু তিনি যে বিধাতার নিয়োজিত মানবপ্রতিনিধি, তাহা অল্পমতি লোকে কিরূপে বুঝিবে?

ব্যয়-নির্ব্বাহের জন্য কেবল এক মাসের উপযুক্ত সম্বল তাঁহার সঙ্গে ছিল। যাই তাহা নিঃশেষিত হইল, অমনি চতুর্দ্দিক্ হইতে নিমন্ত্রণ আসিতে লাগিল। ইউনিটেরিয়ানদিগের সেক্রেটারি প্রেমিকবর রেভারেণ্ড স্পিয়ার্স নিজপরিবারে কেশবচন্দ্রকে লইয়া গেলেন এবং প্রয়োজনীয় অর্থ এবং দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিয়া দিতে লাগিলেন। ছয় মাস কাল প্রায় তিনি সে দেশে অবস্থিতি করেন; থাকিবার ব্যয় এবং আসিবার পাথেয় সমস্তই উক্ত সম্প্রদায়ের খ্রীষ্টীয়ান বন্ধুরা সাহায্য করিয়াছিলেন। ইহা ব্যতীত পাঁচ

সহস্র মুদ্রা তাঁহার পরিবারকে তাঁহারা দান করেন। সে দেশে এমন রীতি আছে, আগন্তুক কোন ধর্ম্মযাজক বক্তা যখন যে উপাসনালয়ে উপাসনা করেন, তাঁহাকে তজ্জন্য প্রত্যেক বারে দুই কি একটী স্বর্ণমুদ্রা দেওয়া হইয়া থাকে। কেশবচন্দ্র তাহা গ্রহণ করিতেন না, কিন্তু তাঁহার সাহায্যার্থ অনেকে মুক্তহস্ত হইয়াছিলেন। এ প্রকার দেশহিতৈষী ব্যক্তিকে প্রভুর কার্য্যে কেমন করিয়া নিশ্চিন্ত চিত্তে নিযুক্ত রাখিতে হয়, তাহা সেখানকার লোকেরা ভালরূপই জানে। গ্রহীতাকে না জানাইয়া, আপনাকে প্রচ্ছন্ন রাখিয়া কত লোক এ বিষয়ে দান করে।

আচার্য্য কেশবচন্দ্রের "ঈশ্বর প্রাণের প্রাণ" বিষয়ক প্রথম উপদেশ ডাক্তার মার্টিনোর ভজনালয়ে হয়। সে দিন শ্রোতৃবর্গের মধ্যে মিস্ কব্ প্রভৃতি অনেক বিদ্বান্ ও কোন কোন সম্ভ্রান্ত রাজপুরুষ উপস্থিত ছিলেন। তদনন্তর কনোয়ের গির্জ্জায় "অপব্যয়ী পুত্র," হ্যাকনী চার্চ্চে "প্রার্থনা," ইস্লিংটনে "ঈশ্বর-প্রেম," একজিটার হলে সাধারণ শিক্ষা সম্বন্ধে উপদেশ দান করেন। শেষোক্ত সভায় জনৈক পাদরী বলিয়াছিলেন, "বাস্তবিক, সেন মহাশয়, আমাদের উচিত যে, আমরা আপনার পদতলে বসিয়া কিছু শিক্ষা করি।" অপর কোন এক জন প্রধান পদস্থ কেশবের দুই একটী প্রকাশ্য বক্তৃতা উপদেশ শুনিয়া বন্ধুভাবে তাঁহাকে এইরূপ পরামর্শ দেন যে, "মিষ্টার সেন, ইহা ভারতবর্ষ নহে, ইংলণ্ড। এখানকার শ্রোতৃবৃন্দ অতিশয় উচ্চ শ্রেণীর শিক্ষিত, তাঁহাদিগের নিকট আপনার যাহা কিছু বিজ্ঞানসঙ্গত তত্ত্ব কথা

থাকে, ধর্ম্মবিজ্ঞান এবং ইতিহাসের প্রমাণ প্রয়োগ অনুসারে তাহাই বলিতে হইবে। বিশেষরূপে গ্রীক, ল্যাটিন এবং অন্যান্য প্রত্নতত্ত্বের পাণ্ডিত্য এখানে বিশেষ প্রয়োজন। এই সকল লোকেরা আপনার ভাবের কথা দুই একবার শুনিয়া তাহার পর শ্রান্ত হইয়া পড়িবে, আর শুনিতে আসিবে না, শেষ আপনাকে শূন্য বেঞ্চের কাছে বক্তৃতা করিতে হইবে।" সে কথার উত্তরে তিনি বলেন, "আমি বিদ্বান্ নহি; কোন প্রাচীন ভাষাও আমি পড়ি নাই, সুতরাং আপনি আমার নিকট সে বিষয়ে কিছুই প্রত্যাশা করিতে পারেন না। যে সত্য আমি উপলব্ধি করিয়া থাকি, তাহাই কেবল বলি।" তচ্ছ্রবণে পাদরী মহাত্মা বলিলেন, "তাহা হইলে আপনার দ্বারা এখানে কোন কার্য্য হইবে না।" অতঃপর দিনের পর দিন তাঁহার আরো কতিপয় জ্বলন্ত বিশ্বাসপূর্ণ বক্তৃতা শুনিয়া তাঁহার মত পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। তখন তিনি এক দিন বলিলেন, "মিষ্টার সেন, আপনি আমাকে ক্ষমা করিবেন। আমি আপনার সম্বন্ধে বড় ভুল বুঝিয়াছিলাম। আপনি স্বভাবতঃই সেই সকল মানসিক এবং আধ্যাত্মিক শক্তি অধিকার করিয়াছেন, যদ্দ্বারা আপনি আমাদের অপেক্ষা অনেক উচ্চস্থানে অবস্থিতি করেন এবং আমরা যাহা বুদ্ধি দ্বারা বুঝিবার চেষ্টা করি, তাহা আপনার প্রত্যক্ষের বিষয়। আমরা অনেকানেক পুস্তক পড়িয়া তাহার বিষয়ে চিন্তা করিয়া পরিশ্রান্ত হই, কিন্তু সমস্ত বিজ্ঞান দর্শনের যে মূল প্রস্রবণ, তাহা আপনার অধিকৃত।" মদ্যপান ও যুদ্ধনিবারিণী সভা, দাতব্য সভা, শ্রমজীবী ও অন্ধ

বধিরদিগের আশ্রম ইত্যাদি নানা স্থলে তিনি বিবিধ বিষয়ে উপদেশ দিয়াছিলেন। অনন্তর সেণ্ট জেম্‌সহলে পাঁচ সহস্র শ্রোতার সম্মুখে সুরাপাননিবারণ বিষয়ে এক বক্তৃতা হয়, তাহাতে তিনি ব্রিটিশরাজের সুরা ব্যবসায়ের প্রতি ভয়ানকরূপে আক্রমণ করেন। স্পার্জ্জন্‌স টেবার্ণেকেলে "ভারতের প্রতি ইংলণ্ডের কর্ত্তব্য" বিষয়িণী বক্তৃতায়, ভারতের নীচশ্রেণীর অত্যাচারী ইংরাজদের উৎপীড়নের কথা এমনি স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছিলেন যে, তাহা লইয়া শেষ মহা আন্দোলন উপস্থিত হয়। এ দেশের হীনমতি ইংরাজেরা তাহা শুনিয়া একবারে খেপিয়া গিয়াছিল। এমন কি, বক্তাকে যদি তাহারা পাইত, তাহা হইলে মারিয়া ফেলিত। লর্ড লরেন্স এই সভায় সভাপতি ছিলেন। তিনি এবং উদারচরিত নিরপেক্ষ ব্যক্তিরা কেশবের পক্ষ সমর্থন করেন, এবং উহাদিগকে ধিক্কার দেন। তাহার পর "খ্রীষ্ট এবং খ্রীষ্টানধর্ম্ম" বিষয়ে বক্তৃতা হয়। ইহার ভিতরকার অভিনব খ্রীষ্টতত্ত্ব-শ্রবণে খ্রীষ্টভক্তগণ অতীব সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। ঈশার রক্তমাংস-ভোজন এবং কল্যকার জন্য ভাবিও না, এই দুইটি মতের আধ্যাত্মিক গভীর অর্থ এই বক্তৃতাপাঠে বুঝিতে পারা যায়। সুইডেন্‌বর্গ সভা হইতেও তিনি একখানি অভিনন্দন এবং প্রেততত্ত্ব-বিষয়ক কতকগুলি মনোহর দৃশ্য গ্রন্থ প্রাপ্ত হন। উহার সভ্যেরা এক দিন তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া যথেষ্ট সমাদর করিয়াছিলেন।

মহাজনাবতার কেশবচন্দ্র এইরূপে লণ্ডন মহানগরীকে

ব্রহ্মনামে জাগ্রৎ করিয়া, ১২ই জুন তারিখে অন্যান্য নগর পরিদর্শনার্থ বহির্গত হন। তিনি কি ভোজন করেন, কখন নিদ্রা যান, কখন তাঁহার কোন্ কাজের সময়, তাহার বিস্তারিত বিবরণ বন্ধুগণ কর্ত্তৃক প্রতি নগরে নগরে ইতঃপূর্ব্বেই প্রেরিত হইয়াছিল। যাহাতে তিনি সর্ব্বত্র আদরে পরিগৃহীত হন, তজ্জন্য তাঁহারা পত্রাদি লিখিয়াছিলেন। রাজধানীতে উচ্চশ্রেণীর লোক-সমাজে একবার সম্মান এবং উচ্চাসন পাইলে, অপর সাধারণের মধ্যে সম্মান-লাভের জন্য আর কোন কষ্ট পাইতে হয় না। আচার্য্য ব্রহ্মানন্দ লণ্ডনে যেরূপ কৃতকার্য্য হইলেন, সংবাদপত্র সকল তাঁহার বিষয়ে যেরূপ আন্দোলন করিল, তাহাতে তিনি আর কোথাও অপরিচিত রহিলেন না। ইউনিটেরিয়ানদিগের ভজনালয় এবং বাসভবন তাঁহার জন্য সর্ব্বত্রই উন্মুক্ত ছিল। কোন কোন স্থানে ব্যাপ্টিষ্ট চার্চ্চেও তিনি উপদেশ দিয়াছেন।

প্রথমে ব্রিষ্টল নগরে কুমারী কার্পেণ্টারের ভবনে উপনীত হন। এক সময় রাজা রামমোহন রায় যে ভজনালয়ে যাইতেন, সেই খানে তিনি উপাসনা করিলেন এবং নবজীবন বিষয়ে উপদেশ দিলেন। উপাসনাকালে রাজার পরলোকগত আত্মার মঙ্গলের জন্য একটী প্রার্থনা করেন। পরে অপরাহ্নে তাঁহার সমাধিস্থান দেখিতে যান এবং সেখানে বন্ধুগণের সহিত জানু পাতিয়া প্রার্থনাপূর্ব্বক আপনার নাম লিখিয়া আসেন। ব্রিষ্টল হইতে বাথ্, তথা হইতে মহাকবি সেক্সপিয়ারের জন্মস্থান ষ্ট্রাট্‌ফোর্ড গমন করেন। কবিবরের লিখিবার স্থান, সমাধি-

মন্দির দেখিয়া তিনি লিচেষ্টার ও বার্ম্মিংহ্যামে চলিয়া যান। শেষোক্ত স্থানের অধিবাসীরা মহাসমারোহের সহিত তাঁহাকে গ্রহণ করিয়াছিল। কিন্তু কয়েক জন পাদরী কিছু বিদ্বেষ ভাব প্রকাশ করেন। যে সময় উক্ত নগরে তিনি প্রভুর কার্য্য-সাধনে ব্যস্ত ছিলেন, সেই সময় শ্রীমতী গণেশসুন্দরীর খ্রীষ্টধর্ম্ম-গ্রহণ সম্বন্ধে অনেক কথা উঠে। ব্রাহ্মেরা তাঁহাকে খ্রীষ্টান হইতে দেয় নাই, সুতরাং কেশবচন্দ্র সেন সে জন্য দায়ী। জেনানামিসনের কোন কোন নারী ঐ সময় ছোট ছোট কাগজে এইরূপ গ্লানি প্রচার করেন যে, "কেশব বাবুর বাড়ীতে আমরা গিয়া দেখিয়া আসিয়াছি, তথায় জ্ঞান সভ্যতার কোন নিদর্শন নাই, অতএব তিনি যাহা প্রচার করিতেছেন, তাহা কেবল মুখের কথা।" এইরূপ অপবাদ দিয়া তাঁহারা তাঁহাকে কিছু বিপাকে ফেলিয়াছিলেন; কিন্তু ভদ্র ইংরাজেরা সে কথা গ্রাহ্য করিলেন না। তদ্দর্শনে কেশবচন্দ্র বলিলেন, "যে পর্য্যন্ত স্বাধীন রাজ্য ইংলণ্ডে আমি আছি, তত দিন আমার মান সম্ভ্রম রক্ষা বিষয়ে কোন ভয় নাই।" এক জন সরলহৃদয় সৎসাহসী ব্যক্তি তাঁহাকে নির্দ্দোষী জানিয়া বলিয়াছিলেন, "পরোক্ষে নিন্দা-কারী ভীরুদিগকে দমন করা আমার একটি বিশেষ কাজ। একদা কোন ব্যক্তি অপর কোন লোকের বিরুদ্ধে পত্রদ্বারা নিন্দা প্রচার করিয়াছিল। আমি চাবুক লইয়া তাহাকে তাড়া করি এবং বলি যে, তোমাকে দেশছাড়া না করিয়া আমি ক্ষান্ত হইব না। সে আমার এইরূপ প্রতিজ্ঞা অবগত হইয়া শেষ

পলায়ন করিতে বাধ্য হয়।" অনন্তর তিনি নটিংহাম নগরে উপস্থিত হইলে চল্লিশ জন পাদরির স্বাক্ষরিত এক পত্র তাঁহার নিকটে আসিল। "খ্রীষ্টীয়ান না হইলে পরিত্রাণ নাই, তুমি খ্রীষ্টীয়ান হইবে কি না?" এই তাহার অর্থ। কেশবচন্দ্র স্পষ্ট ভাষায় উত্তর দিলেন, "আমি আপনাদের মত অনুসারে খ্রীষ্টীয়ান হইব না। কিন্তু যিশুর বিনয়, ভক্তি, আত্মত্যাগ এবং প্রেম আমার প্রার্থনীয়।" তথা হইতে ম্যানচেষ্টারে গমন করেন। তথায় দুইটী বড় বড় সভা হয়।

যেরূপ উৎসাহের সহিত তিনি কার্য্য আরম্ভ করিয়াছিলেন, তাহা নিরাপদে অধিক দিন চলিবার নহে। প্রতিদিনই সভা আর বক্তৃতা, কোন দিন বা দুই তিনটিও হইত। ইহা ব্যতীত নানা স্থানে পত্র লেখা, প্রাপ্তপত্রের উত্তর দেওয়া, ধর্ম্মালোচনা করা, বিশ্রামের আর সময় পাইতেন না। এইরূপ অবৈতনিক লোক পাইলে সে দেশের স্ত্রী পুরুষদের অতিশয় কৌতূহল বৃদ্ধি হয়। তাহারা যেমন খাটায়, তেমনি বকায়। একই বিষয়ে তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ বকিতে হইত। একে এই পরিশ্রম, তাহাতে আহার কেবল উদ্ভিদ্ মাত্র ভরসা। দুধ জলের মত, তরকারী কেবল সিদ্ধ করা, তাহাতে স্বাদ নাই ; সুতরাং অনেক সময় খাইয়া পেট ভরিত না। গভীর রাত্রি কালে জঠরাগ্নি জ্বলিয়া উঠিত। সঙ্গে স্বদেশের কিছু কিছু খাদ্য দ্রব্য ছিল, তদ্দারা অরুচি নিবারিত হইত। রজনীতে ক্ষুধা নিবারণের জন্য তাঁহার সঙ্গী প্রসন্ন বাবু বিস্‌কুট কাছে রাখিতেন। এরূপ

সামান্য আহারে শরীর কি রক্ষা পায়? বিলাতের জল বায়ুর গুণে এত দিন চলিল,* শেষ অতিরিক্ত পরিশ্রমে মাথা ঘুরিতে লাগিল। মস্তিষ্ক নিষ্পেষিত এবং ভারাক্রান্ত হইল। বিনা বেতনে এমন সুন্দর সারগর্ভ বক্তৃতা শুনিতে পাইলে কে আর ছাড়িয়া কথা কয়? বিদেশী বাঙ্গালীর মুখে বিশুদ্ধ ইংরাজি বক্তৃতা, ইহাও একটি প্রলোভন বটে। যদি টিকিট করিতেন, রাশি রাশি টাকা সংগ্রহ করিতে পারিতেন। এ প্রকার কাজে টাকা লওয়াতে সে দেশে নিন্দা নাই। অনন্তর ক্রমে লোক-দিগের আমোদ উৎসাহ বাড়িয়া গেল; সভার উপর সভা, ক্রমাগত পরিশ্রম করিতে করিতে মস্তক আর সহ্য করিতে পারিল না, কিন্তু মন ইচ্ছুক ছিল। লোকে বলিত, সেন মহাশয় অনেক বিষয় শিখিয়াছেন, কিন্তু একটী বিষয় শিখেন নাই। ইনি "না" বলিতে জানেন না। বস্তুতঃ তিনি কাহারো অনুরোধ পরিত্যাগ করিতে পারিতেন না। এই কারণে শরীর নিতান্ত অসুস্থ হইয়া পড়িল। রেভারেণ্ড হার্ডফোর্ড ব্রুকের গৃহে তৎকালে তিনি অতিথি। ব্রুকের পত্নী এই বিদেশী সাধুর পীড়া দর্শন করিয়া কাঁদিতেন এবং জননীর ন্যায় স্নেহের সহিত সেবা করিতেন। কোন্ দিন কোন্ সময় কোন্ নগরে সভা হইবে তাহা পূর্ব্বেই স্থির ছিল, সুতরাং তাহা বন্ধ করিতে পারিলেন না। ইংরাজ-সমাজ এ বিষয়ে বড় নির্দ্দয়; শয্যাগত না হইলে আর তাঁহাদের কাছে নিস্তার নাই। পীড়িত অবস্থাতেই আচার্য্য লিবারপুলে চলিয়া গেলেন। তথাকার সভায় বিশ

মিনিটের অধিক বলিতে পারেন নাই। পর দিবসেও একটী বক্তৃতা করেন।

পীড়ার উপর পরিশ্রম করাতে মস্তিষ্ক দুর্ব্বল হইল। অগত্যা দুই সপ্তাহের জন্য সমস্ত কার্য্য বন্ধ রাখিয়া লিবারপুলে ডবারণ সাহেবের আলয়ে তিনি স্থিতি করিতে লাগিলেন। তখনও মনে সঙ্কল্প আছে, আমেরিকায় যাইবেন। ডাক্তারের প্রতিবাদে এবং দুর্ব্বলতাজন্য সে আশা পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন। বিদেশে এইরূপ পীড়ার কথা সংবাদপত্রে পড়িয়া দেশ বিদেশস্থ আত্মীয় বন্ধুগণের মনে নিতান্ত উৎকণ্ঠা জন্মিল। বনিতা এবং বৃদ্ধা জননীর দুঃখের আর অবধি রহিল না। পরিবার, বন্ধুমণ্ডলী-মধ্যে হাহাকার ধ্বনি উঠিল। রাজা রামমোহনের পরিণাম স্মরণে সকলেরই প্রাণ কাঁদিতে লাগিল। তারযোগে বন্ধুবর স্পিয়ার্সকে ইহা অবগত করাতে তিনি উত্তর দিলেন, "কেশব সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য লাভ করিয়াছেন।" ইহা কি জীবনপ্রদ কুশল সংবাদ! যে কেশবের পীড়ার সংবাদে বন্ধুমণ্ডলী এক দিন শোকসিন্ধুতে ডুবিয়াছিলেন, হায়! সে কেশব জন্মের মত পৃথিবী পরিত্যাগ করিয়াছেন! কি ভয়ঙ্কর বিপদন্ধকারে তখন ব্রাহ্মমণ্ডলীকে ঘেরিয়াছিল! কি গভীর শোকবেদনায় তখন তাঁহাদিগকে অস্থির করিয়াছিল!

আরোগ্য-লাভের পর কেশবচন্দ্র পুনর্ব্বার লণ্ডন নগরে ফিরিয়া আসেন। এবং এ দেশের প্রজাদিগের অবস্থা ও স্ত্রী-শিক্ষা সম্বন্ধে কয়েকটী বক্তৃতা করেন। লণ্ডনে যত প্রধান

প্রধান সভা আছে, প্রায় সমস্তই তাঁহার মধুর বক্তৃতাধ্বনিতে হিল্লোলিত হইয়াছিল। কয়েক দিবস রাজধানীতে থাকিয়া, এডিন্‌বরা, গ্ল্যাস্‌গো, লিড্‌স্ প্রভৃতি নগরে গমন করেন। অক্স-ফোর্ড পরিদর্শন কালে পণ্ডিতবর মোক্ষমূলর এক দিন তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া নিজগৃহে লইয়া যান। তথায় প্রসিদ্ধ ধর্ম্মাত্মা ডাক্তার পিউজীর সহিত সাক্ষাৎ হয়। মন্ত্রী গ্ল্যাডেষ্টোন্ এবং ডিন্ ষ্ট্যান্‌লীর আলয়েও আহারাদি ও কথাবার্ত্তা হইয়াছিল। জন্ ষ্টুয়ার্ট মিলের সহিত সাক্ষাৎ প্রার্থনা করায়, তিনি নিজে দুই বার নিকটে আসিয়া কেশবের সহিত দেখা করিয়া যান। মহাবুদ্ধিশালী মিলের বিনম্র ভাব দর্শনে তিনি বড় মুগ্ধ হইয়া-ছিলেন। পরে নিউম্যান, মিস্ কব্, কাউয়েল প্রভৃতি অনেক বড় লোকের সহিত তাঁহার দেখা হইয়াছিল। পরিশেষে স্বয়ং মহারাণী ভারতেশ্বরী কেশবচন্দ্রকে সম্মান দান করেন। অস্‌বরন্ নামক প্রাসাদে তিনি উপস্থিত হইলে রাজকুমারী লুইসকে সমভিব্যাহারে লইয়া মহারাণী তাঁহাকে দেখা দিলেন। ভারতের উন্নতি সম্বন্ধে দুই চারিটী কথা কহিলেন। পরে তিনি আপনার ছবি এবং স্বামীর জীবনচরিত দুই খণ্ড পুস্তক উপহার দেন। ঐ পুস্তকদ্বয় তাঁহার হস্তাক্ষর দ্বারা শোভিত ছিল। এই সময় রাজপুত্র লিয়োপোল্ড কেশবচন্দ্রের হস্তাক্ষর চাহিয়া লন। রাজভক্ত কেশব মহারাণীর গৃহে নিরামিষ ভোজ্য খাইয়া, পুস্তক এবং ছবি লইয়া, আপন সহধর্ম্মিণীর ছবি মহারাণীকে দিয়া পরমানন্দ চিত্তে বিদায় গ্রহণ করেন।

অনন্তর ১২ই সেপ্টেম্বর হ্যানোবার স্কোয়ার রুমে পুনরায় তাঁহাকে বিদায় দিবার জন্য এক মহাসভা হয়। তৎকালে একাদশটী বিভিন্ন সম্প্রদায়ের খ্রীষ্টীয়ানগণ সেখানে উপস্থিত ছিলেন। বিদায়ী বক্তৃতা অতীব মনোহারিণী হইয়াছিল। সভার প্রারম্ভে রেভারেণ্ড স্পিয়ার্স বলিলেন, "কেশব বাবু ইংলণ্ড এবং স্কট্‌লণ্ডের মধ্যে প্রধানতম চতুর্দ্দশটী নগর পরিদর্শন করিয়াছেন। ব্যাপ্টিষ্ট কন্‌গ্রিগ্যাসনেল এবং ইউনিটেরিয়ান-দিগের ভজনালয়ে তিনি উপদেশ দিয়াছেন। ইহা ব্যতীত চল্লিশটী নগর হইতে নিমন্ত্রণ পত্র আইসে, তাহা রক্ষা করিতে পারেন নাই। চল্লিশ সহস্র শ্রোতার সম্মুখে সত্তরটী প্রকাশ্য সভায় নানা বিষয়ে বক্তৃতা করিয়াছেন। অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সভা এবং গৃহস্থভবনে উপস্থিত থাকিয়া কোথাও ধর্ম্মালোচনা, কোথাও দেশের অবস্থা বর্ণন, কোথাও বা ছোট ছোট বক্তৃতা করিয়াছেন।" স্ত্রীশিক্ষা, সাধারণশিক্ষা, মদ্যপাননিবারণ এবং ধর্ম্ম, এই কয় বিষয়ে তিনি যেখানে সেখানে মনের ভাব বলিতেন। তাঁহাকে দেখিয়া সে দেশের লোকেরা বুঝিয়াছিলেন যে, ভারত সামান্য স্থান নহে। তিনি রাজনীতিজ্ঞ এবং রাজপুরুষদিগের সঙ্গে ঐ সকল বিষয়ে অনেক আলাপ করিয়াছিলেন এবং দেশের দুর্গতির কথা মুখে বলিয়াছিলেন। তাঁহার আগমনে লণ্ডনে একটি ব্রাহ্মসমাজ, ব্রিষ্টলে ন্যাসনাল সভা স্থাপিত হয়, ধার্ম্মিক খ্রীষ্টীয়ানদিগের ভারতের প্রতি দৃষ্টি পড়ে, উভয় দেশের সুরাপান-নিবারিণী সভার সহিত বন্ধুতা জন্মে। এই সময় হইতে যে

ভারতের সহিত ভদ্র ইংরাজগণের একটু বিশেষ সম্বন্ধ হইয়াছে, তাহা স্বীকার করিতে হইবে। সকল শ্রেণীর লোকসমাজেই কেশবচন্দ্র সম্মানিত হইয়াছিলেন। বিশেষ বিশেষ স্ত্রী পুরুষগণ আদরপূর্ব্বক যে সমস্ত উপহার তাঁহাকে দেন, এবং যেরূপ সেবা শুশ্রূষা করেন, তাহা শুনিলে প্রাণ আহ্লাদিত হয়। সুসভ্য ইংলণ্ড এক জন হিন্দুকুলজাত বঙ্গীয় যুবকের জন্য দশ পনর হাজার টাকা ব্যয় করিয়া, তাঁহার মুখে অপূর্ব্ব ধর্ম্মকথা শুনিয়া মোহিত হইল, ইহা কি বাঙ্গালীর পক্ষে কম গৌরবের বিষয়! এক একটী বক্তৃতা উপদেশ শুনিয়া কত নরনারী তাঁহার হস্তস্পর্শ করিবার জন্য ব্যাকুল হইত। কেহ বা সজলনেত্রে আশীর্ব্বাদ করিত। কেহ পানীয় ও সুখাদ্য আনিয়া দিত। রাশি রাশি গ্রন্থ, বস্ত্র, অলঙ্কার, শিল্পদ্রব্য উপহার দিয়া, শেষ তাহারা তাঁহাকে দেশে পাঠাইয়া দেয়। বিদায়ী বক্তৃতায় তিনি স্পষ্টাক্ষরে সে দেশের সাম্প্রদায়িকতা, আধ্যাত্মিক ভাবের অভাব, স্ত্রীজাতির কৃত্রিম বেশ বিন্যাসের কথা বলিয়াছিলেন। কিন্তু তাহা শ্রবণে সন্তোষ ভিন্ন কেহ বিরক্তি প্রকাশ করেন নাই। উপসংহার কালে তত্রত্য বন্ধুগণের দয়া স্নেহ স্মরণ করত কৃতজ্ঞচিত্তে এই কয়টী কথা বলেন ;—"ভ্রাতৃগণ! আমার শেষ কথা বলিবার এখন সময় আসিল। ইংলণ্ড ছাড়িয়া এখন আমি চলিয়া যাইতেছি। কিন্তু আমার হৃদয় তোমাদের সঙ্গে চিরদিন থাকিবে। প্রিয় ইংলণ্ড! আমাকে বিদায় দাও। দোষ ত্রুটি সত্বেও আমি তোমাকে ভালবাসি। হে সেক্সপিয়ার মিল্টনের

দেশ! স্বাধীন দয়াশীলতার দেশ! বিদায় দাও। হে আমার ক্ষণস্থায়ী ভবন! তোমার মধ্যে থাকিয়া আমি ভ্রাতৃপ্রেমের মধুরতা ভোগ করিয়াছি। হে আমার পিতার পশ্চিম গৃহ! প্রিয়তম ভাই ভগ্নীগণ! বিদায় দাও।" হায়! কে জানিত যে, উপরি উক্ত কথাগুলি তাঁহার শেষ কথা হইবে। কিন্তু তাহাই হইল।

১৭ই সেপ্টেম্বর দিবসে কেশবচন্দ্র সাউথামটন্ নগরে জাহাজারোহণ করেন। কয়েকটি বিশেষ বন্ধু সেই স্থান পর্য্যন্ত সঙ্গে আসিয়াছিলেন। স্থানীয় কতিপয় ভদ্রলোকের অনুরোধে তথাকার ভজনালয়েও তাঁহাকে কিছু বলিতে হইয়াছিল। এই স্থান হইতে শেষবিদায় গ্রহণ করেন।

নূতন সদনুষ্ঠান

মহাভাগ কেশবচন্দ্র ১৮৭০ খৃষ্টাব্দের ১৫ই ফেব্রুয়ারিতে কলিকাতা পরিত্যাগ করিয়া ইংলণ্ডে যান এবং তথা হইতে ১৬ই অক্টোবর স্বদেশে ফিরিয়া আসেন। তদীয় আগমন সংবাদ প্রাপ্তে বোম্বাইবাসিগণ পূর্ব্ব হইতেই একটি সভার আয়োজন করিয়া রাখিয়াছিলেন। সেই সভায় তিনি ইংরাজজাতির সামাজিক এবং পারিবারিক অবস্থা বর্ণন করেন। তাহা শুনিয়া শ্রোতৃবর্গ অতিশয় আহ্লাদিত হইয়াছিলেন। অতঃপর ২০শে অক্টোবরে

তিনি হাওড়া ষ্টেসনে পৌঁছিলেন। তৎকালে সমাগত ব্রাহ্মবন্ধু এবং সাধারণ ভদ্রমণ্ডলীর জয়ধ্বনিতে ঐ স্থান কম্পিত হইয়াছিল। তাঁহাকে আনিবার জন্য স্বতন্ত্র ষ্টীমার নিযুক্ত রাখা হয়, তাহাতে গঙ্গা পার হইয়া সকলে কলুটোলার ভবনে উপনীত হইলেন। সে এক কি আনন্দের দিনই গিয়াছে! ষ্টেসনে ষ্টীমারে পথে গৃহে কত লোকই দেখিতে আসিয়াছিল! সকলেরই মুখে আনন্দের চিহ্ন। বাষ্পীয় শকট হইতে নাবিবার সময় যখন দলে দলে দেশীয় ভ্রাতৃগণ কেহ আলিঙ্গন, কেহ নমস্কার, কেহ হস্ত ধারণ করিতে লাগিলেন, তখন কেশবের মুখারবিন্দ বিকসিত, নয়নযুগল প্রেমে বিস্ফারিত হইল। আট মাস পরে সুস্থ সবল শরীরে, প্রসন্ন হৃদয়ে মাতৃভূমিতে পদার্পণ করিয়া তিনি হাসিলেন এবং আনন্দ দানে সকলকে হাসাইলেন। ভারতের প্রিয়পুত্রকে ভারতবাসীরা সমাদর করিয়া জাতীয় মর্য্যাদা বৃদ্ধি করিল। বাড়ী পৌঁছিয়া আত্মীয় পরিবারবর্গের সহিত কেশবচন্দ্র পুনর্ম্মিলিত হইলেন। লোকের জনতা কৌতূহল আর কিছুতেই নিবৃত্ত হয় না। তাঁহাকে পরিবেষ্টন করিয়া সকলে বিলাতের গল্প শুনিতে লাগিল। যে যে সামগ্রী উপহার পাইয়াছিলেন, তাহা প্রদর্শিত হইল। তদনন্তর কিছু দিনের জন্য কেবল বিলাতের গল্পই চলিতে লাগিল।

প্রথম রবিবারে মন্দিরের বেদীতে বসিয়া উচ্ছ্বসিত হৃদয়ে ঈশ্বরকৃপার মহিমা ব্যাখ্যা করিলেন। তিনি বলিতেন, আমি বিলাতে গিয়া জাতীয় স্বভাব ও দেশীয় ভাবকে আরো ভালবাসিতে

শিখিয়াছি। বিলাত দর্শনের পর তাঁহার এক গুণ ভক্তি উৎসাহ দশগুণ বৃদ্ধি হইয়া উঠে। একটী তাঁহার বিশেষ গুণ এই ছিল যে, তিনি যেমন নব নব ভাব উদ্ভাবন করিতেন, তেমনি অপরের যাহা কিছু ভাল, তাহা লইতে পারিতেন। এই কারণ বশতঃ কোন দিন তাঁহাকে ভাবহীন, অকর্ম্মণ্য দেখা যায় নাই। নিজের এবং পরের সম্পত্তিতে তাঁহার হৃদয়ভাণ্ডার পূর্ণ থাকিত। বিদেশীয় সদ্‌গুণ দেশীয় আকারে পরিণত করিয়া স্বজাতির হিতে তাহা ব্যবহার করিতেও পারিতেন। বিলাত হইতে আসিয়া সস্ত্রীক কিরূপে সুখে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে হয়, তাহা লইয়াই বঙ্গীয় যুবকগণ কেবল ব্যস্ত থাকেন, দেশাচার ও মাতৃভাষা ভুলিয়া যান। কিন্তু কেশব শুদ্ধাচারী আর্য্য-সন্তানের ন্যায় মাতৃভাষায় কথা কহিতেন, দেশীয়ভাবে আহার পান করিতেন। উদ্ভিদাহারে রুচি যেন আরো বৃদ্ধি হইয়াছিল। বৈদেশিক রীতি কিছুই অবলম্বন করেন নাই। সে দেশের উচ্চশ্রেণীর লোকদিগের সঙ্গে মিশিয়া যাহা শিখিয়াছিলেন, তাহা অনতিবিলম্বে ভারতক্ষেত্রে রোপণ করিলেন। দেশে ফিরিয়া আসিবার অল্প দিন পরেই বড় বড লোকদিগের সহিত মিশিতে লাগিলেন। হাইকোর্টের জজ দ্বারকানাথ মিত্র এবং ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার প্রভৃতি সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদিগের সহিত নিজে গিয়া আলাপ করিলেন, তাঁহাদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়াইলেন। অপর দিকে মহারাজা যতীন্দ্রমোহন, কৃষ্ণদাস পাল, দিগম্বর মিত্র, শোভাবাজারের রাজগণ সকলের সঙ্গেই মিশিতে লাগিলেন।

ইহার পূর্ব্বে ব্রাহ্মদিগের সহিত ইঁহাদের কতকটা অসম্মিলন ছিল। ক্রমে তাহা চলিয়া যায়, এবং কেশবচন্দ্র ক্রমশঃ সকল দলের মধ্যেই গণ্যমান্য ও প্রীতিভাজন হন। এই সময় ব্রাহ্মসমাজে যে সকল সৎকার্য্যের সূত্রপাত হয়, তদুপলক্ষে দেশের বড় লোকদিগের সঙ্গে কেশবের একটু বিশেষ আনুগত্য জন্মে। পূর্ব্বে যে সমস্ত কার্য্য সামান্যরূপে নির্ব্বাহিত হইত, এক্ষণে তাহার উন্নতি হইল। প্রচারকার্য্যালয় অপকৃষ্ট ভবন হইতে উৎকৃষ্ট অট্টালিকায় আসিল। তাহার মধ্যে বয়স্থা-স্ত্রীবিদ্যালয়ের কার্য্য সুন্দররূপে চলিতে লাগিল। ব্রহ্মমন্দিরের মস্তকে দিব্য চূড়া নির্ম্মিত হইল, অভ্যন্তরে প্রকাণ্ড অর্গ্যান যন্ত্র বাজিতে লাগিল। কেশবচন্দ্রের প্রত্যাগমনের অল্প দিন পরে অর্থাৎ ১৮৭০ খৃষ্টাব্দের ২রা নবেম্বর "ভারতসংস্কারক" সভা স্থাপিত হয়। সুলভসাহিত্য, দাতব্য, শ্রমজীবীদিগের শিক্ষা, স্ত্রীবিদ্যালয় এবং মদ্যপাননিবারণ এই পাঁচ বিভাগে ইহা বিভক্ত। "সুলভসমাচার" দ্বারা বঙ্গসমাজে সাহিত্য বিষয়ে যে এক অদ্ভুত পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, তাহা বোধ হয়, জানিবার কাহারো বাকী নাই। এক পয়সা মূল্যে সংবাদপত্র চলে, পূর্ব্বে কেহ জানিত না। ইতর ভদ্র নানা শ্রেণীর লোকের মধ্যে ইহা প্রচলিত হইল। অনেকে কাগজ পড়িতে শিখিল। প্রতি সপ্তাহে সহস্র সহস্র খণ্ড সুলভ দেশে বিদেশে বিস্তারিত হইয়া, বঙ্গবাসী-দিগকে জাগাইয়া তুলিল। সুলভ রাজপ্রাসাদে এবং মুদির পর্ণকুটীরে, কৃতবিদ্য সভ্যসভাজে এবং অন্তঃপুরে হিন্দুমহিলাগণের

হস্তে শোভা পাইতে লাগিল। ইহা দ্বারা সহজ ভাষার রচনা প্রচলিত হইয়াছে। কেবল তাহা নহে, নীতি বিষয়েও লোকের রুচি ফিরিয়াছে। সুলভের সুরুচিসম্পন্ন গল্প পড়িয়া অনেকেই প্রীত হইতেন। বিলাতে আশ্চর্য্য অদ্ভুত বিষয় যত আছে, কেশবচন্দ্র স্বয়ং তাহা ঐ পত্রিকায় লিখিতেন। এই সুলভ পল্লিগ্রামে নগরে সর্ব্বত্র কেশবচন্দ্রের পরিচয় করিয়া দিয়াছে। শ্রমজীবীদিগের জন্য যে বাঙ্গালা বিদ্যালয় হয়, তাহার সঙ্গে ভদ্রসন্তানদিগকে ছুতারের এবং ঘড়ি মেরামত ইত্যাদি কার্য্য শিক্ষা দেওয়া হইত। এই উপলক্ষে একটী প্রকাণ্ড সভা হয়। জষ্টিস্ ফিয়ার তাহাতে বক্তৃতা করেন। দাতব্যবিভাগ দুর্ভিক্ষ-পীড়িত এবং জ্বররোগাক্রান্ত দীন দুঃখীদিগের যথেষ্ট উপকার করিতে লাগিল। বয়স্থাস্ত্রীবিদ্যালয়ে প্রায় চল্লিশ জন ভদ্র মহিলা শিক্ষা পাইতেন। ইহার পারিতোষিক-বিতরণ উপলক্ষে হবহাউস, লর্ড নর্থব্রুক, লেডি নেপিয়ার এবং টেম্পল্ প্রভৃতি বড় বড় সাহেব বিবিরা আসিতেন। এখানে ইংরাজি এবং বাঙ্গালা উভয়ই পঠিত হইত। কয়েকটি ছাত্রী উচ্চ শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া বঙ্গমহিলাকুলকে উজ্জ্বল করিয়াছেন। সুরাপান-নিবারণ বিভাগ হইতে "মদ, না গরল ?" নামক পত্রিকা বিনামূল্যে বিতরিত হইত। পাঁচটি বিভাগের কার্য্যই প্রথমে বেশ উৎসাহের সহিত চলিয়াছিল। ভারতসংস্কারক সভা দ্বারা ভারত বাস্তবিকই জাগিয়া উঠিল। ইহার দৃষ্টান্তে নানা স্থানে সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান আরম্ভ হইয়াছিল। দেশীয় কন্যাদিগের

কত বয়সে বিবাহ হওয়া উচিত, তৎসম্বন্ধে এই সভা হইতে একবার প্রসিদ্ধ ডাক্তারদিগের মত সংগ্রহ করা হইয়াছিল। সুরাপাননিবারণ বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের সহিত পত্রাদি লেখালেখি চলিত। সুলভসমাচার পত্রিকার আয় ব্যয়ের হিসাব দেখিয়া অনেকে এক পয়সা মূল্যের কাগজ বাহির করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে কতক উঠিয়া গিয়াছে, কতক চলিতেছে। ফলতঃ অল্প মূল্যের সংবাদপত্র প্রকাশের রীতি এই সময় হইতে এ দেশে প্রচলিত হইয়াছে। অনন্তর ১৮৭১ খৃষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারি হইতে "ইণ্ডিয়ানমিরার" দৈনিক হয়। ইহাও এক নববিধ সদনুষ্ঠান। ভারতে এ প্রকার দৈনিক ইংরাজি কাগজ এ পর্য্যন্ত আর কেহ চালাইতে পারেন নাই। সেই মিরার এক সময়ে দেশের গৌরবস্থল হইয়া দাঁড়াইয়াছিল।

মহাতেজা কেশবচন্দ্র বিলাত হইতে আসিয়া কেবল সামাজিক সৎ কার্য্যের উন্নতি সাধন করিলেন তাহা নহে, ব্রাহ্মপরিবারের সর্ব্বাঙ্গীন কুশলসম্পাদনেও উৎসাহী হইলেন। প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের সহিত সম্মিলনস্থাপন বিষয়ে এই সময় আর একবার চেষ্টা করেন। সন্ধিপত্র রচনা পর্য্যন্ত হইয়াছিল, কিন্তু তাহাতে কোন ফল দর্শে নাই। সে সময় দেবেন্দ্র বাবু কলুটোলার ভবনে এবং ব্রহ্মমন্দিরে আসিয়া কয়েক দিন উপাসনায় যোগ দিয়াছিলেন, শেষোক্ত স্থানে এক দিন আচার্য্যের কার্য্যও করিয়াছিলেন। কেশবের ধর্ম্ম মিলন এবং সামঞ্জস্যের ধর্ম্ম; তাহা তিনি নানা সময়ে, বিবিধ প্রকারে দেখাইয়া গিয়াছেন।

পরস্পরের বিশেষ বৈচিত্র্য ও ভাব স্বভাবের প্রতি শ্রদ্ধা রাখিয়া, সাধারণ বিষয়ে একতা স্থাপন করিতে তিনি কখন ত্রুটি করেন নাই।

ভারতাশ্রম

পৃথিবীতে প্রেমপরিবার স্থাপন করিবার জন্য কেশবচন্দ্রের আগমন। ধর্ম্মমত চিরদিনই জগতে প্রচারিত আছে। সম্প্রদায়-বিশেষে ইহার কোন না কোন অঙ্গের বিকাশ দৃষ্টিগোচর হয়। কিন্তু বিশুদ্ধ ধর্ম্মমতসকল মানব-পরিবারে প্রতিষ্ঠিত না হইলে, কেহ তাহা বুঝিতে পারে না। কেশবচন্দ্র ইহার জন্য জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। যোগিবর যিশু এই প্রেমপরিবারকে স্বর্গরাজ্য বলিতেন। বর্ত্তমান বিধানে বিশ্বাসিগণ সপরিবারে ধর্ম্মসাধন করত পৃথিবীতে এক একটী আদর্শ পরিবার হইবে, তাহাদিগের ভাবী বংশধরেরা গৃহাশ্রমে স্বর্গভোগ করিবে, এই উদ্দেশ্যে তিনি "ভারতাশ্রম" স্থাপন করেন। যত কিছু কার্য্য তিনি করিতেন, তাহার মধ্যবিন্দু এই পরিবার। ইহাতে সিদ্ধকাম হইবার জন্য নিজেও সপরিবারে সাধন করিয়াছেন। ১৭৯৩ শকের মাঘোৎসবের অব্যবহিত পরেই এই মহৎ ব্যাপারে তিনি আত্মোৎসর্গ করিলেন। প্রার্থনা, উপদেশ, বক্তৃতা এবং সংবাদপত্রে ক্রমাগত এই বিষয়ের আন্দোলন চলিতে লাগিল।

যখন যে কোন অভিনব কীর্ত্তি স্থাপন করা তিনি কর্ত্তব্য বোধ করিতেন, তখন সে কার্য্যে সমস্ত জীবন যেন একবারে ঢালিয়া দিতেন।

"ভারতাশ্রম" একটি সুবৃহৎ সাধু অনুষ্ঠান। ইহার জন্য প্রচুর অর্থ, ধর্ম্মপিপাসু ভদ্রপরিবার, প্রশস্ত ভবন, উপযুক্ত কর্ম্মচারীর প্রয়োজন। ঈশ্বরপ্রসাদে সমস্তই সংগৃহীত হইল। বেলঘরিয়ার উদ্যানে ইহার কার্য্য প্রথম আরম্ভ হয়। একান্নভুক্ত পরিবারের ন্যায় পান ভোজনের ব্যবস্থা চলিতে লাগিল। যথানির্দ্দিষ্ট সময়ে একত্রে সকলে উপাসনা করিতেন। নিয়ম অনুসারে সমুদায় কার্য্য নির্ব্বাহিত হইত। ইহার সঙ্গে স্ত্রী-বিদ্যালয় ছিল, তাহাতে আশ্রমবাসিনী নারীগণ বিদ্যানুশীলন করিতেন। স্ত্রীপুরুষের পরস্পর ব্যবহার, জ্ঞান-ধর্ম্ম-শিক্ষা, পারিবারিক কর্ত্তব্য কর্ম্ম যাবতীয় বিষয়ের আলোচনা এখানে হইত। কেশবচন্দ্র স্বয়ং মহিলাদিগকে ধর্ম্মপুস্তক পড়াইতেন এবং তাঁহাদিগের সহিত সৎপ্রসঙ্গ করিতেন। ভারতের নারী-সমাজকে জাতীয় সদ্‌গুণে সজ্জিত করিয়া স্বাধীন উন্নতির পথে চালিত করিবেন, এই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল। তদনুসারে সমস্ত শিক্ষা ব্যবস্থিত হইত। এ জন্য তিনি পৈতৃক ভবন পরিত্যাগ করিয়া সপরিবারে কিছু দিন আশ্রমে ছিলেন। অল্প কালের মধ্যে ভারতাশ্রম নরনারী ও বালক বালিকাতে পরিপূর্ণ হইল। বিদেশস্থ ব্রাহ্মগণ এখানে পরিবার রাখিয়া, নিশ্চিন্তমনে বিষয়-কর্ম্ম করিতে লাগিলেন। আচার্য্য ব্রহ্মানন্দ এই আশ্রমে একটি

ব্রাহ্মিকাবিদ্যালয় স্থাপন করিয়া, তাহাতে কিছু দিন বিধিপূর্ব্বক ব্রহ্মতত্ত্ব শিক্ষা দেন। সেখানে স্ত্রীপ্রকৃতির উপযোগী সরল ভাষায় পরমার্থ বিষয়ে যে কয়টি উপদেশ দিয়াছিলেন, তদ্দ্বারা ধর্ম্মপিপাসু মহিলাকুলের বিশেষ উপকার হইবে, সন্দেহ নাই। নারীস্বভাবের দুর্ব্বোধ্য তত্ত্ব তিনি বিলক্ষণ অবগত ছিলেন। অধিকারী ভেদে ধর্ম্মশিক্ষা-দানের ব্যবস্থা করিতেন। ভারতাশ্রমের জন্য তাঁহাকে অনেক নিন্দা গ্লানিও সহ্য করিতে হইয়াছে। পরিশ্রম, অর্থব্যয়, তাহার উপর লোকগঞ্জনা। জগৎহিতৈষী মহাত্মাগণের ভাগ্যে পূর্ব্ব পূর্ব্ব সময়ে যে সকল দুর্দ্দশা ঘটিয়াছিল, কেশব তাহা প্রচুর পরিমাণে ভোগ করিয়া গিয়াছেন। কুটিলবুদ্ধি লোকেরা তাঁহার পবিত্র চরিত্রে কলঙ্কারোপ করিতেও ছাড়ে নাই। কিন্তু মানবস্বভাবের গূঢ় স্থান হইতে তাঁহার চরিত্রের প্রশংসাধ্বনি উঠিয়াছে। স্ত্রী-জাতির সঙ্গে ব্যবহার বিষয়ে তাঁহাকে নির্দ্দোষ বলিয়া মনে মনে সকলেই জানিত।

বিচিত্র-প্রকৃতির বহুসংখ্যক নরনারী লইয়া চারি পাঁচ বৎসর কাল মহা সমারোহের সহিত তিনি আশ্রমের কার্য্য নির্ব্বাহ করেন। একান্নভুক্ত পরিবারে ভাল মন্দ উভয়বিধ ফলই ভোগ করিতে হয়। আশ্রমে ধর্ম্মশিক্ষা, আনন্দ উৎসব এবং ভ্রাতৃভাবের বিকাশ যেমন হইল, তেমনি বিবাদ কলহ ভ্রাতৃবিচ্ছেদের বিষময় ফলও ফলিল। বহুসংখ্যক বাঙ্গালী স্ত্রী পুরুষ এক জায়গায় কি অধিক কাল নির্ব্বিবাদে থাকিতে পারে? টাকা কড়ির দেনা পাওনা লইয়া একটি পরিবারের সঙ্গে

আশ্রমাধ্যক্ষের তর্ক বিতর্ক এবং বচসা হয় ; শেষ উভয়ের মধ্যে এমন বিচ্ছেদ ঘটিল যে, তাহার জন্য দেশে দেশে কেশবচন্দ্রের দলের কলঙ্ক রটিয়া গেল। কাজেই আশ্রম ভাঙ্গিতে আরম্ভ হইল। এই সঙ্গে কলিকাতাস্কুল লইয়া ঘোরতর সংগ্রাম উপস্থিত হয়। নানা কারণে শেষে প্রেমপরিবারে অপ্রেম অশান্তির চূড়ান্ত হইয়া গেল। অতঃপর কতকগুলি গৃহভেদী ব্রাহ্ম অপর লোকের সহিত মিশিয়া, আশ্রমের বিপক্ষে সংবাদ পত্রে গ্লানি প্রচার করিতে লাগিলেন। তাহা লইয়া বিষম আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছিল। এমন কি, বিচারালয় পর্য্যন্ত তাহার অভিযোগ উঠে। কিন্তু এই ঘটনায় লোকে কেশবচন্দ্রের অসাধারণ ক্ষমতার পরিচয় পাইয়াছে। দেশশুদ্ধ লোক বিরোধী, এক পরিবারের এবং এক ঘরের লোক ব্রাহ্মবন্ধুরাও বিপক্ষ। রাজদ্বারে কেশবচন্দ্র অপদস্থ হইবেন, তাঁহার ভারতাশ্রমের মুখে কালী পড়িবে, এই ভাবিয়া সকলে যেন নাচিতে লাগিল। একেবারে সর্ব্বনাশ উপস্থিত। মোকদ্দমার সমস্ত আয়োজন হইল, উকিল বারিষ্টার বিচারপতির সম্মুখে দাঁড়াইল, চারিদিক্ দর্শকগণে পরিপূর্ণ, ভয়ানক তুমুল কাণ্ড হইবে বলিয়া সকলে প্রতীক্ষা করিতেছে ; এমন সময় কেশবচন্দ্রের বারিষ্টার বলিল, "প্রতিবাদী এখনো যদি ক্ষমা প্রার্থনা করে, আমার মক্কেল মোকদ্দমা তুলিয়া লইতে প্রস্তুত আছেন।" সহসা এই বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রতিবাদী বিস্মিত হইল এবং ক্ষমা প্রার্থনা করিল ; সুতরাং সমস্ত বিবাদের নিষ্পত্তি হইয়া গেল। ইহার কিছু

দিন পরে উক্ত প্রতিবাদী কোন বিশেষ কারণে কেশবানুচরগণের শরণাগত হয়। আশ্রমঘটিত এই আন্দোলনের সময় হইতে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে গৃহ-বিবাদের অগ্নি জ্বলিয়া উঠে। যে প্রভেদ-সূত্রে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ জন্মগ্রহণ করিয়াছে, তাহার পূর্ব্বাভাস এই স্থলে দেখা গিয়াছিল। আশ্রমবাসী কয়েক জন ব্রাহ্ম স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করিয়া, আরো কতিপয় ব্রাহ্মের যোগে, কেশবচন্দ্রের একাধিপত্যের উপর হস্তক্ষেপ করেন, এবং তাঁহাকে সাধারণ দশ জনের মধ্যে এক জন বলিয়া গণ্য করিতে চেষ্টা পান। এ নিমিত্ত ব্রহ্মমন্দিরে উপাসক-মণ্ডলীতে এবং ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের প্রত্যেক সভায় অনেক বিবাদ, তর্ক ও বাদানুবাদ হইত। কিন্তু কেশবচন্দ্রের পদমর্য্যাদা কিছুতেই কেহ খর্ব্ব করিতে পারেন নাই।

বিরোধী গৃহভেদী ব্রাহ্মযুবকদল কেশবচন্দ্র এবং তদীয় সহ-যোগী প্রচারকদিগের উপর শেষ এত দূর পর্য্যন্ত বিরক্ত হইয়া উঠেন যে, তাঁহারা প্রকাশ্যে বক্তৃতা করিতে লাগিলেন। মন্দিরের আচার্য্যকে বেদিচ্যুত করিবেন, প্রচারকদিগকে বিশেষ প্রভুত্ব ও মান মর্য্যাদা দিবেন না, এবং তাঁহাদিগকে শাসনে রাখিতে হইবে, প্রতিনিধি এবং সাধারণতন্ত্র প্রণালীতে সমস্ত কার্য্য চলিবে, আদেশবাদের প্রাধান্য থাকিবে না, হাত তুলিয়া যাবতীয় মতামত ও কর্ত্তব্য কর্ম্ম স্থিরীকৃত হইবে, এই অভিপ্রায়ে তাঁহারা যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাহাতে আচার্য্যের মনঃপীড়া বড় কম হয় নাই। সামান্য গৃহকার্য্যে, আহার ব্যবহারে তিনি ঈশ্বরাদেশ

মানেন, এই বলিয়া সে সময় অনেকে উপহাস ও বিদ্রূপ করিতেন। সাধারণ সমাজের ছায়া তৎকালে দৃষ্টিগোচর হইয়াছিল। আচার্য্য কেশবের সঙ্কল্প ছিল, তিনি মানবীয় বুদ্ধি, কৌশল, ক্ষমতা ও প্রভুত্বের অতীত স্থানে, দৈবাদেশের পবিত্র ভূমিতে, ধর্ম্মসমাজ এবং ধর্ম্মপরিবার স্থাপন করিবেন; সুতরাং এখানে মানবীয় এবং দৈবধর্ম্মের মধ্যে ঘাত প্রতিঘাত উপস্থিত হয়।

যে উদ্দেশ্যে ভারতাশ্রম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল এবং যে প্রণালীতে ইহার কার্য্য নির্ব্বাহ হইত, তাহা ভাবিলেও এখন মনে কত আনন্দ হয়। ইহাতে কেশবচন্দ্রের অনেক অর্থ ব্যয় হইয়া গিয়াছে। স্ত্রীজাতির উন্নতির জন্য যেমন আশ্রম, যুবক-দিগের জন্য তেমনি একটি "ব্রাহ্মনিকেতন" স্থাপিত হয়। অনেকগুলি উচ্চ শ্রেণীর ছাত্র ইহাতে বাস করিতেন। আশ্রমের বিধি অনুসারে এখানকার কার্য্য চলিত। প্রচারকদল-গঠন এবং ভারতাশ্রম-স্থাপন এই দুইটি বিষয় কেশবচরিত্রের বিপুল মাহাত্ম্য প্রতিপাদন করিতেছে।

এই সময় ব্রহ্মমন্দিরে স্ত্রীস্বাধীনতা লইয়াও আন্দোলন উঠে। প্রকাশ্য স্থানে স্ত্রী পুরুষকে এক সঙ্গে বসাইবার জন্য কয়েকটি ব্রাহ্ম প্রতিজ্ঞারূঢ় হন। ইহা লইয়া কতকটা দলাদলির ভাব দাঁড়াইয়াছিল। কিন্তু কেশবের উদার এবং সাত্ত্বিক ব্যবহারে তখন তাহার এক প্রকার মীমাংসা হইয়া যায়। তিনি বৈদেশিক সভ্যতার বিরোধী হইয়াও সম্ভবতঃ তদ্বিষয়ে সহিষ্ণুতা প্রদর্শন

করিতেন। সভ্যতাপ্রিয় যুবক যুবতীদিগকে নিজদলে রাখিবার জন্য তিনি যত্নের কখন ত্রুটি করেন নাই।

আশ্রম-স্থাপনের অল্প দিবস পরে বিবাহ-বিধি প্রচারিত হয়। ইহা লইয়া আদিসমাজের সঙ্গে মহা বিবাদ ঘটিয়াছিল। তাঁহারা কিছুতেই ইহা হইতে দিবেন না, কেশবচন্দ্রও ছাড়িবেন না। প্রকাশ্য সভায় বক্তৃতা, সংবাদপত্রে বাদানুবাদ, পণ্ডিতদিগের ব্যবস্থা-সংগ্রহ ইত্যাদি নানা প্রকারে ইহার বিপক্ষে চেষ্টা হইল, কিন্তু কোন বাধাই দাঁড়াইল না; পরিশেষে কেশব-চন্দ্রই জয় লাভ করিলেন। প্রায় চারি বৎসর ক্রমাগত এ বিষয়ের আন্দোলন চলিয়াছিল। ব্রাহ্মসাধারণকে লইয়া সে সময় কেশবচন্দ্র যদি এ সম্বন্ধে বহু আয়াস স্বীকার না করিতেন, তাহা হইলে আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্মদিগকে পৈতৃক সম্পত্তির অধিকার বিষয়ে ঘোর অনিশ্চয়তার মধ্যে থাকিতে হইত। ব্রাহ্মদল ব্যতীত ধর্ম্মহীন নব্যদলের লোকেরাও এক্ষণে ইহার উপকারিতা লাভ করিতেছে।

সাধন এবং শিক্ষাদান।

যে আদেশের মত লইয়া পরে নানা কথা উঠিয়াছিল, তাহার সূচনা এই সময় হয়। তৎকালকার উপদেশ, বক্তৃতা এবং সঙ্গীতে আদেশ-মতের ভূরি ব্যাখ্যান সন্নিবিষ্ট আছে। ইতঃপূর্ব্বে

সাধারণ লোকদিগের ধর্ম্মশিক্ষার জন্য কোন উপায় ছিল না, এক্ষণে কেশবচন্দ্র তাহাঁর ব্যবস্থা করিলেন। অনাবৃত স্থানে গোলদিঘীর ধারে তিনি প্রথম বক্তৃতা করেন। তদনন্তর হাটে মাঠে ঘাটে এইরূপ মহাসভা আহূত হইত। সাতু বাবুর মাঠে, বিডন পার্কে চারি পাঁচ সহস্র লোক একত্রিত হইয়া তাঁহার বাঙ্গালা উপদেশ শ্রবণ করিয়াছে।

১৭৯৪ শক হইতে ১৭৯৬ শক পর্য্যন্ত প্রায় তিন বৎসর কাল ভক্ত কেশবচন্দ্র পূর্ব্বোল্লিখিত সৎকার্য্যগুলির উন্নতির জন্য বিশেষরূপে আবদ্ধ ছিলেন। তদনন্তর প্রকৃত আর্য্য ঋষির ন্যায় সশিষ্য তিনি যোগ তপস্যা আরম্ভ করিলেন। একাধারে ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মাঙ্গ এবং সর্ব্বাবয়বসম্পন্ন সমগ্র ধর্ম্ম-সাধন, এই উভয়ের দৃষ্টান্ত তাঁহার জীবন। উচ্চ অট্টালিকায় বাস করিয়া, স্ত্রী পুত্র পরিবারবর্গের সঙ্গে থাকিয়া, কিরূপে বৈরাগী হওয়া যায়, তাহা প্রমাণ করিবার জন্য, নিজ কলুটোলার ভবনে ছাদের উপর তিনি এক কুটীর বাঁধিলেন। ১৭৯৪ শকের শেষার্দ্ধ ভাগে এই কার্য্যে ব্রতী হন। মধ্যাহ্নে এবং সন্ধ্যায় কুটীরে বাস করিতেন, স্বহস্তে রাঁধিতেন এবং যোগ ভক্তি সাধন করত সাধকদিগকে তাহা শিক্ষা দিতেন। ইহার কিছু দিন পূর্ব্বে বেলঘরিয়ার তপোবনে মধ্যে মধ্যে এইরূপ প্রণালীতে সাধন ভজন চলিত। অতিরিক্ত মানসিক পরিশ্রমে তাঁহার মস্তক চিরদিন পীড়াগ্রস্ত ছিল। সময়ে সময়ে তজ্জন্য শয্যাশায়ী থাকিতে হইত, তথাপি স্বহস্তে রন্ধনব্রত পালনে তিনি পরাঙ্মুখ হইতেন না। অগ্নির উত্তাপে চক্ষু এবং মুখমণ্ডল

রক্তিমবর্ণ, শরীর ঘর্ম্মাক্ত, ধূমরাশিতে প্রাণ অস্থির হইয়া উঠিয়াছে, তদবস্থায় মাথায় গামছা বাঁধিয়া দৃঢ়ব্রতধারী কেশবচন্দ্র রন্ধন করিতেন। কুটীরে বসিয়া তিনি রাঁধিতেন, আর বন্ধুগণ তাঁহাকে প্রাচীন যোগ এবং ভক্তিশাস্ত্রের ব্যাখ্যা শুনাইতেন। মধ্যাহ্ন উপাসনার পর প্রতিদিন এইরূপ হইত। সন্ধ্যাকালে সবান্ধবে তথায় হরিসঙ্কীর্ত্তন করিতেন এবং যোগশিক্ষার্থী অঘোরনাথ এবং ভক্তিশিক্ষার্থী বিজয়কৃষ্ণকে উপদেশ দিতেন। সে সকল উপদেশ ভবিষ্যতে গীতা ভাগবতের ন্যায় এক দিন সমাদৃত হইবে। "ব্রহ্মগীতোপনিষদ্" নামক গ্রন্থে ঐ সকল উপদেশ মুদ্রিত আছে।

সাধন ভজন, যোগ তপস্যা, এ সকল শব্দও ব্রাহ্মসমাজে পূর্ব্বে প্রচলিত ছিল না। যৎকালে আচার্য্য কেশব যোগ, বৈরাগ্য এবং ভক্তির সাধন আরম্ভ করিলেন, তখন ব্রাহ্মসাধারণ ভীত হইয়া বলিতে লাগিল, এ কি আশ্চর্য্য ব্যবস্থা! ব্রাহ্মধর্ম্ম কি উদাসীনের ধর্ম্ম? ইংলণ্ডের বন্ধুগণও ইহা শ্রবণে নানা আশঙ্কা করিতে লাগিলেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর সভ্য জীব হইয়া বৈরাগ্য-ব্রত পালন করিবে, এ কথা কেহ সহ্য করিতে পারিল না! বিশুদ্ধ যুক্তির অনুমোদিত ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া কেশবচন্দ্র প্রাচীন আর্য্যঋষির ন্যায় কুটীরবাসী হইবেন এবং স্বপাক ভোজন করিবেন, ইহা স্বপ্নের অগোচর। কিন্তু সংসারী গৃহস্থ হইয়াও তাহা তিনি করিলেন। কাহারো প্রতিবাদ শুনিলেন না। মস্তিষ্ক পীড়িত, শরীর রন্ধনকার্য্যে অপটু, তথাপি ব্রতাচরণে শিথিলযত্ন

হইলেন না। ইংলণ্ডে ভ্রমণ করিয়া, উচ্চশ্রেণীর ইংরাজসমাজের সহিত সামাজিক যোগ রাখিয়াও, হিন্দুর ন্যায় অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। স্বপাক-ভোজনের কথা শুনিয়া কোন কোন সম্ভ্রান্ত হিন্দুর মনে তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধার সঞ্চার হইয়াছিল। রাজা কমল-কৃষ্ণ বাহাদুর একবার তাঁহাকে কতকগুলি উৎকৃষ্ট অড়হরের ডাল পাঠাইয়া দেন। কেশবচন্দ্র কোন কালে রাঁধিয়া খান নাই; কিন্তু যখন রাঁধিতে আরম্ভ করিলেন, তখন তাহাতে বিলক্ষণ কৃতকার্য্য হইলেন। ত্যাগী সন্ন্যাসীর ন্যায় তাঁহার রান্না ছিল না, প্রতি দিন চারি পাঁচটি ব্যঞ্জন প্রস্তুত করিতেন। বিদেশ হইতে বন্ধু বান্ধব আসিলে তাঁহাদিগকে উহার কিছু কিছু অংশ দিতেন। রন্ধনের প্রণালী, শৃঙ্খলা, রন্ধনপাত্র দেখিলে দর্শকগণেরও রাঁধিবার ইচ্ছা হইত। অনেকে এই দৃষ্টান্ত অনুসরণও করিয়াছিলেন। চারি বৎসর কাল এই ভাবে আহারের বিধি চলিয়াছিল। প্রথমে দুই বেলা স্বপাক ভোজন করিতেন, শেষে এক বেলার অধিক পারিতেন না। মধ্যাহ্নে দুই প্রহর পর্য্যন্ত উপাসনা করিয়া কখন কুটিরে, কখন বৃক্ষতলে এইরূপে আহার করিতেন। সিমলা, লাহোর, জয়পুর, গাজিপুর প্রভৃতি স্থানে প্রচার করিতে গিয়াও এই নিয়মে চলিতেন। পরে ১৭৯৫ শকে যখন অত্যন্ত পীড়িত হইয়া পড়েন, তখন অগত্যা বাধ্য হইয়া রন্ধনকার্য্য ছাড়িয়া দিতে হইল। ব্রতসাধন বিষয়ে তাঁহার ভয়ানক দৃঢ়তা ছিল। আচার্য্যের দৃষ্টান্ত এবং শিক্ষানুসারে প্রচারক ও সাধক অনেকেই, কেহ প্রতিদিন, কেহ বা সময়ে

সময়ে স্বপাক-ভোজন আরম্ভ করেন। এই সময় আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য সাধন ভজনের যেরূপ শ্রীবৃদ্ধি দৃষ্টিগোচর হইয়াছে, ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে তেমন আর কখনও দেখা যায় নাই। সেরূপ গভীর আনন্দ শান্তি সম্ভোগের দিন আর সাধকদলে ফিরিয়া আসিবে না। যথার্থ সুখের সময় সেইটিকে বলা যাইতে পারে। এইরূপে সাধন আরম্ভ করিয়া পরে কেশবচন্দ্র সাধকদিগকে যোগ ভক্তি কর্ম্ম জ্ঞান এই চতুর্ব্বিধ ধর্ম্ম শিক্ষা দেন। তাঁহার জীবনে ধর্ম্মের সকল বিভাগের অতি সুন্দর সামঞ্জস্য বিদ্যমান ছিল। ধর্ম্মাঙ্গ-চতুষ্টয়ের ব্যষ্টি এবং সমষ্টিগত বিশেষ ও সাধারণ লক্ষণ যেরূপে তিনি ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন, তাহা অধ্যয়ন করিলে তত্ত্বজ্ঞান জন্মে। হিন্দুশাস্ত্র না পড়িয়াও কেবল যোগবলে এবং দৈবপ্রতিভায় এ সকল অভিনব তত্ত্বের আবিষ্কার তিনি করিয়া গিয়াছেন। কেশবচন্দ্র স্বভাবের সন্তান ছিলেন; প্রথম যৌবনে স্বাভাবিক নিয়মে বৈরাগ্য-ধর্ম্ম সাধন করেন, পরে বয়োবৃদ্ধি সহকারে স্বভাব কর্ত্তৃক নীত হইয়া জ্ঞান নীতি ভক্তি যোগ মহাযোগের উচ্চ শিখরে উত্থিত হন। স্বভাবের ইঙ্গিত এত মান্য করিতেন যে, পানাহার ইত্যাদি শারীরিক ক্রিয়াকে পর্য্যন্ত আদেশ বলিতেন। বিভিন্ন শাখাধর্ম্ম পৃথকরূপে শিখাইবার জন্য ব্যক্তিবিশেষকে নিযুক্ত করিতে দেখিয়া বিরোধী পক্ষ বলিত, ইহাতে ধর্ম্ম আংশিক হইয়া যাইবে। কিন্তু নববিধানেব ধর্ম্মসমন্বয় এই খানে বিশেষরূপে আরম্ভ হইয়াছিল। তাঁহার ভিতরে বিয়োগ এবং সংযোগের যে মিলন ছিল, এক্ষণে তাহা সকলে

বুঝিতেছে। নববিধানের সংযোগ-ধর্ম্ম প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বে বিয়োগ-ধর্ম্ম তিনি শিক্ষা দেন। পরে যখন ধর্ম্মসমন্বয় প্রতিষ্ঠিত হইল, তখন পৃথিবীর চির অমীমাংসিত মতভেদ ঘুচিয়া গেল। যোগ ভক্তি জ্ঞান কর্ম্ম এই অঙ্গ-চতুষ্টয়ের কোন্‌টি কাহার দ্বারা সাধিত হইবে, তাহা বুঝিয়া যথাযোগ্য ব্যক্তিকে তাহা তিনি বিভাগ করিয়া দিয়াছিলেন। এই চারিটি বিভাগের সমন্বয়ে যে এক আশ্চর্য্য রাসায়নিক যোগক্রিয়া সম্পাদিত হইয়াছে, তাহার দৃষ্টান্ত তাঁহার নিজের জীবন। নববিধানের নূতনত্ব এই খানে। প্রথম দিনে শিক্ষার্থীদিগকে বলিলেন, "ভবিষ্যতে কোথায় দিয়া কিরূপে যাইতে হইবে, তাহা তোমরাও জান না, আমিও জানি না। আমি তোমাদিগকে শিক্ষা দিয়া তাহা হইতে আবার শিক্ষা পাইব। শিক্ষা পাইয়া আবার শিক্ষা দিব। ধর্ম্ম-রাজ্যে পরস্পরে জ্ঞানের বিনিময় করিব।" ধর্ম্মপ্রচার সম্বন্ধে তিনি কোন কালে আপনার ক্ষমতা শক্তির উপর নির্ভর করিতেন না। বেদীতে বসিয়া কি উপদেশ দিবেন, অনেক সময় তাহা নিজেই জানিতেন না; কিন্তু শেষে আপনার কথায় আপনি মোহিত হইয়া যাইতেন। দৈবপ্রেরণা তাঁহার সমস্ত কার্য্যের মূল অবলম্বন ছিল।

যে সময় এইরূপ যোগশিক্ষা দিতেন, সেই সময় আলবার্ট হলের জন্য অর্থসংগ্রহ করিতেন। ১৭৯৮ শকের ৫ই বৈশাখ উহা প্রতিষ্ঠিত হয়। এক দিকে কুটীরে যোগ ধ্যান ভজন কীর্ত্তন, অপরদিকে রাজপুরুষ, রাজা মহারাজগণের নিকট

অর্থ-ভিক্ষা; উভয় কার্য্য এক সঙ্গে চলিতে লাগিল। অতি অল্প কালমধ্যে প্রায় ত্রিশ হাজার টাকা এই কার্য্যের জন্য তিনি সংগ্রহ করেন। সমস্ত জাতীয় লোকদিগের মধ্যে ভ্রাতৃভাব বর্দ্ধনের জন্য ইহা নির্ম্মিত হয়। এই গৃহে সংবাদপত্র, পুস্তকাদি সঞ্চিত থাকে। সাধারণহিতকর বিষয়ে সভা ও বক্তৃতাদি হয়। এখানে মহাত্মা রাজা রামমোহনের প্রতিমূর্ত্তি লম্বিত আছে। ইহাও কেশবচন্দ্রের এক অক্ষয় কীর্ত্তি। আলবার্ট কলেজ নামক বিদ্যালয়ের কার্য্য এইখানে হইয়া থাকে।

তদনন্তর ৮ই জ্যৈষ্ঠ তারিখে মোড়পুকুর গ্রামে তিনি "সাধন-কানন" স্থাপন করেন। গ্রীষ্মকালে এই কাননে সপরিবারে বন্ধুগণসঙ্গে বাস করিতেন। বৃক্ষতলে উপাসনা, কুটীরে রন্ধন, গ্রামের ভিতরে বাড়ী বাড়ী কীর্ত্তন, এইরূপে কাল গত হইত। বনবাসী ঋষিদিগের ন্যায় এখানে কাল হরণ করিতেন। বন্ধু-গণসহ প্রাতে উঠিয়া ফুল ফল আহরণ, স্নান, নামগান, পরে বৃক্ষতলে দৈনিক উপাসনা, তদনন্তর কুটীরে স্বহস্তে রন্ধন, অতিথিসেবা, আহারান্তে ক্ষণকাল বিশ্রামের পর লিখন পঠন, বৈকালে বাগানের কাজ, রাস্তা প্রস্তুত, জল তোলা, কাঠ কাটা ইত্যাদি; সন্ধ্যার সময় নির্জ্জন সাধন এবং পল্লীর ঘরে ঘরে সংকীর্ত্তন। কেশববাবু নিষ্কর্ম্মা যোগী হইয়া বনে বাস করিতেছেন, এই বলিয়া লোকে তখন নিন্দা করিবার আর একটী সুযোগ প্রাপ্ত হইল। এই বৎসর ভাদ্র মাস হইতে দীর্ঘ ধ্যান সাধন আরম্ভ হয়। অর্দ্ধ ঘণ্টা কাল উপাসকমণ্ডলীকে ধ্যান

করিতে হইত। তরলচিত্ত ব্রাহ্মগণের পক্ষে ইহা অতিশয় কষ্টের কারণ হইয়াছিল। তাঁহারা বিরক্তি প্রকাশ করিতেন। একদা বর্ষাকালে মুশলধারে বৃষ্টি পড়িতে লাগিল, তদবস্থায় কেশবচন্দ্র সবান্ধবে বৃক্ষতলে উপাসনা ধ্যানে মগ্ন রহিলেন, কিছুতেই ধ্যান ভঙ্গ করিলেন না। ধর্ম্মের জন্য কষ্ট স্বীকার করিতে কখন তিনি ত্রুটি করেন নাই। প্রাসাদ তুল্য গৃহে থাকিয়াও যে তিনি পরমবৈরাগী ছিলেন, তাহার প্রমাণ অনেক আছে। দীনাবস্থার ভদ্রলোকেরাও তাঁহার মত কষ্ট বহনে প্রস্তুত নহে। মিতাহারী মিতাচারী গৃহস্থ বৈরাগী তাঁহার মতন আর অতি অল্পই দেখা যায়। এত সাধন ভজনের ব্যস্ততার মধ্যে থাকিয়াও সভ্যসমাজে মিশিতে তিনি কখন অবহেলা করিতেন না। এই বৎসর সাম্বৎসরিক উৎসবের পর ফাল্গুন মাসে লর্ড লিটনের অনুরোধে টাউনহলে "ধর্ম্মে বিজ্ঞান এবং উম্মত্ততা" বিষয়ে এক বক্তৃতা করেন।

কুচবিহার বিবাহের পূর্ব্বে মহাত্মা কেশবচন্দ্র সাধন ভজন এবং যোগ ভক্তি শিক্ষাদানকার্য্যে প্রধানতঃ ব্যাপৃত ছিলেন। সমাজের মধ্যে কখন কখন এমন দিন উপস্থিত হইত যে, জীবন-রথ যেন আর চলে না। এত ভক্তির মত্ততা উদ্যম, ধর্ম্মকার্য্যের এত আড়ম্বর ও উৎসাহ, তথাপি মধ্যে মধ্যে আধ্যাত্মিক উন্নতির গতি অবরুদ্ধ প্রায় হইত। কাজ কর্ম্ম এবং বক্তৃতা করিবার, উপদেশ দিবার লোকের অভাব ছিল না। ভারতাশ্রম, ব্রাহ্ম-নিকেতন, ভারতসংস্কার-সভা, মুদ্রাযন্ত্র এবং প্রচারকার্য্যালয়ে

কর্ম্মকাণ্ডের শৈথিল্য কোন দিন দৃষ্ট হইত না; কিন্তু মাঝে মাঝে এক একবার ভাবরস শুকাইয়া যাইত। কর্ম্মচারী ও প্রচারকদলের মধ্যে আশানুরূপ একতা এবং ভ্রাতৃভাবেরও বিলক্ষণ অপ্রতুল ছিল। এইরূপ বদ্ধ ভাবের সময় কেশবচন্দ্রের তেজস্বিতা ও উন্নতিশীলতার পরিচয় আমরা যাহা পাইয়াছি, তাহার সহিত তাঁহার অন্য কোন গুণগ্রামের তুলনা করিতে পারি না। কতকগুলি সহচর ধর্ম্মবন্ধুকে উপলক্ষ করিয়া, মানবসমাজকে স্বর্গপথে তিনি সময়ে সময়ে এমনি বেগে চালিত করিতেন যে, তদ্দ্বারা ভাব ভক্তির স্রোত পুনঃ পুনঃ উন্মুক্ত হইয়া যাইত। এ জন্য তিনি বিবিধ উপায় অবলম্বন করিতেন। কখন ঝুলি পাতিয়া আশ্রমবাসী এবং আশ্রমবাসিনীদিগের নিকট তণ্ডুল ভিক্ষা লইতেন। কখন প্রচারকবৃন্দের ছিন্ন জীর্ণ চর্ম্মপাদুকার উপর মস্তক রাখিতেন। কখন পাপস্বীকার এবং অনুতাপ ও প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা করিতেন। কখন বা প্রচারক সহচরগণকে ছাড়িয়া ছাত্রনিবাসে ছাত্রদিগের সহিত উপাসনা ধর্ম্মালাপ করিতেন। এমন কি, উন্নতির গতি রুদ্ধ দেখিয়া একবার মন্দিরের কার্য্যও পরিত্যাগ করেন এবং বেলঘরিয়া তপোবনে চলিয়া যান। পুরাতন সঙ্গীদিগকে ধর্ম্মোন্নতির পথে সঙ্গে লইয়া যাইবার জন্য কি ব্যাকুলতাই তাঁহার ছিল! "আমি পারিব না" এই বিশ্বাসবিরুদ্ধ নিরাশ বাক্য তিনি বলিতে দিতেন না। এমন এক দিন আসিয়াছিল, যখন তিনি এই সাংঘাতিক নিরাশ বাক্য পারিষদবর্গের মুখে শুনিয়াছিলেন। অবশ্য স্বহস্তে রন্ধন

এবং তপস্যাব্রত গ্রহণের পূর্ব্বের কথা আমরা বলিতেছি। সে সময় এমনি হইল যে, আর উন্নতি হইবে না বলিয়া অনেকে ভগ্নোদ্যম এবং শ্রান্ত হইয়া পড়িলেন। কিন্তু ধন্য বিধাতার বিধান! কেশবচন্দ্র তদবস্থায় কাহাকেও থাকিতে দিলেন না। কর্দ্দমে নিমজ্জিত বিধানরথকে তিনি যেন সবলে টানিয়া তুলিলেন। অতঃপর কেহ আর নৈরাশ্যে পতিত হন নাই। বিষয়কার্য্যে আবদ্ধ গৃহী ব্রাহ্মবন্ধুগণ পর্য্যন্ত তাহা দেখিয়া সাধনানুরাগী হন এবং আশার আলোক লাভ করেন। যাহারা বিধবাবিবাহ সঙ্করবিবাহ দেয়, উপবীত ছিন্ন করে, জাতিভেদ ও পৌত্তলিকতা মানে না, তাহাদিগকে আগে উন্নতিশীল ব্রাহ্ম বলা হইত। এক্ষণে পূর্ণমাত্রায় যোগ ভক্তি বৈরাগ্য প্রেমোন্মত্ততার সাধন এবং সম্ভোগ উন্নতিশীলতার লক্ষণ হইয়া দাঁড়াইল। তরল বিশ্বাস ভক্তির ঘনীভূত অবস্থা এবং অস্পষ্ট দর্শন শ্রবণকে স্পষ্ট এবং উজ্জ্বলরূপে উপলব্ধি করাকেই প্রকৃত ধর্ম্ম বলিয়া মনে হইতে লাগিল। কেশবচন্দ্রের ব্রহ্মসম্ভোগের এক উচ্চ আদর্শ ছিল। নিজের এবং সঙ্গিগণের আধ্যাত্মিক ধাতু পরীক্ষা দ্বারা তিনি বুঝিতে পারিতেন যে, ধর্ম্মজীবনের স্বাস্থ্য প্রকৃতিস্থ আছে কি না। ক্রমাগত পনর বৎসর কাল প্রাত্যহিক উপাসনা, কীর্ত্তন এবং ধর্ম্মপ্রসঙ্গের প্রভাবে কেশবের চতুর্দ্দিকে একটি বিশুদ্ধ চিদাকাশমণ্ডল সংরচিত হয়। তাহাতে নিরন্তর ব্রহ্ম-বায়ু সঞ্চরণ করিত। যে কয় জন ব্যক্তি তাহাতে বাস করিতেন, তাঁহারা পুণ্যহিল্লোলে সর্ব্বদা ভাসিতেন। সেখানকার নিশ্বাস

প্রশ্বাস গ্রহণ, স্থিতি এবং বিচরণক্রিয়ায় ব্রহ্মজ্যোতি প্রকাশিত হইত। সে পবিত্র জল বায়ু মুমুক্ষু ভক্তগণের পক্ষে পরম স্বাস্থ্যকর ছিল। হায়! কেশবের তিরোধানের সঙ্গে সঙ্গে তাহা চলিয়া গিয়াছে। তাঁহার অপরাপর বাহ্য কীর্ত্তিকলাপ অর্থ এবং বল বুদ্ধির সাহায্যে স্থায়ী হইতে পারে, কিন্তু স্বর্গের সেই নব-বিধান-বসন্তসমীরণ আর প্রবাহিত হইবে না। তাহার মধুর হিল্লোলে যে প্রেমপরিমল সঞ্চরণ করিত, তাহার সুঘ্রাণ হৃদয়-কোষে আর প্রবিষ্ট হইবে না। শূন্যে অন্তরীক্ষে এমন প্রেমের ভেল্কী লাগাইবার কি আর কাহারো ক্ষমতা আছে? ভক্ত-মণ্ডলীকে প্রেমের তারে বাঁধিয়া কেশব নাচাইতেন। ভক্তি ভাবুকতার রস সংক্রামিত করিয়া তাঁহাদিগের জড়বৎ আত্মাকে তিনি হাসাইতেন, কাঁদাইতেন। মেঘে মেঘে যেমন বিজলী খেলা করে, সেইরূপ হৃদয়ে হৃদয়ে তাঁহার ভাব খেলা করিত।

অগ্নি-পরীক্ষা

(কুচবিহার বিবাহ।)

যে সময়ে ধর্ম্মবীর কেশবচন্দ্র পুরাতন ব্রাহ্মধর্ম্মকে সম্পূর্ণ-রূপে নবীন আকারে, নূতন ভাবে, নবরসে পুনর্গঠিত করিলেন, সেই মহাবিপ্লাবক যুগান্তরের সময়ে এক্ষণে আমরা আসিয়া উপস্থিত হইলাম। কুচবিহার বিবাহের অব্যবহিত পূর্ব্বে

সমাজের অভ্যন্তর প্রদেশ কিরূপ দুইটি বিপরীত মতবাদের সংগ্রামস্থল ছিল, তাহার আভাস কিছু কিছু আমরা দিয়া আসিয়াছি। আদেশবাদ এবং হস্তোত্তোলনবাদ এই উভয়ের সামঞ্জস্য কেশবের কার্য্যক্ষেত্রে যে ছিল না, তাহা কেহ বলিতে পারিবেন না; কিন্তু তাহা ফলোপধায়ী হয় নাই। তিনি চাহিতেন, আদেশের স্রোতে ব্রাহ্মসমাজ এক খানি অবিভাজ্য সামগ্রী হইয়া ভাসিতে ভাসিতে নির্ব্বিঘ্নে ব্রহ্মধামে চলিয়া যাইবে। তাহাতে যদি মধ্যে মধ্যে এক একবার হাত তুলিয়া সাঁতার খেলিতে হয় খেলিব, কিন্তু আদেশের স্রোতে না ভাসিলে সেরূপ সন্তরণে পার হওয়া যাইবে না। এই বিশ্বাসে তিনি সমবেত আদেশ-ভূমিতে প্রচারকসভা স্থাপন করেন। তৎসঙ্গে প্রয়োজন অনুসারে সাধারণ বিষয়কার্য্যে ব্রাহ্মসাধারণের মতামত লইতেন। এরূপ প্রণালী অবলম্বন করাতে হস্তোত্তোলনবাদ সম্পূর্ণ চরিতার্থ হইত না বটে, কিন্তু আদেশবাদের মর্য্যাদা রক্ষা পাইত। এতদুভয়ের সামঞ্জস্যই তাঁহার ধর্ম্ম ছিল। পাপ পুণ্যে বিমিশ্র এই পৃথিবীতে অপূর্ণ মানব জীবনের পক্ষে যে দুইয়ের সমতা নিতান্ত প্রয়োজন, তাহা কে অস্বীকার করিবে? এবং এই উভয় মতের অপব্যবহারে যে ধর্ম্মসমাজ একদিকে অবিশ্বাস অভক্তি পাপ দুরাচার এবং অপরদিকে অন্ধবিশ্বাস ও ধর্ম্মাভিমানের আলয় হয়, তাহাই বা কে অস্বীকার করিতে পারে? ব্রাহ্মসমাজ ইহার প্রত্যক্ষ প্রমাণস্থল। সুতরাং এ সম্বন্ধে অধিক আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। ধর্ম্মসমন্বয়কারী কেশব

যেমন অপরাপর সমস্ত বিষয়ে মধ্যভূমি অবলম্বন করিতেন, এ সম্বন্ধেও তেমনি চিরদিন মিলনের চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন; কিন্তু সফলকাম হইতে পারেন নাই। কেবল নিয়ম শাসনে কাজ চলে না, আবার দয়ার প্রশ্রয় দিলেও সমাজ ধর্ম্মভ্রষ্ট হয়; দুয়ের মিলনেই বড় বড় রাজ্য চলিতেছে। জনসমাজে ব্যক্তিগত প্রভুত্ব এবং অধিকাংশের নির্দ্ধারণের আধিপত্যই চিরদিন দেখা গিয়াছে। সমবেত আদেশ-প্রাপ্তির শাসনপ্রণালী এ পর্য্যন্ত একটী অমীমাংসিত প্রহেলিকা। ১৭৯৯ শকের আশ্বিন মাসে হস্তোত্তোলনবাদী ব্রাহ্মগণের উৎপীড়নে কেশবচন্দ্র প্রতিনিধি-সভা স্থাপন করেন। কিছু দিন তাহার কার্য্য চলিয়াছিল, শেষ ব্রাহ্মসাধারণের ঔদাসীন্য হেতু তাহা বন্ধ হইয়া যায়। ব্রাহ্মসমাজে,—কি দেবেন্দ্রনাথের রাজ্যে, কি কেশবচন্দ্রের রাজ্যে,—অধ্যক্ষসভা কি প্রতিনিধি-সভা, কোন সভা দ্বারাই রীতিমত কার্য্য কোন কালে নির্ব্বাহ হইত না; যে কয়েক জন ব্যক্তি ইহাতে জীবন সঁপিয়াছিলেন, তাঁহারাই কার্য্য করিতেন। হাতে কলমে যে কাজ করে, কালক্রমে সহজেই সে কর্ত্তা ব্যক্তি হইয়া উঠে; সুতরাং বিধি ব্যবস্থানুসারে সর্ব্বসাধারণের মতে কোন দিনই এখানে কার্য্য নির্ব্বাহ হয় নাই। কোন জীবন্ত ধর্ম্মসমাজ সে প্রণালীতে চলিতে পারেও না। যাহা কিছু চলিয়াছে, সে বিপদ আপদে পড়িয়া। যখন সমাজমধ্যে এক পক্ষ প্রবল হইয়া অপর পক্ষকে বিদায় করিয়া দেয়, তখন দুর্ব্বল পক্ষ সাধারণের স্বত্ব রক্ষা করিব বলিয়া সাধারণের সাহায্যপ্রার্থী হয়। তৎকালে উভয়বিবাদী সাধারণকে বিভাগ করিয়া লইতে চেষ্টা

করে; কিন্তু কার্য্য উদ্ধার হইলে আর কাহারো সাধারণের মতামত বড় প্রয়োজন হয় না। পৃথিবীর সাম্রাজ্য অধিকার এবং প্রভুত্ব ও রাজত্ব এই প্রণালীতে হইয়া আসিতেছে। সাধারণ একটী সামগ্রী, যাহা মৃত্তিকার ন্যায়, দেবতা এবং হনূমান উভয় মূর্ত্তিই পরিগ্রহ করিতে পারে। ফলতঃ এ সকল সাধারণহিতকর ব্যাপারে যাহার হস্তে যে কার্য্যের ভার থাকে, পরিণামে দেখা যায়, সেই তাহা অধিকার করিয়া বসে। এই কারণে ব্রাহ্মসমাজেও বরাবর ব্যক্তিগত একাধিপত্যের প্রাদুর্ভাব চলিয়া আসিয়াছে। এরূপ কর্ত্তৃত্ব ধর্ম্মেরও হইতে পারে, অধর্ম্মেরও হইতে পারে। তৎসংক্রান্ত ব্যক্তিগত দোষ গুণের যথার্থ বিচার ঈশ্বরের হস্তে।

এই বৎসর মান্দ্রাজ অঞ্চলের মহাদুর্ভিক্ষ নিবারণের জন্য কেশবচন্দ্র ব্রহ্মমন্দিরে এক সভা করেন। তাহাতে সর্ব্বসাধারণের সহানুভূতি ছিল। অনেক টাকা চাঁদা উঠে এবং তাহা দ্বারা যথাস্থানে ভাণ্ডারা স্থাপিত হয়। পরে কার্ত্তিক মাসের ২৮ তারিখে আচার্য্যদেব কলুটোলার পৈতৃক ভবন ছাড়িয়া কমল-কুটীরে আসিয়া বাস করেন। এ সম্বন্ধেও তিনি এক মহা পরীক্ষায় পতিত হন। উড়িষ্যা দেশজাত কোন বঙ্গীয় যুবা আপনার সমস্ত সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া প্রায় উনিশ বিশ হাজার টাকা তাঁহাকে দেয়, এবং বারংবার অনুরোধ করে যে, ইহা আপনি সৎকার্য্যে নিয়োগ করুন। চঞ্চলমতি যুবার সাময়িক উৎসাহবাক্যে বিশ্বাস না করিয়া তিনি বলিলেন, তুমি আপন ইচ্ছামত ট্রাষ্টির হস্তে উহা দাও। কিছুদিন পরে কমলকুটীর

ক্রয় করিবার সময় ঐ টাকা হ্যাণ্ডনোট দিয়া তিনি ধার করেন। একদিন হঠাৎ সেই যুবা বলিয়া উঠিল, আমি সমস্ত টাকা এখনি চাই। এই বলিয়া সে একবারে হাইকোর্টে গিয়া উপস্থিত। তখন অপর কোন বন্ধুর নিকট হইতে টাকা লইয়া আচার্য্য সে ঋণ শোধ করিলেন। টাকা ফিরিয়া পাইবে না মনে করিয়া, যুবা এইরূপ অবিশ্বাস এবং চপলতার পরিচয় দিয়াছিল। ঈশ্বরকে মাতৃনামে সম্বোধন এবং সেই ভাবের সাধন এইবার মাঘ মাস হইতে আরম্ভ হয়। তদনন্তর কুচবিহারের বিবাহ। এই বিবাহ লইয়া একটি মহাপ্রলয় ঘটিয়া গিয়াছে। ইহার আনুপূর্ব্বিক বিবরণ অতি বিস্তৃত। আমরা কেবল তাহার সংক্ষিপ্ত সার এ স্থলে উল্লেখ করিব। বিস্তারিত বিবরণ মিরার ও ধর্ম্মতত্ত্ব পত্রিকায় বর্ণিত আছে।

মহাত্মা কেশব ধর্ম্ম এবং সংসার উভয় কার্য্যে বিধাতার উপর ঐকান্তিক বিশ্বাস এবং নির্ভর রাখিয়া চলিতেন। বিধাতার ইঙ্গিত তাঁহার সমস্ত কর্ম্মের পরিচালক ছিল। সহসা কুচবিহারের কোন কর্ম্মচারীর মুখে তত্রত্য মহারাজের সহিত আপনার কন্যার বিবাহের প্রস্তাব যখন তিনি শুনিলেন, তখন ইহা প্রজাপতির নির্ব্বন্ধ, বিধাতার অভিপ্রায় বলিয়া তাঁহার বিশ্বাস জন্মিল। সুতরাং তাহাতে সম্মতি দান করিলেন। এইরূপ বিশ্বাস তাঁহার হইল, যদি আমি এ কার্য্য সম্পন্ন না করি, তাহা হইলে আমি বিবেকের নিকট দায়ী হইব। প্রথম প্রস্তাবে এই প্রশ্ন তাঁহার মনে উদয় হয়, "ব্রিটিশরাজ যে যুবরাজকে সুশিক্ষা দিয়া, শিক্ষিতা বনিতার হস্তে

স্থাপনপূর্ব্বক, উচ্চ পদের উপযুক্ত করিতে চাহেন, তাহার বিষয়ে সহকারিতা করা প্রার্থনীয় কি না?" প্রশ্নটি বিধাতৃপ্রেরিত বলিয়া তাঁহার বিশ্বাস জন্মিল। তখন তিনি অনুভব করিলেন, যখন আমার সমস্তই ঈশ্বরের, তখন তাঁহার ইচ্ছা অবশ্য পালনীয়। আপনা হইতে গবর্ণমেণ্টের অপ্রত্যাশিত প্রস্তাব, কুচবিহার-রাজ্যের প্রজাপুঞ্জের মঙ্গলাশা, উভয় পক্ষের ঐক্যমত, মহারাজের উন্নত চরিত্র, এই সমুদায় চিহ্ন দ্বারা প্রজাপতির নির্ব্বন্ধ প্রমাণিত হইল। বিবাহ-সম্পাদনের বিস্তারিত ঘটনা বিষয়ে তাঁহার মনে সন্দেহ ছিল বটে, কিন্তু ঈশ্বর তাহা দূর করিয়া দিবেন, এই বিশ্বাসে কার্য্যে অগ্রসর হইলেন। তদনন্তর কথাবার্ত্তা স্থির হইলে, পাত্র-পক্ষের ইচ্ছানুসারে আচার্য্য এই কয়টি প্রস্তাব করেন। (১) রাজা ব্রাহ্ম অথবা একেশ্বরবাদী বলিয়া লিখিয়া দিবেন। (২) ব্রাহ্মসমাজের পদ্ধতি অর্থাৎ অপৌত্তলিক হিন্দুবিবাহপদ্ধতি অনুসারে বিবাহ হইবে। (তাহাতে পৌত্তলিকতা-দোষবিমুক্ত স্থানীয় আচার ব্যবহার থাকিতে পারে)। (৩) পাত্র পাত্রী উপযুক্ত বয়ঃক্রমে বিবাহ করিবেন। যদি তত দিন অপেক্ষা করা না যায়, তবে এক্ষণে কেবল বাগ্‌দান মাত্র হইবে, পরে মহারাজ বিলাত হইতে ফিরিয়া আসিলে বিবাহ সম্পাদিত হইবে। (৪) বিবাহ-পদ্ধতিতে ব্রাহ্মধর্ম্ম সম্বন্ধীয় নিয়ম প্রতিপালিত হইবে। এই প্রস্তাবের পর ডেপুটী কমিশনর লিখিলেন, "ছোট লাট বাল্যবিবাহে সম্মত নহেন, মহারাজা নিজেও ইহাতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন।" সুতরাং সম্বন্ধ এক প্রকার ভাঙ্গিয়া গেল।

পুনরায় তিন মাস পরে সংবাদ আসিল, "লাট সাহেব মত দিয়াছেন, কিন্তু বিবাহের অব্যবহিত পরেই মহারাজা বিলাতে গমন করিবেন। রাজাকে যেমন করিয়াই হউক, বিলাতে যাই-তেই হইবে; কিন্তু অবিবাহিতাবস্থায় তাঁহার দূর দেশ ভ্রমণ প্রার্থনীয় নহে, অতএব প্রস্তাবিত বিবাহ ৬ই মার্চ্চের পরে হইতে পারে না। অবশ্য এ বিবাহ কেবল নাম মাত্র। কেশববাবু ইহা যেন বিবেচনা করেন, প্রচলিত অর্থে এখন বিবাহ হইবে না, কেবল বাগ্‌দান হইবে।"

উপরিউক্ত দিবসে বিবাহ হইবে, ইহা ধার্য্য হইয়া গেল। পাত্র পাত্রী পরস্পরের দেখা সাক্ষাৎ হইল। কমলকুটীরে তাঁহাদিগকে বসাইয়া আচার্য্য প্রার্থনাদি করিলেন। অনন্তর রাজপক্ষীয় লোক নিম্নলিখিত প্রস্তাব লইয়া কুচবিহারে চলিয়া গেলেন। (১) বিবাহের পূর্ব্বে বা পরে পাত্র পাত্রীর সহিত কোন পৌত্তলিক সংস্রব থাকিবে না। (২) বিবাহমণ্ডপে মূর্ত্তি, ঘট, বা অগ্নি স্থান পাইবে না। (৩) মুদ্রিত মন্ত্র ব্যতীত অন্য মন্ত্র উচ্চারিত হইবে না। (৪) কোন মন্ত্র পরিত্যক্ত বা পরিবর্ত্তিত হইবে না। পাত্রীপক্ষ কুচবিহারে যাইবার পূর্ব্বে কেশবচন্দ্র তথায় তারযোগে সংবাদ দিলেন, "ধর্ম্মসম্বন্ধে বিন্দু মাত্র এদিক ওদিক হইবে না।" উত্তর আসিল, "কোন আশঙ্কা করিবার প্রয়োজন নাই, পৌত্তলিক অংশ বাদ দিয়া হিন্দুবিবাহ-পদ্ধতি অনুযায়ী কার্য্য করা হইবে।" এই আশা পাইয়া আচার্য্য মহাশয় তথায় গমনে উদ্যত হইলেন।

মনে করিলেন, যদি সামান্য বিষয়ে কোন মতভেদ উপস্থিত হয়, সাক্ষাতে তাহা ঠিক করিয়া লওয়া যাইবে। পরে যখন যাইবার জন্ম প্রস্তুত হইতেছেন, এমন সময় সংবাদ আসিল, "বিবাহপদ্ধতি দেখা হয় নাই এবং ইহা মুদ্রিত হইবে না।" কয়েকদিন পরে আবার সংবাদ আসিল, "ব্রাহ্ম-পদ্ধতি ইহার ভিতর প্রবিষ্ট আছে, ইহা ব্যবহৃত হইতে পারিবে না।" সে কথার এবং বাইনাচের প্রতিবাদ করিয়া বলা হইল, "স্পেসেল্ ট্রেণ বন্ধ থাকুক।" পাত্রপক্ষীয়েরা বলিলেন, "না, তাহা সম্ভব নহে।" শেষ বাধ্য হইয়া কেশবচন্দ্র সপরিবারে কুচবিহারে উপনীত হইলেন। এখন আমাদের মনে হইতেছে, এরূপ অবস্থায় তাঁহার যাওয়া রহিত করিলে, হয় তো পূর্ব্ব অঙ্গীকারের বিরুদ্ধে পাত্রপক্ষীয়েরা কোন প্রকার অত্যাচার করিতে পারিতেন না। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট যখন নিজে বরকর্ত্তা, তখন কেশবচন্দ্র যাইতে কেনই বা ভীত হইবেন? মহারাজার পিতামহী এবং তাঁহার অনুচরগণ হিন্দুয়ানী রাখিবার জন্ম যে সকল অসদুপায় পরে লইয়াছিলেন, তাহা ভদ্রতাবিরুদ্ধ কেবল নহে; তাহাতে অঙ্গীকার ভঙ্গ হইয়াছে। অথচ তাহাতে হিন্দুয়ানীও রক্ষা পায় নাই। কতিপয় ব্যক্তির কুমন্ত্রণা এবং দুষ্ট বুদ্ধির দোষে শেষে কেবল অনুষ্ঠানের পবিত্রতা বিনষ্ট হইয়া গিয়াছিল মাত্র। কন্যাযাত্রিদল রাজধানীতে পৌঁছিলে, তথায় নূতন নূতন প্রস্তাব সকল হইতে লাগিল। কর্ম্মচারীরা বলিলেন, "কেশববাবু বিবাহমণ্ডপে যাইতে পারিবেন না, উপবীতধা

ব্রাহ্মণ ব্যতীত অন্য কেহ মন্ত্র পড়িবে না, ব্রহ্মোপাসনা হইতে পারিবে না, পাত্র পাত্রী বিবাহের অঙ্গীকার-বাক্য বলিবে না, এবং উভয়কে হোম করিতে হইবে।” বিবাহের পূর্ব্ব দিবসে এই কথা। অদ্ভুত প্রস্তাব শ্রবণে আচার্য্যের মন ভঙ্গ হইল। ইতঃ-পূর্ব্বেই নিজ ভবনে তিনি কন্যাকে ধর্ম্মতঃ রাজার হস্তে সমর্পণ করিয়াছেন। সে বন্ধন আর ছিন্ন হইবার নহে। কেবল লৌকিক নিয়ম পালন অবশিষ্ট ছিল। কাজেই তখন ঘোর বিপদ উপস্থিত হইল। রাত্রি তৃতীয় প্রহর পর্য্যন্ত তর্ক বিতর্ক আলোচনা, কিছুতেই আর মীমাংসা হয় না। অধিবাসের জন্য কন্যাকে মহাসমারোহের সহিত সকলে রাজবাড়ী লইয়া গেল, কিন্তু আচার্য্য সবান্ধবে অকূল সমুদ্রে পতিত হইলেন। যিনি সহস্র বিপদ অতিক্রম করিয়া বীরের ন্যায় অটল থাকেন, তাঁহাকে এই ঘটনায় একবারে হতবীর্য্য বিষণ্ণচিত্ত করিয়া ফেলিল। কেশবের চিরপ্রফুল্ল মুখচন্দ্র মলিন হইল, বিশ্বাসের তেজঃ এবং বুদ্ধির প্রভা যেন পরীক্ষার মেঘে ঢাকিয়া ফেলিল। রাত্রিজাগরণ, উদ্বেগ, লোকলজ্জায় সকলে মৃতপ্রায় হইলেন। এ দিকে ত বিবাহের নাম শুনিয়া পর্য্যন্ত প্রথম হইতেই পৃথিবী শুদ্ধ লোক খড়্গহস্ত হইয়া উঠিয়াছে। সংবাদপত্র দুর্নামে পরিপূর্ণ। দেশ বিদেশ হইতে রাশি রাশি প্রতিবাদপত্র আসিতেছে। বালক বৃদ্ধ নরনারী সকলে যেন অগ্নি-অবতার। কেহ সভা করিয়া বক্তৃতা করে, কেহ দল বাঁধে, পত্র লেখে, কেহ তর্ক করিতে আইসে। ব্রাহ্মবিবাহের বিধি

ভাঙ্গিল, বাল্যবিবাহের মহাপাপ ঘটিল, ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্য পৌত্তলিকতার প্রশ্রয় দিলেন, এই বলিয়া সকলেই মহা চীৎকার আরম্ভ করিল। ঐ সকল পাপ যাহারা চিরদিন করে এবং করিবে, তাহাদেরও নৈতিক ক্রোধ জ্বলিয়া উঠিল। ইহার ভিতর হিংসা দ্বেষ বৈরনির্য্যাতন পরশ্রীকাতরতা যে অনেক পরিমাণে ছিল, তাহা আর বলিবার আবশ্যকতা নাই। কুচ-বিহারে যাইবার পূর্ব্বে আচার্য্য এইরূপে ক্ষতবিক্ষত হইয়াছিলেন, সেখানে গিয়াও এই মহাবিপদ উপস্থিত। নিত্য উপাসনা প্রার্থনা দ্বারা যিনি সকল বিপদ হইতে উদ্ধার লাভ করেন, তিনি কন্যাকে তদবস্থায় বিদায় দিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। বিবাহ দিবসে প্রাতঃকালের সেই দৃশ্য কি শোকাবহ! সহচর বন্ধুগণ এ পর্য্যন্ত কিছুই অবগত ছিলেন না। কেশবচন্দ্র যে কার্য্যে আছেন, তাহা কখনই ব্রাহ্মধর্ম্মবিরুদ্ধ হইবে না, এই বিশ্বাস সকলের মুখকে এত দিন নীরব রাখিয়াছিল। তিনিও জানিতেন, এ আন্দোলনের সময় বিবাহ-প্রণালী সম্বন্ধে সহযোগীদিগের সহানু-ভূতি পাওয়া যাইবে না। এই কারণে সে সম্বন্ধে কাহারো সঙ্গে কোন পরামর্শ করেন নাই। কখন কোন বিষয়ে তিনি বন্ধুগণের মতামত লইতেনও না। নিজধর্ম্মবুদ্ধি অনুসারে সমস্ত কার্য্য করিতেন। সুতরাং বন্ধুমণ্ডলীর চিত্ত নিতান্ত বিক্ষিপ্ত হইল। আচার্য্য তথাকার কর্ম্মচারীদিগের ব্যবহার দেখিয়া শেষ বলিলেন, "এক্ষণে তোমরা যাহা হয় কর, আমি কিছু বুঝিতে পারিতেছি না।" বাস্তবিক যেখানে ধর্ম্মবন্ধন, মনুষ্যত্ব, সেইখানে

কেশব মহাবীর; কিন্তু যেখানে রাজনৈতিক কৌশল চাতুরী, সেখানে তিনি দুর্ব্বল মেষের ন্যায়। কারারুদ্ধ বন্দীর মত তাঁহার অবস্থা হইল। যাহার মুখে যাহা আসে, সেই তাহা বলে। এইটীই সকলে মনে করিয়া লইল, রাজ্য এবং টাকার লোভে কেশবচন্দ্র যে এ কার্য্য করিয়াছেন, তাহার আর কোন ভুল নাই।

বিবাহ-দিবসে রাত্রি দুই প্রহরের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত হোম হইবে কি না, এই আন্দোলন চলিতে লাগিল। তাহাতে সম্বন্ধ ভাঙ্গিয়া যায় যায় হইয়া উঠিয়াছিল; কিন্তু তাহা সম্ভব নহে। শেষ নির্দ্ধারিত হইল যে, কন্যাপক্ষীয়েরা কোন পৌত্তলিকতায় যোগ দিবেন না। তদনন্তর বিবাহস্থলে সকলে উপস্থিত হইলেন। সেখানে বিষম গোলযোগ। চতুর্দ্দিকে বাদ্য ও কামানের শব্দ এবং প্রজামণ্ডলীর কোলাহল। বিবাহ-মণ্ডপে একদল ব্রাহ্মণ পুরোহিত উপস্থিত। মধ্যস্থলে বসনাবৃত চিত্র বিচিত্র ঘট এবং ছদ্মবেশী গ্রাম্যদেবতার দল। কেহ লুক্কায়িত, কেহ প্রকাশ্য। সর্ব্বাগ্রে সভাস্থলে বসিয়া কন্যাপক্ষের লোকেরা ব্রহ্মের অষ্টোত্তর শত নাম এবং সত্যং জ্ঞানমনন্তম্ পাঠ করিলেন। তখন এমনি কোলাহল আরম্ভ হইল যে, কিছুই আর শুনা যায় না। পরে চিত্রিত ঘট এবং গ্রাম্যদেবতাদিগকে সরাইবার জন্য অনুরোধ করা হইল। ডেপুটী কমিশনর স্বয়ং তদারক করিতে আসিলেন। কিন্তু পাত্রপক্ষীয় চতুর ভীরু লোকেরা বলিল, উহারা দেবতা নহে, মঙ্গলসূচক চিহ্নবিশেষ। অনন্তর ব্রাহ্মণ পুরোহিতগণ

ব্রাহ্ম পুরোহিতের সহিত মিলিয়া পৌত্তলিক অংশ পরিত্যাগপূর্ব্বক বিবাহের মন্ত্র পড়িলেন। শেষ কন্যা অন্তঃপুরে গমন করিলে, পাত্র কেবল হোমের স্থানে পুরোহিতদিগের নিকট ক্ষণকাল বসিয়াছিলেন। পরে অন্তঃপুরে পাত্র পাত্রীর নিকট বিবাহ-প্রতিজ্ঞা এবং প্রার্থনা পঠিত হয়, এবং আচার্য্য তাঁহাদিগকে উপদেশ দান করেন।

এইরূপে বিবাহক্রিয়া সম্পন্ন হইল বটে, কিন্তু কোন পক্ষের তাহা ভাল লাগিল না। দৃশ্যতঃ হিন্দুয়ানী রাখিবার জন্য যে সব ষড়যন্ত্রের আয়োজন হইয়াছিল, তাহা নিতান্ত বিড়ম্বনা মাত্র। প্রচারকদল এবং আচার্য্য পর দিবস উপাসনা কালে অতিশয় খেদ করিতে লাগিলেন। কেশবচন্দ্র সে দিন প্রার্থনায় যেরূপ কাঁদিয়াছিলেন, তেমন আর দেখা যায় নাই। একে লোক-নিন্দা, তাহাতে রাজকর্ম্মচারিগণের দুর্ব্যবহার, অধিকন্তু প্রচারক-গণের অসন্তোষ, এ সকল বিষয় তাঁহাকে নিতান্ত ব্যথিত করিয়া-ছিল। কেন তিনি পাত্রপক্ষের লোকের কথায় এত নির্ভর করিয়াছিলেন? কেনই বা ব্রহ্মোপাসনা যথারীতি হইল না? কি ভাবে কি প্রণালীতে তিনি বিবাহপদ্ধতি স্থির করিয়াছিলেন, বন্ধুগণের প্রশ্নের উত্তরে তখন তাহা সমস্ত ভাঙ্গিয়া বলিলেন। তাঁহার অভিপ্রায়, উদ্দেশ্য, বিশেষ দায়িত্ব বিষয়ে কেহ অবিশ্বাস করেন নাই; কিন্তু কার্য্যের বিশৃঙ্খলা-দর্শনে সকলেই দুঃখিত হইয়াছিলেন। তিনি নিজেও কি হন নাই? একস্থানে স্পষ্ট বলিয়াছেন, "বিবাহ সম্বন্ধে যাহা ঘটিয়াছে এবং যে যে উপায়

লওয়া হইয়াছিল, সে সমস্ত বিষয়ে তিনি আত্মপক্ষ সমর্থন করিতে চাহেন না। কোন কোন বিষয়ে এমন ঘটিয়াছে যে, তজ্জন্য তিনি সকলের অপেক্ষা অধিকতর ব্যথিত। বিবাহ-ক্রিয়া সম্পূর্ণরূপে তাঁহার ইচ্ছানুসারে সম্পাদিত হয় নাই এবং তৎসম্বন্ধে অসন্তোষ তিনি গোপন করেন নাই। কার্য্যপ্রণালী সম্বন্ধে যদি কিছু মন্দ ঘটিয়া থাকে, তাহার বিরুদ্ধে প্রকাশ্য-রূপে প্রতিবাদ করিতে তিনিও অন্যান্য ব্রাহ্মের ন্যায় প্রস্তুত।”

এ কথা ত তিনি নিজে লিখিয়া দিয়াছেন, তদ্ব্যতীত সময়ে সময়ে বন্ধু-মণ্ডলীর মধ্যে বলিতেন, “অপর কোন ব্রাহ্ম যদি এই প্রকারে বিবাহ দিত, আমি তাহাকে অগ্রে আক্রমণ করিতাম।” অন্যের পক্ষে যাহা দোষ, তাঁহার পক্ষে তাহা কর্ত্তব্য, এ কথার তাৎপর্য্য কি ? তাৎপর্য্য এই যে, দোষ গুণ এখানে অভিপ্রায়ের উপর নির্ভর করে, কার্য্যের উপর নহে। যে ভাবে বিবাহক্রিয়া নিষ্পন্ন হইল, এবং পাত্র ও পাত্রীপক্ষের সাংসারিক অবস্থার যেরূপ বৈষম্য, তাহাতে ঈশ্বরাদিষ্ট ব্যক্তি ভিন্ন যে কেহ ইহাতে হস্তার্পণ করিত, সে ব্যক্তি নিশ্চয়ই লোভ এবং নীচ স্বার্থপরতায় কলঙ্কিত হইত, সন্দেহ নাই। কিন্তু দৈবাদেশ যখন লোকচক্ষুর অগোচর একটি গূঢ় আধ্যাত্মিক ক্রিয়া, বিশেষরূপে তাহা আবার যখন ব্যক্তিগত বিশেষ অবস্থা ও কার্য্যে সম্বদ্ধ, তখন ইহা লইয়া যে জনসমাজে গণ্ডগোল উঠিবে, কিছুই বিচিত্র নহে। এই জন্যই পণ্ডিতবর মোক্ষমূলর আচার্য্য কেশবকে লিখিয়াছিলেন, “কেবল আদেশে করিয়াছি বলিলে যথেষ্ট হয় না।” বিজ্ঞানচক্ষে দেখিলে

বিবাহের বিরুদ্ধে সাধারণের যে আন্দোলন এবং প্রতিবাদ, ইহা নিতান্ত স্বাভাবিক। বিশ্বস্ত বন্ধুগণ ভিন্ন এ সম্বন্ধে কেশবচন্দ্রকে কেহ সহানুভূতি দিতে পারে না।

প্রচলিত প্রথা বা পরিবর্ত্তনশীল কোন কোন সামাজিক নিয়ম ভঙ্গ করাতেই অবশ্য তিনি লোভী বলিয়া গণ্য হন, তদ্ভিন্ন অন্য কারণ আর কি ছিল? কিন্তু এ কারণটি তাঁহার চরিত্রবিচারের পক্ষে যথেষ্ট নহে। পঁচিশ বৎসরের ইতিহাসে যাহা প্রতিষ্ঠিত, তাহা একটী ঘটনা দ্বারা বিপর্য্যস্ত হইতে পারে না। কেশবচরিত্র অনেক বিষয়ে সাধারণ সিদ্ধান্তের অন্তর্ভূত ছিল না। বিশেষত্বই তাঁহার জীবনের বিশেষ লক্ষণ। বিবাহ সম্বন্ধেও যে সেই বিশেষত্ব ছিল, তাহার প্রমাণ আছে। তাঁহার ধর্ম্ম বিস্তৃত হইবে, এইটি যদি লোভের মধ্যে গণ্য হয়, তবে সে লোভ তাঁহার ছিল। নিজমুখেই তিনি তাহা স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু পার্থিব ধনলোভ অপবাদটি অতি জঘন্য এবং তাঁহার পক্ষে অসম্ভব। বিবাহের পূর্ব্বে তিনি বৈরাগী নির্লোভী নিঃস্বার্থ ছিলেন, ইহা অনেকেই জানেন এবং মানেন; তাহা যদি হইল, তবে বিবাহের পরেও যে তিনি সেই ভাবে জীবন কাটাইয়া গিয়াছেন, ইহাও সত্য। পাছে রাজসংসারের টাকার সহিত কোন সংস্রব ঘটে, এজন্য বিবাহের অল্প দিন পরে তিনি সংসারের ভার নিজহস্তে গ্রহণ করেন। আয় ও ব্যয়ের সমতা রক্ষার জন্য সাংসারিক ব্যয় সে সময় এত হ্রাস করিয়াছিলেন যে, তাহাতে পুত্র পরিজনবর্গের এবং নিজের অনেক কষ্ট উপস্থিত হইত।

ধর্ম্মবন্ধুগণের নিকট নিজের জন্য তিনি ভিক্ষা করিয়াছেন, তথাপি রাজভাণ্ডারের ধনের উপর কদাপি নির্ভর করেন নাই। আমরা স্বচক্ষে দেখিয়াছি, রেলগাড়ীর যে শ্রেণীতে রাজার খানসামা চাকর বসিয়া আছে, রাজার শ্বশুরও প্রচারযাত্রা হইতে সেই শ্রেণীর গাড়ীতে তাহাদের সঙ্গে বসিয়া বাড়ী ফিরিতেছেন। ধনলোভী হইয়া ধর্ম্মনীতিকে বিসর্জ্জন দিয়া যে তিনি বিবাহ দেন নাই, জীবনই তাঁহার সাক্ষী। এইরূপ নিঃস্বার্থ ভাব থাকাতেই তিনি সাহসপূর্ব্বক বলিয়াছিলেন, "এ বিবাহ অন্যে দিলে আমি তাহার প্রতিবাদ করিতাম"। "তেজীয়সাং ন দোষায়" কথার যদি কিছু উচ্চ অর্থ থাকে, তবে তাহা এখানে ছিল।

আচার্য্য কেশবের এই ধারণা ছিল যে, তিনি গবর্ণমেণ্টের সঙ্গে সকল কথা স্থির করিয়াছেন, ইহাতে আর কোন বিঘ্ন ঘটিবে না। এই বিশ্বাসে কন্যাকে স্বীয় ভবনে পাত্রস্থ করেন, প্রার্থনা করিয়া উভয়ের সঙ্গে উভয়কে মিলাইয়া দেন। বিবাহ-পদ্ধতির পরিবর্ত্তন এবং অনুষ্ঠানের বিকৃতি তাহার পরের ঘটনা, সুতরাং তিনি প্রবঞ্চিত ও অপমানিত হইয়া শেষ বহু কষ্ট পাইলেন।

প্রতিবাদকারিগণ এই কয়টি দোষ দিয়াছিলেন যে, কন্যার বয়ঃক্রম সাড়ে তের, পাত্রের সাড়ে পনের, অতএব ইহা বাল্য-বিবাহ, এবং কেশববাবু ধনের লোভে পৌত্তলিকতার প্রশ্রয় দিয়াছেন। ইহা ব্যতীত আরও অনেক নীচ অভিপ্রায় তাঁহার উপর আরোপিত হইয়াছিল। যাহাই হউক, কেশবচন্দ্র যাহা

ঈশ্বরাদেশ বলিয়া বুঝিতেন, তাহা মনুষ্যের কথায় ছাড়িয়া দিতেন না। অটল তাঁহার বিশ্বাস এবং সুদৃঢ় তাঁহার সঙ্কল্প। বিবাহটি যদি বিধাতার আদেশেই হইয়াছে, তবে তাহাতে এত বিঘ্ন ঘটিল কেন? তাহার উত্তরে তিনি এক স্থানে লিখিয়া গিয়াছেন, "ঈশ্বর ইহা আদেশ করেন, সুতরাং আচার্য্য প্রতিবাদ এবং পরীক্ষা সত্বেও বিশুদ্ধ প্রণালী অনুসারে তাহা সম্পাদনের জন্য চেষ্টা করিলেন। কিন্তু অন্য পক্ষের হাতে পড়িয়া সে প্রণালী পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল এবং বিধাতার বিধানে মানবীয় অপূর্ণতা দোষ মিশ্রিত হইয়া উহার সৌন্দর্য্য নষ্ট করিয়া ফেলিল।"

বিবাহ দিয়া বাড়ী আসিয়া দেখিলেন, কলিকাতায় মহা পরীক্ষার অগ্নি প্রজ্বলিত। বিপক্ষেরা তাঁহাকে বেদীচ্যুত করিবে, মন্দির কাড়িয়া লইবে, এবং মন্দিরের ট্রাষ্টি নিযুক্ত করিবে বলিয়া প্রতিজ্ঞারূঢ় হইয়াছে। অন্তরে বাহিরে লোকগঞ্জনা ও উৎপীড়ন। বিপদন্ধকারে যেন চারিদিক্ আচ্ছন্ন করিল। এত গঞ্জনা সহিয়া তিনি যে বিবাহ দিলেন, সে বিবাহ বিপদ পরীক্ষাকে আরও ঘনতর করিয়া তুলিল। রাজকর্ম্মচারীরা তাঁহাকে এক জন সামান্য লোকের মত জ্ঞান করিয়া যথেচ্ছা ব্যবহার করিয়াছিল। অতঃপর প্রতিবাদীদিগের উত্তেজনায় তিনি আচার্য্যের পদ পরিত্যাগে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। ব্রহ্মমন্দিরে তজ্জন্য সভা হইল। প্রকাশ্য সভায় ত্যাগপত্র লিখিয়া দিলেন; কিন্তু তাহাতে বিপক্ষের ক্রোধ বৃদ্ধি হইল। কেহ কুবাক্য বলে, কেহ কর্ম্মচ্যুত করিতে

চায়, যে কোন কালে মন্দিরে আসে না, সেও বলে আমি ব্রাহ্ম, মহা গণ্ডগোল। ঠিক যেন দক্ষযজ্ঞের ব্যাপার। শেষ মারামারি হইবার উপক্রম হইল। যাঁহারা শিষ্যস্থানীয়, তাঁহারা পর্য্যন্ত আচার্য্যের মুখের উপর কটু কথা প্রয়োগ করিলেন। অপর লোকেরা, বিশেষতঃ ছাত্রেরা তদুপলক্ষে মন্দিরমধ্যে বড় উৎপাত করিয়াছিল। এমনি দৌরাত্ম্য আস্ফালন হুঙ্কার গর্জ্জন, মনে হইল, বুঝি দ্রব্যাদির সহিত মন্দির চূর্ণ হইয়া যায়। কেশব-সভাপতিকে অগ্রাহ্য করিয়া বিপক্ষদলের জনৈক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি সভাপতি হইলেন এবং আপনারা কতকগুলি প্রস্তাব নির্দ্ধারণ করিয়া লইলেন। কেশবচন্দ্র প্রচারক বন্ধুগণের সহিত পার্শ্ব গৃহে চলিয়া গেলেন। কারণ, সে অবস্থায় শান্তভাবে রীতিপূর্ব্বক কার্য্য-নির্ব্বাহের কোন আশা ছিল না।

পরে সংবাদপত্রে, নাটকে, বক্তৃতায় এমন সব কথা বাহির হইতে লাগিল যে, তাহা শুনিলে কর্ণে হস্তার্পণ করিতে হয়। এত উৎপীড়ন অবমাননা কিসের জন্য? কেশবচন্দ্র কি এত অপরাধ করিয়াছিলেন? অপরাধ তাঁহার এই, তিনি সমাজের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি। ধর্ম্মমত-প্রচার, ব্রহ্মমন্দিরের কার্য্যনির্ব্বাহ, আরও অন্যান্য অনেক বিষয়ে তাঁহার আধিপত্য যথেষ্ট হইয়াছিল। সমাজের মঙ্গলার্থ যে কিছু কার্য্য যখন আবশ্যক বোধ করিতেন, তখন তিনি তাহাতে কাহারো কথা শুনিতেন না। এ সমস্ত কার্য্যে তাঁহার পক্ষে কতকগুলি ব্রাহ্ম চিরদিন সহায়তা করিয়া আসিয়াছেন।

একদল ব্রাহ্ম ভারতাশ্রমের বিবাদের সময় হইতে কেশবচন্দ্রের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হন। তাঁহাদের প্রতিবাদ এবং বিরুদ্ধাচরণের কথা আমরা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। বিবাহের পূর্ব্বেই একটি বিরোধী দল বর্ত্তমান ছিল। তদনন্তর যখন বিবাহ-ক্রিয়া সম্বন্ধে তাঁহারা নানাবিধ মন্দ কথা শুনিলেন, তখন সকলে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন। "ব্রাহ্মসমাজের নেতা হইয়া বাল্য-বিবাহ অনুমোদন করেন? বিবাহপ্রণালীতে তিনি পৌত্তলিকতার প্রশ্রয় দেন? আপনি বিবাহের আইন বিধিবদ্ধ করিয়া আপনিই তাহা অগ্রাহ্য করেন? ইহা ভয়ানক পাপ। অন্যায় কার্য্যের প্রতিবাদকারীদিগকে আবার অল্পবিশ্বাসী নিন্দুক বলেন? তাহাদের প্রতিবাদপত্রের উত্তর দেন না? দেখিব কেমন তিনি বড় লোক!" এই বলিয়া কতকগুলি ব্যক্তি ক্ষেপিয়া দাঁড়াইল, এবং বিবিধ উপায়ে দেশের লোকদিগকে উত্তেজিত করিয়া তুলিল। এক জন লোকের বিপক্ষে এত আন্দোলন ব্রাহ্মসমাজে আর দেখা যায় নাই। আন্দোলনকারীদিগের মধ্যে অনেক শিক্ষিত এবং সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ছিলেন। বিশেষতঃ বিবাহের কার্য্য দৃশ্যতঃ যেরূপ দোষজনক হইয়াছিল, তাহাতে সহজেই লোকে মন্দ অভিপ্রায় আরোপ করিবার অবসর পাইল। পৃথিবীর অধিকাংশ সভ্য এবং ভদ্রাভদ্র লোক যে কার্য্যে অন্যায় বোধ করে, তাহা যে সকল সময় অন্যায়, তাহা নহে। অথচ দশের মুখে ভগবান্ কথা কহেন, এ কথাও প্রচলিত বটে। দশ জনে যাহা মন্দ বলে, সে কাজ কেশব বাবু ধার্ম্মিক লোক

হইয়া কেন করিলেন? অবশ্য তাঁহার ইহাতে কোন নীচ অভিসন্ধি আছে, এইরূপ সকলে মনে করিতে লাগিল। বস্তুতঃ কেশবচন্দ্র যে ভাবে বিবাহে সম্মতি দেন, তাহা সাধারণের পক্ষে সন্তোষজনক নহে। প্রতিষ্ঠিত নিয়ম এবং অক্ষর ছাড়িয়া এ স্থলে কেবল তিনি ধর্ম্মভাব রক্ষার জন্য চেষ্টা পাইয়াছিলেন। সেই ভাব লইতে লইতে, শেষ বাধ্য হইয়া আপত্তিজনক প্রণালীর এত নিকটে গিয়া উপস্থিত হন যে, তাহাতে অপর সংসারাসক্ত মায়া-বদ্ধ জীবেরা তাঁহাকে আপনাদের মত এক জন বিষয়ী লোক বলিয়া বিশ্বাস করিবার সুযোগ পাইল। সুতরাং তাঁহার সদভি-প্রায় সহজে কেহ বুঝিতে পারিল না। আর একটী কথা এই, সংস্কারক নব্যদল বিবাহ সম্বন্ধে যে আদর্শ অনুকরণ করেন, কেশবচন্দ্রের সে আদর্শ নহে। পৃথিবীর প্রচলিত নীতিশাস্ত্রও সকল সময় তাঁহার পরিচালক ছিলনা। আদেশবাদ অনুসারে তিনি অনেক সময় অনেকানেক বিষয়ে অক্ষর পরিত্যাগপূর্ব্বক উচ্চ নীতির অনুসরণ করিতেন; এইজন্য এত প্রভেদ লক্ষিত হইত। তবে কি তিনি প্রচলিত নীতির সাধারণ মূল সত্যের বিরুদ্ধে উপরিউক্ত উচ্চ নীতি পালন করিতেন? তাহাও নহে। সাধারণ নীতির মূল মত তিনি ঈশ্বরাদেশ বলিয়া জানিতেন। বিবাহসম্বন্ধে তাহার প্রতি স্থির দৃষ্টি রাখিয়া, আবান্তরিক বিষয়ে পাত্রপক্ষীয় হিন্দু অভিভাবকগণের ইচ্ছায় যোগ দান করেন। অবশ্য তিনি পরমধার্ম্মিক ভক্তপাত্র অন্বেষণ করেন নাই। কেবল পাত্রের পরিশুদ্ধ নৈতিক চরিত্র এবং

কন্যার ভাবী কল্যাণের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া, ঈশ্বরের মঙ্গলাভিপ্রায়-সাধনের জন্য বিবাহ দেন। দ্বিতীয়া কন্যার বিবাহেও এই রীতি অবলম্বন করিয়াছিলেন। ফলতঃ বিবাহটি যে সম্পূর্ণ-রূপে ব্রাহ্মসমাজের প্রচলিত প্রণালী অনুসারে হইবে না, তাহা তিনি অগ্রেই জানিতেন। এ বিবাহ বাগ্‌দান স্বরূপ; তাহার কার্য্যপ্রণালী অপৌত্তলিকভাবে ব্রহ্মোপাসনার সহিত হইলেই ধর্ম্মনীতি রক্ষা পাইবে, এই বিশ্বাস তাঁহার ছিল। প্রথম নিয়মটিতে কোন ব্যতিক্রম ঘটে নাই। পূর্ণ বয়সে অর্থাৎ বিবাহের আড়াই বৎসর পরে ব্রহ্মমন্দিরে উপাসনান্তে রাজা ও রাণী প্রকৃত বৈবাহিক জীবনে প্রবেশ করেন এবং স্বামী স্ত্রীর সম্বন্ধে মিলিত হন। দ্বিতীয় নিয়মটিতে অনেক ব্যতিক্রম ঘটিয়াছিল।

বিষয়টি যেরূপ গুরুতর এবং জটিল, প্রকৃত অবস্থা আমরা কত দূর অবধারণ করিতে সক্ষম হইলাম, নিরপেক্ষ পাঠকগণ তাহা বুঝিতে পারিবেন। আচার্য্যমুখে সময়ে সময়ে এ সম্বন্ধে যাহা শুনিয়াছি এবং তাঁহার হস্তাক্ষর যাহা পড়িয়াছি এবং প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত স্বচক্ষে যেরূপ দেখিয়াছি, সংক্ষেপে তদ্বিবরণ আমরা বর্ণন করিলাম। এ বিষয়ে আচার্য্য আপনার মূল ধর্ম্মবিশ্বাস পরিত্যাগ করেন নাই। যদিও ঘটনাচক্রে পড়িয়া তিনি সাধারণের নিকট অপরাধী হন, কিন্তু সে অপরাধ তাঁহার ইচ্ছাপ্রসূত নহে। তথাপি লোক-সমাজে তাঁহাকে অতিশয় নিন্দনীয় হইতে হইয়াছিল। তাঁহার গুপ্ত এবং প্রকাশ্য

জীবনের দোষ ক্রটি জগতে প্রচার করিবার জন্য কতকগুলি লোক একবারে যেন প্রতিজ্ঞারূঢ় হন। আন্দোলনের স্রোতে পড়িয়া অনেক নিরপেক্ষ ন্যায়বান্ ব্যক্তিও তাঁহাকে অবিশ্বাস করিয়াছিলেন। কেশবচন্দ্রের ধর্ম্মোপদেশ, ক্ষমতা ও প্রতিভা সকলেরই নিকট প্রশংসনীয়, কিন্তু তাঁহার সাধুতা এবং আধ্যাত্মিক মহত্ত্ব সম্বন্ধে পূর্ব্বের ন্যায় বিশ্বাস শ্রদ্ধা আর তাঁহাদের রহিল না। অতি নিকটস্থ ধর্ম্মবন্ধুদিগের মন পর্য্যন্ত সংশয়ান্বিত হয়। কেবল অল্পসংখ্যক ধর্ম্মপিপাসু কতিপয় বন্ধু এরূপ অবিশ্বাস করেন নাই। কিন্তু তন্মধ্যেও কাহারো কাহারো মন অত্যন্ত বিরক্ত এবং ক্ষুব্ধ হইয়াছিল। অন্য দ্বিতীয় ব্যক্তি সে অপবাদের মুখে এক দিনও দাঁড়াইতে পারে কি না সন্দেহ। কেশবচন্দ্রের অটল ধৈর্য্য সহিষ্ণুতা ও দুর্জ্জয় বিশ্বাস ছিল, তাই রক্ষা; নতুবা ঘোর আন্দোলনে তাঁহার মন অবসন্ন হইয়া পড়িত। কতক নিন্দা অপবাদ সহ্য করিলেন, কতক বা খণ্ডন করিলেন, কিন্তু কিছুতেই পৃথিবীর শত্রুতার হ্রাস হইল না। বাগ্দানের নিয়ম রক্ষা হয় কি না, তিনি রাণীকে নিজভবনে রাখিয়া রাজভাণ্ডারের অর্থসাহায্য লন কি না, পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিপক্ষদল এই সকল বিষয় অনুসন্ধান করিতে লাগিল। এমন কি, রাজপুরুষদিগের মনে অবিশ্বাস জন্মাইবার জন্য, তাঁহার বিরুদ্ধে এক অস্বাক্ষরিত পত্র প্রেরিত হয়। পুলিসকর্ম্মচারী তাহার তদন্ত পর্য্যন্ত করেন। শেষ কড়ায় গণ্ডায় হিসাব করিয়া যখন তিনি মাসে মাসে জমা খরচ দিতে লাগিলেন, তখন কর্ত্তৃপক্ষের সকল সংশয় বিদূরিত হইল।

মহারাণীর শিক্ষয়িত্রী এক বিবি ছিলেন, তাঁহার অত্যাচার দুর্ব্যবহারেও কেশবচন্দ্রের প্রাণ জর্জ্জরিত হইয়াছিল। তিনি গোপনে গোপনে আচার্য্য মহাশয়ের বিরুদ্ধে কুচবিহারের কর্ত্তৃপক্ষকে পত্র লিখিতেন। তদনুসারে ডেপুটী কমিসনর মহাশয় তাঁহাকে একবার ভয় প্রদর্শন করেন যে, তোমার নামে গ্লানি প্রচার করিব। কোন কোন বিষয়ে তিনি দোষারোপও করেন। তাহার উত্তরে কেশবচন্দ্র এমন সাহস প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, সেই হইতে উক্ত ডেপুটি কমিসনর আর সেরূপ অভদ্র পত্র লিখেন নাই। একদিকে শিক্ষয়িত্রী এবং রাজপুরুষগণ, অপরদিকে বিপক্ষদল, ইহার মধ্যে পড়িয়া কেশব বহু কষ্ট সহ্য করিলেন। সপ্ত রথীতে ঘেরিয়া যেমন অভিমন্যুকে ব্যতিব্যস্ত করিয়াছিল, তদ্রূপ এই ব্যাপারটি।

পরিশেষে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের কতকগুলি সভ্য স্বতন্ত্র হইয়া "সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ" নামে এক দল বাঁধিলেন। প্রতিদ্বন্দ্বী ব্রাহ্মদল প্রথমে ব্রহ্মমন্দির অধিকার করিবার চেষ্টা করেন। তাঁহারা কেশবচন্দ্রকে পদচ্যুত করণার্থ আপনা আপনির মধ্যে যে নির্দ্ধারণ করিয়াছিলেন; তদনুসারে উক্ত মন্দির এক দিন বলপূর্ব্বক আক্রমণ করিলেন। তাহাতে কিছু ফল হইল না দেখিয়া, রবিবার সন্ধ্যায় নিজেরা উপাসনা করিবেন বলিয়া কৃতসঙ্কল্প হন; তাহাতেও কোন ফল দর্শিল না। কেশবচন্দ্রের পক্ষেও বহুলোক সহায় ছিল। এক জন প্রচারক বেদীতে বসিয়া রহিলেন, তিনি নামিলেই অপর দলের ব্রাহ্ম উপাচার্য্য তাহাতে

বসিবেন, কিন্তু তিনি নামিলেন না। বিপক্ষগণ শেষ নীচে বসিয়া উপাসনা করিবার আয়োজন করিলেন। কাজেই তাহা নিষ্ফল করিবার জন্য কেশবানুচরগণ "দয়াল বল জুড়াক হিয়া রে।" কীর্ত্তন ধরিয়া দিলেন। পুলিসপ্রহরী শান্তিরক্ষার জন্য তথায় উপস্থিত ছিল, তজ্জন্য নিয়মিত উপাসনার কেহ ব্যাঘাত করিতে পারিল না। সে দিন ব্রহ্মমন্দির যুদ্ধক্ষেত্ররূপে পরিণত হইয়াছিল। ধর্ম্মের নামে অনেক আসুরিক আচরণ দেখা গিয়াছিল। আক্রমণ-কারিগণ উপাসনার শেষে আর অধিক ক্ষণ থাকিতে পারিলেন না, পুলিসের উত্তেজনায় বাহিরে যাইতে বাধ্য হইলেন। কেশব বাবুর মন্দির বলিয়াই লোকে জানিত, ট্রাষ্টী নিযুক্ত না হওয়াতে তাহার দলিল তাঁহার নামেই ছিল, সুতরাং পুলিস তাঁহার দলের বিরুদ্ধে কোন অশান্তিকর উপদ্রব ঘটিতে দেয় নাই।

তদনন্তর প্রতিবাদকারিগণ ট্রাষ্টী-নিয়োগ এবং ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের কর্ম্মচারী পরিবর্ত্তন ইত্যাদি অভিপ্রায়ে সম্পাদককে আবেদন করিলেন। সম্পাদক কেশবচন্দ্র মন্দিরের চাঁদাদাতৃগণকে তদনুসারে আহ্বান করেন। তাঁহার পক্ষীয় বহুসংখ্যক সভ্য আবার এইরূপ সভা আহ্বানের বিরোধী হইয়া সম্পাদককে আর এক আবেদন পত্র পাঠাইলেন। অস্থির অবস্থায় সভা ডাকিলে কোন ফল হইবে না ভাবিয়া, কর্ম্মচারিগণ কাল বিলম্ব করিতে লাগিলেন। ট্রাষ্টী-নিয়োগ বিষয়ে যে দিন নির্দ্দিষ্ট ছিল, তাহার পূর্ব্বে অতি অল্পসংখ্যক ব্যক্তির নাম তাঁহাদের হস্তগত হয়। তদ্দর্শনে তাঁহারা বিজ্ঞাপন দিলেন, নির্দ্দিষ্ট সময়ের পরে আর

কাহারো নাম গ্রহণ করা যাইবে না। সুতরাং চাঁদাদাতৃগণের সভা রীতিমত হইবার আর কোন আশা রহিল না। তখন গণ্ডগোল নিষ্পত্তি হইয়া গেল। ইহার পূর্ব্বেই প্রতিবাদকারী দল স্বতন্ত্র সমাজ সঙ্গঠন করেন। কেশবচন্দ্র তৎকালে সহকারী সম্পাদক প্রতাপচন্দ্র মজুমদারের দ্বারা এক খানি পত্র লিখাইয়া এই বলেন যে, "আপনারা ব্যক্তিবিশেষের প্রতি বিরক্ত হইয়া কেন স্বতন্ত্র সমাজ গঠন করিবেন? আমাদের সঙ্গে আপনাদের মতের ত কোন প্রভেদ নাই। কার্য্যপ্রণালীর পরিবর্ত্তন বা সংশোধন আবশ্যক হয়, রীতিমত সভা ডাকিয়া যথানিয়মে তাহা সম্পাদন করুন। সভা আহ্বানের সময় আমাদের স্থির করিবার অধিকার আছে। উত্তেজনার সময় তাহাতে কোন ফল হইবে না, এই জন্য বিলম্ব করা যাইতেছে। অতএব দল ভাঙ্গিবেন না। যে কোন বিষয়ে প্রস্তাব থাকে, তাহা আপনারা সভায় আসিয়া করুন। ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত বিধি নিয়মানুসারে সকলের সঙ্গে এক হইয়া কার্য্য করিতে পরাঙ্মুখ নহে।"

তখন আর এ সকল কথা কে গ্রাহ্য করে? যুবকগণ অগ্নির অবতার হইয়া উঠিয়াছেন। তাঁহাদের ইচ্ছা ছিল, কেশব বাবু কুচবিহার বিবাহ সম্বন্ধে সাধারণের নিকট দোষ স্বীকার-পূর্ব্বক ক্ষমা প্রার্থনা করেন, তাহা হইলে সকলে একত্রে থাকিবেন। তাহা তিনি করিলেন না, বরং প্রতিবাদকারীদিগকে অনুতাপ করিতে বলিলেন। এক স্থানে তাঁহার এই রূপ একটী

প্রার্থনা আছে, "যত বাণী ধরিতে পারিয়াছি, প্রত্যেকটীই অভ্রান্ত সত্য দৈববাণী। কখন দেখিলাম না, ব্রহ্মবাণী কল্পনা করিয়া ভ্রম হইল। এক দিনের জন্যও অনুতাপ হইল না।" বিশেষ কোন কার্য্যের জন্য কখন তাঁহাকে কেহ অনুতাপ করিতে বা ক্ষমা চাহিতে দেখে নাই। কর্ম্মবিশেষের নিমিত্ত নিজদোষ তিনি স্বীকার করিতেনই না। সকল প্রকার জঘন্য পাপের মূল তাঁহাতে আছে, এই মাত্র কেবল বলিতেন। অতঃপর বিপক্ষ ব্রাহ্মদল কিছুতেই সন্তুষ্ট না হইয়া অতি ব্যস্ততার সহিত ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে অর্থাৎ উক্ত বিবাহের চারি মাসের মধ্যে স্বতন্ত্র সমাজ স্থাপন করিলেন। তাহাতে ইংরাজি বাঙ্গালা পত্রিকা প্রচার, বেতনভোগী প্রচারক নিয়োগ, সাপ্তাহিক মাসিক উপাসনা এবং বার্ষিক উৎসব সমস্তই চলিতে লাগিল। প্রথম প্রথম হিন্দু মুসলমানের ন্যায় উভয়ের মধ্যে সম্বন্ধ দাঁড়াইয়াছিল। নূতন দল পুরাতন দলের সঙ্গে আদান প্রদান, আহার পান এবং উপাসনায় যোগ রাখিবেন না, এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন। পরস্পরের মুখদর্শন পর্য্যন্ত বন্ধ হইয়াছিল। নব্যদলস্থ ব্রাহ্মগণ সেই উদ্যমে অনেক কার্য্যও করিয়া ফেলিলেন। পরিশ্রমে, অর্থে ও লোকবলে যে সকল কার্য্য হইতে পারে, তাহাতে কৃতকার্য্য হইলেন। উপাসনালয়, বিদ্যামন্দির, পুস্তক-পত্রিকা-প্রণয়ন, লোকসমারোহ কিছুরই ত্রুটি রহিল না। এক পরিবারেরই লোক, যাঁহারা ভারতাশ্রম, ব্রহ্মমন্দির, কলুটোলার ভবনে এক সঙ্গে এত দিন সাধন ভজন এবং অবস্থান করিতেন, তাঁহাদেরই কয়েক জন

লোক নূতন দলের প্রধান নেতা হইলেন। এইরূপে যখন স্বতন্ত্র সমাজ হইল, তখন মতভেদ ত কিছু চাই। ব্যক্তিবিশেষের কন্যার বিবাহের অবৈধতা হইতে আর ত দুইটি দল হইতে পারে না। কিন্তু ব্যক্তিগত বিদ্বেষ সাধারণ মতদ্বৈধ সহজেই ঘটাইতে পারে। তাহাই হইল। মহাপুরুষ, বিশেষ কৃপা, আদেশ, বিধান, ধ্যান যোগ ভক্তি বৈরাগ্য এই সকল বিষয়ে উভয়ের মধ্যে কার্য্যতঃ কিছু প্রভেদ ছিল, তখন স্পষ্টতঃ তাহা মতভেদরূপে প্রকাশ হইয়া পড়িল। কার্য্যগত প্রভেদই এখানে শেষ মতগত প্রভেদ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। পরে কেশবচন্দ্র যাহা কিছু নূতন অনুষ্ঠান আরম্ভ করিলেন, তাহারই প্রতিবাদ হইতে লাগিল। অবশেষে ইহার জন্য নববিধান পর্য্যন্ত নব্যদলের ঘৃণার বিষয় হইয়া পড়িয়াছিল। এই বিবাদ বিচ্ছেদ হইতে অনেক সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান হইয়াছে। যাঁহারা এত কাল কেশবচন্দ্রের সমকক্ষ বা প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া স্বাধীনভাবে কার্য্য করিতে পারিতেন না, তাঁহারা এক্ষণে হাত পা ছড়াইয়া স্ফূর্ত্তির সহিত পরিশ্রম করিতে লাগিলেন। সেই উৎসাহ ও পরিশ্রমে একটি প্রশস্ত উপাসনামন্দির, একটি উচ্চশ্রেণীর কলেজ, দুই তিন খানি সংবাদপত্রিকার সৃষ্টি হইয়াছে। কতকগুলি ধর্ম্মপ্রচারক এবং উদ্যমশীল কর্ম্মীও দেশে বিদেশে নানা কার্য্য করিয়াছেন। কিন্তু ইহাঁদের দ্বারা ধর্ম্মের উচ্চ এবং গভীর আধ্যাত্মিক অঙ্গের হানি দেখিয়া, কেশবচন্দ্র অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইয়াছিলেন। বহুসংখ্যক ব্রাহ্মবন্ধু প্রকাশ্য রূপে ঐ দলে মিশিলেন, এবং কতকগুলি ব্যক্তি গুপ্ত-

ভাবে তাঁহাদের সহিত সহানুভূতি করিতে লাগিলেন; কিন্তু ভক্ত সাধক ব্রাহ্মমণ্ডলী সমস্তই প্রায় কেশবের পক্ষে রহিয়া গেলেন। তন্মধ্যে অল্পসংখ্যক যাঁহারা বিপক্ষ, তাঁহারাও শত্রুবেশে তাঁহারি ভাব ও মত প্রচার করিতে লাগিলেন। প্রতিবাদকারীরা কোন দিন যে ভক্ত যোগী সাধক ব্রাহ্ম হইবেন, এরূপ আশা অতি অল্পই ছিল। নব্যদলের বুদ্ধি বল উৎসাহ ক্ষমতাপ্রভাব যাহা এক্ষণে প্রকাশ পাইতে লাগিল, তাহাতেও কেশবপ্রভাব বহু পরিমাণে বিদ্যমান ছিল। এইরূপে কেশবচন্দ্রই আধ্যাত্মিক মহত্বে সর্ব্বোপরি রহিয়া গেলেন। সে রাজ্যের প্রতিযোগী সমকক্ষ কেহ হইতে পারে নাই। পরে নব্য সম্প্রদায় যে পরিমাণে উচ্চতর আধ্যাত্মিক সাধনে সিদ্ধ হইয়াছেন, সেই পরিমাণে কেশবচন্দ্রের সঙ্গে তাঁহাদের ঐতিহাসিক নিকট যোগ বর্ত্তমান রহিয়াছে। দলাদলি সম্বন্ধে তৎকালীন রবিবাসরীয় মিরারের এক স্থানে এই ভাব তিনি ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন ঃ—

প্রশ্ন। ব্রাহ্মসমাজে আরো দল বৃদ্ধি হইবার কি সম্ভাবনা আছে?

উত্তর। অপরিসীম স্বাধীনতার উপর স্থাপিত যে ব্রাহ্মসমাজ, তাহাতে দল হওয়া কেবল সম্ভব নহে, অবশ্যম্ভাবী। উন্নতিশীল স্বাধীন ব্রাহ্মদিগের মধ্যে ইহা বিশেষরূপে সত্য। সময়ে তাহাদের বিশেষ বিশেষ মত এবং রুচির যেরূপ বিকাশ হইবে, সেই পরিমাণে নিশ্চয় তাহারা দল করিবে। আমাদের মধ্যে সামাজিক, প্রেততত্ত্ববাদী, বিষয়ী, রাজনৈতিক, সংশয়ী, জড়বাদী এবং অন্য

প্রকারের ব্রাহ্মদল হইবে। কিন্তু পরস্পারের বিরুদ্ধে সম্প্রদায়-সঙ্গঠন ব্যক্তিগত বিদ্বেষ শত্রুতার উপর নির্ভর করিবে। সত্য ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রেমের ধর্ম্ম; ইহা সাম্প্রদায়িক ভাবকে পোষণ বা উৎসাহ দান করিতে পারে না। ইহা সাম্প্রদায়িকতাকে পাপ জানিয়া, বিবিধ দলস্থ লোকের বিচিত্রতা ও ভিন্ন মতে সহিষ্ণু হইবে। ব্যক্তিবিশেষের প্রতি বিদ্বেষপরতন্ত্র লোকেরা নিশ্চয় দলাদলি করিবে। কিন্তু ক্রোধের পরিবর্ত্তে প্রেম ও দয়ার উদয় হইলে, সে ভাব চলিয়া যাইবে।

প্র। ভিন্ন ভিন্ন ব্রাহ্মদলের মধ্যে পুনর্ম্মিলনের কি আশা আছে?

উ। আছে। প্রকৃত এবং সার্ব্বভৌমিক ব্রাহ্মধর্ম্ম মানিলে আমরা নিশ্চয় একত্রিত হইব। যাহারা ব্রাহ্ম নহে, কিন্তু সাম্প্রদায়িক, তাহারা এক হইতে পারে না, চাহে না। ব্যক্তিগত বিদ্বেষ প্রশমিত হইলে, সব ঠিক হইয়া যাইবে। সমস্ত প্রধান প্রধান ব্রাহ্মদিগকে লইয়া একটী সভা হউক। তাঁহারা এইরূপ প্রতিজ্ঞা করুন যে, যাহা কিছু ভিন্নতা থাক্, আমরা সাধারণ হিতের জন্য সর্ব্বদা একত্রিত হইব।

প্র। বিরুদ্ধ পক্ষের সমাজ (সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ) কত দিন থাকিবে?

উ। যত দিন জ্ঞানের ধর্ম্ম, ব্যক্তিগত হিংসা বিদ্বেষ এবং প্রচুর পরিমাণে অর্থ থাকিবে, তত দিন।

নব্য দলের মধ্যে কেশবের অনুচর ভক্তিশিক্ষার্থী ছাত্র বিজয়-

কৃষ্ণ গোস্বামী এক জন অগ্রগণ্য ছিলেন। গুরুত্যাগী গোস্বামী মহাশয় এই আন্দোলনের এক জন প্রধান পৃষ্ঠপোষক হইয়া, কয়েক বৎসর পরে একেবারে ব্রাহ্মধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়াছেন। শেষজীবন তাঁহার অতিশয় শোচনীয়, ইহা পূর্ব্বজীবনের সম্পূর্ণ প্রতিবাদ। যাহা হউক, কেশবচন্দ্রের নেতৃত্ব অস্বীকার করিয়া এইরূপে তাঁহারা প্রকাশ্যরূপে স্বতন্ত্র সমাজ গঠন করিলেন। উন্নতিশীল ব্রাহ্মসমাজ দুই দলে বিভক্ত হইল। নূতন দলের সঙ্গে সহানুভূতি করিবার জন্য যে সকল ব্যক্তি ছিলেন, তন্মধ্যে প্রধান আচার্য্য দেবেন্দ্র বাবু মহাশয় একজন প্রধান। তিনি স্বয়ং উপরি উক্ত "সাধারণ" নাম নির্ব্বাচন করিয়া দেন, এবং সাধারণ সমাজের উপাসনালয়নির্ম্মাণার্থ প্রায় দশ বার হাজার টাকা দান করেন। সুতরাং কেশবচন্দ্রের বিপক্ষতা বিষয়ে আদি এবং সাধারণ উভয় সমাজ সম্মিলিত হইয়াছিলেন। এক দিকে প্রচুর ধন-জনবল, অপর দিকে কতিপয় দীনাত্মা বন্ধুর সহিত কেশবচন্দ্র ; তথাপি তিনি ভীত নহেন। সেই বিপদের সময় যে কয় জন পুরাতন ধর্ম্মবন্ধু তাঁহার সঙ্গে ছিলেন, তাঁহাদিগকে তিনি পরীক্ষিত সহযোগী বলিয়া স্বীকার করিয়া গিয়াছেন।

বিচ্ছেদের পর প্রায় বৎসরাবধি তুমুল আন্দোলন চলিয়াছিল। তদ্দ্বারা কেশবচন্দ্রের জীবন অগ্নি-পরীক্ষায় পরীক্ষিত হয়। অনেক দিনের বন্ধুরা দলে দলে ছাড়িয়া চলিয়া গেল, একটু দয়া করিতেও কেহ চাহিল না ; অধিকন্তু তাহারা তাঁহাকে অর্থলোভী প্রবঞ্চক বলিয়া ঘোষণা করিতে লাগিল। এ সকল দেখিয়া শুনিয়া তিনি

নিতান্ত ম্রিয়মাণ হইলেন। দুঃখ বিষাদে চিত্ত অধীর হইল। তাহার উপর আবার উৎকট পীড়ার আক্রমণ। কয়েক মাস সঙ্কট ব্যাধিতে শয্যাগত ছিলেন। তৎকালকার রবিবাসরীয় মিরারে যে সকল প্রার্থনা মুদ্রিত আছে, তাহা পাঠ করিলে বুঝিতে পারা যায়, কি ভয়ানক দুঃখানল তাঁহার মনে জ্বলিয়াছিল। দীনতা, অসহায়তা এবং দুঃখ ব্যাকুলতায় সে সকল পরিপূর্ণ। বাহিরের অবস্থা দর্শনে মনে হইত, মহামেঘে শারদীয় পূর্ণ শশধরকে যেন গ্রাস করিয়া ফেলিয়াছে। প্রতিষ্ঠিত দেশবিখ্যাত সাধুতায় কে যেন ঘৃণা অভিশাপের গরল ঢালিয়া দিয়াছে। নিঃস্বার্থ জগৎহিতৈষী যিনি, তাঁহার উপর কি না অর্থলালসা ও নীচ কামনার দোষারোপ! এতদিন তাঁহার বিরুদ্ধে অন্যান্য দোষ ঘোষিত হইয়াছিল, কিন্তু বৈরাগ্য সম্বন্ধে কেহ কিছু বলিতে সাহস করে নাই; এক্ষণে রাজার সহিত কন্যার বিবাহ দেওয়াতে, সেই জঘন্য দোষের কথা যে সে বলিতে লাগিল। ইহা কি তাঁহার পক্ষে সাধারণ দুঃখের কথা! এইরূপ দুঃখেই শ্রীগৌরাঙ্গদেব সন্ন্যাসী হইয়াছিলেন। প্রায় বৎসরাবধি রোগে ও মনঃক্লেশে অতিপাত হইল। বিপক্ষের আক্রমণে তাঁহার শরীর মন ভাঙ্গিয়া গিয়াছে শুনিয়া, তাহাতেই বা শত্রুদের কত আনন্দ! কাগজ পত্রে, উপদেশ বক্তৃতায় ও প্রার্থনাদিতে অবিশ্বাসী বিরুদ্ধবাদীদিগের সম্বন্ধে তিনি যে সকল কঠিন কথা তৎপরে বলিয়াছিলেন, তাহা দেখিয়া পণ্ডিত মোক্ষ-মূলারের ন্যায় উদারচিত্ত নিরপেক্ষ বন্ধুদিগের মনেও সন্দেহ জন্মিয়াছিল।

যাহাই হউক, বিবাহ আন্দোলনের পর তাঁহার জীবনের আর একটি দিক্ খুলিয়া গেল। মহৎ লোকদিগের বিপদ পরীক্ষা শেষ অধিকতর মহত্ত্বে পরিণত হয়। অনন্তর ক্ষতিপূরণের জন্য তিনি শেষ সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন। জীবনে অবশিষ্ট বিশ্বাস উৎসাহ উদ্যম যাহা কিছু ছিল, তাহা ব্রহ্মপদে ঢালিয়া দিলেন। যদিও তাহাতে শরীর ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল, তথাপি সেই ভগ্ন রুগ্ন শরীরের শেষ রক্তবিন্দু জনহিতব্রতে প্রদান করিয়া, পরিশেষে নববিধানের বিজয় নিশান উড়াইয়া, হাসিতে হাসিতে তিনি অমরালয়ে চলিয়া গেলেন।

নবোদ্যম এবং নবজীবন।

প্রেমের হরির বিচিত্র লীলাভিনয়ের গূঢ় তাৎপর্য্য মনুষ্যবুদ্ধির অগোচর। শেষ পংক্তি পর্য্যন্ত না পড়িলে তাহার মর্ম্ম বুঝা যায় না। তিনি আপনার চিহ্নিত ভক্তকে গভীর বিষাদ-যন্ত্রণা ও কঠোর নির্য্যাতনের মধ্যে ফেলিয়া,- শেষ তাঁহারই ভিতর হইতে এক অভিনব প্রেমরাজ্য আবিষ্কৃত করিলেন। পুরাতন জীবনের অভ্যন্তর ভেদ করিয়া, এক অপূর্ব্ব নবজীবন এবং নববিধান অভ্যুদিত হইল। যেমন গরল-মন্থনে অমৃতের উৎপত্তি হয়, তেমনি পরস্পর বিপরীত মতের সংঘর্ষণে নব নব তত্ত্ব বাহির হইয়া পড়িল। প্রকৃত বিবাহ কাহাকে বলে, বাল্যবিবাহের লক্ষণ কি,

আদেশবাদের কি নিগূঢ় তত্ত্ব, বিধানের অর্থ কি, আচার্য্য আপনি আপনাকে কি মনে করেন, এই সমস্ত বিষয় এক্ষণে বিস্তৃতরূপে আলোচিত হইতে লাগিল। পুত্র কন্যার বিবাহে এবং অপরাপর গৃহকার্য্যে আদেশের প্রয়োজন আছে কি না, ইহা জানিবার অবসর হইল।

উৎসাহাবতার কেশবচন্দ্র জ্বর এবং শিরঃপীড়া হইতে আরোগ্য লাভ করিয়া, নব নব কার্য্যের সূত্রপাত করিলেন। তখন তাঁহার উর্ব্বর মস্তিষ্ক এবং হৃদয়প্রস্রবণ হইতে বিচিত্র ভাবের লহরী উঠিতে লাগিল। আন্দোলন-নিপীড়িত, বিচ্ছিন্ন এবং নিরুদ্যম ভ্রাতৃমণ্ডলীকে জাগাইবার জন্য এক দিকে তিনি নিত্য উপাসনা সাধন ভজনের স্রোত খুলিয়া দিলেন, অপর দিকে নবীনতর কার্য্যানুষ্ঠান সকল আরম্ভ করিলেন। ১৮০০ শকের শারদীয় পূর্ণিমার দিবসে শারদীয় উৎসব প্রতিষ্ঠিত হইল। নৌকা এবং বাষ্পীয় তরণী আরোহণ করিয়া ব্রাহ্মগণ স্ত্রী পুত্র বালক বালিকাসহ ভাগীরথীবক্ষে হরিনাম গান করিতে করিতে চলিলেন। পুষ্প পত্র পতাকামালায় সজ্জিত হইয়া নদীবক্ষে যখন বাষ্পীয় পোত বেগে ছুটিতে লাগিল, এবং জল-কল্লোলের সহিত মৃদঙ্গ করতালসহ হরিধ্বনি উত্থিত হইল, তখনকার শোভা কি রমণীয়! অনন্তর দক্ষিণেশ্বরের ঘাটে বসিয়া সকলে উপাসনা করিলেন। শ্রীমৎ রামকৃষ্ণ পরম-হংসের সহিত প্রেমমিলন হইল। ব্রাহ্ম হিন্দু সে উৎসবে যোগ দান করেন। তদুপলক্ষে আচার্য্য গঙ্গা নদীর মহিমা বর্ণন

করতঃ যে বক্তৃতা ও প্রার্থনা করিয়াছিলেন, তাহা শ্রবণে কবিত্বরসহীন অরসিক ব্রাহ্মগণের অসূয়া ও বিদ্বেষ জাগ্রত হয়। ফলতঃ কুচবিহার বিবাহের পর যে যে নূতন কার্য্য তিনি করেন, তাহা বিরোধানলের আহুতি স্বরূপ হইয়া উঠে। কেশব বাবু এখন গঙ্গাপূজা করেন, তিনি পথে পথে রাধাকৃষ্ণের গুণ গাইয়া বেড়ান, এই কথা সকলে বলিতে লাগিল। এই সময় হইতে তিনি সৃষ্টির সৌন্দর্য্যময় এবং কল্যাণপ্রদ পদার্থের মধ্যে ভগবানের আবির্ভাব স্পষ্ট উপলব্ধি করত প্রার্থনা এবং স্তব বন্দনা করিতেন। সৃষ্টির বাহ্যাবরণ যেন তাঁহার সম্মুখে তখন উন্মুক্ত হইয়া গিয়াছিল। মানবসমাজে, বাহ্য জগতে এবং নিজ অন্তরে ঈশ্বরের ত্রিবিধ প্রকাশ তখন একাকার ধারণ করিল। শারদীয় মহোৎসব যে ধর্ম্মসমাজের পক্ষে একটি আমোদজনক মঙ্গলকর অনুষ্ঠান, মানবতত্ত্বদর্শী ব্যক্তি মাত্রেই তাহা স্বীকার করিবেন। যে ব্রাহ্মসমাজ এক সময় কবিত্বহীন বৈদান্তিক মায়াবাদের আলয় ছিল, ভক্ত কেশবচন্দ্রের গুণে সেখানে পৌরাণিক প্রেমলীলারসের স্রোত বহিতে লাগিল। তিনি নিজেও এক সময় বৈজ্ঞানিক এবং নীতিবাদী ছিলেন। এক্ষণে রূপক, উদাহরণ, উপন্যাস, গল্প, আখ্যায়িকার প্রতি অনুরাগ বাড়িল। উপাসনা প্রার্থনা আরাধনা উপদেশ ইত্যাদি যাবতীয় বিষয় কবিতা এবং কাব্যের আকার ধারণ করিতে লাগিল।

তাহার পরে রেলওয়ে ষ্টেসনে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুস্তিকা বিতরণ আরম্ভ হয়। আচার্য্য মহাশয় স্বহস্তে সময়োপযোগী দশ বার

খণ্ড বাঙ্গালা চটি পুস্তক প্রণয়ন করেন। ইহাতে কয়েকটি ছবিও অঙ্কিত হইয়াছিল। মনুষ্যসমাজকে সর্ব্ব প্রকার কর্ত্তব্য কার্য্যে উত্তেজিত করা ইহার উদ্দেশ্য। সপ্তাহে সপ্তাহে বিনামূল্যে রেলওয়ের যাত্রীদিগকে উহা দেওয়া হইত। ক্রমে একটার পর একটা এইরূপ হিতকর এবং জীবনপ্রদ কার্য্যে তিনি অগ্রসর হইতে লাগিলেন। অনন্তর সাম্বৎসবিক উৎসবের দিন আবার ফিরিয়া আসিল। "আমি কি প্রত্যাদিস্ট মহাজন ?" টাউনহলে এই বিষয়ে বক্তৃতা হয়। কেশবচন্দ্রের চরিত্রের বিপক্ষে জনসমাজে পুনঃ পুনঃ যে সকল অপবাদ ঘোষিত হইয়াছিল, তাহার অসারতা বুঝাইবার জন্য তিনি নিজমুখে সাধারণ সমক্ষে আত্ম-পরিচয় প্রদানপূর্ব্বক এবার এই বক্তৃতাটী করেন। নির্ভয়ে অথচ সরলভাবে সাধাবণকে নিম্নলিখিত কয়েকটী কথা বলিয়া-ছিলেন।

"পৃথিবীর প্রত্যাদিষ্ট মহাজনেরা মধ্যবর্ত্তী, পরিত্রাতা এবং পবিত্র লোক বলিয়া গৃহীত, আমি তাহা নহি। আমার প্রকৃতি, অস্থি, শোণিত পাপে পরিপূর্ণ। ইহা বিনয়ের কথা নহে ; সত্য কথা। সর্ব্বপ্রকার পাপের মূল আমার ভিতবে বর্ত্তমান আছে। তাহাদের নাম করিব কি ? মিথ্যা,—প্রবঞ্চনা,—নরহত্যা। প্রকৃত প্রস্তাবে এ সকল কার্য্য করি না বটে, কিন্তু তাহাতে কি ? পাপী পাপকার্য্যের দ্বারা বিচারিত হয় না, পাপপ্রবৃত্তি কুবাসনা দ্বারা তাহার বিচার হয়। পুণ্য পবিত্রতার জন্য আমি নিজেই সাধু মহাজনগণের সাহায্য প্রার্থনা করি।

"ভবিষ্যদ্বক্তা (প্রফেট) যদি আমি না হইলাম, তবে আমি কি? আমি বিশেষ লোক, সামান্য লোক নহি। এ কথা আমি দিব্যজ্ঞানে বলিতেছি। আমার চরিত্রে এবং ধর্ম্মবিশ্বাসে কিছু বিশেষত্ব আছে। চতুর্দ্দশ বর্ষ বয়ঃক্রমে যখন আমিষ ভোজন ত্যাগ করি, তখন এই বিশেষ ভাব প্রকাশ পায়। এইরূপ বিশেষত্ব কিরূপে জন্মিল? তিন জন বিশেষ মহাপুরুষের সঙ্গে দেখা হওয়াতে। জলসংস্কারক জন্ আমার প্রথম জীবনের বন্ধু। তিনি বলিলেন, 'অনুতাপ কর, কারণ স্বর্গরাজ্য নিকটবর্ত্তী।' অনুতাপ শিক্ষা দিবার জন্য ঈশ্বর তাঁহাকে আমার নিকট প্রেরণ করেন। তদনন্তর ঈশার সহিত সাক্ষাৎ হইল। 'কল্যকার জন্য ভাবিও না' তাঁহার এই বাণী আমার হৃদয়ে প্রবেশ করিল। পরিশেষে যৎকালে আমি স্ত্রী গ্রহণ করিতে উদ্যত হই, তখন প্রেরিত মহাত্মা পল্ আসিয়া বলিলেন, 'যাহাদের স্ত্রী আছে, তাহারা যেন মনে করে, তাহাদের স্ত্রী নাই।' পলের উপদেশে আমার আন্তরিক ভাবের সায় পাইয়া আমি সুখী হইলাম। এই ভাব লইয়া বৈরাগীর বেশে আমি সংসারে প্রবেশ করি। ঈশ্বর আমাকে বলিলেন, 'আমি তোমার মত, বিশ্বাস, ধর্ম্মসমাজ; আমিই তোমার ইহপরকাল, স্বর্গ; এবং আমিই তোমার অন্ন বস্ত্র ধন; আমাকে তুমি বিশ্বাস কর।' ঈশ্বরের কৃপা, মাতৃভূমি এবং ব্রাহ্মসমাজ এই তিন জায়গায় আমার স্বাধীনতা বিক্রীত হইয়া গিয়াছে। আমার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই। ঈশ্বরই আমার সর্ব্বস্ব। আমি ধনী নই, জ্ঞানী নই, পবিত্র নই। আপাতদৃশ্য

বিলাস এবং মান সম্ভ্রমের অন্তরালে আমার দারিদ্র্য এবং অজ্ঞতা লুক্কায়িত। বাহিরের পরিবর্ত্তনশীল অবস্থার সহিত আমার যথার্থ অস্তিত্ব এক বস্তু নহে।

"ঈশ্বর যদি সহস্র বীর সৈন্যকে নিকটে আনিয়া দেন, আমি তাহাদিগকে পরিচালিত করিব।—আগ্নেয় অস্ত্রের সম্মুখে আমি সত্যের জয় প্রতিষ্ঠিত করিব। যাহা ঈশ্বরের ইচ্ছা, তাহাই সম্পন্ন হইবে। আমি ধনীও নই, আবার দরিদ্রও নই। তিন শত পঁয়ষট্টি দিবসের মধ্যে যে ব্যক্তি কদাচিৎ দুই খানি গ্রন্থ পাঠ করে, সে জ্ঞানীই বা কিরূপে হইবে? তথাপি আমি পাঠ করি। মনুষ্যস্বভাব আমার পাঠ্য পুস্তক, স্বয়ং ঈশ্বর শিক্ষক; তাই বলিতেছি, আমি জ্ঞানী। আমি কি বক্তা? বক্তৃতা করিতে কখন শিখি নাই। এক প্রকার বন্য বাক্‌শক্তি আছে, সে কেবল ভাবোচ্ছ্বাস মাত্র। ভাব উত্তেজিত না হইলে আমার বাক্যে ব্যাকরণ, অর্থ, ভাষাবোধ কিছুই থাকে না। যখন আবার ভাব আসে, তখন আমার মুখ হইতে অগ্নিময় বাক্য বিনির্গত হয়। তখন আমি শক্তিসহকারে কথা বলি এবং ভ্রমের সুদৃঢ় দুর্গকে চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া ফেলি। কারণ, তখন ভগবান্ আমাকে বাক্‌শক্তি দেন। জ্বলন্ত সত্য বাক্য যাহা আমি বলি, তাহা যদি আমার বলিয়া বিশ্বাস করি, তাহা হইলে আমি প্রবঞ্চক। স্বর্গের আদেশালোক আমাকে দাও, দেখিবে এমন বলের সহিত কথা কহিব যে, তাহা পৃথিবী খণ্ডন করিতে পারিবে না। ঈশ্বরের জ্ঞানে আমি জ্ঞানী। আমি ধনী জ্ঞানী বা পবিত্র নহি, কিন্তু

বিশ্বাস বলিয়া একটী সামগ্রী আমার আছে। এই বিশ্বাসবলে আমি ঈশ্বরকে সর্ব্বত্র দর্শন করি। আমার বিশ্বাস অন্ন জল জ্ঞান বিজ্ঞান আনন্দরূপে পরিণত হয়।

"বিশ্বের প্রত্যেক পদার্থে হরি অনুপ্রবিষ্ট হইয়া আছেন, বিশ্বাসচক্ষু তাহা দর্শন করে। তবে কি আমি অদ্বৈতবাদী? অদ্বৈতবাদ মত আমি ঘৃণা করি, কিন্তু আমি ভাবেতে অভেদবাদী। আমি আশা পাইয়াছি, 'আর আর যাহা কিছু, তাহা দেওয়া হইবে।' ইহার প্রত্যেক বাক্য প্রমাণসিদ্ধ। যাহার প্রমাণ নাই, আমি তেমন সত্য গ্রহণ করি না। যদিও আমি প্রত্যক্ষবাদ মতের বিরোধী, কিন্তু ভাবেতে আমি প্রত্যক্ষবাদমতাবলম্বী। ক্ষেত্রতত্ত্ব এবং গণিত-বিদ্যার ন্যায় ধর্ম্ম আমার সুদৃঢ় প্রমাণের উপর স্থাপিত। আমার অবলম্বিত ধর্ম্মোপদেশে 'এই প্রকার প্রভু বলিয়াছেন' সর্ব্বাগ্রে এই কথা থাকে। ঈশ্বরের বাণী ব্যতীত আমি অন্য নীতি উপদেশ জানি না। তাঁহা দ্বারা সপ্রমাণিত না হইলে আমি কোন সত্য গ্রহণ করি না। ঈশা, জন্, পল্‌সন্নিধানে আমাকে তিনি আধ্যাত্মিকভাবে লইয়া যাইবেন। মৃত ইতিহাসকে আমি ঘৃণা করি। মৃত লোকদিগের অস্থিরাশি যেখানে থাকে, তাহা ঘৃণিত স্থান। প্রাচীন মহাজনেরা জীবন্তভাবে আমার শোণিতে বাস করেন। দ্রষ্টব্য এবং শ্রোতব্য সমস্ত বিষয় আমার আয়ত্ত হয় নাই, কিন্তু আশা করি, ভবিষ্যতে তাহা হইবে। আমি ঊনবিংশ শতাব্দীর লোক হইয়া ভূত কালের অন্ধকারময় স্থানে যাই, এবং সেখানে গিয়া যোগসুধা পান

করি। তথায় নির্জ্জনে অনন্তের প্রেমবক্ষে শুইয়া থাকি। আমি বিজ্ঞানী। হাক্সিলি, ডারুইনকে আমি মান্য করি। তাঁহারা আমার সাহায্য করিতেছেন। ধর্ম্মে বিজ্ঞানেতে কোন প্রভেদ নাই। আমি এসিয়ার লোক, সুতরাং স্বদেশের যোগ ভক্তি ভাবুকতার পক্ষপাতী। কার্য্যসম্বন্ধে আমি ইয়োরোপীয়। ইয়োরোপ আমেরিকার কর্ম্মশীলতা আমার স্বভাবে বহু পরিমাণে আছে। আমার কার্য্যের প্রতিবাদ এবং ঈশ্বরের বিধানের বিরুদ্ধাচরণ একই কথা। আমি কোন বিষয় গোপন করিব না। আমার বিরুদ্ধে যাহা বলিবার থাকে বলিয়া যাও, ঈশ্বর আমাকে রক্ষা করিবেন। আমার কেহ শত্রু নাই। যাহারা শত্রু বলিয়া পরিচয় দেয়, তাহারা আমার ভাব এবং কথা প্রচার করে। তাহাদের কার্য্য দেখিয়া আমি মনে মনে হাসি, আর বলি, যে উহারা আমার প্রতিকৃতি। তাহারা অজ্ঞাতসারে আমার মত গ্রহণ করিয়াছে। আমার বন্ধুরা যেখানে আমার কথা প্রচার করিতে পারিত না, শত্রুরা সেখানে তাহা পারিবে। 'আমার সত্য' আমি বলিতেছি? তাহার অর্থ এই যে, আমার জীবনের মূল সত্য। ঈশ্বর যাহা আমাকে শিখাইয়াছেন, তাহাকেই আমি 'আমার সত্য' বলিতেছি। নতুবা 'আমি' বলিয়া কোন বস্তু আমাতে নাই। অনেক দিন হইল সেই ক্ষুদ্র পক্ষী উড়িয়া গিয়াছে, আর সে ফিরিয়া আসিবে না। যে সত্য আমি প্রচার করিয়াছি, তাহা ভারতের বক্ষে প্রবিষ্ট হইয়াছে, কেহ তাহা উৎপাটন করিতে পারিবে না। আশ্চর্য্যের বিষয় যে,

এত সভ্যতার ভিতরেও ভারতে এবং বঙ্গবাসীর জীবনে আধ্যাত্মিক ধর্ম্মভাবের শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে। আমার শত্রু মিত্র উভয় দ্বারাই ইহার উন্নতি হইতেছে।

"বিংশতি বৎসর কাল আমি পরীক্ষিত এবং নিপীড়িত হইতেছি। দেশস্থ ব্যক্তিগণ, এক্ষণে আমাকে দয়া কর। এ ব্যক্তিকে আর পদদলিত করিও না। আমি পাপী, তাহা তোমাদিগকে বলিয়াছি, কিন্তু তথাপি কতিপয় সত্য প্রচারার্থ ঈশ্বরকর্ত্তৃক আমি প্রেরিত। তাঁহার ইচ্ছাই আমি পালন করিয়াছি। যদি দোষ দিতে চাও, তবে তাঁহাকে দোষ দাও। আমার ভিতরে উচ্চ আমি এবং নীচ আমি দুইটি আছে। উভয়ের প্রভেদ কোথা, তাহা আমি পরিষ্কার দেখিতে পাই। তোমাদের যেমন বিশেষ বিশেষ কার্য্য আছে, আমারও তেমনি আছে।

"অদ্য আমি তোমাদিগের নিকট নিজের কথা বলিলাম, তজ্জন্য ক্ষমা করিবে। সাধারণের পেষণে বাধ্য হইয়া ইহা বলিতে হইল। আমি প্রফেট নই, এক জন নূতন রকমের লোক। বলপূর্ব্বক আমার নিকট হইতে কি ভারতকে কাড়িয়া লইবে? তাহা অসম্ভব। আমার স্থান আমি অধিকার করিয়াছি। বিশ্বস্ত এবং পরীক্ষিত সহযোগীদিগের সহিত সত্যের দুর্গ ধরিয়া থাকিব, ছাড়িয়া দিব না। আমাব অন্য কোন বিষয় বাণিজ্য নাই। আমার স্ত্রী পুত্র পার্থিব সম্পত্তি সমস্ত ব্রাহ্মসমাজকে দিয়াছি। ভারতের সেবা ভিন্ন অন্য কার্য্য জানি না। আমাকে কি তোমরা অবিশ্বাসী ঈশ্বরভ্রষ্ট করিয়া তোমাদের আজ্ঞাধীন

করিতে চাও? কেশবচন্দ্র সেন তাহা পারেন না! এবং সেরূপ করিবেন না! মনুষ্যের ধর্ম্ম, মনুষ্যের পরামর্শ আমি লইব না। কিন্তু আমি ঈশ্বরবিশ্বাসী হইয়া তাঁহারই সেবা করিব।"

কেশবচন্দ্র আপনাকে আপনি কি মনে করিতেন, তাহা এই বক্তৃতায় স্পষ্টরূপে প্রকাশ পাইয়াছে। বিবাহের আন্দোলনে প্রচারকার্য্যবিভাগের আয় ও আধিপত্য কিছু কমিয়া যায়। কিন্তু কেশবের অগ্নিময় উৎসাহে ক্রমে তাহার অনেক ক্ষতি পূরণ হইয়া গেল। তিনি বিশ্বাসবলে সহকারী বন্ধুদিগকে জাগ্রত করিয়া তুলিলেন। অতঃপর কমলকুটীরের নিকট মঙ্গলপাড়া বসিল। নিরাশ্রয, নির্ব্বাসিত এবং দেশত্যাগী প্রচারকগণ এই স্থানে ক্রমে ক্রমে বাড়ী ঘর প্রস্তুত করিলেন। এই পল্লী দর্শন করিয়া মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ বলিয়াছিলেন, "এ সকল তুমি যোগবলে করিয়াছ। তুমি যেখানে থাক, পাঁচ জনকে না লইয়া থাকিতে পার না।" মঙ্গলপাড়া বিধাতার বিশেষ কৃপার একটি দান এবং ইহার অধিবাসিগণ ঈশ্বরের রাজভক্ত প্রজা।

"খ্রীষ্ট কে?" এই বিষয়ে টাউনহলে আর একটী বক্তৃতা এই বৎসরে তিনি করেন। তাহাতে খ্রীষ্টীয় সমাজে পুনরায় এক মহা আন্দোলন উঠে। ফাদার রিভিংটন্ তৎকালে এখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি তাঁহার বিশ্বাসানুযায়ী ঐ বিষয়ে আর একটী বক্তৃতা করেন। তদনন্তর অনেক গুলি নূতন-বিধ সামাজিক ও ধর্ম্মানুষ্ঠানের সূত্রপাত হয়। নারীজাতিকে জাতীয়

স্বভাবানুযায়ী শিক্ষাপ্রণালী দ্বারা জ্ঞান, ধর্ম্ম ও গৃহকার্য্যে দীক্ষিত করিবার জন্য "আর্য্যনারীসমাজ" স্থাপন করেন। স্ত্রী-জাতির কোমল স্বভাবের পক্ষে যেরূপ জ্ঞান, ধর্ম্ম ও কর্ত্তব্যকর্ম্ম উপযোগী, তাহাই এখানে আলোচিত হইত। ১৮০১ শকের ভাদ্রমাসে আচার্য্য মহাশয় বিশেষ বিশেষ কার্য্যে কয়েক জন প্রচারককে দীক্ষিত করেন। গৈরিক বসনের ব্যবহার এই সময় হইতে প্রকাশ্যে প্রচলিত হইয়াছে। খ্রীষ্টীয় শাস্ত্রে প্রতাপ-চন্দ্র মজুমদার, হিন্দুশাস্ত্রে গৌরগোবিন্দ রায়, বৌদ্ধ শাস্ত্রে অঘোরনাথ গুপ্ত, মুসলমান শাস্ত্রে গিরিশচন্দ্র সেন এবং সঙ্গীদের কার্য্যে ত্রৈলোক্যনাথ সান্ন্যাল বিধিপূর্ব্বক নিয়োজিত হন। পরে কার্ত্তিক মাসে আচার্য্যদেব প্রচারযাত্রায় সদলে নানা স্থান ভ্রমণ করেন। এই প্রচারযাত্রা হইতে নব ভাবের স্রোত উন্মুক্ত হয়। আচার্য্য কত কষ্টসহিষ্ণু, কিরূপ পরিশ্রমী এবং ত্যাগী বৈরাগী, তাহা ইহাতে বিশেষরূপে প্রকাশ পাইয়াছিল। দেশে বিদেশে, পথে ঘাটে মাঠে যেরূপ জীবন্ত-ভাবে তিনি এবার ধর্ম্মপ্রচার করিলেন, তাহাতে মৃত ব্রাহ্মসমাজ, নিদ্রিত মন জাগিয়া উঠিল। এ যাত্রায় শরীর এবং জীবনপুরাণে ঈশ্বরের জীবন্ত বর্ত্তমানতা ও প্রত্যক্ষ ক্রিয়া উজ্জ্বলরূপে সকলের হৃদয়ে তিনি মুদ্রিত করিয়া দিয়াছিলেন। ইহা দ্বারা ধর্ম্মপ্রচারের এক নূতন পথ উন্মুক্ত করিয়া দেন। কি পরিশ্রমই সে সময় করিতেন। এক এক সভায় হিন্দি, ইংরাজি, বাঙ্গালা তিন ভাষায় উপদেশ দিয়া, গান করিতে করিতে শেষ ফিরিয়া আসিতেন। যাঁহার

সুমধুর ইংরাজি বক্তৃতায় টাউনহলের কৃতবিদ্য শ্রোতৃমণ্ডলী বিমুগ্ধ, তিনিই খালি পায়ে, একতন্ত্রীহস্তে, গৈরিক বসনগলে পথে পথে দ্বারে দ্বারে হরিগুণ গান করিতে লাগিলেন। আহার নিদ্রা বিশ্রাম ভুলিয়া এইরূপে ভারতবাসীদিগকে হরিপ্রেমে মাতাইলেন। অবিশ্বাস, অভক্তি ও সাংসারিকতার প্রতিকূলে বিশ্বাস, ভক্তি ও বৈরাগ্যের শাণিত অস্ত্র বর্ষণ করিলেন। ইহা ব্যতীত ব্রহ্ম-বিদ্যালয়ে উপদেশ, যুবাদিগকে যোগশিক্ষা দান, ভারতসংস্কারক সভার উন্নতি সাধন, বর্ষাকালে চাতুর্মাস্য ইত্যাদি বহুবিধ কার্য্যে তাঁহাকে কয়েক বৎসর অবিশ্রান্ত পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল। এই সময় হইতে প্রচারপ্রণালী পরিবর্ত্তিত হইয়া যায় এবং হিন্দুভাবের সাধন অধিক পরিমাণে আরম্ভ হয়। তদ্দর্শনে লোকে বলিত, কেশব বাবু এখন হিন্দু হইয়াছেন ; কেন না, হিন্দুমতে কন্যার বিবাহ দিয়া এখন আর কেমন করিয়া ব্রাহ্ম থাকিবেন ? কিন্তু হিন্দু ভাবের প্রতি বিশেষ পক্ষপাতিতা তাঁহার ইতিপূর্ব্বেই জন্মিয়াছিল। বিবাহ আন্দোলনের পর ভয়ানক রোগে পড়িলেন, তাহার পর ভাল হইয়া এইরূপ হিন্দুভাবের প্রতি অনুরাগ দেখাইলেন। তাই এ সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া কেহ বলিত, কেশব বাবু হিন্দু, কেহ বলিত পাগল, কেহ বা অন্য প্রকার সিদ্ধান্ত করিত। হরিনাম ব্যবহার করিতেন, সে জন্য কেহ কেহ তাঁহাকে বৈষ্ণবও বলিত। অথচ তিনি কিছুই হন নাই, পূর্ব্বের ন্যায় ব্রাহ্মধর্ম্মাবলম্বী ব্রহ্মবাদীই ছিলেন। আদিসমাজ হইতে পৃথক্ হওয়ার পর খ্রীষ্টধর্ম্ম এবং ঈশাচরিতের

বিষয়ে অধিক আলোচনা করাতে তখন যেমন খ্রীষ্টান অপবাদগ্রস্ত হইয়াছিলেন, এক্ষণে তেমনি হিন্দু এবং বৈষ্ণব হইলেন। উপহাসপ্রিয় ব্যক্তিরা বলিত, কেশব বাবুর ধর্ম্ম দরবেশের কাঁথা এবং ঘাসিরামের চানাচুর। ইহা শুনিয়া তিনি হাসিতেন, আর ভক্তিরসে মাতিয়া হরিসঙ্কীর্ত্তন করিতেন। এ সময় পূর্ব্বের মত আব অন্য ধর্ম্মেব শ্লোক তিনি পাঠ করিতেন না। ভাগবত এবং গীতা হইতে কতকগুলি ভক্তিরসের উৎকৃষ্ট শ্লোক স্বহস্তে তুলট কাগজেব পুঁথিতে লিখিয়া লইয়াছিলেন, তাহাই পড়িয়া উপদেশ দিতেন। এইরূপ নববিধ আচারপ্রণালীতে বহুসংখ্যক লোকের সমাগম হইতে লাগিল। টাউনহলে বিজ্ঞান, যুক্তি এবং খ্রীষ্টীয়তত্ত্বপূর্ণ ইংরাজি বক্তৃতা, আর বিডন পার্কে হিন্দুশাস্ত্রের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যান, ইহা শুনিবার জন্য সহস্র সহস্র লোক একত্রিত হইত। সে সকল সভার শোভার কথা আর কি বলিব। পুস্তক দীর্ঘ হইবার ভয়ে তাহার লোভ সংবরণ করিতে বাধ্য হইলাম। কলিকাতাবাসী বঙ্গীয় যুবকদল যাহারা হাসিয়া হাততালি দিয়া ভাল কথা উড়াইয়া দেয়, তাহারাও অবাক্ হইয়া কেশবেব নূতন নূতন কথা শুনিত। পাঁচ হাজার লোক যেন এক সঙ্গে জমাট বাঁধিয়া যাইত। তখন গভীর হরিধ্বনিতে যেন নগর কাঁপিত। এইরূপ সঙ্কীর্ত্তন এবং উপদেশে উদার-স্বভাব হিন্দুগণ মত্ত হইয়া নাচিতেন এবং গান করিতেন। কেশবচন্দ্রকে সঙ্কীর্ত্তন-প্রণালীতে কৃতকার্য্য দেখিয়া শেষ দেশীয় খ্রীষ্টীয়ান বন্ধুগণ এই প্রথা অবলম্বন করিয়াছেন। তাঁহারা খোল কর্ত্তাল বাজাইয়া

পথে পথে যিশুগুণ কীর্ত্তন করেন, তাহার ভিতর হরি এবং নারায়ণ শব্দও ব্যবহার করিয়া থাকেন। সময়ের গুণে এবং কেশবচন্দ্রের দৃষ্টান্তে এক্ষণে সর্ব্বত্রই উদারতা এবং অসাম্প্রদায়িকতার চিহ্ন সকল দলেই দেখিতে পাওয়া যায়। এখন বেদান্ত এবং ব্রহ্মজ্ঞানপক্ষপাতী আদিসমাজ তত্ত্ববোধিনীতে গীতা ভাগবত চৈতন্যচরিতামৃত এবং পুরাণের শ্লোক উদ্ধৃত করেন, হরিভক্তিসাধনে উৎসাহ দেন; খ্রীষ্টধর্ম্মপ্রচারকেরা হিন্দু-পুরাণ হইতে ধ্রুব প্রহ্লাদ নিতাই গৌরের দৃষ্টান্ত উল্লেখ দ্বারা ধর্ম্ম-প্রচার এবং দেশীয় আচার ব্যবহার নিরামিষ ভোজে অনুরাগ প্রকাশ করেন; অধিক কি বলিব, মুসলমান মৌলবীকেও প্রচারক্ষেত্রে হিন্দুশাস্ত্রের দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিতে শুনা গিয়াছে। এ সকল উদার রুচির স্রোত কেশবচন্দ্র এ দেশে উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছেন। তাঁহার ধর্ম্মে হিন্দুভাবের প্রাদুর্ভাব দেখিয়া, এবং হরি এবং মাতৃ-নামের রোল শুনিয়া যে সকল ব্রাহ্ম পূর্ব্বে তর্ক করিতেন এবং তাঁহার দোষ দেখাইতেন, তাঁহারাও এখন গৈরিক বসন, হরি এবং মাতৃনামে আসক্ত হইয়া পড়িয়াছেন, কেবল তাহা নহে, অনেকে শেষে কুসংস্কারান্ধ পৌত্তলিক হইয়া অন্ধ ভক্তির পথ ধরিয়াছেন। অনুকরণকারীর সর্ব্বত্রই এই দুর্দ্দশা। সে সময় ইংলণ্ডের কতকগুলি বন্ধুও এ বিষয়ে অনেক আশঙ্কা করিয়াছিলেন। তাঁহাদের উপলক্ষে প্রেরিতদরবারে এইরূপ একটি নির্দ্ধারণ হয়।

"ব্রাহ্মধর্ম্মের মূল সত্যে পূর্ব্ববৎ আমরা বিশ্বাস করি। এ সম্বন্ধে আমাদের বিশ্বাস বিন্দুমাত্র বিচলিত হয় নাই। যদিও ঐ

সকল সত্য অপরিবর্ত্তনীয় এবং নিশ্চিত, কিন্তু আমাদের চরিত্র এবং সামাজিক জীবন তদ্রূপ নহে। ব্রাহ্মধর্ম্ম আমাদের জীবনে প্রবেশপূর্ব্বক সময়ে সাধন ভজন এবং সামাজিক রীতি নীতি ভাষা সাহিত্য বিষয়ে নানারূপ ধারণ করিবে। কিরূপ শেষে দাঁড়াইবে, ঈশ্বর ভিন্ন তাহা কেহ জানে না। তাঁহার শক্তি দ্বারা চালিত হইয়া আমরা এ বিষয়ে উন্নতি সাধন করিব। যেমন আমাদের অভাব অনুসারে ঈশ্বর সময়ে সময়ে বিধান পাঠাইবেন, আমরা তেমনি অবিশ্বাসী না হইয়া জীবনের ব্রত অনুযায়ী তাহার অনুসরণ করিব। পুরাতন বিধির কাজ শেষ হইয়া গেলে আবার নূতন নিয়ম গ্রহণে প্রস্তুত হইব। সুতরাং আমাদের বাহ্য ব্যবহার বিচিত্র হইবে। সে বিচিত্রতা সাময়িক অভাব মোচনের জন্য বিধাতা কর্ত্তৃক প্রেরিত। ইহা দেখিয়া মূল বিশ্বাস সম্বন্ধে কেহ যেন অপসিদ্ধান্ত না করেন। বীজ হইতে যেমন বৃক্ষ উৎপন্ন হয়, ব্রাহ্মসমাজ তেমনি বীজসত্য হইতে উৎপন্ন হইতেছে। ব্যবহারপ্রণালী এবং ভাষা সম্বন্ধে পরিবর্ত্তন হইতেছে, ভবিষ্যতে আরো হইবে। আমাদের সহৃদয় বন্ধুগণ ধৈর্য্য এবং আশার সহিত অপেক্ষা করুন। আন্দোলন এবং পরিবর্ত্তন দর্শনে তাঁহারা যেন ক্ষুব্ধ না হন। ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে ধর্ম্মের সকল অঙ্গের গঠন এবং সামঞ্জস্য তাঁহারা যথাসময়ে বুঝিতে পারিবেন।"

কেশবচন্দ্রের এই নবোদ্যম নববিধান শিশুর জন্মিবার পূর্ব্ব লক্ষণ। প্রসূতির প্রসব-বেদনার ন্যায় ইহাকে বুঝিতে হইবে।

নববিধান

১৮০১ শকের ১২ই মাঘে মহাত্মা কেশবচন্দ্র ব্রাহ্মধর্ম্মকে নববিধান নাম প্রদান করেন। তিনি যাহাকে এত দিন ব্রাহ্মধর্ম্ম বলিতেন, বস্তুতঃ তাহা নববিধান, ইহার প্রমাণ তাঁহার অনেকানেক উপদেশে প্রাপ্ত হওয়া যায়। ব্রাহ্মধর্ম্ম ঈশ্বরপ্রেরিত একটি নূতন বিধান, ইহার নূতনবিধ উদ্দেশ্য, বর্ত্তমান সময়ের অভাব-মোচনের জন্য ধর্ম্মসমন্বয়ের ভার লইয়া ইহা জগতে অবতীর্ণ হইয়াছে। এ ধর্ম্ম ব্যক্তিবিশেষের ক্ষমতা বা বিদ্যা বুদ্ধির ফল নহে, কোন প্রাচীন ধর্ম্মের পুনরুদ্ধারও নহে, বিভিন্ন ধর্ম্মমতের যান্ত্রিক সামঞ্জস্যও নহে; সুতরাং ইহা সম্পূর্ণ একটি নূতন ধর্ম্ম। যদি নূতন হইল, তবে আর নববিধান কেনই বা ইহার নাম হইবে না? যাহারা হরিলীলা এবং জীবন্ত বিধাতার বিধাতৃত্ব-শক্তিতে বিশ্বাস করে, প্রার্থনা মানে, দৈনিক জীবনে ভগবানের বিশেষ কৃপা দেখিতে পায়, জাতীয় ইতিহাসে, ভৌতিক জগতে, সামাজিক বিপ্লবে, স্বদেশ বিদেশে, যুগে যুগে ভগবানের বিশেষ অবতরণ স্বীকার করে, তাহারা পুরাতন বিধান এবং নূতন বিধানে বিশ্বাসী না হইয়া থাকিতে পারে না। ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে যে সকল অদ্ভুত দৈবঘটনা দৃষ্ট হইয়াছে, তাহা বিধাতার সাধারণ শাসনপ্রণালীর অন্তর্গত বটে, কিন্তু তন্মধ্যে তাঁহার বিশেষ অভি-প্রায়, বিশেষ করুণা জ্বলদক্ষরে লিখিত আছে। ভগবান্ এই

বর্ত্তমান যুগে লীলাবিহারার্থ যে সমস্ত আয়োজন উদ্যোগ করিলেন, নানাস্থান হইতে ভক্ত দাসবৃন্দকে তিনি যে ভাবে আনিলেন, তদ্দর্শনে কে আর তাঁহার প্রত্যক্ষ বিধান অস্বীকার করিবে? ঘোর অন্ধকার, কুসংস্কার, পৌত্তলিকতা ও পাপ অভক্তির মধ্যে একটি নূতন প্রেমরাজ্য তিনি সৃষ্টি করিয়াছেন। ইহা যদি নববিধান নামে আখ্যাত না হয়, তবে ইহার অন্য কি নাম হইবে, আমরা জানি না। এ নামটি দ্বারা পাছে কোন মনুষ্যবিশেষের গৌরব ঘোষিত হয়, এই মনে করিয়া অনেকে ভীত হন; কিন্তু সে বৃথা ভয়। রামমোহন রায়ের মস্তিষ্ক, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের অর্থ, কি কেশবচন্দ্রের বক্তৃতাবল এ ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক নহে। মঙ্গলবিধাতা ঈশ্বরেরই মহিমা মহীয়ান্ করিবার নিমিত্ত নববিধান নাম প্রচারিত হইয়াছে। "ব্রাহ্মধর্ম্ম" শব্দ ঐশী শক্তির প্রতিশব্দ নহে। নববিধান নাম দেওয়াতে কেশবচন্দ্রের কোন অসদভিপ্রায় আছে বলিয়া যাঁহাদের সন্দেহ হয়, তাহা দূর করিবার পক্ষে তাঁহার আত্মাভিমানশূন্য ধর্ম্মজীবন এবং ভক্তচরিত্রই যথেষ্ট। "বিধান" সংজ্ঞাটি বিধাতার জীবন্ত বিধাতৃত্ব-ক্রিয়ার জ্ঞাপক। কেহ কেহ বিধান শব্দ লইতে প্রস্তুত, কিন্তু "নব" শব্দটি তাহাতে দেখিতে ভালবাসেন না। পৃথিবীর প্রত্যেক বিধানই নববিধান; কারণ, কিছু নূতনত্ব না থাকিলে বিধান শব্দের কোন সার্থকতা থাকে না। বর্ত্তমান বিধানের উদ্দেশ্য ধর্ম্মসমন্বয়, সুতরাং ইহাকে নব নব বা চিরনব বলিলে আরও ভাল হয়। বিধান শব্দের ভাবার্থ গ্রহণ করিয়াও শব্দ ব্যবহারে অনেকে আপত্তি করেন।

কিন্তু তাহা বালকের আপত্তি। এত দিন এ নামে ব্রাহ্মধর্ম্মকে অভিহিত করা হয় নাই কেন, কুচবিহার বিবাহের পরেই বা কেন হইল, এই মনে করিয়া কেহ কেহ ইহার কূটার্থ গ্রহণ করিয়াছিল। কিন্তু ঈশ্বরের কৃপায় এখন সে ভ্রান্ত সংস্কার ক্রমে চলিয়া যাইতেছে। যুগধর্ম্মের মাহাত্ম্য অনেকে বুঝিতে পারিতেছেন। অনেকে না বুঝিয়াও ইহার নববিধ মাধুর্য্যরস পান করিতেছেন। যিনি বলেন, আমি নববিধান মানি না, তিনিও ইহার ক্রোড়ে লালিত পালিত হইতেছেন।

যে সময় নূতন একটি ধর্ম্মশাস্ত্র, সাধনপ্রণালী, একটি প্রচারক-দল ও ধর্ম্মসমাজ বিধানকর্ত্তা বিধাতা বিধিপূর্ব্বক স্থাপন করিলেন, একটি বিশুদ্ধ অপৌত্তলিক উদার ধর্ম্মপরিবার রচিত হইল, তখন কেশবচন্দ্র নববিধান নাম ঘোষণা করিলেন। পূর্ব্বপ্রচলিত ব্রাহ্মধর্ম্মের মধ্যে প্রত্যাদেশ, বিশেষ কৃপা, সাধুভক্তি, যোগ, ধ্যান, ইন্দ্রিয়সংযমের অভাব দর্শন করিয়া, তিনি ঐ নামটি প্রকাশের বিশেষ সুযোগ প্রাপ্ত হন। ধর্ম্মের উচ্চতর আধ্যাত্মিক লক্ষণ যাহাতে নাই, যে ধর্ম্ম হরিলীলা ও হরিভক্তির বিরোধী, তাহার নাম লোপ হইয়া যায়, কিংবা তাহা একেশ্বরবাদ নামে স্বতন্ত্রভাবে অবস্থিতি করে, এটি তাঁহার মনোগত ইচ্ছা ছিল। এই জন্য একবার বলিয়াছিলেন, "যদি আবশ্যক হয়, তবে 'ব্রাহ্ম' নাম পর্য্যন্ত ছাড়িয়া দিতে হইবে।" কারণ, যাহাতে বিধাতার লীলা নাই, ঈশ্বরের সহিত মানবের জীবন্ত যোগ নাই, সে ধর্ম্ম যতই কেন কুসংস্কারবর্জ্জিত ও ন্যায় যুক্তির অনুমোদিত

হউক না, তদ্দারা জীবগণের মুক্তির আশা অতি অল্প। এ দেশে এবং ইংলণ্ডের একেশ্বরবাদের ধর্ম্ম তাহার প্রমাণ স্থল। নানা কারণে নববিধান নাম উপযোগী বলিয়া তাঁহার বিশ্বাস জন্মে। এই "নববিধান" শব্দ তিনি পূর্ব্বেও অনেকবার ব্যবহার করিয়াছিলেন। "ভারতে স্বর্গের জ্যোতি" নামক বক্তৃতা পাঠ করিলে তাহার স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাইবে। কিন্তু তিনি ব্রাহ্মধর্ম্ম, ব্রাহ্মসমাজ, কিংবা ব্রাহ্ম এ সকল শব্দ পরিত্যাগ করেন নাই। বরং নববিধান ও ব্রাহ্মধর্ম্ম এক বলিয়া কত স্থানে বর্ণন করিয়াছেন। বিধানের স্বরূপ লক্ষণ তিনি ব্রাহ্ম-ধর্ম্মে আরোপ করিতেন। কেবল বিধাতৃত্বশক্তিহীন বৌদ্ধধর্ম্মের অনুরূপ যে ব্রাহ্মধর্ম্ম সাধুমাহাত্ম্য, আদেশ, বিশেষ কৃপা, ধ্যান যোগ বৈরাগ্য সাধন এবং ভক্তির মত্ততা স্বীকার করে না, তাহাকেই তিনি পৃথক করিয়া দিতে চেষ্টা পাইয়াছিলেন। তাহাতে কৃতকার্য্যও হইয়া গিয়াছেন। কারণ, শুষ্ক-হৃদয় ব্রহ্মজ্ঞানীরা এখন ভক্তি প্রেমে, হরিলীলারসে মত্ত হইতে না পারিলে আপনাদিগকে অকৃতার্থ মনে করেন।

ব্রাহ্মধর্ম্ম যেমন ঈশ্বরপ্রেরিত এক নূতন বিধান, তেমনি ইহার প্রবর্ত্তক এবং প্রচারকদলও প্রেরিত। রামমোহন রায়, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং কেশবচন্দ্রের দল সমস্তই প্রেরিত। তদ্ভিন্ন ব্রাহ্মসমাজের প্রত্যেক ব্যক্তিকে নববিধানের অন্তর্গত বলিয়া তিনি স্বীকার করিতেন। ব্রাহ্মসমাজ বা ব্রাহ্মধর্ম্মকে তিনি কখন বিধানবহির্ভূত বলেন নাই। ১৮০০ শকের

৮ই পৌষে ব্রহ্মমন্দিরের বেদী হইতে একবার বলিয়াছিলেন,—"ঈশ্বরের বিশেষ অভিপ্রায় সাধন করিবার জন্য বিশেষ বিধান প্রেরিত হয়। ভ্রান্ত লোকেরা বলে, যাহারা বিধানের আশ্রিত নহে, তাহারা নরকে যাইবে। তাহারা মনে করে, কেবল বিধানভুক্ত দশ জন লোকে বৈকুণ্ঠে যাইবে; পৃথিবীর আর সমস্ত লোক ঈশ্বরের করুণা হইতে বঞ্চিত। ইহা মিথ্যা কথা।" বিবাহ আন্দোলনের পর যদিও বহুসংখ্যক পুরাতন ব্রাহ্মদল স্বতন্ত্র এবং বিরোধী হইলেন, তাহাতে কিছু দিন লোকসমাগম কমিয়া গেল; কিন্তু যখন নববিধানের নবোৎসাহ জ্বলিয়া উঠিল, তখন পূর্ব্বাপেক্ষা সাধারণ শ্রোতার সংখ্যা বাড়িতে লাগিল। নগরকীর্ত্তনে রাজপথ ভরিয়া যাইত। মহানগরী কলিকাতা হরিসঙ্কীর্ত্তনে যেন টলমল করিত। একবার কীর্ত্তন করিয়া আসিবার সময় কেশবচন্দ্র সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের দ্বারে জানু পাতিয়া প্রার্থনা এবং প্রণাম করেন। ভাবের ঘরে ধর্ম্মের দ্বারে তাঁহার ভেদবুদ্ধি ছিল না।

ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের স্থাপনকাল হইতে এত দিন যে সকল ধর্ম্মবীজ তিনি বপন করিয়াছিলেন, এক্ষণে তাহাদিগকে কর্ষণ এবং ফল ফুলে পরিণত করিতে লাগিলেন। নববিধান-ঘোষণার সঙ্গে হরিলীলার প্রেমের বংশী বাজিয়া উঠিল। শুষ্ক ব্রাহ্মসমাজ মহাপ্রেম এবং মহাযোগের উৎসবক্ষেত্ররূপে পরিণত হইল। অল্প দিন পরে নববিধান নাম সর্ব্বত্র অঙ্কিত হইতে লাগিল। সংবাদপত্রে, নিশানে, ভোজ্য ও পানপাত্রে,

বস্ত্রে, মুদ্রাযন্ত্রে সর্ব্বত্রই এই নাম মুদ্রিত হইয়া গেল। "বিধান" কথাটী ভক্তের কর্ণে বাস্তবিকই সুধা বর্ষণ করে। ইহার গূঢ় অর্থ মনুষ্যের সঙ্গে ঈশ্বরের প্রত্যক্ষ ব্যবহার; এই কারণে অধিকতর উৎসাহের সহিত তিনি উহা প্রচার করিতে কৃতসঙ্কল্প হন। ইদানীং আদেশবাদ, সাধুভক্তি, হিন্দুধর্ম্মের আধ্যাত্মিক ভাবের সাধন যেরূপ বৃদ্ধি হইয়াছিল, যেরূপ উদার-ভাবে ভগবানের তেত্রিশ কোটী নামের গূঢ় অর্থ, মাতৃস্তব বন্দনা আরতি, ব্রহ্মের অষ্টোত্তর শতনাম, যোগ বৈরাগ্য ভক্তির বাহ্য নিদর্শন নিত্য উপাসনার সহিত তিনি ব্যবহার করিতেন, তাহাতে পুরাতন ব্রাহ্মধর্ম্মের সহিত আর ইহা একীভূত থাকিতে পারিল না। বিধান-ঘোষণার পর কেশবচন্দ্রের এই প্রতিজ্ঞা হইল, পুরাতন প্রচলিত ব্রাহ্মধর্ম্ম এবং ব্রাহ্মসমাজকে বৌদ্ধ ভাব ও মানবীয় কর্ত্তৃত্বের হস্ত হইতে রক্ষা করিতে হইবে; এবং উহাতে এমন এক নবভাব দিতে হইবে, যদ্দারা পূর্ব্বদূষিত ভাব একেবারে বিলুপ্ত হইয়া যায়। নববিধানের ধর্ম্ম, ইহার প্রচারক, ইহার সমাজ এবং পরিবার সমস্তই ঈশ্বরনিয়োজিত; এই বিষয়টি পরিষ্কার রূপে জগতে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য তিনি নানাবিধ নূতন অনুষ্ঠান করিলেন। পুরাতন শব্দ সংজ্ঞা অনেক পরিবর্ত্তিত করিয়া ফেলিলেন।

প্রথমে তীর্থযাত্রা। সাধুজীবনরূপ মহাতীর্থে গমনপূর্ব্বক তাঁহাদের চরিত্রের বিশেষ গুণ এবং সাধুতা আলোচনা, অধ্যয়ন, নিজজীবনের সহিত তাহার একত্রীভূত করণ, তজ্জন্য ভক্তবৎসল ভগবানের নিকট প্রার্থনা, এই

সমস্ত উপায়ে তীর্থযাত্রা নিষ্পন্ন হয়। সক্রেটীশ, মুসা, শাক্য, গৌরাঙ্গ, ঈশা, মহোম্মদ, আর্য্যঋষিবৃন্দ, দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণ এবং আধুনিক চিন্তাশীল জ্ঞানী ও প্রসিদ্ধ দয়ালু ব্যক্তিদিগকে তীর্থরূপে গ্রহণ করত, তিনি সবান্ধবে প্রত্যেকের নিকট আধ্যাত্মিক ভাবে যাত্রা করেন। সাধু মহাত্মাদিগের চরিত্রের সহিত মিলিত হইয়া তাঁহাদিগকে আত্মস্থ করা এই অভিনব অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য। পূর্ব্বে কেবল স্বদেশ-বিদেশস্থ মহৎলোকদিগকে ভক্তি করিতে হইবে এই মাত্র শিক্ষা দিতেন, এক্ষণে তাঁহাদিগের মহচ্চরিত্র প্রাত্যহিক উপাসনায় ধর্ম্মজীবনের বিশেষ সহায়রূপে উপস্থিত করিলেন। যোগবলে দেশকালের ব্যবধান অতিক্রম করিয়া ঐ সকল মহাপুরুষগণের সহিত তিনি সম্মিলিত হইতেন। প্রাচীন স্বর্গগত মহাত্মাদিগের সঙ্গে চরিত্রগত আধ্যাত্মিক যোগ, পূর্ব্বকালের প্রচলিত প্রধান প্রধান ধর্ম্মানুষ্ঠান সকলকে আধ্যাত্মিক ভাবে গ্রহণ, পৃথিবীর সমস্ত ধর্ম্মশাস্ত্র ও সাধু ভক্তের মধ্যে সমন্বয়-স্থাপন এই কয়েকটি কার্য্যের দ্বারা জগতে এক মহা আন্দোলন উঠিল। মহোম্মদের তীর্থযাত্রা উপলক্ষে একটি প্রার্থনা হয়, তাহাতে অবিশ্বাসী ঈশ্বরদ্রোহিগণের বিপক্ষে যে তীব্র ভৎ´সনা ছিল এবং ব্যভিচারদোষের প্রতিকূলে যে কয়টি প্রবন্ধ তিনি তৎকালে কাগজে লেখেন, তাহা পাঠে অনেকের মনে এক বিপরীত সংস্কার জন্মে। তাঁহারা প্রচার করেন যে, কেশব বাবু ইহা দ্বারা বিপক্ষ দলের বিরুদ্ধে পুরাতন রাগদ্বেষ চরিতার্থ করিয়াছেন। প্রথম বর্ষে

তীর্থযাত্রা, দ্বিতীয় বর্ষে নিশানস্পর্শ, হোম, জলসংস্কার, খ্রীষ্টের রক্ত-মাংস-ভোজন, মস্তক-মুণ্ডন, ভিক্ষাব্রত অবলম্বন, বন্ধুগণের পাদোদক-পান, প্রেরিতদিগকে পদক-দান; তদনন্তর নববৃন্দাবন নাটকের অভিনয়, নবনৃত্য, হিন্দুপৌত্তলিকতার ভিতর হইতে মূল ভাব অর্থাৎ অখণ্ড সচ্চিদানন্দ ঈশ্বরের খণ্ড খণ্ড স্বরূপ গ্রহণ, প্রাচীন প্রথানুযায়ী আরতি স্তোত্র, শঙ্খ ঘণ্টা কাঁসরবাদ্য, ধূপ ধূনা পুষ্পমালা দ্বারা দেবমন্দির সাজান ইত্যাদি বাহ্যানুষ্ঠান দ্বারা বিধানের নূতনত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। অবশ্য ঐ সকল বাহ্যানুষ্ঠান চির অবলম্বনীয় বলিয়া তিনি কখন প্রচার করেন নাই, দেশীয় ভাব রক্ষার নিমিত্ত ইহার ভিতরকার আধ্যাত্মিক অর্থ কি, তাহাই কেবল দেখাইয়া দিলেন, এবং তদ্দ্বারা ভক্তিরস বৃদ্ধি করিয়া লইলেন। তদ্ব্যতীত নববিধানকে প্রচলিত ব্রাহ্মধর্ম্ম হইতে স্বতন্ত্র রাখিবার জন্য তিনি উপরি উক্ত অনুষ্ঠানের গুরুত্ব প্রতিপাদন করিতেন।

বিধান ঘোষণা করিয়া কয়েক মাস পরে আচার্য্য কেশবচন্দ্র নৈনিতাল পর্ব্বতে চলিয়া যান। তথায় অবস্থান কালে কখনও একাকী নির্জ্জনে, কখন বা সস্ত্রীক শিলাতলে বসিয়া যোগ ধ্যান সাধন করিতেন। সহধর্ম্মিণীকে পার্শ্বে বসাইয়া, ব্যাঘ্রচর্ম্ম পরিধান করিয়া, হস্তে একতন্ত্রী লইয়া যে সময় সাধনে মগ্ন থাকিতেন, তৎকালকার এক সুন্দর ছবি বর্ত্তমান আছে। গৃহস্থ যোগী মহাদেবের যোগ বৈরাগ্য এবং বিশুদ্ধ গার্হস্থ জীবন তাঁহাকে এক সময় অতিশয় মুগ্ধ করিয়াছিল।

যখন যখন তিনি হিমালয়ে যাইতেন, তখনই এই ভাবের প্রভাব তাঁহার মনে জাগ্রত হইত। এক এক সময়ে এক একটি বিশেষ 'সাধনে তিনি জীবন উৎসর্গ করিতেন। "স্বামী-আত্মা এবং স্ত্রী-আত্মা" বিষয়ে এক প্রবন্ধ এই সময় লেখেন। পরে সহধর্ম্মিণীকে যোগের সঙ্গিনী করিয়া একত্রে সাধন করেন। আচার্য্যপত্নী স্বামীর যোগপথের সঙ্গিনী হইবার মানসে কিছুদিন পরে কেশ কর্ত্তন এবং গৈরিক ও একতন্ত্রী ধারণ করিয়াছিলেন। নৈনিতাল হইতে আসিয়া কেশবচন্দ্র ইংরাজীতে কয়েক খণ্ড চটি পুস্তক রচনা করেন। তদনন্তর বর্ষাকালে ধ্যান-সাধনে প্রবৃত্ত হন। সন্ধ্যা হইতে রাত্রি দশটা পর্য্যন্ত একাসনে বসিয়া একতন্ত্রী যোগে ভগবানের নাম গুণ এবং লীলা কীর্ত্তন করত ক্রমে ধ্যানে এমন মগ্ন হইতেন যে, তিন চারি ঘণ্টা কাল তাহাতে কাটিয়া যাইত। ইষ্টদেবতার সহিত কথোপকথন এই সাধনের প্রধান অবলম্বন ছিল। একাকী এরূপ যোগ সাধন করিতেন তাহা নহে, সহচরগণসঙ্গে একত্রে ক্ষণকাল সেই ভাবে থাকিতেন। মধ্যে মধ্যে যুবক ব্রাহ্ম এবং ব্রাহ্মিকা মহিলাদিগের সহিত মিলিত হইয়া যোগ সাধন করিতেন, এবং যোগের প্রণালী তাঁহাদিগকে বুঝাইয়া দিতেন।

এইস্থানে দক্ষিণেশ্বরবাসী পরমহংস রামকৃষ্ণের সহিত তাঁহার সম্বন্ধের বিষয় কিছু উল্লেখ করা আবশ্যক হইতেছে। আমাদের ধর্ম্মবন্ধু হরিভক্ত রামকৃষ্ণকে ইদানীং যাঁহারা স্বয়ং

ভগবান্ বলিয়া পূজা করত নববিধ এক পৌত্তলিকতার সূত্রপাত করিয়াছেন, তাঁহারা বলিয়া বেড়ান,—কেশব রামকৃষ্ণের শিষ্য ছিলেন, তাঁহারই নিকট তিনি "নববিধান-ধর্ম্ম" শিক্ষা পাইয়াছেন। ইহা দ্বারা রামকৃষ্ণোপাসকেরা গুরুদেবের মহিমা বাড়াইতে গিয়া তাঁহাকে ডুবাইতেছেন সন্দেহ নাই। রামকৃষ্ণের প্রকৃত মহত্ত্ব যাহা কিছু, কেশব দ্বারা জগতে তাহা প্রথম প্রচারিত হয়। তিনি তাঁহাকে দক্ষিণেশ্বরের অজ্ঞাত অবস্থা হইতে প্রকাশ করেন। ইহার অনেক পরে ঐ সকল রামকৃষ্ণোপাসকেরা তাঁহার মহত্ত্বকে বিকৃত করিয়া নিজেদের ইচ্ছা মত এক অন্ধ ভক্তির ধর্ম্ম প্রচার আরম্ভ করিয়াছেন। এ সকল ব্যক্তির চরিত্র ফিরিয়াছে, রামকৃষ্ণের শিক্ষা এবং দৃষ্টান্তে ইঁহাদের অনেক উপকার হইয়াছে সত্য, কিন্তু ইঁহারা রামকৃষ্ণ ও কেশব সম্বন্ধে অনেক কাল্পনিক এবং অলীক কথা বলিয়া উভয় ভক্তের নিকট অপরাধী হইয়া পড়িয়াছেন। বাহ্যাড়ম্বর, লোকসমারোহ, অজ্ঞানান্ধতা এবং লৌকিক উৎসাহ এখন ইঁহাদের মধ্যে যথেষ্ট বৃদ্ধি হইয়াছে, তৎসঙ্গে রামকৃষ্ণের নামও জগতে প্রচার হইয়াছে; কিন্তু তাঁহার স্বাভাবিক ধর্ম্মজীবনের সে অকৃত্রিম সৌন্দর্য্য মিষ্টতা আর এখন নাই। এখন তিনি বৈদান্তিক পণ্ডিত এবং উপাস্য দেবতা। যাই হউক, সারগ্রাহী মধুপ কেশব ইঁহার ভিতর যাহা কিছু সার ছিল, তাহা লইয়াছিলেন। এই মহাত্মার সঙ্গে তিনি প্রথমে

বেলঘরিয়ার উদ্যানে মিলিত হন। প্রথম মিলনেই উভয়ের হৃদয় এক হইয়া যায়। সাধুরাই লুপ্ত এবং গুপ্ত সাধু-দিগকে জগতের সম্মুখে বাহির করিয়া থাকেন। কেশবচন্দ্র যেমন বর্ত্তমান সময়ে শিক্ষিত ধর্ম্মপিপাসু নব্যদলের সহিত ঈশা মুসা গৌর শাক্য সক্রেটিশ মহোম্মদের পরিচয় করিয়া দিয়াছেন, এবং তাঁহাদের মনে সাধুভক্তির সঞ্চার করিয়াছেন, তেমনি পরমহংসকে তিনিই বঙ্গীয় যুবকবৃন্দের নিকট ডাকিয়া আনিয়াছেন। এই দুই মহাত্মার ধর্ম্মভাবের বিনিময়ে ব্রাহ্ম-সমাজে ভক্তিবিষয়ে অনেক উন্নতি হইয়াছে। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, কেশব যাহার ভিতরে ভাল সামগ্রী যাহা কিছু পান, তাহা শোষণ করিয়া লন। অবিকল প্রতিলিপির ন্যায় তাঁহার অনুকরণ ছিল না। অন্যের ভাব লইয়া তিনি তাহাকে নূতন আকার প্রদান করিতেন, এবং এক গুণ ভাবকে দশ গুণ করিয়া তুলিতে পারিতেন। পরমহংসের সরল মধুর বাল্যভাব কেশবের যোগ বৈরাগ্য নীতি ভক্তি ও বিশুদ্ধ ধর্ম্মজ্ঞানকে অনুরঞ্জিত করিয়াছিল। ব্রাহ্মসমাজে এক্ষণে যে ভক্তির লীলাবিলাস ও মাতৃভাবের প্রকাশ দেখা যাইতেছে, তাহার এক প্রধান সহায় পরমহংস রামকৃষ্ণ। তিনি শিশু বালকের মত মা আনন্দময়ীর সহিত যেমন কথা কহিতেন, এবং হরিলীলার তরঙ্গে ভাসিয়া যেমন নৃত্য কীর্ত্তন করিতেন, শেষ জীবনে কেশব অবিকল তাহা দেখাইয়া গিয়াছেন। কিন্তু উভয়ের মধ্যে জ্ঞানের ধারণা

সম্পূর্ণ পৃথক ছিল। রামকৃষ্ণ প্রেমভক্তি, ভাবুকতার আলোকে কালী কৃষ্ণ ইত্যাদির জড় মূর্ত্তি দেখিতেন। কেশব পরম ভক্ত হইলেও চিরকাল ব্রহ্মজ্ঞানী ছিলেন। মাতৃভাবের সাধন, সহজ প্রচলিত ভাষায় উপাসনা প্রার্থনা ইদানীং তিনি যাহা করিতেন, তাহাই মাত্র কেবল উক্ত মহাত্মার সহিত যোগের ফল। কিন্তু কেশব ভিন্ন কয় ব্যক্তি সে ভাবের অনুকরণ করিতে পারিয়াছেন? এই প্রেমযোগের কিছু অংশ সকলেই পাইয়াছেন, কিন্তু তাঁহার মত কেহই আদায় করিতে পারেন নাই। আবার কেশবচন্দ্রের প্রভাবও পরমহংস মহাশয়ের ধর্ম্মজীবনকে অনেক বিষয়ে পরিমার্জ্জিত ও পরিশোধিত করিয়া দিয়াছে। তিনি মনুষ্যের স্বাধীনতা, দায়িত্ব এবং সংসারী লোকের ভক্তি বৈরাগ্য উপার্জ্জনের সম্ভবনীয়তা পূর্ব্বে স্বীকার করিতেন না। হিন্দুসীমার বহির্ভাগে তাঁহার যে উদারতার পরিচয় এখন পাওয়া যায়, তাহা কেশবসহবাসের ফল। ইহা ব্যতীত রামকৃষ্ণের অশ্লীল ভাষার বাক্যালাপ, ভদ্র মহিলাদিগের অশ্রাব্য রূপক উপমা, মতগত এবং জ্ঞানগত ভ্রান্তি কেশব দ্বারা বহু পরিমাণে সংশোধিত হইয়া যায়। ফলতঃ রামকৃষ্ণ রামপ্রসাদের ন্যায় এক জন উচ্চ শ্রেণীর পৌত্তলিক ভক্ত ছিলেন। তাঁহার জীবন ভক্তজীবন, কিন্তু মত বিশ্বাস অনেক ভ্রান্তিপূর্ণ বিজ্ঞানবিরোধী ছিল। ধর্ম্মপ্রচারের প্রস্তাব শুনিলে তিনি বলিতেন, "সে সব ঐ আধারে" অর্থাৎ সে জন্য কেশবই আছেন। রামকৃষ্ণ বলেন, "আমি বহু কাল

পূর্ব্বে এক দিন আদিসমাজ দেখিতে গিয়াছিলাম। তথায় গিয়া দেখিলাম, চক্ষু বুজিয়া স্থিরভাবে সকলে বসিয়া আছে। কিন্তু বোধ হইল, ভিতরে যেন সব লাঠী ধরিয়া রহিয়াছে। কেশবকে দেখিয়া মনে হইল, এই ব্যক্তির ফাতনা ডুবিয়াছে।” অর্থাৎ তাঁহার ছিপে মাছ খাইতেছে। এই লোক দ্বারা মায়ের কাজ হইবে, ইহা তিনি মায়ের মুখেও শুনিয়াছিলেন। জাতিভেদ, পৌত্তলিকতার সহিত যোগ থাকাতে রামকৃষ্ণ সাধারণের নিকট এখন বিশেষ প্রিয়। যাহা হউক, এইরূপে উভয়ের যোগে ধর্ম্মজগৎ অনেক বিষয়ে উপকৃত হইয়াছে। এই উপলক্ষে হিন্দুধর্ম্মের শাখা প্রশাখার মধ্যে যে সকল আধ্যাত্মিক মধুর ভাব ছিল, তাহা বিধানবিশ্বাসীদিগের দ্বারা ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে। যে ধর্ম্ম এক সময় নিতান্ত কঠোর নীরস বোধ হইত, এই রূপে তাহা সরস এবং অত্যন্ত সরল হইল। কোথায় বৈদান্তিক জ্ঞানবিচার, আর কোথায় মাতার সঙ্গে শিশুর কথোপকথন। আরাধনা প্রার্থনায় গ্রাম্য কথার চলন এই সময় হইতে আরম্ভ হইয়াছে। পরমহংসের সহিত কেশবের এই ধর্ম্মবন্ধুতার অন্য অর্থ ধরিয়া এখন অনেকে অনেক মিথ্যা কথা প্রচার করিয়া থাকেন। কিন্তু স্বয়ং রামকৃষ্ণই ইহা মিথ্যা বলিয়া জানিতেন। কেশব রামকৃষ্ণের গুণগ্রাহী ছিলেন, ইহা সত্য। কারই বা গুণ তিনি গ্রহণ না করিতেন? নববিধান-ধর্ম্মের মূল বীজ তাঁহার আত্মাতে বিধাতা কর্ত্তৃক রোপিত হয়; পরে তাহা স্বদেশ বিদেশের মৃত এবং জীবিত মহাজন

ও সাধকদিগের ব্যক্তিগত সাহায্যে ফলে ফুলে সুশোভিত হইয়াছিল।

১৮০২ শকে আচার্য্য ব্রহ্মানন্দ নব নব ধর্ম্মানুষ্ঠান সকল প্রবর্ত্তিত করেন। যিনি বিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত, নীতির কঠোর শাসন ভিন্ন কিছু জানিতেন না, তিনি এখন প্রেমিক কবি হইলেন। ব্রাহ্মসমাজের কঠোর জ্ঞানপীড়নে এত দিন ভাবের খেলা, প্রেম ভক্তির বিলাস কেহ ভোগ করিতে পারে নাই। পাছে কুসংস্কার ও পৌত্তলিকতার প্রেত স্কন্ধে চাপিয়া বসে, এই ভয়ে অনেক সভ্যের প্রাণ আকুল হইত। কেশব সে ভূতের ভয় ভাঙ্গিয়া দিলেন, ভাবের স্বাধীনতা সকলকে সম্ভোগ করাইলেন। ভাবের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ভাষাও নূতন হইল। উৎসবের সময় নববিধানের সমন্বয় এবং জয় ঘোষণার জন্য বেদ বাইবেল ললিতবিস্তর এবং কোরাণ এক স্থানে রাখিয়া তদুপরি এক বিজয় নিশান উড়াইয়া দিলেন। পরে নিশানকে সম্বোধনপূর্ব্বক ঈশ্বরের মহিমা ব্যাখ্যা করত বিশ্বাসীদিগকে তাহা স্পর্শ করিতে বলিলেন। কতকগুলি ব্যক্তি উহা স্পর্শ করত বিধানভুক্ত হন। ধ্বজাপূজা বলিয়া যে মিথ্যাপবাদ উঠিয়াছিল, তাহার মূল এই। কেবল বিধানধর্ম্মের জয়-ঘোষণাই উহার উদ্দেশ্য। এই বৎসর ১৬ই মাঘে প্রচারকসভা "প্রেরিত দরবার" নামে আখ্যাত হয়। ইহার প্রত্যেক সভ্য ঈশ্বরাদেশে নীত হইয়া সর্ব্বসম্মতিতে যে নির্দ্ধারণ করিবেন, তাহাই স্থির হইবে, এইরূপ নিয়ম হয়। ১৭৯৪ শকের ২২শে শ্রাবণ এই

প্রচারকসভা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। দরবারের প্রত্যেক প্রস্তাব সর্ব্ব-সম্মতিতে অবধারিত হইবে, এক জন সভ্য বিরোধী হইলে তাহা স্থগিত রাখিতে হইবে। কোন সভ্য বলিয়াছিলেন, অমীমাংসিত স্থলে সভাপতির মত সর্ব্বোপরি হওয়া উচিত। কেশবচন্দ্র তাহা খণ্ডন করিয়া বলিলেন, "সর্ব্বতোভাবে চেষ্টা করিয়া একতা রক্ষা করিতেই হইবে। অধিকাংশের মত, কি সভাপতির মত, এ সকলের প্রাধান্যের প্রয়োজন নাই। এক শরীরের অঙ্গের ন্যায় প্রতি জনকে মানিতে হইবে। ইহাতে এক অঙ্গ অন্য অঙ্গের বিরোধী কখন থাকিতে পারে না। অধিকাংশের মত লইয়া কার্য্য করিলে এই দোষ থাকিয়া যাইবে। সুতরাং যে পর্য্যন্ত সকলে একমত না হন, সে পর্য্যন্ত প্রয়াস যত্ন দ্বারা এক করিতে হইবে। এইরূপ একতায় যাহা নির্দ্ধারণ হয়, কোন কথা না বলিয়া সকলে তাহার অনুসরণ করিবেন।" আচার্য্য মহাশয় যে সকল নূতন মত বা অনুষ্ঠান প্রচার করেন, তাহা দরবারের মত লইয়া হইত না; তিনি যাহা আদেশ পাইতেন, তাহা করিয়া যাইতেন। সামান্যতঃ সমাজের, প্রচারকপরিবারের এবং প্রচারকার্য্যপ্রণালী সম্বন্ধে মধ্যে মধ্যে দরবার দ্বারা নিয়মাদি নির্দ্ধারিত হইত। কিন্তু তদনুসারে কাজ বড় বেশী দিন চলিত না। কখন বা ছয় মাস আট মাস দরবারের সভা বসিত না।

আচার্য্য এক দিন এইরূপ অনুমতি করিলেন যে, প্রত্যেক প্রচারকের পদ ধৌত করিয়া দাও। ভাই কান্তিচন্দ্র মিত্র পাদ

প্রক্ষালন করেন, উপাধ্যায় গৌরগোবিন্দ রায় তাহা মুছাইয়া দেন। তদনন্তর সেই জল আচার্য্য কিঞ্চিৎ পান করিলেন। পরে উপসনা প্রার্থনা উপদেশাদি হইলে, প্রেরিত প্রচারকগণের মধ্যে গৌরগোবিন্দ রায়, প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, অঘোরনাথ গুপ্ত, অমৃতলাল বসু এবং ত্রৈলোক্যনাথ সান্ন্যালকে তিনি রৌপ্যনির্ম্মিত এক একটি পদক দান করেন এবং নিজেও একটি গলদেশে ধারণ করেন। তদনন্তর প্রচারকার্য্যের বিভাগ এবং প্রত্যেকের বিশেষ কার্য্য তিনি নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছিলেন। উপরিউক্ত পাঁচ জন এবং দীননাথ মজুমদার, উমানাথ গুপ্ত, প্যারীমোহন চৌধুরী, গিরিশচন্দ্র সেনকে প্রেরিত উপাধি, কান্তিচন্দ্র মিত্রকে প্রচারকপরিবারের প্রতিপালক এবং মহেন্দ্রনাথ বসু, রামচন্দ্র সিংহ, প্রসন্নকুমার সেনকে তৎকার্য্যের সহকারী পদ প্রদান করেন। প্রতাপচন্দ্র বোম্বাই দেশে, অমৃতলাল মান্দ্রাজে, অঘোরনাথ পঞ্জাবে, দীননাথ বেহারে, গৌরগোবিন্দ উড়িষ্যা এবং উত্তর বাঙ্গালায়, প্যারীমোহন ও গিরিশচন্দ্র পূর্ব্ব বাঙ্গালায়, ত্রৈলোক্যনাথ এবং উমানাথ কলিকাতা ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থানে প্রচার কার্য্যের জন্য নিযুক্ত হন। ইহার কিছু দিবস পরে এক দিন হোম, এক দিন জলসংস্কার, এক দিন খ্রীষ্টের রক্ত-মাংস-ভোজনের অনুষ্ঠান হইয়াছিল। খ্রীষ্টভক্তেরা যেমন নিস্তার পর্ব্ব দিবসে প্রভুর ভোজ বলিয়া একটি অনুষ্ঠান করেন, এবং ঈশার রক্ত মাংসের পরিবর্ত্তে রুটী ভক্ষণ ও মদ্য পান করেন, যিশুদাস কেশব তেমনি মাংসের পরিবর্ত্তে অন্ন এবং

রক্তের পরিবর্ত্তে জল পান করিয়াছিলেন। খ্রীষ্টের ভাগবতী তনু নিজজীবনে পরিণত করাই ইহার তাৎপর্য্য। কেশবচন্দ্রের অনুষ্ঠিত ঐ সমস্ত বাহ্য কর্ম্মকাণ্ড বাহিরের বিষয় বলিয়া মনে করিতে হইবে না। সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বভূতময় বিশ্বরূপী ভগবানের ভিতর তিনি সমস্ত জগৎ দর্শন করিতেন। মহাযোগের ধর্ম্ম তাঁহাকে জড় ও চৈতন্যের সহিত অভেদরূপে মিলাইয়া দিয়াছিল। তিনি হরিময় ভূমণ্ডল দেখিতেন। জর্দ্দনের তীরে ঈশার মস্তকে পবিত্রাত্মার জ্যোতি যেমন বর্ষিত হইয়াছিল, কমলসরোবরে জল-সংস্কার উপলক্ষে তিনি জলের মধ্যে সেই আবির্ভাব অনুভব করিয়া প্রার্থনা করেন। এই কার্য্যে তাঁহাকে কল্পনাপ্রিয় বলিয়া অনেকে উপহাস করিয়াছে। কোথায় জর্দ্দন, আর কোথায় কমলসরোবর! কোথায় এথেন্স নগর, আর কোথায় কলিকাতা! কিন্তু কেশবচন্দ্র অধ্যাত্মযোগে পৃথিবীর সমস্ত জল স্থল এক অখণ্ড পদার্থ বোধ করিতেন। তাঁহার কল্পনা বিশ্বাসগত অটল সত্যের কিরণমালারূপে প্রতীয়মান হইত। বিশ্বাসী অভেদ-বাদীর নিকট যাহা হইয়াছে এবং হইবে, তাহা একাকার; ব্যক্ত অব্যক্ত, প্রকট অপ্রকট, খণ্ড এবং সমগ্র, ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান অবিভক্তরূপে তাঁহাদের চক্ষে প্রকাশিত থাকে। অল্পদর্শী ইতিহাসপাঠকের সঙ্কীর্ণ দৃষ্টিতে এ কথার কোন অর্থ নাই, কিন্তু বিশ্বাসী ভাবুক ইহার মর্ম্ম বুঝিতে পারেন।

তদনন্তর গোঁফ ও কেশমুণ্ডন এবং গৈরিক খিলকা ও কৌপীন পরিধানান্তে গৃহস্থ যোগী কেশবচন্দ্র ভিক্ষার ঝুলি স্কন্ধে ধারণ-

পূর্ব্বক ভিক্ষাব্রত অবলম্বন করিলেন। বাক্সের ,চাবি, সংসারের ভার সন্তানের হস্তে দিলেন। গৌরাঙ্গ শাক্যের দৃষ্টান্তানুসারে সেই দিন হইতে তিনি ভিক্ষালব্ধ দ্রব্যাদি দ্বারা নিজদেহ পোষণ করিতেন। পরিশেষে যখন মূত্রকৃচ্ছ্র রোগ উপস্থিত হইল, আর অন্ন আহার করিতে পারিতেন না, তখন সামগ্রীর পরিবর্ত্তে বন্ধুগণের নিকট নিজব্যয়োপযোগী অর্থ ভিক্ষা লইতেন। ১৮০২ শকের ২রা চৈত্রে এই ব্রত তিনি গ্রহণ করেন। ঐ দিবস প্রেরিতগণকে রৌপ্যপদক প্রদত্ত হয়। যে দিন প্রেরিত কয়েক জনকে প্রচারকার্য্যে বিশেষরূপে অভিষেক করিয়া নববিধান-ঘোষণার্থ তিনি বিদেশে প্রেরণ করেন, সে দিনকার শোভা কি চমৎকার! আপনি হাওড়া ষ্টেসন পর্য্যন্ত যাইয়া সকলকে বিদায় দিলেন। রণবীরগণ যেমন সেনাপতির আদেশে সমরক্ষেত্রে গমন করে, প্রেরিতগণ তেমনি বিধাননিশান হস্তে লইযা প্রেম-রাজ্য-স্থাপনের জন্য কেহ পঞ্জাবে, কেহ বোম্বে, কেহ মান্দ্রাজে, কেহ হিমালয় প্রদেশে গমন করিলেন। পুরাতন ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রত্যেক কার্য্যকে কেশবচন্দ্র এইরূপে নবভাবে নবোদ্যমে নবজীবনে অভিষিক্ত করিয়া দেন। সমস্ত কার্য্যবিভাগে নববিধানের নব-জীবন যাহাতে অবতীর্ণ হয়, তজ্জন্য তাঁহার বিশেষ যত্ন আগ্রহ প্রকাশ পাইয়াছিল। প্রচারকচরিত্রে, প্রচারপ্রণালীতে, দৈনিক জীবনে, পরিবারমধ্যে, প্রার্থনা সঙ্গীতে, যাবতীয় বিষয়ে নববিধান মূর্ত্তিমান আকার ধারণ করিল। হরিলীলা ছন্দোবন্ধে বর্ণনা করিবার জন্য "বিধানভারত" গ্রন্থ রচিত হইল। সত্য সত্যই

ইহা দ্বারা সকলের মনে নবোৎসাহের অগ্নি জ্বলিয়াছিল এবং প্রচলিত ব্রাহ্মধর্ম্ম হইতে নববিধানের ব্রাহ্মধর্ম্ম এক স্বতন্ত্র মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিল। ব্রাহ্মধর্ম্মের নামে যখন একটি স্বতন্ত্র সমাজ তাঁহার নববিধানরূপী ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রতিকূলে দণ্ডায়মান হয়, তখন তিনি নিজদলকে এক গ্রাম ঊর্দ্ধে তুলিবার চেষ্টা করেন। এই কারণে নাম সংজ্ঞা অনেক পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। অন্যেরা বলে প্রচারক, তিনি নাম দিলেন প্রেরিত। মন্দিরের নাম টেবার্ণেকেল, প্রচারকসভার নাম দরবার, প্রচারকদিগের বাবু উপাধির স্থানে শ্রদ্ধেয় ভাই ইত্যাদি নানা শব্দ প্রবর্ত্তিত হইল। পুরাতন বস্তু এবং ব্যক্তিকে নূতন সংজ্ঞা এবং উপাধি দ্বারা তিনি সাজাইলেন। ব্রত নিয়ম উৎসব কর্ম্মকাণ্ডও কতকগুলি বাড়াইলেন। একটি নূতন সমাজের পক্ষে যে সকল বাহ্য অনুষ্ঠান এবং আন্তরিক মত বিশ্বাস সাধনপ্রণালী প্রয়োজন, একে একে সমস্ত প্রতিষ্ঠা করিয়া ফেলিলেন। যতই এ সকল নব নব সৃষ্টি করিতে লাগিলেন, ততই বিপক্ষ দলের ক্রোধ উত্তেজিত হইতে লাগিল। কাজে কাজেই তাহা লইয়া দেশ বিদেশে আন্দোলনও যথেষ্ট হইয়াছিল। যে দিন প্রেরিতগণ প্রচারার্থ বিদেশে যাত্রা করেন, সেই দিন অর্থাৎ ১৮৮১ খৃষ্টাব্দের ২৪ শে মার্চ্চ হইতে পতাকাঙ্কিত নববিধান নামক ইংরাজি পত্রিকা বাহির হয়। আচার্য্য একাকী ইহা সম্পাদন করিতেন। তিনি প্রতি সপ্তাহে ইহা বাহির করিয়া আদ্যোপান্ত নিজে পড়িয়া সহচরবৃন্দকে শুনাইতেন। যদিও এ পত্রিকার আকার অতি ক্ষুদ্র,

কিন্তু এত অধিক সারবান্ বিষয় ইহাতে থাকিত যে, পড়িলে হৃদয় পরিতৃপ্ত হইত। অল্পের মধ্যে ছোট ছোট করিয়া অনেক তত্ত্ব-কথা তিনি ইহাতে লিখিতেন। নববিধান পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় নববিধানের মূল মত এই কয়টি বিবৃত হইয়াছিল—"এক ঈশ্বর, এক শাস্ত্র, এক সমাজ। আত্মার অনন্ত উন্নতি। সাধু মহাজনদিগের সহিত আধ্যাত্মিক যোগ। ঈশ্বরের পিতৃত্ব এবং মাতৃত্ব, নরের ভ্রাতৃত্ব এবং নারীর ভগ্নীত্ব। জ্ঞান, পবিত্রতা, প্রেম, সেবা, যোগ এবং বৈরাগ্যের উচ্চতম বিকাশের সামঞ্জস্য। রাজভক্তি।" প্রচারকদিগকে যেমন তিনি প্রেরিত উপাধি দান করেন, তেমনি সাধক ব্রাহ্ম কয়েক জনকে গৃহস্থ বৈরাগীর ব্রতে ব্রতী করিয়াছিলেন। তাঁহাদের জন্য একটি বিধানব্যাঙ্ক হয়। আচার্য্যের আদেশে সাধক গৃহীদিগের ব্যয় নিয়মিত হইত। ইহাতে তাঁহারা বিশেষ উপকার লাভ করেন। এই বৎসর ভারতের সুদূর স্থান পর্য্যন্ত নববিধান প্রচারিত হইয়াছিল। যোগী অঘোরনাথ দারাগাজীখাঁ পর্য্যন্ত গমন করেন। বহু পরিশ্রমে তাঁহার বহুমূত্র রোগ জন্মে। সেই রোগে হঠাৎ তিনি পরলোকে চলিয়া যান। তাঁহার শোক কেশবহৃদয়কে ভগ্ন করিয়াছিল। অঘোর নাথের জন্য তিনি এমন কাঁদিয়াছিলেন যে, তাহা শ্রবণে পাষাণ ভেদ হইয়া যায়। তাঁহার সমাধি স্তম্ভের নিকট সদলে দাঁড়াইয়া, "ভাই অঘোর" বলিয়া চীৎকার-রবে যে ডাকিয়াছিলেন, সে হৃদয়-বিদারক ক্রন্দন-রব এখনও কাণে লাগিয়া রহিয়াছে। পরে শ্রদ্ধা প্রীতি সহকারে তাঁহার

শ্রাদ্ধক্রিয়া সম্পাদন করেন। এই সময়ে আচার্য্য মহাশয় নিজেও বহুমূত্র রোগে আক্রান্ত হন। প্রথমে অধিক পিপাসা বোধ হইত, কিন্তু তাহা যে রোগের লক্ষণ, ইহা বুঝিতে পারেন নাই। শেষে উৎসবের সময় নবনৃত্যের সঙ্গে কীর্ত্তন করিতে করিতে এক দিন মূর্চ্ছিত হইয়া পড়েন। তদনন্তর রোগের চিকিৎসা চলিতে লাগিল।

এই বৎসর শ্রাবণ মাসে তাঁহার প্রথম পুত্র এবং দ্বিতীয়া কন্যার বিবাহ হয়। যোগ ভক্তি হরিসঙ্কীর্ত্তনে কেশবচন্দ্রের যেমন উৎসাহ, গৃহকার্য্যে সামাজিক অনুষ্ঠানেও তেমনি ছিল। বালকের ন্যায় যাবতীয় কার্য্যে তাঁহার অনুরাগ প্রকাশ পাইত। ইদানীন্তন গৃহে মঙ্গলকার্য্য উপলক্ষে যাত্রাদি আমোদ হইত। ভাবুক চূড়ামণি কেশব সারা রাত্রি জাগিয়া যাত্রার গান শুনিতেন এবং তাহার ভিতর হইতে ভক্তিরস সংগ্রহ করিয়া লইতেন। সময়ে সময়ে দক্ষিণেশ্বরের পরমহংসও ইহাতে যোগ দান করিতেন। ফলতঃ কমলকুটীরে আসিয়া অবধি তিনি নিত্য নূতন ব্যাপার সকল করিতে লাগিলেন। গান যাত্রা কীর্ত্তন কথকতা প্রভৃতি বিবিধ আমোদজনক অনুষ্ঠান এখানে হইত। এই সময় নাট্যাভিনয়ের প্রতি অতিশয় উৎসাহ জন্মে। চিত্তবৃন্দাবনে অনুদিন হরিলীলার অভিনয় তিনি যাহা দেখিতেন, তাহার অনুরূপ ছবি বাহিরে প্রকাশের জন্য কৃতসঙ্কল্প হইলেন। প্রথমে যখন এ বিষয়ে প্রস্তাব করেন, তখন কে তাহা সম্ভব মনে করিয়াছিল? ব্রাহ্মেরা নর্ত্তক নর্ত্তকী সাজিয়া নাট্যাভিনয় করিবে, ইহা কাহারো

মনে স্থান পাইল না। কিন্তু প্রস্তাবকর্ত্তা কেশবচন্দ্রের কোন কথা অর্থশূন্য নহে। শেষে যাহা বলিলেন, তাহাই করিলেন। তাঁহার পুনঃ পুনঃ উত্তেজনায় নববৃন্দাবন নাটক রচিত হইল। নাটকের রচয়িতা তাঁহার অনুরোধে তখন নাটক পড়িতে বসিলেন। স্বগতঃ, নেপথ্যে, প্রবেশ, প্রস্থান ইত্যাদি সংজ্ঞার অর্থ বুঝিয়া লইলেন এবং ধর্ম্মসমন্বয় নাটকের পাণ্ডুলেখ্য প্রস্তুত করিলেন। কিন্তু নাটকের পুস্তক লেখা হইলেই যে তাহার অভিনয় হইবে, তাহারই বা সম্ভাবনা কোথায়? নর্ত্তক নর্ত্তকী কে সাজিবে? পরে একে একে প্রচারকদল, এবং সাধক ভক্ত ব্রাহ্মগণ ক্রমে উহা শিখিতে লাগিলেন। অর্থও সংগৃহীত হইল। পরে এমন নাট্যাভিনয় তিনি করিলেন যে, এ দেশে তেমন কেহ কখন দেখে নাই। মহাবিদ্বেষী ব্যক্তিরাও অভিনয় দেখিয়া সন্তুষ্ট হইল। নাট্যাভিনয় সম্বন্ধে কেশবচন্দ্রের পারদর্শিতা যথেষ্ট ছিল। তিনি যে ধর্ম্ম শেষে প্রচার করেন, তাহাও এক নাটক বিশেষ। চৈতন্যদেব রুক্মিণী সাজিয়া যাত্রা করিয়াছিলেন। তাঁহার রূপের ছটায় দর্শকগণের চিত্ত বিমুগ্ধ হইয়াছিল। ব্যাঘ্রাম্বর-ধারী বাজীকর এবং পাহাড়ী বাবার অভিনয় যিনি দেখিয়াছেন, তাঁহার চক্ষে, বোধ হয়, অদ্যাপি সেই সৌম্যমূর্ত্তি মহাপুরুষের জীবন্ত ছবি জাগরিত আছে। নববৃন্দাবনের শেষ দিনে তিনি বাজীকর সাজিয়া বিশ্বাস ভক্তির ভোজবিদ্যার অদ্ভুত কার্য্য প্রদর্শন করেন। যাহাতে দেশের ধর্ম্ম নীতি সংশোধিত হয়, আমাদের ভিতর দিয়া লোকে ধর্ম্ম শিক্ষা পায়, তাহারই জন্য নববৃন্দাবন

নাটকের সৃষ্টি। কেশবচন্দ্রের কোন কার্য্য যদি সর্ব্বজনপ্রিয় হইয়া থাকে, তবে তাহা এই নাটক ; ইহা অদ্যাবধি লোকচক্ষের সম্মুখে বর্ত্তমান আছে, সুতরাং তদ্বিষয়ে বাহুল্য বর্ণনা নিষ্প্রয়োজন। কেশবচন্দ্রের এই নাট্যশালা বৃথা আমোদের স্থান হয় নাই, উহা ব্রহ্মমন্দিরের ন্যায় পবিত্র ভাব ধারণ করিয়াছিল। নাট্যকার ধর্ম্মবন্ধুদিগকে লইয়া প্রার্থনান্তে তিনি এ কার্য্যে ব্রতী হইতেন। এক দিকে কমলকুটীরে নাট্যাভিনয়ের আয়োজন, অন্য দিকে ব্রহ্মমন্দিরে প্রতি সপ্তাহে "জীবনবেদ" ব্যাখ্যা, দুই সঙ্গে সঙ্গে চলিয়াছিল। নিজজীবনের পরীক্ষিত ধর্ম্মতত্ত্ব যাহা পনরটি উপদেশে তিনি ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহা এক অপূর্ব্ব সামগ্রী হইয়া রহিয়াছে। এই কয়টি উপদেশ যদি পৃথিবীতে থাকে, তবে আর কেশবচরিত্রের গূঢ় তাৎপর্য্য এবং স্বর্গীয় মহত্ত্ব বর্ণন করিবার কাহারো প্রয়োজন হইবে না। ইহা পাঠ করিলে বাস্তবিক মৃতেরা জীবন পায়।

প্রেরিত বন্ধুদলকে বিদেশে পাঠাইয়া বৈরাগ্যব্রতধারী কেশবচন্দ্র আপনি কলিকাতা নগরের পথে পথে দ্বারে দ্বারে দীনবেশে হরিনাম প্রচারে ব্রতী হন। প্রচারকার্য্যে তাঁহার অনুরাগ উৎসাহ কেমন প্রবল, তাহার পরিচয় প্রথম জীবনেই আমরা পাইয়াছি। কখন কখন তিনি দুই এক জন সহচরকে সঙ্গে লইয়া বন্ধুদিগের গৃহে হঠাৎ উপস্থিত হইতেন এবং হরিগুণ কীর্ত্তন করিয়া আসিতেন। পরে ১৮০৩ শকের বৈশাখের প্রথম দিন হইতে নগরের পথে পথে সদলে নববিধানের হরিলীলা-

মাহাত্ম্য গান করিতে লাগিলেন। নিজের গান গাইবার শক্তি ছিল না বলিয়া যে তৎসম্বন্ধে উৎসাহ কিছু কম ছিল তাহা নহে, গায়ক বন্ধুদিগকে সহায় করিয়া ইহাতে প্রবৃত্ত হইতেন। প্রচার-যাত্রা কিংবা পথে সঙ্গীত করিবার সময় সঙ্গীতপ্রচারককে নেতার পদ প্রদান করিতেন। প্রায় এক মাস কাল নগরের নানা স্থানে যেরূপ মত্ততার সহিত তিনি হরিপ্রেম বিলাইয়াছিলেন, তাহা মনে হইলে মৃতপ্রাণে নবজীবনের সঞ্চার হয়। কেশবচন্দ্র উচ্চ অট্টালিকায় বাস করেন, তাহাতে কি? পৃথিবীর উচ্চ শ্রেণীর লোকমধ্যে উচ্চাসনে বসেন, তাহাতেই বা কি? এমন প্রেমমাখা বৈরাগ্য কি বৃক্ষতলবাসী করঙ্ক-কন্থাধারী সন্ন্যাসীর পক্ষেও প্রার্থনীয় নহে? আহা ভক্তবর কেশবের সেই অনুপম বৈরাগ্য-বেশ, সে জ্বলন্ত উৎসাহপূর্ণ মুখশ্রী নয়নে এখনও জ্বলিতেছে। কেশবভিখারী নগরের দ্বারে দ্বারে হরিপ্রেমসুধা বিলাইয়া গেল, এ কথা বঙ্গদেশ যেন কখন বিস্মৃত না হয়। অনাবৃত পদে, একতন্ত্রীহস্তে, গৈরিক অঙ্গাবরণ ধারণ করিয়া তিনি পল্লীতে পল্লীতে ভ্রমণ করিতেন। বৈশাখের গ্রীষ্মতাপে শরীর ঘর্ম্মাক্ত হইয়াছে, দর্শকবৃন্দ আসিয়া চতুর্দ্দিক ঘেরিয়া দাঁড়াইয়াছে, নর্দ্দামার দুর্গন্ধে নাক জ্বলিয়া যাইতেছে, তথাপি কেশবের শ্রান্তি বোধ নাই। অন্য সময় তিনি অর্দ্ধ ক্রোশ পথ চলিতে পারিতেন না, কিন্তু প্রচারযাত্রায় বাহির হইয়া তিন চারি ঘণ্টা কাল দাঁড়াইয়া বক্তৃতা ও সঙ্গীত করিতেন, দুই তিন মাইল পথ খালি পায়ে চলিয়া যাইতেন। নগরের পথে গান করিতে বাহির হইলে, প্রায়

প্রতি দিন দুই এক জন সুরাপায়ী আসিয়া জুটিত। তাহারা জগাই মাধাইয়ের ন্যায় কীর্ত্তনের সঙ্গে নানা রঙ্গ ভঙ্গ করিত, কেহ বা নাচিত গাইত। কোথাও বা ভদ্র গৃহস্থেরা ফুলের মালা গোলাপ জল দ্বারা গায়কগণের সম্মান বর্দ্ধন করিতেন। এই রূপে ভিখারীর বেশে কেশবচন্দ্র কখন রাজভবনের দ্বারে, কখন দুঃখী গোপগৃহে, কখন বা হিন্দুপল্লিমধ্যে, কখন খ্রীষ্টীয়প্রাঙ্গণে হরিগুণ গাইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেন।

এই অবস্থায় এক দিন মহাভাগ কেশব সবান্ধবে এক গোয়ালার গৃহে গিয়া উপস্থিত হইলেন। তাহার ঘরের মধ্যে এক বলীবর্দ্দ আবদ্ধ ছিল, মৃদঙ্গ করতালের ধ্বনি শুনিয়া সে সবলে বন্ধনরজ্জু ছিন্ন করত প্রাণের ভয়ে একেবারে গায়কগণের ভিতরে আসিয়া উপস্থিত হয়। মহা বিভ্রাট। বৃষের হম্বারবে এবং ঘন ঘন পদশব্দে গৃহস্বামী, গৃহস্বামিনী এবং আগন্তুকগণের মনে ভয় ও বিস্ময়ের সঞ্চার হইল। কুটীরবাসী দিন দরিদ্র গোপসন্তান সহসা আপন প্রাঙ্গণমধ্যে ভদ্র লোকের দল দেখিয়া কি করিবে বুঝিতে পারিল না। তাহার স্ত্রী ভয়ে ভীতা হইল। এমন সময় গৃহ মধ্য হইতে দ্বার ভগ্ন করিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে তাহার গোরু ছুটিয়া বাহিরে আসিল। দৈবগতিকে কাহারো কোন অঙ্গহানি হয় নাই, গৃহস্বামী শীঘ্রই তাহার গতিরোধ করিল। পরে বাদ্য বন্ধ রাখিয়া গায়কগণ দুই একটি গান করিলেন এবং আচার্য্য বিদায়কালে গৃহস্থের নিকট কিঞ্চিৎ তণ্ডুল ভিক্ষা লইলেন। যে সময় গোরু ছুটিয়াছিল এবং গৃহস্থ নরনারী ভয়ে বিস্ময়ে আকুল

হইয়াছিল, গায়কগণের তৎকালকার অবস্থা আর বলিবার প্রয়োজন নাই। সাত্ত্বিক গম্ভীর ভাবের সহিত আমোদ এবং ভয় মিশ্রিত হইলে যাহা হয়, তাহাই হইয়াছিল। দুঃখীর বন্ধু কেশব কাঙ্গাল জনের গৃহে যাইতে বড় ভাল বাসিতেন। মোড়পুষ্করিণী গ্রামে সাধনকাননে অবস্থানকালীন প্রতিবাসী কার্ত্তিক ঘোষ এবং অন্যান্য দীন কৃষকভবনে তিনি যখন কীর্ত্তন করিতে যাইতেন, তখন তাহারা আপনাদিগকে কৃতকৃতার্থ জ্ঞান করিত।

এক দিন খালধারের পথ ধরিয়া উল্টাডিঙ্গী অঞ্চলে শেটের বাগান নামক পল্লীতে গিয়া তিনি হঠাৎ উপস্থিত হইলেন। তথায় অনেক বৈষ্ণব বৈষ্ণবী ও বাউলের দল বাস করে। মনোহর বৈরাগী তাঁহার বড় প্রিয় ছিল। সময়ে সময়ে সে প্রেম ভক্তি এবং বৈরাগ্য বিষয়ে গান শুনাইয়া তাঁহাকে বড় সুখী করিত। যদিও নীচ শ্রেণীর বৈষ্ণব বাউলেরা দূষিত চরিত্র, কিন্তু তিনি তাহাদের ভিতর হইতেও সার গ্রহণ করিতেন। হঠাৎ সন্ধ্যাকালে কেশবচন্দ্র বাউলদিগের কুটিরে গিয়া উপস্থিত হইলেন। তখন তাহারা কেহ ধূমপান করিতেছে, কেহ পান্তাভাত খাইতেছে, কেহ বা তপ্ত ভাত রাঁধিতেছে। আচার্য্যকে দেখিয়া তাহারা ব্যস্ত হইল। কেমন করিয়া মহতের সম্মান রক্ষা করিবে, কিই বা তাহাদের আছে? আপনাদের আসনে বসাইল, গান শুনাইল এবং নাচিল, বৈষ্ণবীদিগকে দূরে বিদায় করিয়া দিল।

কিয়ৎকাল তথায় থাকিয়া বাউলদিগের অবস্থা দর্শন করতঃ তিনি গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। ঐ সকল লোকদিগের নিকট তিনি ফকীরি শিক্ষা করিতেন, এবং তাহাদের মত লোকের দ্বারে দ্বারে হরিগুণ গাইয়া বেড়াইতেন।

কুচবিহার বিবাহ আন্দোলনের পর মহাত্মা কেশবচন্দ্র এই কয়টি নূতন বিষয়ের অবতারণা করেন ;—ইংরাজি বাঙ্গলা ক্ষুদ্র পুস্তক প্রচার; সাধক, অধ্যক্ষ এবং গৃহস্থের বৈরাগ্যব্রত প্রতিষ্ঠা, প্রচারযাত্রা; পরিচারিকা, বালকবন্ধু, থিইষ্টিক্‌রিভিউ, লিবারেল, নববিধানপত্রিকা প্রকাশ; ব্রহ্মবিদ্যালয় ও ভিক্টোরিয়া কলেজ স্থাপন; প্রেরিত নাম দান, ভিক্ষাব্রত গ্রহণ, তীর্থযাত্রা, নিশান প্রতিষ্ঠা, হোম, জলসংস্কার, সাধুর চরিত্র পান ভোজন, বসন্ত ও শারদীয় উৎসব, নবনৃত্য, নববৃন্দাবন নাট্যাভিনয়, গৈরিক, শঙ্খবাদ্য, ধূপ ধুনা, পুষ্প, লতাপত্র, আরতি ইত্যাদির ব্যবহার। এই সমস্ত নূতনবিধ ব্যবহার দ্বারা জগতে নিত্য নব নব আন্দোলন উঠিতে লাগিল। দিন কয়েক এইরূপ জনবর উঠিল, কেশব বাবু পাগল হইয়াছেন। পাগলের মুখে ইংরাজি ভাষায় সারগর্ভ অভূতপূর্ব্ব তত্ত্বকথা শ্রবণে আবার সকলে মুগ্ধ হইতে লাগিল। কেশব সেন কখন হিন্দু, কখন বৈষ্ণব, কখন খ্রীষ্টান, কখন দুর্ব্বোধ্য জীব। সমস্ত ধর্ম্ম একত্রে সাধন করাতে দেশ বিদেশ হইতে সহানুভূতি-সূচক পত্রাদিও আসিতে লাগিল। এক দিকে বেদের পণ্ডিত ব্রহ্মব্রত, ভক্তির সাধক রামকৃষ্ণ পরমহংস, দরিয়াপন্থী সাধুর

সমাগম; অপর দিকে পারসিয়ার মৌলবী, ইয়োরোপ আমেরিকার পাদরী, দেশীয় খ্রীষ্টান দলের মিলন। নববৃন্দাবনের প্রেমচ্ছবি দৈনিক জীবনে এবং সমাজের মধ্যে আসিয়া দেখা দিল। এই সমস্ত কার্য্যদ্বারা কেশবচন্দ্রের নববিধান যে পুরাতন ব্রাহ্মধর্ম্ম হইতে এক পৃথক্ সামগ্রী, তাহা সাধারণ্যে এক প্রকার প্রচার হইয়া পড়িল। তখন নববিধানসমাজ এবং আদি ও সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রভেদ রেখা জাগিয়া উঠিল। উপাসনাপ্রণালী, প্রচাররীতি, সাধন ভজন, আহারাদি সম্বন্ধে উভয়ের মধ্যে একটি স্পষ্ট স্বতন্ত্র ভাব বাহির হইল। এক দিকে কেশবের দল স্বপাক নিরামিষ খায়, গৈরিক পরে, একতারা বাজায়, ঈশ্বরকে হরি, প্রাণপতি, জগদ্ধাত্রী, জননী বলিয়া ডাকে, হরি সংকীর্ত্তনে মাতে, নাচে এবং এক অখণ্ড সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মে লক্ষ্মী, সরস্বতী, কালী দুর্গা প্রভৃতি তেত্রিশ কোটি দেবীর অর্থ ঘটায়, পৌত্তলিকদিগের ব্যবহৃত বস্তু এবং ভাষা নূতন অর্থে ব্যবহার করে, উপাসনাকালে ব্রহ্মের অষ্টোত্তর শত নাম পাঠ করে, দীর্ঘ উপাসনা ধ্যানে মগ্ন থাকে, অপর দিকে আদি ও সাধারণ ব্রাহ্মদল এই সকল কার্য্য অর্থশূন্য কুসংস্কারাপন্ন বাহ্যক্রিয়া বলিয়া তাহার প্রতিবাদে প্রবৃত্ত হয়। কয়েক বৎসর এরূপ চলিয়াছিল। এক্ষণে কেশবপ্রবর্ত্তিত ঐ সকল অর্থশূন্য কুসংস্কার রীতি সাধারণ ব্রাহ্মদল বহু পরিমাণে গ্রহণ করিয়াছেন। নববিধানের যে সকল আধ্যাত্মিক সারবত্তা, তাহা প্রায় সমুদায়ই তাঁহারা

লইয়াছেন। অবশিষ্টাংশ ক্রমে লইবেন, তাহারও লক্ষণ দেখা যাইতেছে। আক্ষেপের বিষয় এই, নববিধানের আধ্যাত্মিক গূঢ় তাৎপর্য্য এবং সামঞ্জস্য ভাব গ্রহণে অসমর্থ হইয়া তাঁহাদের মধ্যে অনেকে অন্ধ বিশ্বাসী, পৌত্তলিক হইয়া শেষে ব্রাহ্মধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়াছেন।

কেশবচন্দ্র যে কোনরূপ অসার বাহ্যাড়ম্বরকে নববিধানের মূল মত বা অপরিহার্য্য সত্যরূপে ধরিতেন না, ইহার প্রমাণ অনেক স্থলে দেখিতে পাওয়া যায়। তিনি ব্রাহ্মসমাজের কয়েকটী নীতিবিগর্হিত ঘটনার বিরুদ্ধে মহোম্মদের ভাবে যে প্রার্থনা করিয়াছিলেন, এবং ইদানীং অবিশ্বাস অভক্তি ব্যভিচার ইন্দ্রিয়াসক্তি ইত্যাদি পাপাচারের সম্বন্ধে যেরূপ তীব্র ভাষা ব্যবহার করিতেন, এবং সময়ে সময়ে বিশ্বাসগত সত্যবাক্য সকল ঈশ্বরবাণী বলিয়া যাহা সংবাদপত্রে লিখিতেন, তাহা ক্রোধ-বিদ্বেষমূলক ব্যক্তিগত ঘৃণা বলিয়া অনেকের সংস্কার জন্মে। ইহা ব্যতীত কুচবিহার-বিবাহকলঙ্ক ত তাঁহার ছিলই। সেই কলঙ্কের বর্ণে নববিধানকে যাঁহারা চিত্রিত করিতে লাগিলেন, তাঁহারা কেশবের ভাল ভাব আর কিছু দেখিতে পাইলেন না। তিনি স্বর্গের ধর্ম্ম প্রচার করিলে কি হইবে? যখন তিনি বাল্যবিবাহ পাপে অপরাধী, তখন তাঁহার সত্যও সত্য নহে; অধিকন্তু তাহা দুরভিপ্রায়ের আচ্ছাদন। এই সিদ্ধান্তে মহা বিপদ ঘটিয়াছিল। যে পরিমাণে অন্তরে যোগ ভক্তি জ্ঞান বৈরাগ্য সংসার ধর্ম্মের মিলন

হইবে, যে পরিমাণে ব্রহ্মের মধ্যে হরিপ্রেম ও মাতৃস্নেহ এবং ঈশা শাক্য আর্য্য ঋষিবৃন্দ ও চৈতন্য প্রভৃতি ভক্তগণের চরিতামৃতের আস্বাদ পাওয়া যাইবে, সেই পরিমাণে কেশবের সঙ্গে লোকের যোগ বাড়িবে। ভক্তবন্ধু কেশবকে ভক্ত হইয়া কেহ ছাড়িয়া থাকিতে পারিবে না। এক্ষণে তিনি অলক্ষিতভাবে শত্রুর মধ্যেও অবস্থিতি করিতেছেন। যাহারা তাঁহাকে ভিতরে রাখিয়াও চিনিতে পারিতেছে না, তাহারা এক দিন চিনিবে, এবং বিনয় সহকারে তাঁহার নিকট ক্রন্দন করিবে। নিশ্চয় এ সকল লোক ঈশা চৈতন্য নানক শাক্য জনক যাজ্ঞবল্ক্যের সময় যদি জন্মিত, তাহা হইলে সেই সকল মহাজনকে অনেক বিষয়ে নিন্দা করিত, সন্দেহ নাই। সে যাহা হউক, কেশবের নবধর্ম্মভাব যেমন বিদ্যু-দগ্নির ন্যায় লোকসমাজে বিস্তৃত হইয়া পড়িতেছে, তেমনি এক দিন তাঁহার ধর্ম্মচরিত্রও সর্ব্বত্র আদর লাভ করিবে। নববিধান বাস্তবিকই সাধারণের সম্পত্তি ;—জগৎপিতার প্রদত্ত স্নেহোপহার।

বিশ্ববন্ধু কেশব এইরূপে নববিধান স্থাপন করিলেন। কতকগুলি লোক তাঁহার পথের অনুবর্ত্তী হইল। সেই পুরাতন ব্রাহ্মসমাজ, এবং পুরাতন প্রচারক ও ব্রাহ্মদলকে তিনি নবভাবে সঙ্গঠন করিলেন। তিন চারি বৎসর কাল প্রভূত পরিশ্রম এবং ত্যাগস্বীকার দ্বারা এইটি তিনি করিয়া তুলিলেন। বিবাহের আন্দোলনে যদিও একটি প্রকাণ্ড দল পৃথক্ হইয়া গেল,

তজ্জন্য তাঁহাকে অনেক পুরাতন বন্ধু হারাইতে হইল, তথাপি বিশ্বাসবলে ভক্ত সহচরবৃন্দের সাহায্যে আবার সমাজকে তিনি জীবিত করিলেন। এ জন্য তাঁহাকে শারীরিক এবং মানসিক শক্তি বহু পরিমাণে ব্যয় করিতে হইয়াছিল। ফরাসী জাতি যেমন প্রুসিয়া কর্তৃক বিধ্বস্ত ও পরাজিত হইয়া কালক্রমে পুনরায় সমস্ত ক্ষতি পূরণ করিয়া লইয়াছে, কেশবচন্দ্র তেমনি নানা উপায়ে ভগ্নাবশেষ সমাজের জীর্ণ সংস্কার করিলেন। সমুদায়কে একত্রিত করিতে পারেন নাই বটে, কিন্তু একটি ধর্ম্মপরিবারের ভিত্তি-স্থাপনে কৃতকার্য্য হইলেন। নববিধানাশ্রিত কত লোক, কত সমাজ আছে, তাহার এক তালিকা সংগ্রহ করেন এবং বিধানভুক্ত মণ্ডলীব উপর একটি স্বতন্ত্র চিহ্ন অঙ্কিত করিয়া দেন। প্রচলিত ব্রাহ্মধর্ম্মের সঙ্গে মিশিয়া ইহা বিকৃত হইয়া না যায়, তজ্জন্য বিশেষ সাবধানতা লইয়াছিলেন। ইহাতে তাঁহার স্বর্গীয় মহত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ধর্ম্মবীরের যে সকল লক্ষণ থাকা প্রয়োজন, তাহা শেষ দিন পর্য্যন্ত তাঁহার জীবনে বর্ত্তমান ছিল। কিন্তু তথাপি তাঁহার উচ্চ আশা পূর্ণ হয় নাই। নববৃন্দাবন কেবল নাটকেই রহিয়া গেল, একটী অবিভক্ত বৈরাগী প্রেমপরিবার তিনি দেখিয়া যাইতে পারিলেন না। কতকগুলি নরনারী একপ্রাণ একহৃদয় হইয়া নববিধানের দৃশ্যমান প্রতিমূর্ত্তি জগৎকে দেখাইবে, এই তাঁহার চিরদিনের বাসনা ছিল; তাহা হইয়া উঠিল না। যে কয় জন লোককে ভগবান্ তাঁহার সঙ্গে মিলাইয়া দিয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই তাঁহাকে

ভাল বাসিতেন, কিন্তু পরস্পরকে ভালবাসিয়া তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিতে পারেন নাই। বিবিধ উপায়ে ভ্রাতৃমণ্ডলী নির্ম্মাণের জন্য তিনি চেষ্টা করেন; আশ্চর্য্যের বিষয় এই, যতই চেষ্টা করিলেন, ততই যেন বিচ্ছেদ বিরোধ উপস্থিত হইতে লাগিল। সকলে এক স্থানে থাকিবে, এক অন্ন ভোজন করিবে, এক ধর্ম্ম মানিবে, এক আদেশস্রোত প্রত্যেকের অন্তরে বহিবে, তাহার জন্য বাহিরে নিয়ম বিধি ব্যবস্থা কতই হইল, কিন্তু ভিতরে জমাট বাঁধিল না। এই কারণে তাঁহার শেষ জীবনের বর্ষাধিক কাল দুঃখ বিরক্তি অশান্তি অনুশোচনায় গত হয়। একে উৎকট ব্যাধির যন্ত্রণা, তাহার উপর এই সব ভাবনা চিন্তা, সুতরাং তিনি যথেষ্ট মনঃক্ষোভ পাইলেন। পরিশেষে এ সম্বন্ধে এক প্রকার হতাশ্বাস হইয়া কতকগুলি শাসন বিধি প্রচার করেন এবং পবিত্রাত্মার হস্তে মণ্ডলীর ভার অর্পণ করতঃ সিমলা পর্ব্বতে চলিয়া যান।

রোগশয্যা।

কেশবচরিত্রের নিগূঢ় ধর্ম্মবিশ্বাস রোগের অবস্থায় যেমন জয়লাভ করিয়াছে, এমন আর কিছুতে দেখা যায় নাই। বল বুদ্ধি ক্ষমতা, ধন জন থাকিলে অনেক মহৎ কার্য্য সম্পাদন করিতে পারে, ইহা তত আশ্চর্য্যের বিষয় নহে; আচার্য্য ব্রহ্মানন্দ

সুস্থাবস্থায় ইহার যথেষ্ট প্রমাণই দিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার যোগবল, বিশ্বাসের দৃঢ়তা, চরিত্রের একত্ব রোগশয্যায় যাহা দেখা গিয়াছে, তাহা অনির্ব্বচনীয়। কেবল রোগশয্যার যদি এক খানি গ্রন্থ হয়, তবে সে সকল কথা বলা যাইতে পারে। কেশবচন্দ্র যেমন ক্ষমতাশালী বুদ্ধিমান্ বিচক্ষণ গভীরাত্মা ধর্ম্মসংস্কারক, তেমনি তিনি সচ্চরিত্র ভক্ত বিশ্বাসী পরম সাধু। গুণ ক্ষমতা এবং সাধুতা উভয়ই তাঁহাতে বর্ত্তমান ছিল।

১৮০৩ শকের সাম্বৎসরিক উৎসব শেষ হইতে না হইতে কাল বহুমূত্র রোগে তাঁহাকে আক্রমণ করে। প্রথম আক্রমণেই প্রাণ যায় যায় হইয়াছিল। তদনন্তর কখন অল্প কখন অধিক, এইরূপ ভাবে চলিতে লাগিল। একটু সুস্থ হইতে না হইতে নববৃন্দাবন নাটকাভিনয়ের জন্য কৃতসঙ্কল্প হইলেন। প্রাত্যহিক উপাসনা আর ইদানীং সমগ্ররূপে সম্পন্ন করিতে পারিতেন না, একটি প্রার্থনা মাত্র করিতেন। এই অবস্থায় ভিক্টোরিয়া কলেজের প্রথম বার্ষিক পারিতোষিক বিতরণ করিয়া কিছু দিনের জন্য দার্জ্জিলিং পর্ব্বতে যান। তথায় গিয়া পীড়া বৃদ্ধি হইল, এবং উহা শরীরকে ক্রমে অন্তঃসারবিহীন করিতে লাগিল। অনন্তর কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়া নববৃন্দাবন নাটক করিলেন। তাহাতে ভয়ানক পরিশ্রম করিতে হইত। কারণ, এ কার্য্যে তিনি ভিন্ন আর কেহ সুপটু ছিল না। নাটকে আশাতীত জয় এবং আনন্দ লাভ করিলেন। আদ্যোপান্ত নিজেই সমস্ত ব্যবস্থা করিয়া দিতেন। উৎসাহের প্রভাবে এমনি পরিশ্রম

করিলেন যে, ভাদ্র মাসের গ্রীষ্মে শরীর গলদ্‌ঘর্ম্ম হইলেও, তাহা হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইতেন না। অভিনয়ে কৃতকার্য্য হইয়া নিম্নলিখিত পত্রখানি লেখককে লিখিয়াছিলেন।

"তোমার সুন্দর উপহারটী (নবনৃত্যের গীত) অদ্য প্রাপ্ত হইলাম। এখানে ঘোরঘটা করিয়া কয় বার নাটকের অভিনয় হইয়া গেল। তজ্জন্য শরীরটা একটু অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছে। ভয়ানক গরম, ভয়ানক পরিশ্রম ও রাত্রি জাগরণ, ভয়ানক ভিড়। কয়টী ভয়ানক একত্র। সুতরাং শরীর যে অবসন্ন হইবে, তাহাতে আশ্চর্য্য কিছুই নাই। যাহা হউক, পরিশ্রম সফল হইয়াছে। লোকমুখে সুখ্যাতি আর ধরে না। সকলেই সন্তুষ্ট ও মোহিত। বালক বৃদ্ধ নরনারী সকলেই আশীর্ব্বাদ করিতেছে। আশ্চর্য্য এই, যাহারা একবার দেখিয়াছে, তাহারা আবার আসিয়া দেখিতেছে। তুমি এখানে থাকিলে খুব আনন্দিত হইতে। তোমার হাতের রচনা অভিনীত হইতে দেখিলে বিশেষ আনন্দ হইত, সন্দেহ নাই। পাথরিয়াঘাটার রাজারা খুব সন্তুষ্ট হইয়াছেন এবং তাঁহাদের বাটীতে একবার অভিনয় হয়, এরূপ প্রস্তাব হইয়াছে। এবার যদি নাটক লেখা হয়, ২।৩ ঘণ্টা মধ্যে অভিনয় শেষ হইতে পারে, এরূপ একটি লিখিলে সকলের আদরণীয় হয়। অনেক বড় বড় লোক আসিয়াছিলেন। মেয়েদের মধ্যেও খুব আন্দোলন। এক দিকে গালাগালির ধূম, আর এক দিকে প্রশংসার ধূম, কলিকাতা খুব গরম হইয়া উঠিয়াছে। আমাদের যথা লাভ। নাটকের ছলে

আমাদের মত এবং কীর্ত্তনাদি সাধারণের কাছে প্রচার করিবার খুব সুবিধা হইয়াছে। বড় মজা! আজ সকালে উপাসনার সময় বলিলাম, হাস্যই আমাদের দেবতা। হাস্যই আমাদের মুক্তি।"

ব্রাহ্মসমাজসংক্রান্ত যে বিষয়ে যখন তিনি হাত দিয়াছেন, তাহাতে কৃতকার্য্য না হইয়া সহজে কখন ক্ষান্ত হন নাই। কিন্তু বাহিরের কার্য্যে জয় লাভ করিলেই কি তাঁহার হৃদয় পরিতৃপ্ত হইত? তাহার সম্ভাবনা কি? যে প্রেমপরিবার স্বর্গরাজ্যের ছবি, যে জন্য এত আয়োজন পরিশ্রম, সে পরিবার কোথা? তাহা না হইলে যে নববিধান কেবল শাস্ত্রের কথা হইয়া রহিল। নববিধান অনুযায়ী নবজীবন কৈ? এই ভাবনায় কেশবহৃদয় সতত আকুল ছিল। শেষ কয়েক বৎসর প্রার্থনা আলোচনা উপদেশে কেবল এই অভাবটী তিনি পুনঃ পুনঃ ব্যক্ত করিয়াছেন। নবধর্ম্মের উদার সত্য সকল এসিয়া হইতে ইয়োরোপ আমেরিকায় বিস্তৃত হইয়া পড়িল, কিন্তু তাহা জন্মস্থান বঙ্গভূমিতে ঘনীভূত হইল না। নববিধান মানবচরিত্রে এবং মণ্ডলী ও পরিবারে মূর্ত্তিমান্ আকার ধরিয়া তাঁহাকে সুখী করিতে পারিল না। অথচ কার্য্যকোলাহলের মধ্যে দিন দিন তাঁহার শরীর ক্ষয় হইতে লাগিল।

ইংরাজি ১৮৮৩ সনের ১লা জানুয়ারিতে পৃথিবীস্থ যাবতীয় ধর্ম্মসম্প্রদায়কে সম্বোধন করিয়া কেশবচন্দ্র এক পত্র প্রকাশ করেন। তাহাতে নববিধানের সুসমাচার বর্ণিত ছিল। সকল জাতীয় লোককে ভাই বলিয়া আদর করিয়া কয়েকটি নূতন

সংবাদ উপহার দিলেন। সেই পত্র ভারতবর্ষে, ইয়োরোপ এবং আমেরিকার সংবাদপত্রের সম্পাদকগণের নিকট প্রেরিত হয়, এবং অনেকে তাহা পুনর্ম্মুদ্রিত করেন। কেহ কেহ উত্তরও দিয়াছিলেন। অনন্তর সাম্বৎসরিক উৎসব উপলক্ষে টাউনহলে "ইয়োরোপের নিকট এসিয়ার সংবাদ" বিষয়ে বক্তৃতা হয়। এই তাঁহার শেষ বক্তৃতা। টাউনহলের বহুজনাকীর্ণ মহাসভা এই তাঁহার শেষ বাক্য শ্রবণ করিল। আর সে সুদীর্ঘ সুন্দর দেবশ্রী টাউনহলের শ্রোতৃবর্গ দেখিতে পাইবে না। ব্রহ্মমন্দিরের উপাসকমণ্ডলীও বেদীর উপর সে শান্তমূর্ত্তি প্রসন্ন বদন দর্শন করত নয়নকে তৃপ্ত করিতে পাইবে না। গুণের অনুরূপ রূপ ভগবান্ সৃষ্টি করিয়াছিলেন। একবার নয়নপথে পতিত হইলে সে রূপের প্রতি কেহ উদাসীন থাকিতে পারিত না। মহাসমারোহের সহিত এ বৎসর কেশবচন্দ্র ব্রহ্মোৎসব করিলেন। তৎকালকার একটী প্রার্থনায় আছে, "হে প্রেমময় হরি, রোগাক্রান্ত হইয়া শরীর ভাঙ্গিবার জন্য যেন গত বৎসর প্রস্তুত হইতেছিলাম। ভাবিয়াছিলাম, উৎসব আর শেষ করিতে পারিব না। কিন্তু শান্তিধাম সুখধাম তুমি, আমার মাথায় যখন তুমি হাত দিয়া কোলে করিয়া রাখিলে, তখন আমি বুঝিলাম, তোমার সেবা করাই জীবন, আলস্য মৃত্যু, মৃত্যু আর কিছুই নয়। আবার খাটিতে লাগিলাম, বন্ধুদের সেবা করিতে লাগিলাম, আবার উৎসব সম্ভোগ করিতে পারিলাম। প্রেমের কথা, পুণ্যের কথা আবার যেন বলিতে পারি ; মরি নাই যদি, তবে মৃতের ন্যায়

থাকি না যেন, ভাগবতী তনু পাই যেন। এই পৃথিবীতে থাকিতে থাকিতে যেন বীরের মত শক্তি সামর্থ্য আমার ভিতরে আইসে। আমার দক্ষিণ হস্ত লৌহের মত কঠিন হইবে। অগ্নিস্ফুলিঙ্গ আমার কথা হইতে বাহির হইবে।”

পূর্ব্বোল্লিখিত পত্রখানি সংস্কৃত, উর্দ্দু এবং বাঙ্গালায় অনুবাদিত হইয়া উৎসবমন্দিরে পঠিত হইল। দেবালয়ে এক গ্লোব স্থাপন করিয়া তদুপরি এক বিধাননিশান তিনি উড়াইয়া দিলেন। সমস্ত পৃথিবী সম্মুখে রাখিয়া প্রার্থনা করিলেন। বন্ধুদিগকে যাহা বলিবার ছিল, পরিষ্কার ভাষায় তাহা বলিলেন। অঙ্গ বিশেষ গ্রহণ না করিয়া তাঁহার ধর্ম্মচরিত্রের সর্ব্বাঙ্গীন ভাব যাহাতে সকলে গ্রহণ করে, তদ্বিষয়ে অতি সার সার কথা বলিয়াছিলেন। নবনৃত্যের দিনে এমনি মত্ততার সহিত নৃত্য কীর্ত্তন করিলেন যে, তাহা দেখিয়া ভয় হইল, পাছে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়েন। এবারকার উৎসব-ক্রিয়া তিনি রুগ্ন দেহ লইয়াই সম্পাদন করেন। তথাপি বুঝিতে দিলেন না যে, তিনি পীড়িত আছেন। কি কাল-রোগ যে আসিয়াছিল, কোন চিকিৎসাতেই তাহার উপশম হইল না। উৎসবান্তে প্রেরিতমণ্ডলীর জন্য কয়েকটি বিধি এবং জীবনাদর্শ লিপিবদ্ধ করিয়া সপরিবারে সিমলা পর্ব্বতে চলিয়া গেলেন। মণ্ডলী গঠিত হইল না, কেহ কাহাকে প্রাণ দিয়া ভাল বাসিল না, এই নিদারুণ বিশ্বাস লইয়া নিরাশ-মনে তিনি পর্ব্বতে যাত্রা করেন।

একে ভগ্ন শরীর, তাহাতে পথকষ্ট, আম্বালায় গিয়া জ্বরে আক্রান্ত হইলেন। তাহাতে শরীর একবারে শ্রীভ্রষ্ট বলহীন হইয়া পড়িল। পরে চিকিৎসা দ্বারা কথঞ্চিৎ আরোগ্য লাভ করিলেন বটে, দুই মাসের জন্য একটু সুস্থও হইয়াছিলেন, কিন্তু রোগের হ্রাস হইল না। তথায় তারাভিউ নামক ভবনে অবস্থিতি করিতেন। কিঞ্চিৎ সুস্থতা লাভ করিয়াই "নবসংহিতা" লিখিতে প্রবৃত্ত হন। প্রতিদিন প্রাতঃকালে পর্ব্বতের মনোহর দৃশ্যের সম্মুখে বসিয়া সংহিতা লিখিতেন। প্রায় দুই প্রহর একটা পর্য্যন্ত লিখিয়া, ডাকে কাপি পাঠাইয়া তাহার পর উপাসনায় বসিতেন। প্রথম দুই মাস কাল একটু স্ফূর্ত্তি পাইয়াছিলেন, তাহার পরে যে রোগ-দুর্ব্বলতা বৃদ্ধি হইল, আর তাহা কমিল না। অরুচি, অর্শ, কোমরবেদনা, কাশি, তাহার সঙ্গে রক্ত, শরীরটা যেন ব্যাধির মন্দির হইয়া উঠিল। সহসা সে মূর্ত্তি দেখিলে চক্ষে জল আসিত। কোথায় বা তখন সে সুন্দর রূপলাবণ্য, কোথায় বা দেহসৌষ্ঠব। রোগেতে গলদেশ, মুখমণ্ডল ও ললাটের চর্ম্ম সকল সঙ্কুচিত, রক্তহীন, পাণ্ডুবর্ণ ; কেবল যোগ ও বিশ্বাসবলে জীবিত থাকিয়া অবশিষ্ট কর্ত্তব্য নির্ব্বাহ করিতেন। সে সময়ে তাঁহার আহার নিদ্রা কোন বিষয়েই জীবনে সুখ ছিল না, তথাপি চারি পাঁচ ঘণ্টা একাসনে বসিয়া সংহিতা লিখিতেন। আমেরিকার কোন ব্যক্তির অনুরোধে সেই সঙ্গে আর্য্যজাতির যোগ-সাধনের প্রণালীও লিখিতে আরম্ভ করেন। দুই খানি গ্রন্থে গভীর চিন্তার আবশ্যকতা হইয়াছিল। যদিও যোগতত্ত্ব তাঁহার দৈনিক জীবনের

পরীক্ষিত বিষয়, তথাপি সে সমুদয় বিনা পরিশ্রমে লিপিবদ্ধ হইতে পারে নাই। শেষ জীবনে তাঁহার এইরূপ কার্য্য দেখিয়া মনে হইত, এ সকল লীলাসমাপ্তির নিদর্শন। বাস্তবিক তাহাই ঘটিল। প্রার্থনাদি যাহা করিতেন, তাহাতে কেবল পরলোক এবং অমরধামের কথাই অধিক থাকিত। ব্যস্ত সমস্ত হইয়া সংহিতা এবং যোগ-রচনা শেষ করিয়া ফেলিলেন। প্রথমটি নববিধান পত্রিকায় মুদ্রিত হয়, শেষটি আমেরিকায় পাঠাইয়া দেন।

প্রতি দিন উপাসনাকালে প্রথমে একতারা বাজাইয়া পদাবলীর সুরে আরাধনা ও প্রার্থনার ভাবে গান করিতেন। তদনন্তর ধ্যান ও প্রার্থনা হইত। এক ঘণ্টা উপবেশনের পর অত্যন্ত কাতর হইতেন, এবং একবারে বিছানায় গিয়া পড়িতেন। দুই এক জন লোক সবলে কোমর এবং পিঠ টিপিয়া দিলে তবে আহার করিতে পারিতেন। এই রূপ অবস্থা দর্শনে ডাক্তারেরা শারীরিক পরিশ্রমের জন্য ছুতারের কার্য্য করিতে পরামর্শ দেন। তদনুসারে অচিরে গড়ন কাঠ এবং অস্ত্রাদি সমস্ত আনা হইল। আহারান্তে আচার্য্য দুই তিন ঘণ্টাকাল তদ্রূপ কার্য্য করিতে লাগিলেন। কাঠ চিরিয়া তাহা রেঁদা দ্বারা সাপ করিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র টেবিল এবং আলমারা প্রস্তুত করিলেন। সে সকল দ্রব্য এখনো তাঁহার শয়নগৃহে বর্ত্তমান আছে। দুর্ব্বলতা কমিল না দেখিয়া ডাক্তার দুগ্ধের সহিত ডিম খাইবার ব্যবস্থা করেন। অগত্যা তাহা তিনি কর্ত্তব্য জ্ঞানে পান করিতেন। তথাপি শরীর

দিন দিন দুর্ব্বল হইতে লাগিল ; কিন্তু তাহাতে নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়া বন্ধ রহিল না। শারীরিক মানসিক পরিশ্রম এবং সাধন ভজন পূর্ব্ববৎ চলিতে লাগিল। ভাদ্রোৎসবের দিনে পাহাড়ে যথারীতি উৎসব করিলেন। শারীরিক গ্লানি সত্ত্বেও এই সকল কর্ম্ম করিতেন।

যে দুঃসহ বেদনায় প্রাণবায়ু শেষ বহির্গত হইল, তাহা সিমলায় থাকাকালীন আরম্ভ হয়। দুই জন বলবান্ হিন্দুস্থানী বন্ধু সবলে কোমর টিপিতেন, তাহাতেও কিছু হইত না। এক প্রকার শুষ্ক কাশিতে তাঁহাকে বড় কষ্ট দিত। কিন্তু সেই অবস্থায় তাঁহার ধর্ম্মবিশ্বাস এবং যোগবলের প্রভাব যাহা দেখা গিয়াছে, তাহা আর ভুলিবার নহে। কেশবচন্দ্র জীবদ্দশায় সুস্থ শরীরে যে সকল অদ্ভুত কার্য্য করিয়াছেন, তাহা তাঁহার বুদ্ধি বিদ্যা এবং ক্ষমতার পরিচায়ক বলিয়া লোকে মনে করিতে পারে, কিন্তু যোগবলে রোগযন্ত্রণাকে যেরূপে তিনি দমন করিতেন এবং তদবস্থায় ইষ্টদেবের সহিত যে ভাবে কথাবার্ত্তা কহিতেন, তদ্বৃত্তান্ত শুনিলে এমন লোক নাই, যাহার মন স্তম্ভিত না হইয়া থাকিতে পারে। যাহা আমরা স্বচক্ষে দেখিয়াছি, তাহাই বলিতেছি। রোগ দুঃখেতেই বিশ্বাসের বল পরীক্ষিত হয়।

প্রতিদিন সন্ধ্যাকালে তাঁহাকে শুষ্ক কাশিতে নিতান্ত অবসন্ন এবং কাতর করিয়া ফেলিত। কাশিতে কাশিতে যেন শ্রান্ত হইয়া পড়িতেন। যন্ত্রণা যখন শেষ সীমায় উঠিত, আর কোন উপায় কার্য্যকর হইত না, তখন তিনি অবসন্ন হইয়া যোগে মগ্ন

হইতেন। দুইটি বৎসর ক্রমাগত রোগভোগ, তাহার উপর বিবিধ প্রকার যন্ত্রণাদায়ক উপসর্গ। আহারে সুখ নাই, উপাদেয় বস্তুতেও অরুচি, চক্ষে নিদ্রা নাই, অর্থের অনটনজন্য অভাব কষ্ট যথেষ্ট, সমাজের এই দুরবস্থা; বাহিরের সমস্ত সুখে জলাঞ্জলি দিয়া নিরবলম্বে কয় ব্যক্তি সেরূপ গভীর যোগে প্রাণকে ডুবাইয়া দিতে পারে, জানি না। ঈদৃশ রোগ দারিদ্র্য মনঃপীড়ায় সাধারণ লোকেরা চক্ষে কেবল অন্ধকার দর্শন করে, আর পৃথিবীকে অভিশাপ দেয়। কিন্তু ধন্য কেশবচরিত্রের যোগবল! এত দিন জীবনক্ষেত্রে যেমন তিনি ধর্ম্মসংস্কারকের মহত্ত্বের পরিচয় দিলেন, রোগশয্যায় এখন তেমনি বিশ্বাসের জয় ঘোষণা করিতে লাগিলেন। কাশির যন্ত্রণা যেন তাঁহাকে বিশ্বজননীর স্নেহক্রোড়ে শয়ন করাইয়া দিত। তদবস্থায় মায়ে ছেলের যেমন কথাবার্ত্তা হয়, সেই ভাবে মৃদু স্বরে ফিস ফিস রবে তিনি প্রাণস্থ জননীর সঙ্গে কথা কহিতেন। দশ পনর মিনিট এইরূপে নানা ভাবের কথা চলিত। কখন ক্রন্দন, কখন অভিমান, কখন বা হাসি আমোদ; কখন বিশ্বাস অনুরাগের কথা। রোগেতেও আনন্দানুভব। সে প্রকার অদ্ভুত হাসি আমরা কখন দেখি নাই। ঠিক যেন উন্মাদের হাসি। সে সকল কথোপকথনে এমন গূঢ় প্রগল্‌ভা ভক্তির ভাব প্রকাশ হইত যে, স্বর্গের লোক ভিন্ন তাহা শুনিতেও সাহস করে না। ক্ষণকাল পরে আবার উঠিয়া বসিতেন, কিছু খাইতেন, যেন রোগ ভাল হইয়া গিয়াছে মনে হইত। আশ্চর্য্য এই, যত ক্ষণ ঐ রূপ কথা চলিত, তত ক্ষণ আর কাশি আসিত না। প্রেমোন্মাদের

লক্ষণ দর্শন করিয়া সহচর আত্মীয়গণ অবাক্ হইয়া যাইতেন। পীড়িতাবস্থায় একটী প্রার্থনার আভাস এখানে দেওয়া যাইতেছে, ইহা দ্বারা পূর্ব্বোক্ত কথা আরো প্রমাণিত হইবে। "জীবনের অশান্তি বাস্তবিক, হে ঈশ্বর! বড় অশান্তি। তথাপি রোগের ভিতর সময়ে সময়ে মিষ্টতা ভোগ করা যায়। দুর্ব্বল অবসন্ন তনু অলক্ষিতভাবে কিরূপে যোগের শান্তির মধ্যে মগ্ন হয়, ইহা আমার নিকট একটি 'নূতন ব্যাপার। পীড়ার অবস্থা দুঃখের অবস্থা বলিয়াই লোকে জানে। কিন্তু যখন রোগশয্যার পার্শ্বে আস্তে আস্তে এসে তুমি আপনার সন্তানের দুর্ব্বল মস্তক স্বীয় ক্রোড়ে তুলিয়া লইয়া কাণে কাণে মিষ্ট কথা বল, তখন আহা! দুঃখ সন্তাপ সকল কেমন বিদূরিত হয় এবং আত্মা কেমন গভীর যোগের মধ্যে প্রবেশ করে! সেরূপ সময় স্বাস্থ্যের অপেক্ষাও উৎকৃষ্ট।" যে অবস্থায় যখন পড়িতেন, তাহা হইতে সার সংগ্রহ করিয়া লইতেন। শরীরের অবসন্নতাও যোগের অনুকূল হইত।

ইং ১৮৮৩ সনের অক্টোবর মাসের প্রথম সপ্তাহে রোগে এইরূপ জীর্ণশীর্ণ হইয়া ভগ্নশরীরে তিনি কলিকাতায় প্রত্যাগমন করেন। পথিমধ্যে দিল্লী এবং কাণপুরে কয়েক দিন ছিলেন। হাকিমের দ্বারা চিকিৎসা হইল, তাহাতেও কোন ফল দর্শিল না। যখন একটু অবসর পাইতেন, তখনি নববিধান পত্রিকার জন্য কাপি লিখিতে বসিতেন। এক দিন পুনঃ পুনঃ কাশি এবং বেদনার সঙ্গে সংগ্রাম করিয়া অল্প কিঞ্চিৎ লিখিলেন। সঙ্গে এমন পাথেয় নাই যে, একবারে বাটী আসিয়া উপস্থিত হন।

কোন সহৃদয় •উন্নতমনা• ব্রাহ্মবন্ধুর সাহায্যে অক্টোবরের শেষ ভাগে বাড়ী আসিয়া পৌঁছিলেন। পূর্ব্ব হইতেই সঙ্কল্প করিয়া আসেন যে, বাড়ীতে একটি নূতন দেবালয় স্থাপন করিবেন। পথে আসিবার সময় তাহার নক্‌সা প্রস্তুত করেন।

বাটী পৌঁছার পর কিছু দিন চিকিৎসাসঙ্কট উপস্থিত হয়। নানা মতের চিকিৎসক আসিয়া জুটিলেন, কোন্ মতে চিকিৎসা হইবে, এই ভাবিয়া সকলে অস্থির। রোগীর ইচ্ছা যে, ইহাতেও নববিধানের মত কোন সামঞ্জস্য প্রণালী অবধারিত হয়। কিন্তু তাহা কে করিবে? চিকিৎসারাজ্যে কেশবচন্দ্র কেহ এ পর্য্যন্ত জন্মে নাই। পরিশেষে য়্যালোপাথ চিকিৎসা আরম্ভ হইল। মাংসের জুস এবং ডিম্ পথ্য চলিতে লাগিল, কিছু উপকার তদ্দ্বারা প্রথমে হইয়াছিল, কিন্তু সে কেবল অল্প সময়ের জন্য। কার্য্যের অবতার কেশবচন্দ্র নিষ্কর্ম্মা হইয়া থাকিতে পারেন না। রোগশয্যায় পড়িয়াও নানাবিধ কার্য্যের সূচনা করিলেন। কখন উৎসবের সময় "আনন্দবাজার" কিরূপে নিষ্পন্ন হইবে তাহার চিন্তা, কখন যোগ এবং নবসংহিতার প্রুফ দর্শন। এই অবস্থায় দেবালয় আরম্ভ করিয়া দিলেন। রুগ্ন শরীরে কাঁপিতে কাঁপিতে টলিতে টলিতে নীচে নামিলেন, প্রচারকগণের সহিত মিলিত হইয়া ভিত্তি গাঁথিলেন। নবদেবালয়ে যাহাতে প্রচারকগণ গৃহভিত্তির ন্যায় ঐক্যবদ্ধ হইয়া থাকেন, তদুদ্দেশে প্রত্যেক ব্যক্তি দ্বারা এক একখানি ইট গাঁথাইয়া

লইলেন। এক মাসের মধ্যে গৃহ নির্ম্মিত হইবে, এই ব্যবস্থা। সেই ভাবে কার্য্য চলিতে লাগিল। কয়েক দিন কিঞ্চিৎ সুস্থতা লাভ করিয়া যেরূপ বাড়ী ঘর সমস্ত পরিবর্ত্তন ও সংশোধনের জন্য ব্যস্ত রহিলেন, তাহা দেখিয়া সকলেরই মনে আশার সঞ্চার হইল। উৎসবের সময় কি কি করিতে হইবে, তাহার ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন। বিছানায় শুইয়া এইরূপ করিতেন, আর মধ্যে মধ্যে চেয়ারে বসিয়া দেবালয়ের নির্ম্মাণকার্য্য দেখিতেন। কখন কখন নীচে আসিয়া অন্তঃপুর ও বহির্ব্বাটীর নির্ম্মাণ ও মেরামতকার্য্য পরিদর্শন করিয়া বেড়াইতেন। প্রচারকগণের ধর্ম্মোন্নতির পরীক্ষা লইবার জন্য সৎপ্রসঙ্গের প্রস্তাব করেন। দুই দুই জন তাঁহার সম্মুখে বসিয়া ধর্ম্মালাপ করিবেন, আর তিনি শুনিবেন। যোগ ভক্তি স্নান আহার দর্শন শ্রবণ ইত্যাদি গুরুতর বিষয় তাহার জন্য নির্দ্ধারিত ছিল। দুই এক দিন সেরূপ কথাবার্ত্তা চলিয়াছিল, তদনন্তর পীড়া সাংঘাতিক হইয়া উঠিল, আর কোন কার্য্যই হইল না।

পীড়ার অবস্থায় ধর্ম্মবন্ধুদিগের সহিত তাঁহার যেরূপ কথোপকথন আলাপ সম্ভাষণ হইত, তাহা বিশ্বাসরাজ্যের জীবন্ত প্রমাণ স্বরূপ। এক দিন প্রধান আচার্য্য মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ তাঁহাকে দেখিতে আসেন। কয়েক মাস পূর্ব্বে তাঁহার সহিত পত্র দ্বারা ভাবের বিনিময় হইয়াছিল। মহর্ষি রোগের কথা শুনিয়া স্নেহের সহিত এক খানি অতি সুন্দর

পত্র প্রেরণ করেন। অনন্তর তিনি কমলকুটীরে উপস্থিত হইলে আচার্য্য কেশব ভূমিষ্ঠ হইয়া তাঁহার পদে প্রণাম করিলেন এবং মহর্ষি তাঁহাকে প্রেমভরে আলিঙ্গন দিয়া পার্শ্বে বসাইলেন। যেন পিতা পুত্রের শুভ সম্মিলন হইল। কেশবচন্দ্র দেবেন্দ্র বাবুর হাত খানি নিজমস্তকে রাখিয়া বুলাইতে লাগিলেন। রোগযন্ত্রণার সময় জননীকে নিকটে পাইয়া যেমন আনন্দানুভব হয়, সুস্থতার সময় তেমন হয় না; এই সম্বন্ধে ও অন্যান্য বিষয়ে ক্ষণকাল উভয়ে আন্তরিক বিশ্বাস অভিজ্ঞতার কথা কহিলেন। প্রধান আচার্য্যকে এক দিন ভোজন করাইতে তাঁহার বড় ইচ্ছা ছিল, কিন্তু ব্যারাম বৃদ্ধি হওয়াতে তাহা ঘটিল না।

পরমহংস রামকৃষ্ণ এক দিন দেখিতে আসেন। তৎকালে কেশবচন্দ্র নিদ্রিতাবস্থায় ছিলেন। অনেক বিলম্ব দেখিয়া পরমহংস মহাশয় ব্যাকুল হইলেন। সাক্ষাৎ হইবে এমন সময় তাঁহার চিত্ত সমাধিতে ডুবিয়া গেল। তদবস্থায় উচ্চৈঃস্বরে তিনি বলিয়া উঠিলেন, "ও গো বাবু, আমি অনেক দূর হইতে তোমাকে দেখিব বলি আসিয়াছি। একবার দেখা দেও, আমি আর থাকিতে পারি না।" এমন সময় কেশবচন্দ্র নিকটে আসিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। প্রায় আধ ঘণ্টা কাল নানা কথার প্রসঙ্গ হইল। পরমহংস বলিলেন, "ভাল ফুল হইবে বলিয়া মালী যেমন গোলাপ গাছের গোড়া খুঁড়িয়া দেয়, তোমাকেও মা তাই করিতেছেন, এ

তোমার পীড়া নয়। তুমি মায়ের বছুরাই গোলাপ গাছ! মাকে পাকা রকমে পাইতে গেলে শরীরে এক একবার বিপদ হয়; তিনি এক একবার শরীরকে নাড়া চাড়া দেন। সেবারে তোমার যখন অত্যন্ত রোগ হইয়াছিল, তাহাতে আমার বড় ভাবনা হয়। সিদ্ধেশ্বরীকে ডাব চিনি মানিয়াছিলাম। এবার তত ভাবনা হয় নাই। কেবল কাল রাত্রিতে প্রাণ কেমন করিয়া উঠিল। মাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, মা, যদি কেশব না থাকে, তবে আমি কাহার সঙ্গে কথা কহিব?" অনন্তর পরমহংস চলিয়া গেলে আচার্য্য কেশবচন্দ্র শ্রান্ত হইয়া বিছানায় পড়িলেন। সে দিন তাঁহার অদ্ভুত সমাধি, তাহার সঙ্গে হাসি এবং গভীর যোগানন্দ যাঁহারা দেখিয়াছেন, তাঁহারা অমররাজ্যের এক আশ্চর্য্য অবস্থা অবলোকন করিয়াছেন সন্দেহ নাই। তাঁহার হাস্যোদ্গম-দর্শনে আত্মীয়গণের মনে মহা ভয়ের সঞ্চার হইয়াছিল।

রোগের অবস্থায় লর্ড বিশপ এক দিন দেখিতে আসেন। তখন কেশবচন্দ্রের দাঁতের গোড়া দিয়া রক্ত নিঃসারিত হইতেছিল। পিকদানিতে রক্ত ফেলিতে ফেলিতে তিনি বিশপের সহিত ধর্ম্মালাপ করিতে লাগিলেন। রোগশয্যার ঘটনা সকল দেখিলে মনে হইত, এক দিকে যেমন ব্যাধির আক্রমণ এবং তীব্র ক্লেশাঘাত, অপর দিকে বিশ্বাস নির্ভরের তেমনি তেজঃ এবং দৃঢ়তা।

চরমকাল

পীড়া কিছুদিন সাম্যাবস্থায় থাকিয়া পরিশেষে এমন ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করিল যে, চিকিৎসকগণ একেবারে হতবুদ্ধি হইয়া পড়িলেন। অনন্তর য়্যালোপাথিক ছাড়িয়া ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার দ্বারা হোমিওপাথি আরম্ভ হইল। কিন্তু সেই কোমরের বেদনার কেহই কিছু করিতে পারিলেন না। বিছানায় পড়িয়া পড়িয়া আচার্য্য কেশবচন্দ্র দেবালয় প্রস্তুত করিলেন। ১লা জানুয়ারীতে তাহার প্রতিষ্ঠার দিন স্থির হইল। উত্থান-শক্তি নাই, তথাপি নীচে নামিয়া আসিলেন। এমনি ব্যাকুল হইলেন যে, কেহ নিবারণ করিতে পারিল না। অবশেষে এক খানি চেয়ারে বসাইয়া চারি পাঁচ জনে ধরিয়া তাঁহাকে নামাইলেন। দেবালয়ের অসম্পন্ন বেদীতে বসিয়া এই কয়টী কথা তিনি বলেন ;—

"এসেছি মা, তোমার ঘরে। ওরা আস্‌তে বারণ করেছিল, কোন রূপে শরীরটা এনে ফেলেছি। মা, তুমি এই ঘর অধিকার করে বসেছ? এই দেবালয় তোমার ঘর, লক্ষ্মীর ঘর। নমঃ সচ্চিদানন্দ হরে! আজ ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারি, মঙ্গলবার, ১৮০৫ শকের ৫ই পৌষ ; এই দেবালয় তোমার শ্রীচরণে উৎসর্গ করা হইল। এই ঘরে দেশ দেশান্তর হইতে তোমার ভক্তেরা আসিয়া তোমার

পূজা করিবেন। এই দেবালয়ের দ্বারা এই ব্যাড়ীর, পল্লীর কল্যাণ হইবে। এই সহরের কল্যাণ হইবে, এবং সমস্ত দেশের ও পৃথিবীর কল্যাণ হইবে। গত কয়েক বৎসর আমার বাড়ীতে ক্ষুদ্র দেবালয়ে স্থানাভাবে তোমার ভক্তেরা ফিরিয়া যাইতেন। আমার বড় সাধ ছিল, কয়েক খানা ইট কুড়াইয়া তোমাকে এক খানা ঘর করে দিই। সেই সাধ মিটাইবার জন্য, মা লক্ষ্মী, তুমি দয়া করিয়া স্বহস্তে ইট কুড়াইয়া তোমার এই প্রশস্ত দেবালয় নির্ম্মাণ করিয়া দিলে। আমার বড় ইচ্ছা, এই ঘরের ঐ রোয়াকে তোমার ভক্তবৃন্দসঙ্গে নাচি। এই ঘরই আমার বৃন্দাবন, ইহা আমার কাশী ও মক্কা, ইহা আমার জেরুশালম; এ স্থান ছাড়িয়া আর কোথায় যাইব? আমার আশা পূর্ণ কর। মা, আশীর্ব্বাদ কর, তোমার ভক্তেরা এই ঘরে আসিয়া তোমার প্রেমমুখ দেখিয়া যেন অদর্শন-যন্ত্রণা দূর করেন। মা, আমার বড় সাধ, তোমার ঘর সাজাইয়া দিই।"

"প্রিয় ভ্রাতৃগণ! তোমাদিগকেও বলি, আমার মা বড় সৌখীন মা। ভাই, তোমরা মনে করিও না, আমার মা পাথরের মত শুষ্ক মা, তাঁহার কোন সখ নাই। তোমরা সকলে কিছু কিছু দিয়ে মার ঘরখানি সাজিয়ে দিও। কিছু কিছু দিয়া তাঁহার পূজা করিও। মিছে মিছি অমনি কেবল কতকগুলি কথা দিয়া মায়ের পূজা করিও না। মা তোমাদিগকে বড় ভাল

বাসেন। তোমরা একটি ক্ষুদ্র ভক্তিফুল মার হাতে দিলে, মা আদর করিয়া তাহা স্বহস্তে স্বর্গে লইয়া গিয়া দেব দেবী সকলকে ডাকিয়া তাহা দেখান এবং আনন্দ প্রকাশ করিয়া বলেন, দেখ পৃথিবীর অমুক ভক্ত আমাকে এই সুন্দর সামগ্রীটী দিয়াছে! ভাই রে, আমার মা বড্ড ভাল রে, বড্ড ভাল, মাকে তোরা চিন্‌লি নে। তোরা মার হাতে যাহা দিস্, পরলোকে গিয়ে দেখবি, তাহা আদর ও যত্নের সহিত সহস্র গুণ বাড়াইয়া তাঁহার আপনার ভাণ্ডারে তিনি রাখিয়া দিয়াছেন। এই মা আমার সর্ব্বস্ব। মা আমার প্রাণ, মা আমার জ্ঞান, মা আমার ভক্তি দয়া, মা আমার পুণ্য শান্তি, মা আমার শ্রী সৌন্দর্য্য। মা আমার ইহলোক পরলোক। মা আমার সম্পদ্ সুস্থতা। বিষম রোগযন্ত্রণার মধ্যে মা আমার আনন্দসুধা। এই আনন্দময়ী মাকে নিয়ে, ভাইগণ, তোমরা সুখী হও। এই মাকে ছাড়িয়া অন্য সুখ অন্বেষণ করিও না। এই মা তাঁহার আপনার কোলে রাখিয়া তোমাদিগকে ইহলোকে চিরকাল সুখে রাখিবেন। জয় মা আনন্দময়ীর জয়! জয় সচ্চিদানন্দ হরে!"

যে অমৃতভাষিণী রসনা সহস্র সহস্র শ্রোতৃমণ্ডলীকে মুগ্ধ করিয়া রাখিত, বীণা-যন্ত্রের ন্যায় যাহা হরিগুণ-গানে এত দিন নিযুক্ত ছিল, সে এই কয়টি কথা বলিয়া জন্মের মত নীরব হইল। আনন্দময়ী অখিলমাতার জয় গান করিয়া লীলা সাঙ্গ করিল। হায় রে কেশবরসনা, কাহার সঙ্গে আমি

তোমার তুলনা করিব! তুমি স্বর্গের কোন অদ্ভুত উপাদানে রচিত, তাহা জানি না! তুমি নিরাকার ব্রহ্মের সাকার বাগ্‌যন্ত্র। অভিনব বেদতত্ত্ব প্রচার করিয়া তুমি ভারতের যুবকবৃন্দের প্রাণে নবজীবন সঞ্চার করিয়াছ। তোমার মূলে স্বয়ং ভগবতী বাগ্দেবীরূপে অবতীর্ণ হইতেন। এই জন্য তোমাকে পরম পদার্থ জ্ঞান করি।

মহাত্মা কেশব দুঃসহ রোগে কাতর হইয়া কাঁপিতে কাঁপিতে এই মহাবাক্যগুলি বলিলেন। এমনি দুর্ব্বল তনু, বোধ হইতেছিল, যেন বেদী হইতে বা পড়িয়া যান। অতঃপর মণ্ডলীকে আশীর্ব্বাদ এবং তাহাদের কল্যাণ প্রার্থনা করিয়া উপরে উঠিলেন। জীবনের শেষ সাধু সঙ্কল্পটি পূর্ণ হইল। কিন্তু তথাপি বিদায়সূচক কোন কথা তখনও বলিলেন না। এখন বুঝা যাইতেছে, সেই কয়টী কথার মধ্যে বিদায়ের ভাব ছিল। অনুরাগের আতিশয্য বশতঃ তাদৃশ ক্ষীণ শরীরে নিম্নে অবতরণ করিলেন, কিন্তু তাহাতে কোন প্রকার ক্লেশ বা শ্রান্তি বোধ হইল না। বরং স্ফূর্ত্তির সহিত এই বলিলেন, "ইহাতে যদি কষ্ট হয়, তবে ধর্ম্ম মিথ্যা। তোমরা আমার যথার্থ চিকিৎসা করিলে না।"

যে দুঃসহ ক্লেশজনক বেদনার কথা পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে, সেই বেদনা শেষে অত্যন্ত বাড়িয়া উঠিল। দেবালয়-প্রতিষ্ঠার তিন চারি দিন পূর্ব্বে উহা প্রবল হয়, পরে ঐ দিন হইতে ভয়ানক যন্ত্রণা হইতে লাগিল। যখন বেদনা বাড়িল, তখন

আর হোমিওপ্যাথ চিকিৎসার উপর কেহ নির্ভর করিতে পারিলেন না। রোগী বলিলেন, যে পথেই হউক, যাহাতে পার কোন উপায়ে বেদনা নিবারণের চেষ্টা কর। "মা রে!" "বাবা রে!" দিন রাত্রি কেবল এই চীৎকার-ধ্বনি। সে আর্ত্তনাদ কর্ণে যেন এখনো লাগিয়া রহিয়াছে। ক্রমাগত "গেলাম রে, বাবা রে," করিতে করিতে বিছানার এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত গড়াগড়ি দিতেন। শত শত সহৃদয় বন্ধু, আত্মীয় প্রিয়জন সেবার জন্য দিবানিশি শয্যাপার্শ্বে বসিয়া রহিয়াছেন, বড় বড় চিকিৎসক বৈদ্য সকলে যাতায়াত করিতেছেন, কিন্তু সে নিদারুণ বেদনা নিবারণ করিবার কাহারো ক্ষমতা নাই। সে কি সাধারণ বেদনা! এমন যন্ত্রণাদায়ক ব্যথা আমরা কখন দেখি নাই। তাহাতে কেশবের ন্যায় অটল ধৈর্য্যশীল ব্যক্তিকেও অস্থির করিয়া তুলিয়াছিল। তাঁহার কাতর উক্তি এবং মর্ম্মভেদী আর্ত্তনাদে সকলের প্রাণ যেন বিদীর্ণ হইয়া যাইত। শরীরের রক্ত দিলে তাহার উপশম যদি হইত, তাহা দিতে শত শত লোক প্রস্তুত। কিন্তু ধন্য কেশবচন্দ্রের বিশ্বাস! আশ্চর্য্য তাঁহার যোগপ্রভাব! সে অবস্থাতেও সুর করিয়া কাঁদিতেন, আর বলিতেন, "মা, আমার মুখ যেন তোমার নিন্দা না করে। কেন আমি তোমার নিন্দা করিব মা! তুমি রোগ দ্বারা যে আমাকে তোমার কোলে টানিয়া লইতেছ মা!" রোগযন্ত্রণায় শরীর ভয়ানকরূপে নিষ্পেষিত হইলেও, সন্তানবৎসলা স্নেহময়ী জননীর মধুর প্রকৃতি যে

পরিবর্ত্তিত হয় না, ইহা তিনি জানিতেন এবং অনুভব করিতেন। বস্তুতঃ মায়ের ভিতরকার ব্যবহার এবং সঙ্কল্প যে অভয়প্রদ, ইহা পূর্ব্ব হইতেই তাঁহার ভালরূপ জানা ছিল। মা সন্তানকে মারিলেও সন্তান যেমন মার কোলে গিয়ে পুনঃ পুনঃ আশ্রয় গ্রহণ করে, কেশবচন্দ্র গভীর বেদনায় আকুল হইয়া হৃদয়-বিহারিণী জননীর চরণ তেমনি মুহুর্মুহু চুম্বন করিতে লাগিলেন। কেন না, তাঁহার বিশ্বাস ছিল, যাঁহার স্নেহহস্ত এত দিন প্রচুর সুখ সৌভাগ্য আনন্দ শান্তি বিতরণ করিয়াছে, তাঁহারই হস্ত রোগযন্ত্রণার মধ্যে বর্ত্তমান। প্রতি নিমেষে নিমেষে শত সহস্র ক্রুশে যেন তাঁহার প্রাণকে তখন বিদ্ধ করিতেছিল। কিন্তু যতই রোগের তীব্রতা, ততই যোগের গাঢ়তা। উদ্বেলিত সমুদ্রতরঙ্গের প্রতিকূলে বাষ্পীয় পোত যেমন সবেগে ধাবিত হয়, কেশবের যোগবল তদ্রূপ। তিনি আর সংসারের দিকে তখন ফিরিয়া চাহিলেন না। জীবন মৃত্যু যেন তাঁহার এক বলিয়া বোধ হইল। এই জন্য কোন্ কথাটী শেষ কথা, তাহা কেহ বুঝিতে পারিল না। সে ভাবে কাহাকেও তিনি কোন কথা বলিলেন না। শয্যাপার্শ্বে ভাই অমৃতলাল বসিয়া রহিয়াছেন দেখিয়া তাঁহার গলা জড়াইয়া বলিলেন, "ভাই অমৃত, বেদনায় হাড় গুঁড় হইয়া গেল!" এই বলিয়া তাঁহার বুকের মধ্যে মাথা দিয়া ক্ষণকাল রহিলেন। দেবালয়ের মেঝের জন্য শ্বেত পাথর কত লাগিবে, তৎসম্বন্ধে তাঁহার সহিত কথাবার্ত্তা কহিলেন। ভক্তের একটি নাম তিনি বলিতেন চৈতন্য। ভক্ত

কখন চৈতন্যবিহীন হন না। এ কথার সফলতা তাঁহার জীবনে প্রত্যক্ষগোচর হইয়াছে। অমৃতলাল শ্বেতপাথরের যে হিসাব ধরেন, তাঁহার হিসাব যে ভুল, তখনও তিনি দেখাইয়া দিলেন। ভুল ধরিবার ক্ষমতা বড়ই চমৎকার ছিল। অন্য এক দিন সঙ্গীত-প্রচারকের গলা জড়াইয়া, "ভাই, প্রাণের ভাই আমার! তুমি আমাকে অনেক ভাল ভাল গান শুনিয়েছ! আবার আমি গান শুনিব। স্বর্গে গিয়া আবার গান শুনিব। মা আমাদের জন্য ধ্রুবলোক প্রস্তুত করে রেখেছেন। সেইখানে আমরা সকলে যাব।" এইরূপ অনেক কথা বলিলেন। ক্ষণকাল বুকে মাথা দিয়া গলা জড়াইয়া রহিলেন। পরে কনিষ্ঠ সহোদর এবং জ্যেষ্ঠের গলা ধরিয়া নীরবে বিদায় গ্রহণ করিলেন। এ সমস্ত বিদায়ের লক্ষণ, কিন্তু তাহা পরিষ্কাররূপে কাহাকেও তখন বুঝিতে দিলেন না। শয্যাপার্শ্বস্থ জননীদেবীর পদধূলি পুনঃ পুনঃ গ্রহণ করিতেন। বেদনায় অস্থির দেখিয়া মাতা ঠাকুরাণী এক দিন কাঁদিতে কাঁদিতে বলিয়াছিলেন, "কেশব, আমার পাপেই তোমার এত যন্ত্রণা হইতেছে।" আচার্য্য তাঁহার বক্ষে মাথা রাখিয়া গদ্‌গদকণ্ঠে বলিতে লাগিলেন, "মা, এমন কথা তুমি বলিও না। তুমি আমার বড় ভাল মা। তোমার আশীর্ব্বাদেই আমার সব হইয়াছে। তুমি যে আমার ধার্ম্মিকা মা। তোমার মত মা কে পায়? তোমার গর্ভে জন্মিয়াই ত আমি এত ভাল হইতে পারিয়াছি।" ইত্যাদি হৃদয়ভেদী বাক্যে সকলকে কাঁদাইলেন। তাঁহার চরমাবস্থার

যন্ত্রণা দেখিয়া কেহ আর অশ্রুজল সংবরণ করিতে পারিত না। সে দৈহিক যন্ত্রণার কথা আর আমরা অধিক বলিব না। সে অবস্থায় তাঁহার ভক্তি বিশ্বাস, দৃঢ়তা নির্ভর কেমন আশ্চর্য্যরূপে জয় লাভ করিল, তাহাই কেবল বিস্তৃতরূপে লিখিতে ইচ্ছা হয়। কেমন করিয়া ধর্ম্মজীবনে জীবিত থাকিতে হয়, তাহা যেমন তিনি দৃষ্টান্তদ্বারা শিখাইয়া গিয়াছেন, তেমনি ভগবানের চরণ বক্ষে রাখিয়া কেমন করিয়া মরিতে হয়, তাহাও শিখাইলেন। উদ্যানের বৃক্ষ লতাদি দেখিয়া বলিতেন, "আমি পরলোক এইরূপ প্রত্যক্ষ করিতেছি।" চরমকাল নিকট জানিয়া পুরস্ত্রীগণ রোদন করিতেছেন। কোন বন্ধু অনুরোধ করিলেন, আপনি যদি কিছু বলেন, তাহা হইলে মেয়েদের মনে একটু শান্তি হয়। তিনি বলিলেন, "আমি বৈকুণ্ঠের নূতন নূতন কথা ভাবিতেছি, আমি এখন তাহাই বলিব; তাহা বলিলে উহাঁরা আরো কাঁদিয়া উঠিবেন। তোমরা তাঁহাদিগকে বলিয়া দেও যে, সংসারের সকলি মিথ্যা ও মায়া।" চব্বিশ ঘণ্টাই যন্ত্রণাভোগ, এক আধ মিনিট সুস্থতা লাভ করিয়া, অমনি হয় প্রুফ দেখিতে চাহিতেন, না হয় উৎসবাদি হইতেছে কি না সংবাদ লইতেন। বেদনায় ছটফট করিতেছেন, এমন সময় সিন্ধুদেশবাসী নেভালরাও বিদায় লইতে আসিলেন। আচার্য্য তাঁহাকে বলিলেন, নববিধানাঙ্কিত টুপি কিংবা অন্য শিল্প দ্রব্য যদি পাও, আনন্দবাজারের জন্য পাঠাইয়া দিও। ইহার অল্প কয়েক দিন পূর্ব্বে ভাই অমৃতলালকে বলেন, মন্দিরের ঋণ পরিশোধের জন্য উহার পার্শ্বস্থ ভূমি বিক্রয় করিয়া ফেল।

তদনুসারে তিনি চেষ্টাও করেন। কিন্তু পীড়া এত বৃদ্ধি হইয়া উঠিল যে, তৎসম্বন্ধে অধিক কথাবার্ত্তা হইবার আর সুযোগ ঘটিল না। অনেক লোক তাঁহাকে দেখিবার জন্য ঘরে প্রবেশ করিত। ইহাতে পরিবারস্থ আত্মীয়গণ ভীত এবং বিরক্ত হইতেন; কেন না, বহুলোকের নিশ্বাসে বায়ু দূষিত হইবার সম্ভাবনা। কিন্তু রোগীর তাহাতে মনে কষ্ট হইত। লোকে মনঃক্ষুণ্ণ হইয়া পাছে ফিরিয়া যায়, এ জন্য তিনি দুঃখ প্রকাশ করিতেন। অল্প ক্ষণের জন্য প্রত্যেক ব্যক্তিকে এক একবার ঘরে আসিবার অনুমতিও দিতেন।

মহাসমাধি

এখন যে অবস্থায় আসিয়া আমরা পৌঁছিলাম, এখানে আর লেখনী চলে না। হায়! আমি কি লিখিতেছি। সোণার কেশবচন্দ্র পৃথিবী পরিত্যাগ করিলেন, এই নিদারুণ কথা যে আবার এই হতভাগ্যকে লিখিয়া যাইতে হইবে, তাহা আর সে কখন জানিত না। কিন্তু কেশবচন্দ্রের মহাসমাধি, মহাযোগ, মহাবৈরাগ্যের বিবরণ যে আমার মর্ম্মস্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে। ইহার আদ্যোপান্ত বৃত্তান্ত না শুনিলে পৃথিবী বড় বঞ্চিত হইবে। পরলোক, অমরধাম, নিত্যযোগ, অনন্ত জীবন যদি কেহ দেখিতে চাহেন, তবে তিনি আমার সঙ্গে কেশবচন্দ্রের

সমাধিশয্যাপার্শ্বে একবার আগমন করুন। এখানে যে গম্ভীর শোকাবহ এবং স্বর্গীয় দৃশ্য দেখিয়াছি, তাহা আর কখন দেখি নাই, বোধ হয়, দেখিব না।

এক সপ্তাহ পূর্ব্বে যাঁহাকে নানা কার্য্যে ব্যাপৃত দেখা গিয়াছিল, তিনি এখন সংসার, পরিবার এবং ইহকাল সম্বন্ধে একেবারে উদাসীন। ঘোরতর পীড়ার অবস্থায় বৈরাগী কেশব যে ভাবে বাড়ী ঘর মেরামতের জন্য ব্যস্ত থাকিতেন, তাহা দেখিলে হঠাৎ মনে হইতে পারিত, ইনি পরলোকের দ্বারদেশে দণ্ডায়মান থাকিয়া কিরূপে এ সকল অসার কার্য্য করিতেছেন? কিন্তু কেশবের গূঢ় বৈরাগ্যের গভীর তত্ত্ব উহার মধ্যেই নিহিত ছিল। তিনি ভিতরে পরকাল ভাবিতেন, আর বাহিরে অবশিষ্ট কার্য্য সমাধা করিতেন। ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের আদ্যোপান্ত কার্য্য-বিবরণ যাহাতে এক খানি পুস্তকে বদ্ধ হয়, তাহার ব্যবস্থা পূর্ব্বেই করিয়া রাখিয়াছিলেন। ব্রাহ্মপরিবারের ধর্ম্ম ও নীতি, সাধন ভজন, নিত্য নৈমিত্তিক ও সামাজিক অনুষ্ঠান সম্বন্ধে যাহা প্রয়োজন, রোগশয্যায় পড়িয়া "নবসংহিতা" নামক গ্রন্থে তাহাও লিপিবদ্ধ করিলেন। যাইবার জন্য যেন একবারে প্রস্তুত। ইত্যবসরে স্বর্গদূত আসিয়া যাই পরলোকগমন-সূচক শঙ্খধ্বনি করিল, অমনি কেশব পৃথিবীর দিকে বিমুখ হইলেন। এখানকার যাবতীয় সম্বন্ধ কেবল এক রোগযন্ত্রণার মধ্যে তখন অবস্থিতি করিতে লাগিল। পরিবার-পুত্রগণের কি হইবে, তাহার সম্বন্ধে একটী কথাও বলিলেন না। বেশ বুঝা গেল, পদ্মপত্রের জলের

ন্যায় তাঁহার আত্মা নির্লিপ্ত ছিল। সংসার-মায়ার কর্দ্দম তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে নাই। মহাবৈরাগ্যের পরিচয় এ স্থলে প্রকাশিত হইয়াছে। যাঁহার চিত্ত পৃথিবীর সহস্র সহস্র বিষয়ে নিরন্তর প্রধাবিত হইত, সমস্ত পৃথিবী যাঁহার কার্য্যক্ষেত্র, আত্মীয় কুটুম্ব বন্ধু বান্ধব যাঁহার বহুসংখ্যক, কেমন করিয়া সহজে তিনি মায়ার বন্ধন কাটিলেন, ইহা বুঝিয়া উঠা যায় না। রোগজীর্ণ শরীরের সহিত যোগী আত্মার কি প্রবল সংগ্রামই এখানে দেখা গেল! পরিণামে আত্মারই জয় হইল। চরমাবস্থার অষ্টাহ কাল যে গভীর বেদনা এবং নিদারুণ আর্ত্তনাদের কথা উল্লিখিত হইয়াছে, তাহার ভিতর বিধাতার কিছু বিশেষ অভিপ্রায় ছিল। কেশবচন্দ্রের বিশ্বাস ভক্তি কেমন খাঁটি, তাহাই দেখাইবার জন্য এই দুঃসহ বেদনার আক্রমণ। নতুবা তিনি তাঁহার প্রিয় সেবকের জীর্ণ দেহে কেন এমন অসহ্য যন্ত্রণা আনিয়া দিলেন? যে যন্ত্রণায় ঈশামসি আকুল হইয়া বলিয়াছিলেন, "পিতা, কেন তুমি আমায় পরিত্যাগ করিলে?" ইহা সেই জাতীয় যন্ত্রণা! তদপেক্ষা অধিক বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কিন্তু যিশুদাস কেশবের রসনা সে অবস্থায় মাতৃপ্রেম ঘোষণা করিতে ক্ষান্ত হয় নাই।

যে মঙ্গলবারে দেবালয় প্রতিষ্ঠা করিলেন, তাহার পর রবিবারে জীবনের আশা এক প্রকার ছাড়িয়া দিতে হইল। একে পীড়ার উৎকট বেদনা, তাহার উপর চিকিৎসার পীড়ন, শরীরটা যেন ক্লেশের আধার হইয়া পড়িল। আহা! সে হৃদয়-ভেদী মা মা ধ্বনি এখনো পর্য্যন্ত কাহার কর্ণমূলে না বাজিতেছে!

অবিশ্রান্ত শয্যাবিলুণ্ঠিত ভগ্নদেহখানি যেন বাত্যাপীড়িত পোতের ন্যায় আন্দোলিত হইতে লাগিল। কিন্তু সেই শেলবিদ্ধ আন্দোলিত দেহমধ্যে প্রশান্তাত্মা কেশব তখন মহাযোগনিদ্রায় অভিভূত। ভয়াকুল শিষ্যমণ্ডলীর মধ্যে যিশু যেমন তরঙ্গাকুলিত অর্ণবযানে নির্ভয়ে ঘুমাইয়াছিলেন, কেশবচন্দ্র বিশ্বজননীর ক্রোড়ে তেমনি যেন ঘুমাইতে লাগিলেন।

সোমবারের রজনী কি ভয়ঙ্করা কাল রজনী! ক্রমে কেশবের মুখ বাক্যরহিত হইল। তখন কেবল তাঁহার দুর্ব্বল ভগ্ন কণ্ঠনালী হইতে অস্পষ্ট ক্লেশজনক কাতরোক্তি উত্থিত হইয়া বন্ধুগণের প্রাণকে বিদ্ধ করিতে লাগিল। আত্মীয় বন্ধুগণের শোকের কথা আর কি বলিব! পত্নী উন্মাদিনী, জননী মৃতপ্রায়, ধর্ম্মবন্ধু এবং সহচরবৃন্দ মহাবিষাদে অবশাঙ্গ, চক্ষের জলে কমলকুটীর ভাসিতেছে। ক্ষণে ক্ষণে নিস্তব্ধ গম্ভীর, ক্ষণে ক্ষণে মর্ম্মভেদী শোকনিনাদ। শত শত বন্ধু বান্ধব নীরবে বিষণ্ণ বদনে আসিতেছে এবং কাঁদিতে কাঁদিতে ফিরিয়া যাইতেছে। সন্ধ্যার অন্ধকার শোকের অন্ধকারে মিশিয়া রজনী অতি ভীষণাকার ধারণ করিল। শয্যাপার্শ্বস্থ বন্ধুগণ তখন গভীর শোকোদ্বেলিত হৃদয়ে সঙ্গীতপ্রচারককে গান করিতে বলিলেন। তিনি শয্যাপার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়া গলদশ্রুলোচনে নিম্নলিখিত দুইটি সঙ্গীত করেন।

রাগিণী বিভাষ।— একতালা।

"যদি হয় সম্ভব, হে প্রাণবল্লভ, কর এই পানপাত্র স্থানান্তর।
কিন্তু নয় আমার, হউক তোমার,—ইচ্ছা পূর্ণ ঘোর দুঃখের ভিতর।

দেহ মন প্রাণ সকলি তোমার, যাহা ইচ্ছা কর কি বলিব আর, দেও হে কেবল, শান্তিধৈর্য্যবল, কৃতাঞ্জলিপুটে যাচি এই বর।”

রাগিণী সুরট জয়জয়ন্তী।—ঝাঁপতাল।

“বিপদআঁধারে মা তোর এ কি রূপ ভয়ঙ্কর!
ভৈরব মুরতি হেরি কাঁপে অঙ্গ থর থর।

ভীষণ শ্মশানমাঝে, নাচিতেছে রণসাজে, রুধিরে রঞ্জিত যেন চিদ্‌ঘন কলেবর।

কিন্তু মা ভিতরে তব, সুগভীর প্রেমার্ণব, উথলি উথলি পড়ে মহাবেগে নিরন্তর; তবে আর কিসের ভয়, চিনেছি গো মা তোমায়, তুমি যে সেই দয়াময়ী অনন্ত প্রেমসাগর।”

গায়ক শ্রোতৃগণের সঙ্গে সঙ্গীতস্রোতে ভাসিতে ভাসিতে তখন যে কোথায় গিয়া পড়িয়াছিলেন, তাহা কেহই বলিতে পারে না। কেশবচন্দ্রের রঙ্গভূমিতে নিত্য নব নব লীলা মহোৎসব হইয়াছে, কত নূতন অদ্ভুত ব্যাপার লোকে দেখিয়াছে, কিন্তু এমন অভূতপূর্ব্ব গম্ভীর দৃশ্য কেহ কখন দেখে নাই। কেশব যেন তখন সহচরবৃন্দকে সঙ্গে লইয়া পরলোকের দ্বারদেশে দণ্ডায়মান। তিনি সে দ্বার দিয়া প্রবেশ করিলেন, পৃথিবীর দিকের যবনিকা পড়িয়া গেল, বন্ধুগণ প্রাণের সখাকে হারাইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে ফিরিয়া আসিলেন। আচার্য্য তখন কোথায়? যেখানে পূর্ব্বে ছিলেন, সেই খানেই। বদ্ধজীবের দুরধিগম্য প্রদেশের

অভ্যন্তরে। আশ্চর্য্য ব্রহ্মানন্দের ব্রহ্মানুরাগ! যে শরীর অবিশ্রান্ত শয্যাতলে বিলুণ্ঠিত হইতেছিল, যে রসনা নিরন্তর আর্ত্তনাদ করিতেছিল, সঙ্গীতের সময় তাহা একবারে নিস্তব্ধ! হরি-নাম-মহৌষধ কর্ণরন্ধ্রে প্রবিষ্ট হইবা মাত্র রোগী স্থিরতা অবলম্বন করিলেন। এমন অবস্থায় সে পরম ঔষধ তেমন করিয়া কে আর সেবন করিতে পারে? বাস্তবিক সঙ্গীত শ্রবণের ফল অতিশয় অলৌকিক। ইহাতে তাঁহার বিশ্বাস ভক্তির গৌরব প্রতিষ্ঠিত হইল। প্রসিদ্ধ চিকিৎসকের মানবীয় চিকিৎসা-নৈপুণ্যে যাহা হয় না, তাহা হরিনামে সম্পাদিত হয়। দ্বিতীয় সঙ্গীতের শেষভাগ যৎকালে তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিল, তখন সেই রোগ-জর্জ্জরিত মলিন মুখমণ্ডল হাস্যদ্যুতিতে দীপ্তি পাইতে লাগিল। কারণ ঐ গীতাংশের ভাবার্থ তাঁহার বিশ্বাসের অনুরূপ ছিল। সত্য সত্যই তিনি রোগশয্যায় পড়িয়া অবসন্ন শরীরে জননীর চিরপ্রসন্ন বদন দেখিতেন। তাই মধ্যে মধ্যে এত হাসির ঘটা। কেশবের রুগ্নাবস্থা এবং চরমাবস্থার হাসি এক গভীর রহস্য হইয়া রহিল। উহা যোগরাজ্যের এক অদ্ভুত ক্রিয়া বলিয়া ভক্তেরা বিশ্বাস করেন, বৈজ্ঞানিক চিকিৎসকেরা তাহাকে প্রাকৃতিক নিয়মের ব্যতিক্রম বলেন। কোথায় বসিয়া কেশবচন্দ্র হাসিয়াছিলেন, তাহা কি কেহ বুঝিয়াছেন? তাঁহার পার্থিব সংসারের ভিতর আর একটি সংসার ছিল। অতীন্দ্রিয় জগতে অমরধামে অমরবৃন্দ-পরিবেষ্টিত ভগবানের

পার্শ্বে বসিয়া। তিনি নিত্যানন্দ-সাগরে মগ্ন হইয়া হাসিলেন। ইহলোকের পরিবার ছাড়িয়া অমরপরিবারে বিহার করিতে লাগিলেন। যেমন উচ্চ আকাশ হইতে বিজলীর ছটা ভূতলে আসিয়া পতিত হয়, সেই গভীর রহস্যময় দিব্যধাম হইতে তাঁহার হাস্যপ্রভা তেমনি পৃথিবীতে এক একবার আসিতেছিল।

যেই সঙ্গীত শেষ হইল, তদ্দণ্ডে অমনি রোগীর আর্ত্তনাদ ও পুনঃ পুনঃ পার্শ্বপরিবর্ত্তন আরম্ভ হইল। এ দিকে রজনী ক্রমে ভয়ঙ্কর করাল মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিতে লাগিল। আত্মীয় বন্ধু নর নারীতে বাড়ী ঘর পরিপূর্ণ। এমন সুখের মৃত্যুও আর দেখা যায় না, আবার এমন হৃদয়বিদারক শোকজনক মৃত্যুও অতি বিরল। সুখের বলি এই জন্য যে, ইহা দ্বারা বিশ্বাসের জয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। দুঃখের কারণ এই যে, কেশবচন্দ্রের অন্তর্দ্ধানে জগৎ অন্ধকারময় হইয়াছে। শোক করিবার এত আত্মীয় কুটুম্ব অন্তরঙ্গ সুহৃদ সহচর অল্প লোকেরই থাকে। মৃত্যুশয্যায় যাহা ধার্ম্মিক ব্যক্তির প্রার্থনীয়, তাহারও অভাব ইহাতে কিছু মাত্র ছিল না। নবসংহিতায় এ সম্বন্ধে যাহা যাহা তিনি লিখিয়াছিলেন, তাহার কিছুমাত্র ত্রুটি ইহাতে হয় নাই। অন্তিমের ধন হরিকে পাইবার পক্ষে যাহাদের প্রয়োজন, সেরূপ ধর্ম্মবন্ধুদল শয্যার চারিপাশে বর্ত্তমান। সচ্চিদানন্দের পবিত্র হিল্লোলে ভাসিতে ভাসিতে, হরিনাম শ্রবণ করিতে করিতে, আচার্য্য ব্রহ্মানন্দের শেষ

নিশ্বাসবায়ু অনন্ত আকাশে মিশিয়া গেল। চিদাকাশে নিশ্বসিত সেই শ্বাসবায়ু চিদাকাশেই নিঃশেষিত হইল।

শেষ রজনীর গাম্ভীর্য্য বর্ণনাতীত। ঘোরান্ধকার-সাগরে জগৎ নিমগ্ন। শয্যাপার্শ্বে লোক আর ধরে না। তাঁহারা প্রিয়তমের শেষ গতি অনিমেষলোচনে দেখিতেছেন। পার্শ্বের গৃহ বন্ধুগণে পরিপূর্ণ। কেহ অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় কেশব-বিরহের মর্ম্মভেদী মূর্ত্তি চিন্তা করিতে করিতে ব্যাকুল হইতেছেন। কেহ জাগ্রত সুষুপ্তির অবস্থায় ভাবী দুঃখ সকল বিচিত্র আকারে অবলোকন করিতেছেন। কোথাও বা চিকিৎসকদল মৃদু শব্দে দুর্দ্দমনীয় রোগের প্রকৃতি আলোচনা করিতেছেন। প্রবল শোকের বাষ্পরাশিতে সকলের অন্তঃকরণ ভারাক্রান্ত এবং মুখমণ্ডল ঘন বিষাদে আচ্ছন্ন। মধ্যে মধ্যে রজনীর নিস্তব্ধতা ভেদ করিয়া পুরস্ত্রীগণের উন্মাদবৎ গভীর ক্রন্দনধ্বনি উত্থিত হইতেছে, তাহার শব্দে আচার্য্যভবন কাঁপিতেছে। কখন বা ডাক্তার সাহেব আসিয়া বলিতেছেন, "বাবু, বাবু, মুখ খুলিয়া আব একটু পান কর।" আহা! যখন তিনি দেখিলেন, আর প্রাণের আশা নাই, তখন মুদ্রিত নয়নে প্রার্থনা করিয়া চলিয়া গেলেন। তখন বন্ধুগণের সংযত শোকরাশি একবারে মহাবেগে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। নিরাশার শেষ ক্রন্দনধ্বনি গগনমণ্ডল ভেদ করিল। এক জনের শ্বাসবায়ু যেন শত শত নর নারীর প্রাণবায়ুকে ধরিয়া ভীম বলে টানিতেছিল। কাহার সহিত

কোন্ স্থানে তাঁহার প্রেমগ্রন্থি বদ্ধ ছিল, তখন সকলে অনুভব করিতে লাগিলেন। কাহার সঙ্গেই বা কেশবের প্রেমবন্ধন ছিল না? বিশেষ এবং সাধারণ সকল প্রকারের বন্ধনরজ্জুকে আকর্ষণ করিতে করিতে তিনি স্বধামে চলিয়া গেলেন। তখন আর শত্রু মিত্রের প্রভেদ রহিল না।

ধর্ম্মবিশ্বাসবলে সাধু অমর হন, কেশবচরিত্র তাহার সাক্ষী; কিন্তু প্রাণ তবু যে ব্যাকুল হইয়া কাঁদে। না কাঁদিয়া সে কি থাকিতে পারে? যাঁহার প্রেমমুখের মধুর বাক্য শুনিয়া সে সুখী হইত, সে সুন্দর মুখখানি আর দেখিতে পাইবে না বলিয়া কাঁদে। যাঁহার পবিত্র সহবাসে বসিয়া এবং চিরদিন সঙ্গে সঙ্গে ভ্রমণ করিয়া অপূর্ব্ব শান্তি অনুভব করিত, তাহা হইতে সে জন্মের মত বঞ্চিত হইল; হায়! এ দুঃখ সে কাঁদিয়াই কি দূর করিতে পারে? অসার ক্রন্দন পৃথিবী চিরকালই কাঁদিয়াছে, এবং দুইদিন কাঁদিয়া শোক দুঃখ ভুলিয়া গিয়াছে; কিন্তু কেশববিরহানল কি সে শোকাশ্রুতে নিবিবে? হৃদয়ের বিন্দু বিন্দু শোণিত-দানেও তাহা নির্ব্বাণ করা যায় না। এ শোকাবেগ তবে প্রাণের নিভৃত প্রদেশে লুকাইয়া থাকুক। কেশববিরহ-বিলাপে সমস্ত পৃথিবীর সহানুভূতি আছে, তথাপি এ পবিত্র শোকবিলাপ অন্তরের গূঢ় স্থানে চির দিনের জন্য লুকায়িত থাকুক। গোপনে নির্জ্জনে সে দ্বার উদ্‌ঘাটন করিব, এবং একাকী তাহার মধ্যে ডুবিব।

আচার্য্যের বিহারস্থানে গিয়া সেই শোকের সাহায্যে আনন্দময়ী মায়ের কোলে প্রবেশ করিব। জননীর প্রেমক্রোড়ে এখন তাঁহার সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ হইবে, বাহিরে আর সাক্ষাৎ লাভের প্রত্যাশা নাই।

সোমবারের রজনী আঁধার অঞ্চলে কেশবকে ঢাকিয়া লইয়া আস্তে আস্তে চলিয়া গিয়াছিল, এখানে কেবল তাঁহার রোগভগ্ন তনু গুটিকতক আর্ত্তনাদ ও মৃদু নিঃশ্বাসের সহিত পড়িয়াছিল। বাস্তবিক যোগিবর কেশব দুই দিন পূর্ব্বেই যেন দেহ পরিত্যাগ করেন। বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া তিনি মহাযোগনিদ্রায় নিমগ্ন হন। অনন্তর বাহিরের অজ্ঞানতা এবং শোকান্ধকারের অভ্যন্তরে মহাসমাধির অনন্ত আঁধারকোলে তিনি প্রবেশ করিলেন। জননী জগদ্ধাত্রী আপনার বিশাল বক্ষে পুত্রধনকে তুলিয়া লইলেন। অনন্তের সন্তান অনন্তের বক্ষে খেলা করিতে লাগিল। বিদ্যুদালোক-প্রকাশের ক্ষণকাল পরে যেমন মেঘগর্জ্জন কর্ণগোচর হয়, কেশবজীবনজ্যোতি তেমনি অন্তর্হিত হইবার বহুক্ষণ পরে শোকের নিনাদ আকাশে উত্থিত হইল। কিন্তু তখন কেশব কোথায়? ভবনদী পার হইয়া চলিয়া গিয়াছেন। তথাপি তাঁহার পরিত্যক্ত জীর্ণ দেহ হাসে এবং ধর্ম্মবন্ধুগণের পঠিত ব্রহ্মস্তোত্রে যোগদান করে। "ঊর্দ্ধপূর্ণমধঃপূর্ণং মধ্যপূর্ণং যদাত্মকম্। সর্ব্বপূর্ণং স আত্মেতি সমাধিস্তস্য লক্ষণং॥" এই লক্ষণে লক্ষণাক্রান্ত হইয়া তখন আত্মারামরূপে কেশবচন্দ্র চিন্ময়রাজ্যে বিচরণ করিতে লাগিলেন। এই জন্য কেহ আর

ডাকিয়া তাঁহারে উত্তর পাইল না। তাই লোকে মনে করিল, কেশব অচৈতন্য। বাহিরের লোকে শোকের অন্ধকার, রোগের অন্ধকার এবং অজ্ঞানতার অন্ধকার দেখিয়া কাঁদিল, অমর কেশবচন্দ্র সেই বাহ্য অন্ধকারের ভিতরে মহাসমাধির অনন্ত অন্ধকার দেখিলেন এবং তাহার গভীর প্রদেশে অবতরণ করিয়া চিদালোকময়ী বিশ্বজননীর দর্শন পাইলেন। সেই দর্শনানন্দে আপ্তকাম হইয়া যে হাসিয়াছিলেন, সেই হাসির ছটা শেষে রোগযন্ত্রণা ভেদ করিয়া বাহিরে তাঁহার সেই চিরপ্রফুল্ল মুখে প্রতিফলিত হয়।

নিশাবসানের কথা লিখিতে লিখিতে সেই গেথ্‌সিমেনির উদ্যানের কথা আমাদের মনে পড়িতেছে। সেই এক ভীষণদর্শনা কালরজনী, আর এই এক রজনী। পৃথিবী এমন কাল রজনী আর কয়টী দেখিয়াছে জানি না। কিন্তু এ দুইটী একজাতীয়। উভয় আচার্য্যের শিষ্যগণের অবস্থাও অনেক বিষয়ে সমতুল্য। শেষ রাত্রিতে যখন সকলে সমস্বরে স্তব পাঠ করিলেন, রোগীর তাহাতে যোগ দিবার ভাব প্রকাশ পাইয়াছিল। তাহার পূর্ব্বে পুনর্ব্বার একটি সংগীত হয়, তাহাতেও তিনি স্থির এবং নীরব হইয়াছিলেন। পরে নাভিশ্বাস আরম্ভ হইল, ক্রমে ক্রমে অবশিষ্ট নিশ্বাস বায়ু উদরমধ্যে আলোড়িত হইতে লাগিল, তাহার পর বেলা নয়টা তিপ্পান্ন মিনিটের সময় অল্পে অল্পে শেষ নিশ্বাসটি আকাশে মিশিয়া গেল। অঙ্গপ্রত্যঙ্গ মুখমণ্ডল তখন শান্ত অবিকৃত রহিল কেবল তাহা নহে, দেখিতে দেখিতে

ওষ্ঠাধরে এবং দন্তে দিব্য এক হাস্যদ্যুতি বিকসিত হইয়া পড়িল। তখন মহাক্রন্দন রবে আকাশ ফাটিল, আত্মীয় বন্ধুগণের হৃদয় শোকসাগরে এককালে ডুবিয়া গেল। শত শত নরনারী বালক বালিকার রোদনধ্বনি একত্রিত হইয়া গগনমণ্ডলকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। যাঁহারা দিবানিশি জাগিয়া প্রাণপণ যত্নে এত দিন আচার্য্যের সেবা করিলেন, সেই সেবকবৃন্দের কি মর্ম্মান্তিক যন্ত্রণা! পাছে সন্তানের অকল্যাণ হয় ভাবিয়া, যিনি এতদিন অন্তরে অন্তরে শোক সংবরণ করিয়াছিলেন, সেই বৃদ্ধা জননীর মুখপানে তখন আর চাওয়া যায় না। পত্নী উন্মাদিনীর ন্যায় 'হা হতোঽস্মি' করিতেছেন। পুত্রকন্যাগণ অকূল সাগরে পড়িয়া হাহাকার করিতেছে। সহোদর ভ্রাতৃদ্বয়, ধর্ম্মবন্ধু এবং আচার্য্যগতপ্রাণ শিষ্যবৃন্দ অনাথ বালকের ন্যায় কাঁদিতেছেন। হা পিতা, হা ভ্রাতা, হা নাথ, হা বন্ধু, হা প্রাণাধিক পুত্র, বলিয়া বিলাপ করিতে করিতে সকলে যেন মহাসমুদ্রের মধ্যে গিয়া পতিত হইলেন। কিন্তু মা বাপ সকল, আর কাঁদিবার প্রয়োজন নাই। যাঁহার জন্য ক্রন্দন, ঐ দেখ তিনি হাসিতেছেন। কেশব যেন হাসিয়া বলিতেছেন, "আমার জন্য আর তোমরা কেন কাঁদ, আপনার আপনার জন্য সকলে ক্রন্দন কর।" ভবের খেলা সাঙ্গ করিয়া মায়ের সন্তান হাসিতে হাসিতে মায়ের কাছে চলিল। পৃথিবীর সুখ দুঃখ জীবন মরণ সকলি ফাঁকি, এই বলিয়া কেশবচন্দ্র হাসিলেন। তবে আর তাঁহার জন্য রোদন কেন? কারণ,

তিনি ত সর্ব্বদাই জীবিত। মৃত আমরা, আমাদের দুরবস্থার দিকে এ সমস্ত রোদন বিলাপ ফিরিয়া আসুক। যাহারা পৃথিবীতে চিরকাল শোক করিতে এবং কাঁদিতে আসিয়াছে, তাহারা কাঁদিবে না ত কি করিবে? হরিগতপ্রাণ জীবন্মুক্ত সাধুর হাস্যবিজলী বদ্ধ জীবগণের দুর্গতির অন্ধকারকে প্রকাশ করিয়া দেয়, সুতরাং তাহাদের ক্রন্দন ভিন্ন আর অন্য গতি কি আছে। যিনি ইহ জীবনে চির কাল হাসিয়াছেন, তিনি পরলোকে যাইবার সময়েও সেই হাসি টুকু আমাদের জন্য রাখিয়া গেলেন।

শ্বাসবায়ু নিঃশেষিত হইলে মুহূর্ত্তেকের মধ্যে এক আশ্চর্য্য মূর্ত্তি নয়নগোচর হইয়াছিল। রোগনিপীড়িত সেই মলিন মুখ-খানি পদ্মফুলের ন্যায় হাসিতে লাগিল। ললাট এবং গণ্ডস্থল এক অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করিল। তখন রোগ দুর্ব্বলতা বিষণ্ণ ভাব আর কৈ? প্রিয়দর্শন কেশবচন্দ্রের মুখমণ্ডল হইতে এক অপার্থিব জ্যোতিঃ ফুটিয়া বাহির হইতে লাগিল। ইহার অন্য কোন কারণ যখন কেহ অবধারণ করিতে পারিলেন না, তখন আমরা বলিব, উহা অমরধাম হইতে আসিয়াছে। সে শোভা দর্শনে শোকাতুরা জননী বলিলেন, "ও রে, এ যে মহাদেবের মূর্ত্তি দেখিতেছি!" এই বলিয়া তিনি গতাসু সন্তানকে কোলে লইয়া শয়ন করিলেন। রোরুদ্যমানা সহধর্ম্মিণী স্বামীর পদযুগলে পুষ্পাঞ্জলি এবং গলদেশে পুষ্পমালা প্রদান-পূর্ব্বক বলিলেন, "ও গো, আমি যে দেবতা স্বামী পেয়েছিলাম!

আমি তাঁহাকে চিনিতে পারি নাই।” তৎকালকার বিস্তারিত বিবরণ লিখিতে পারা যায় না। সমস্ত মনে আনিতে প্রাণ কেমন করিয়া উঠে। এক মহাবজ্রাঘাতে যেন সকলকে ভগ্ন এবং বিচূর্ণ করিয়া ফেলিল। সূর্য্য অস্তগমন কালে যেমন এক দিক্ অন্ধকার করিয়া অপর ভূভাগকে আলোকিত করে, কেশবচন্দ্র তেমনি অমরলোকে সমুদিত এবং পৃথিবীতে অস্তমিত হইলেন। সে আলোক কত দিনে আবার যে ফিরিয়া আসিবে, তাহা কেহ জানে না। সাধু মহাপুরুষদিগের আহ্নিক এবং বার্ষিক গতি কি নিয়মে সংসাধিত হয়, তাহা বিধাতার পঞ্জিকায় লেখা আছে।

কেশবচন্দ্রের সেই হাস্যবিভূষিত মুখচ্ছবিখানি যদি কেহ তুলিতে পারিত, তাহা হইলে উপরি উল্লিখিত কথার প্রমাণ সকলে পাইতেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তাহা ঘটিল না। যখন ছবি তোলা হইল, তখন সে সুন্দর শোভা প্রায় অন্তর্হিত হইয়াছিল।

১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে, ৮ই জানুয়ারি, মঙ্গলবার, প্রাতে নয়টা তিপ্পান্ন মিনিটে, পঁয়তাল্লিশ বৎসর বয়সে, কেশবচন্দ্র স্বর্গারোহণ করেন। অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া বিষয়ে তিনি নবসংহিতায় আদর্শরূপে যাহা লিখিয়া গিয়াছিলেন, নিজের সম্বন্ধে তাহা সর্ব্বাঙ্গীনরূপে সম্পাদিত হয়। হায়! যে কেশব শত সহস্র ভক্তবৃন্দের নেতা হইয়া নগরের পথে হরিসঙ্কীর্ত্তন করিতেন, তাঁহার প্রসন্ন মূর্ত্তি আজ শবরূপে পরিণত! প্রাণের কেশবচন্দ্র,

পৃথিবীতে বসিয়া আর আমি সে সকল কথা লিখিতে পারিলাম না। তোমার পার্শ্বে একটু স্থান দাও, সেই খানে বসিয়া তোমার অমরচরিত আগে দেখি, দেখিয়া বিগতশোক হই, তার পর তোমার পরিত্যক্ত দেহের ঔর্দ্ধ্বদেহিক ক্রিয়ার কথা বলিব। তোমার মৃতদেহের প্রতি পৃথিবী বড় সম্মান দেখাইয়াছে। পথে এবং শ্মশানঘাটে সহস্র সহস্র লোক শোকাশ্রু বিসর্জ্জন করিয়াছে। যাহারা তোমাকে জীবিতাবস্থায় গ্রাহ্য করিত না, তাহারাও সে দিন নয়নজলে ভাসিয়াছে। যাহাদিগকে তুমি হরিলীলার কথায় কাঁদাইতে পার নাই, দেহলীলা-সংবরণের উপলক্ষে তাহাদিগকে তুমি কাঁদাইয়া গিয়াছ।

ভক্তবর কেশবের সমাধিগৃহ হইতে বিদায় লইবার পূর্ব্বে দেশীয় ভ্রাতৃগণের চরণ ধরিয়া আমি গুটি দুই কথা বলি। রোগ দুঃখ পরীক্ষা মৃত্যুতে চরিত্রের স্বরূপাবস্থা প্রকাশিত হয়। তাঁহার শেষাবস্থার এই দৃষ্টান্ত স্মরণ করিলে জীবগণ কৃতার্থ হইতে পারিবে, সন্দেহ নাই। কিন্তু যদি জীবন ভাল না হয়, তাহা হইলে ঈদৃশ মৃত্যু কি কাহারো সম্ভব হইতে পারে? আহা, যাইবার সময় কি অমূল্য সম্পত্তিই তিনি রাখিয়া গেলেন! সাধকমণ্ডলী যদি ইহার সাহায্য গ্রহণ না করে, তবে সে নিতান্তই দুর্ভাগ্য। এ সামগ্রী কি যোগশাস্ত্রে পাওয়া যায়? যোগশাস্ত্র যাহা যাহা কল্পনা করিয়াছে, এখানে তাহা চক্ষে দেখা গেল। অনেক দিন হইল, ক্রুশাহত যিশু একবার পৃথিবীকে এই মনোহর দৃশ্য দেখাইয়া-

ছিলেন, আর যিশুদাস কেশব বর্ত্তমান সময়ে' দেখাইলেন। কেশব আমাদের জীবন মরণের সম্বল হইয়া রহিলেন। কর্ম্ম যোগ জ্ঞান ভক্তি ধ্যান সমাধির নিগূঢ় স্থানে প্রবেশ করিলে কেশবকে তথায় দেখা যায় এবং চেনা যায়। কি উচ্চতম আধ্যাত্মিক প্রেম-রাজ্যের আবিষ্কারই তিনি করিয়াছেন! যে পরিমাণে যিনি সাধু ভক্ত যোগী হইবেন, সেই পরিমাণে কেশবচরিত তাঁহার পক্ষে মূল্যবান্ বলিয়া অনুভূত হইবে। জীবন মরণে তাঁহার জয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই চিরস্মরণীয় ঘটনার একটি সঙ্গীত আমার এখানে থাকিল।

রাগিণী আলেয়া।—তাল যৎ।

"আহা কি সুখের মরণ! কে বলে মরণ, এ যে নূতন জীবন।
গভীর বেদনায় প্রাণ, করে সদা আন্ চান্, তবু যোগানন্দরসে
হৃদয় মগন।
কোথা মৃত্যু! কোথা রোগ! নিরালম্ব ব্রহ্মযোগ, সশরীরে স্বর্গ-
ভোগ দেখিনি এমন; দেখ রে জগতবাসী, কেশবচন্দ্রের হাসি,
হাসি হাসি যায় চলি অমর ভবন।"

পূর্ব্ব এক সময় মৃত্যুশয্যার জন্ম যে প্রার্থনা তিনি লিখিয়া রাখিয়াছিলেন, তাহা নিজের সম্বন্ধে কেমন মিলিয়া গিয়াছে, একবার দেখা যাউক! "হে পিতা, তোমার সেবা পূজার জন্ম তুমি যে সকল শক্তি, সুযোগ এবং অশীর্ব্বাদ দান করিয়াছিলে, তজ্জন্য তুমি আমার শেষ কৃতজ্ঞতা গ্রহণ কর। আমার কৃত পাপরাশি তুমি জান, এক্ষণে পবিত্রাত্মা

দ্বারা আমাকে পবিত্র এবং মুক্ত করিয়া আমাকে আশ্রয় দাও। এই অসহায় অবস্থায়, হে প্রভো! আমাকে তোমার প্রেম অনুভব করিতে দাও। আমার চারি দিক্ অন্ধকারে আচ্ছন্ন, হে দয়াময় পিতা, এই সঙ্কটকালে তোমার প্রেমমুখ প্রকাশ কর এবং তোমার সুমিষ্ট সহবাসে আমায় রাখ। তোমাকে ধন্যবাদ করি, যে তুমি এ বিপদ সময়ে আমাকে পরিত্যাগ কর নাই এবং কখন করিবে না। তুমিই কেবল আমার চিরদিনের বন্ধু। আমার পরিবার, বন্ধু এবং ভ্রাতৃগণকে আমি তোমার হস্তে সমর্পণ করিতেছি, তাহাদিগকে আশীর্ব্বাদ কর এবং তোমার আশ্রয়ে চির দিনের জন্য স্থান দাও। এক্ষণে অনুমতি কর, আমি শান্তমনে আনন্দহৃদয়ে চলিয়া যাই। প্রিয় পিতা, তুমি আমাকে বিশ্বাস, প্রেম এবং পবিত্রতার রাজ্যে লইয়া চল।”

আচার্য্য কেশবের মৃত শরীরও বড় আদরের সামগ্রী। সকল শ্রেণীর ভদ্রাভদ্র ব্যক্তিগণ ইহার প্রতি সমাদর প্রদর্শন করিয়াছেন। মৃত্যুর পর ক্রমে সেই সুদীর্ঘ সুন্দর তনু মলিন হইতে লাগিল। মুখের সেই অদ্ভুত হাসির আভাস শেষ পর্য্যন্ত ছিল, কিন্তু ক্রমে কমিয়া গেল। অপরাহ্ণ তিন ঘটিকার সময় শ্মশানে লইয়া যাইবার জন্য আয়োজন হয়। মৃতদেহকে স্নান করাইয়া, দিব্য গরদের বস্ত্র পরাইয়া, গলায় ফুলের মালা এবং ললাটে চন্দন দিয়া সাজাইয়া শিবিকার উপরে রাখা হইল। শিবিকা খানি

পুষ্পমালা, এবং বিচিত্র বর্ণের বস্ত্রে সুসজ্জিত ছিল। তদনন্তর সহচরগণ সেই শিবিকা খানি দেবালয়ে রাখিয়া উপাসনা করিলেন। পরে তাহা স্কন্ধে করিয়া লইয়া জাহ্নবীতটে চলিলেন। শত শত ব্রাহ্মবন্ধু বাতাহত কদলী তরুর ন্যায় শোকাভিভূত চিত্তে সজলনেত্রে অনাবৃতপদে হায়! হায়! করিতে করিতে আগে পাছে চলিতে লাগিলেন। বহুশত লোক শ্মশানযাত্রী হইয়া সঙ্গে সঙ্গে চলিল। কেশব-চন্দ্রের পরিত্যক্ত দেহের সে অনুপম শোভা দেখিয়া কেহ আর সহজে বাড়ী ফিরিতে পারিল না। মহাবৈরাগ্যের বেশে কেশব শ্মশানে চলিলেন। তাঁহার শিবিকা স্পর্শ করিবার জন্য লোকের কি আগ্রহ! আহা! সে হৃদয়-বিদারক শোকাবহ দৃশ্য দর্শনে কাহার বক্ষ না নয়নজলে ভাসিয়াছিল! প্রাণাধিক ভারতরত্নকে আজ সকলে কোথায় বিসর্জ্জন দিতে যাইতেছে? "জয় জয় সচ্চিদানন্দ হরে" এই ধ্বনি করিতে করিতে যাত্রিগণ শ্মশানঘাটে গিয়া পৌঁছিলেন। নিমতলার ঘাট যেন কেশবচন্দ্রের ব্রহ্মমন্দির হইল। সমুদায় স্থান লোকে পূর্ণ হইয়া গেল। দিব্য শ্বেত-চন্দনের চিতার উপর গগনস্পর্শী প্রজ্বলিত অনলশিখার মধ্যে যখন সে দেহ জ্বলিতে লাগিল, তৎসঙ্গে ধর্ম্মবন্ধুগণ শোকভগ্ন উদাস মনে যখন গান করিতে লাগিলেন, তখন শ্মশানবৈরাগ্যের জ্বলন্ত হুতাশনে সকলের প্রাণ যেন জ্বলিয়া উঠিল। অবাক হইয়া মলিনবদনে দর্শকবৃন্দ সে

অগ্নিময় তনুর পরিণাম দর্শন . করিলেন। যে সুন্দর কলেবর বিডন উদ্যানে, টাউনহলে, ব্রহ্মমন্দিরে, কমলকুটীরে এবং পৃথিবীর নানাস্থানে নানা দেশে পঁচিশ বৎসরকাল ক্রমাগত সূর্য্যের ন্যায় বিচরণ করিত, তাহা আজ শ্মশানে পুড়িয়া ভস্মসাৎ হইল। যেখানে তাহার উৎপত্তি, সেই খানে প্রত্যাগমন করিল।

পরিশিষ্ট

সাধ্য, সাধন, সিদ্ধি

সাধারণ জনসমাজের সম্মুখে কেশবচন্দ্র কিরূপ কার্য্য করিয়াছিলেন, তাহার ইতিহাস যতদূর সংগ্রহ করিতে পারিলাম, তাহা দিলাম; এক্ষণে তাঁহার ভিতরকার তত্ত্ব-কথা কিছু কিছু বিবৃত করিব। ক প্রণালীতে কোন্ ধর্ম্ম তিনি পাইলেন, এবং জীবনের সমস্ত বিভাগে তাহার কিরূপ পরিচয় দিয়া গিয়াছেন, তদ্বিবরণ ইহাতে প্রাপ্ত হওয়া যাইবে।

যে কেশব ধর্ম্মজগতে ভাবী কালের সাধকবংশে চির-কাল অমর হইয়া থাকিবেন, তিনি পূর্ব্বতন মহাজন-দিগের বংশে, চিৎপুর নগরে, চিদাবাসে, ব্রহ্মের ঔরসে এবং পবিত্রাত্মার গর্ভে জন্ম গ্রহণ করেন। স্বর্গবিদ্যালয়ে স্বয়ং ভগবানের তত্ত্বাবধানে অমরাত্মা সাধু গুরুগণের নিকট তাঁহার বিদ্যাশিক্ষা আরম্ভ হয়। কেশবচন্দ্র জনের নিকট অনুতাপ, সক্রেটিশের নিকট আত্মতত্ত্ব, ঈশার নিকট বিশ্বাস ও বৈরাগ্য, মুসার নিকট আদেশ, শাক্যের নিকট নির্ব্বাণ, গৌরাঙ্গের নিকট প্রেমভক্তি, পল ও মহাদেবের নিকট গার্হস্থ ধর্ম্ম, মহোম্মদের নিকট একেশ্বরবাদ, জন-কের নিকট অনাসক্তি, যাজ্ঞবল্ক্যের নিকট যোগ সমাধি

এবং পবিত্রাত্মার নিকট দিব্যজ্ঞান শিক্ষা করেন। তাঁহার ধর্ম্ম এক কল্পবৃক্ষ বিশেষ। শেষ জীবনে তাহা হইতে বহুবিধ অমৃত ফল সকলকে তিনি বিলাইয়া গিয়াছেন।

যৌবনের প্রারম্ভে কেশব এক অদ্বিতীয় অনন্ত গুণাকর চিন্ময় ব্রহ্মের উপাসক হন। তিনিই তাঁহাকে ধর্ম্মরাজ্যের যেখানে যাহা কিছু ছিল, ক্রমে সে সমস্ত দেখাইয়া দিয়াছিলেন। প্রার্থনা করিলে ঈশ্বর শ্রবণ করেন, যাহা অভাব হয় তাহা আনিয়া দেন, এই বিশ্বাস লইয়া প্রথমে তিনি স্বর্গরাজ্যের অন্বেষণে প্রবৃত্ত হন ; তদনন্তর আর আর যাহা কিছু প্রয়োজন, তৎসমুদায় তাঁহার করতলন্যস্ত হইল।

বিশ্বাস

এক ঈশ্বরের সাক্ষাৎ কর্ত্তৃত্ব ও জীবন্ত বর্ত্তমানতায় বিশ্বাস এবং প্রার্থনা ধর্ম্মের প্রধান সাধন, এই দুইটি তত্ত্ব লাভ করিয়া অবশেষে তিনি সকল বিষয়ে সিদ্ধকাম হন। ভগবান্ স্বয়ং কর্ম্ম জ্ঞান যোগ ভক্তির তত্ত্বশাস্ত্র, তাহার সাধন-প্রণালী, মহাজনদিগের সহিত আধ্যাত্মিক নিকট সম্বন্ধ ইত্যাদি বিষয় তাঁহাকে বুঝাইয়া দিয়াছিলেন। এক দিকে প্রচলিত ভ্রম কুসংস্কার পৌত্তলিকতা, অপর দিকে যুক্তি তর্ক বুদ্ধিগত মত এবং কর্ম্মকাণ্ডহীন, ভক্তিহীন কঠোর জ্ঞানবিচার, ইহার ভিতর দিয়া তিনি স্বর্গের দিকে অগ্রসর হন। ভগবান্ তাঁহার কর্ণে এই মন্ত্রটি দিয়াছিলেন যে, তুমি সকল বিষয়ে

মধ্যভূমি অবলম্বন করিবে। সেই মহামন্ত্র যেখানে তিনি সংলগ্ন করিতেন, সেই খানে অমনি প্রকৃত তত্ত্ব উদ্‌ঘাটিত হইয়া যাইত। সৃষ্টির বিচিত্রতার মধ্যে একতা এবং একত্বের মধ্যে বহুতা দেখিয়া তিনি তত্ত্বজ্ঞ হন।

সমস্ত জগৎকার্য্য সেই এক আদি পুরুষ নিত্য অপরিবর্ত্তনীয় নির্ব্বিকার ঈশ্বরের লীলা বা প্রকাশ, তাঁহার মঙ্গল ইচ্ছা, সর্ব্বজ্ঞত্ব এবং সর্ব্বব্যাপিত্ব অশেষবিধ ঘটনার মধ্যে বহু এবং নানা ভাবে বিচরণ করিতেছে, ভগবান্ অনন্ত অপরিমেয় নিরাকার হইয়াও কার্য্যেতে পিতা মাতা বন্ধুর ন্যায় জীবদিগকে পালন করিতেছেন, এই বিশ্বাসে কেশবচন্দ্র সর্ব্ব ঘটে এক অখণ্ড অবিভক্ত ব্রহ্ম-পদার্থের লীলা দেখিতেন। ব্যক্তিত্বহীন নির্গুণ ব্রহ্মস্বরূপ সকলকে মূর্ত্তিমান আকারে, স্থূল স্বরূপকে সূক্ষ্মরূপে, অখণ্ডকে সামান্য অসামান্য যাবতীয় বিষয়ে তিনি অনুভব করিতেন। সপ্তম স্বর্গবাসী রাজসিংহাসনারূঢ় মহান্ ঈশ্বর জীবের পরিচর্য্যা করেন। তাঁহার ন্যায়, দয়া, প্রেম, পুণ্য, জ্ঞান, শক্তি প্রভৃতি স্বরূপের সামঞ্জস্যই নববিধান। যিনি নিত্য নির্ব্বিকল্প, তিনিই আবার লীলার সময় বিধাতা। ব্রহ্মতত্ত্বের এই সকল গভীর রহস্যমধ্যে কেশব প্রবিষ্ট হন, এবং সেইখানে বসিয়া বিয়োগ ও সংযোগবিজ্ঞানের সহায়তায় সকল তত্ত্ব লাভ করেন। ব্রহ্মের স্বরূপ সকলের উপলব্ধি এত দূর পর্য্যন্ত সূক্ষ্মভাবে করিতেন এবং দৈনিক জীবনে তাহা সংলগ্ন করিতেন যে, লোকে তজ্জন্য উপহাস করিত। সর্ব্বব্যাপী, দয়াময় বিধাতা বল, তাহাতে তাহাদের কাহারো আপত্তি নাই ;

কিন্তু সেই মঙ্গলময়ী পালনী-শক্তি রান্নাঘরে, অন্ন বস্ত্রে, পুত্র কন্যার বিবাহে কেন লাগাও ? ঈশ্বরকে অনন্ত বলিয়া সুদূর আকাশে তুলিয়া রাখ, আর নিজেরা সংসারে কর্ত্তৃত্ব কর, এই অন্ধজ্ঞান এবং নাস্তিকতার প্রতিকূলে তিনি আকাশবাসী ঈশ্বরকে ঘরে আনিয়া বসাইলেন, তাঁহার হস্তে সমস্ত টাকা কড়ি ঘরকন্নার ভার দিয়া নিজে দাস এবং যন্ত্রবৎ হইয়া রহিলেন। প্রত্যেক ঘটনায় তাঁহাকে দয়াময়রূপে ব্যক্তিভাবে না দেখিলে দয়া শব্দের কোন অর্থ থাকে না, এই জন্য সাধারণ শক্তির স্থানে বিশেষ ব্যক্তিরূপে তিনি ঈশ্বরকে দেখিতেন।

ব্রহ্মদর্শনকে তিনি কোন অলৌকিক অদ্ভুত ব্যাপার বলিয়া মানিতেন না। উহা নিশ্বাস প্রশ্বাসের ন্যায় সহজ। চক্ষু খুলিবামাত্র সহজে যেমন লোকে আলোক দর্শন করে, বিশ্বাসচক্ষে ঈশ্বরাবির্ভাবও তেমনি। কৃত্রিম উপায়ে অস্বাভাবিক প্রণালীতে তাহা সম্পাদিত হইবার নহে। তাঁহার বিশ্বাস ছিল, সাগরজলে যেমন লবণ মিশ্রিত, জীব ব্রহ্মের মিলন তদ্রূপ ; উভয়কে প্রভেদ করা যায় না। মনুষ্যের স্বাস্থ্য বল, বুদ্ধি বিচার, মঙ্গল ভাব, সাধুতা, মনুষ্যত্ব, ধর্ম্ম পুণ্য যাহা কিছু আছে, তাহা ঈশ্বরের ; ইহাদিগের মধ্যে মনুষ্যের আপনার বলিবার কিছুই নাই। এই সকল শক্তি এবং প্রবৃত্তির স্বাভাবিক ক্রিয়ার সীমা মধ্যে দেবক্রিয়া প্রকাশ পায়। জীবননদীর মূলদেশে ভগবান্ বসিয়া বিবিধ শক্তি সঞ্চার করেন। ইহারই ভিতর ব্রহ্মদর্শন। অন্তর বাহে তাঁহার ক্রিয়া অনুভবই দর্শন। জড় এবং জ্ঞানশক্তির প্রত্যেক কার্য্য

তাঁহার নিকট ঈশ্বরের জীবন্ত বর্ত্তমানতা প্রকাশ করিয়া দিত। এরূপ যদি কেশবচন্দ্রের বিশ্বাস হইল, তবে কি তিনি অদ্বৈতবাদী ছিলেন? না, প্রচলিত ভ্রান্ত অদ্বৈতবাদ তিনি মানিতেন না। তিনি মহাযোগী ঈশার ন্যায় অভেদবাদী ইচ্ছাযোগী ছিলেন। তাঁহার মতে মিলন এবং একত্ব দুই সমান নহে। জীব ব্রহ্মের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব এবং ব্যক্তিত্ব আছে, চিরকাল থাকিবে, কেবল উভয়ের রুচি, ইচ্ছা, জ্ঞান, ভাব এক হইয়া যাইবে। "আমি এবং আমার পিতা এক" ইহার ভিতর সেব্য সেবকের মিলন ভিন্ন আর অন্য কোন অর্থ নাই। ইচ্ছাযোগই প্রকৃত মুক্তি। সর্ব্বঘটে ব্রহ্ম আছেন, কিন্তু কোন পদার্থ ব্রহ্ম পদার্থ নহে; এইরূপ তাঁহার মত বিশ্বাস ছিল।

ঈদৃশ যে ব্রহ্ম, তাঁহাকে কেশবচন্দ্র নানা রূপে সম্ভোগ করিতেন। মানবসমাজে, বাহ্য প্রকৃতিতে এবং নিজের হৃদয়ে ব্রহ্মকে দেখিতেন। শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মাধুর্য্য এই পঞ্চ রস তিনি মনের সাধে পান করিতেন। তাঁহার প্রতিদিনের আরাধনা, প্রার্থনা, উপদেশ যাঁহারা মনোযোগ দিয়া শুনিয়াছেন, তাঁহারা আমার সঙ্গে এক হইয়া বলিবেন, কেশবাত্মা ব্রহ্মসাগরে ডুবিত, সাঁতার খেলিত; কেশবহৃদয় প্রেমকল্পনার মহাকাশে উড়িয়া বেড়াইত এবং বসন্তকালের গগনবিহারী বিহঙ্গের ন্যায় সুললিতস্বরে গান করিত। ব্রহ্মোপাসনা তাঁহার রত্নভাণ্ডার ছিল। ভক্তিসুধা-পানে মত্ত হইয়া তিনি নববিধানের চাবি দ্বারা তাহার দ্বার খুলিতেন, এবং নিগূঢ় প্রকোষ্ঠে প্রবেশপূর্ব্বক উৎকৃষ্ট

রত্নরাজী লুটিতেন, আর সকলকে তাহা বিলাইতেন। যে ব্রহ্মজ্ঞানী, সে নীরস, কঠোর-প্রকৃতি ও তার্কিক, এই সংস্কারই চিরদিন চলিয়া আসিয়াছে ; কিন্তু ভক্তবর কেশব তাহা উল্টাইয়া দিয়া গিয়াছেন। ব্রহ্মজ্ঞানীর ভিতর এত ভাব ভক্তি, এত বিচিত্র রসের খেলা পূর্ব্বে কেহ দেখে নাই। নিরাকার দেবতাকে লইয়া এত রস-বিলাস প্রেম-বিহার চলে, ইহা নূতন কথা। বাস্তবিক সাকার অপেক্ষাও তাঁহার দেবতা স্পর্শনীয় ছিলেন। যে চিন্ময় হরিকে তিনি পতিরূপে বরণ করিতেন, তাঁহাকেই মাতৃভাবে দেখিয়া আহ্লাদিত হইতেন। অনন্তশক্তিশালী বিচিত্র গুণময় মহান্ ব্রহ্মকে শেষে মাতৃত্বে পরিণত করিয়া, তিনি শিশুর ন্যায় তাঁহার স্তন্যসুধা পান করিয়াছেন। লক্ষ্মী সরস্বতী ভগবতী কালী গোপাল হরি মহাদেব প্রভৃতি গুণবাচক শব্দের অবলম্বনে সময় সময় প্রার্থনা এবং জপ তপও করিয়াছেন। এক ব্রহ্ম বস্তুতে তিনি সকল তত্ত্বের মীমাংসা দর্শন করিতেন। কিন্তু সে ব্রহ্ম কবির কল্পনা, ন্যায়ের সিদ্ধান্ত বা অজ্ঞেয়বাদের অনুমান নহেন, তিনি জীবন্ত পুরুষ। বিজ্ঞানপ্রিয় সুমার্জ্জিত-বুদ্ধি হইয়াও, জীবনের প্রত্যেক কার্য্যের সহিত ঈশ্বরের সাক্ষাৎ সম্বন্ধ সকল তিনি এমনি বিশ্বাস করিতেন যে, তাহা দেখিয়া অন্ধবিশ্বাসী কুসংস্কারী অতিভাবুক বলিয়া লোকে তাঁহার নিন্দা করিত। এমন কি, কত সহৃদয় বন্ধুরাও তাঁহাকে গোঁড়া এবং বিকৃত উৎসাহী বলিতেন। বাস্তবিক বিশ্বাসী কেশব এক অদ্ভুত রহস্য। তাঁহার বিশ্বাস বিজ্ঞানবিচারী বাহ্যদর্শী পণ্ডিতগণের দুরধিগম্য।

যে বিশ্বাসে ভেল্কী হয়, পর্ব্বত টলে, সাগর কাঁপে, সেই বিশ্বাসের বলে তিনি বলী ছিলেন। বলিতেন, এখানে বসিয়া ফুৎকার দিলে, পৃথিবীর সীমায় গিয়া তাহা পৌঁছিবে। আমি যেখানে যেমন অবস্থায় ছিলাম, তেমনি রহিলাম এবং ঈশ্বরও যেখানকার সেই খানেই রহিয়া গেলেন, তাঁহার ভজন পূজনে আত্মার কোন ভাবান্তর পরিবর্ত্তন ঘটিল না, এমন দূরস্থ মৃত দেবতার পূজা তিনি করিতেন না।

পরলোক ইহলোকেরই অভেদ অঙ্গ। ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস যদি স্বতঃসিদ্ধ হইল, তাহা হইলে পরলোকবিশ্বাসও স্বীকার্য্য সত্য; অর্থাৎ তাহা ঈশ্বরবিশ্বাসের অবশ্যম্ভাবী ফল। ইহার প্রমাণ স্থলে শত শত যুক্তি আনা যাইতে পারে, কিন্তু তাহা কেবল উপরিউক্ত বিশ্বাসের দৃঢ়তা ও উজ্জ্বলতা সাধনের জন্য। কেশবপ্রচারিত ঈশ্বরেতে পরলোক-দর্শন মতকে মিস্ কব্ অতিশয় প্রশংসা করিতেন। আচার্য্য বলিতেন, লবণ অভাবে যেমন ব্যঞ্জন প্রস্তুত হয় না, অথচ একটু পরিমাণ বেশী হইলেই তাহা পুড়িয়া যায়, ধর্ম্মসম্বন্ধে পরলোক-বিশ্বাস তেমনি; না হইলেও চলে না, আবার অধিক ব্যবহার করিলে কল্পনা আসিয়া পড়ে। ব্রহ্মযোগে তিনি সশরীরে পরকাল এবং স্বর্গ দর্শন করিতেন। তাঁহার প্রদত্ত দর্শনযোগের উপদেশ পাঠ করিলে ইহা বুঝিতে পারা যায়। নির্ব্বাণ-মুক্তি তিনি মানিতেন না। মুক্তি অনন্তজীবনের আরম্ভ, এই তাঁহার বিশ্বাস ছিল। ভগ্ন জীর্ণ শরীরে তেজোময় উন্নতিশীল আত্মা

যে বাস করে, তাহার প্রমাণ তিনি নিজেই দিয়া গিয়াছেন। রোগশয্যায় সৎপ্রসঙ্গ করিতে করিতে এক দিন বলিলেন, “যেমন সম্মুখের এই সকল বৃক্ষ দেখিতেছি, যেমন এই ঘর দেখিতেছি, ইহার কোথায় কি আছে সকল জানিতেছি তেমনি যদি তোমরা পরলোক দেখিতে পাও, ইহলোকে থাকিয়া তাহার শোভার ভিতর বাস করিতে পার, তবেই বুঝিব, তোমাদের পরলোকে বিশ্বাস যথার্থ। নতুবা পরলোকের অপ্রত্যক্ষ জ্ঞানকে আমি বিশ্বাসই বলি না।” খণ্ড জ্ঞান, বিভক্ত বিশ্বাস তাঁহার ছিল না; বিশ্ব এক খানি অখণ্ড সামগ্রী, ইহাই তিনি বলিতেন। ইহ পরলোক, স্বর্গ মর্ত্ত্য, ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান, যাবতীয় সাধু মহাজন, ধর্ম্মশাস্ত্র এবং ধর্ম্মবিধান, সমস্ত মানবাত্মা এক খানি জিনিষ। চিন্ময়রাজ্যে একত্ব ও অভেদ ভাব, ঐতিহাসিক অথবা দৃশ্যমান জগতে তাহার বিচিত্র বিকাশ, এই মহাযোগ-শাস্ত্রে তিনি দীক্ষিত হইয়াছিলেন। আধ্যাত্মিক সাধু গুণের মধ্যে তিনি কোন প্রভেদ দেখিতেন না। যে পরিমাণে মনুষ্য যোগী বৈরাগী প্রেমিক ভক্ত বিশ্বাসী পুণ্যাত্মা দয়ালু হিতৈষী হয়, সেই পরিমাণে ঈশা চৈতন্য শাক্য জনকাদি সাধু আত্মাগণের সে অবতার। এই অর্থে ভক্তাবতার, কৃপাসিদ্ধ মহাত্মাগণের পুনরাবির্ভাব তিনি অনুভব করিতেন। মনুষ্য সম্বন্ধে তিনি অভেদবাদী ছিলেন। মহাপুরুষেরা মনুষ্য এবং ঈশ্বরের প্রতি-নিধি, তাঁহারা পৃথিবীতে জন্মিবার পূর্ব্বে বীজরূপে অব্যক্ত ভাবে ভগবানেতে নিত্যকাল বাস করিতেন, পরে যথা সময়ে

ঈশ্বরেচ্ছায় দেহ ধারণ করিয়াছেন; ইহাও তিনি বিশ্বাস করিতেন।

স্বর্গধাম তাঁহার কল্পনা বা অস্পষ্ট বস্তু ছিল না। ভক্ত-সম্মিলন সাধন দ্বারা ইহলোকেই তিনি স্বর্গভোগ করিয়াছেন। পূর্ব্ববর্তন সাধু মহাত্মাগণ যে অবস্থায় ভগবান্‌কে লইয়া নিত্যযোগে বিহার করেন, দেশ কালের অতীত সেই চিন্ময়ধামে তিনি একটু জায়গা পাইয়াছিলেন। তথায় বসিয়া সশরীরে স্বর্গভোগ করিতেন। এক ব্রহ্মবিশ্বাসের ভিতর তাঁহার সমস্তই বর্ত্তমান ছিল। পরলোকের অমরধাম এমন সুন্দররূপে ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন যে, তাহা শুনিলে লোকের আত্মীয়-বিয়োগশোক বিদূরিত হয়। অতীব সারবান্ বিজ্ঞানসঙ্গত, ভক্তিরসরঞ্জিত খাঁটি বিশ্বাস তাঁহার ছিল। সে বিষয়ে ভাবান্ধতা অনিয়ম অযৌক্তিকতা, সন্দেহ অনিশ্চয়তা দেখিতে পাওয়া যায় নাই।

প্রার্থনা

প্রার্থনা বাক্য নহে, অঙ্গভঙ্গী নহে, আপনার কল্পনাশক্তি কিম্বা ভাবোচ্ছ্বাস দ্বারা আপনার সাধুভাবকে উত্তেজিত করাও নহে; প্রকৃত প্রার্থনা আত্মার ঈশ্বরাভিমুখ্য গতি এবং ব্যাকুল পিপাসা। তদ্রূপ প্রার্থনায় স্বর্গীয় বলের সঞ্চার হয়, তাহাতে চিত্তের পরিবর্ত্তন সাধন করে, এবং সেই পরিবর্ত্তন বশতঃ সদিচ্ছা, সাধুপ্রতিজ্ঞা, সৎসঙ্কল্পের আবির্ভাব হইয়া থাকে। সুতরাং তদ্দ্বারা হাতে হাতে ফল লাভ করা যায়। ঈশা

বলিতেন, যে বিষয়ের জন্য প্রার্থনা করিবে, তাহা পাইয়াছি এইরূপ আশা বিশ্বাস অগ্রে মনে স্থান দিবে। প্রার্থনা প্রাকৃতিক নিয়মের ব্যভিচার ঘটাইবার জন্য নহে, কিন্তু বৈজ্ঞানিক প্রণালী অনুসারে তাহার পূর্ণতা সাধন করা। প্রকৃত প্রার্থনা ঈশ্বরপ্রেরিত, তাহার সঙ্গে সঙ্গে প্রার্থিত বিষয়-লাভের উপায়, শক্তি, বুদ্ধি, আশা, উদ্যম আসিয়া উপনীত হয়। তখন এরূপ বিশ্বাস জন্মে, যেন চাহিবার অগ্রেই ফলদাতা ফলদান করিলেন; কিন্তু বিধিনিয়োজিত দান ব্যতীত অন্য বিষয়ে প্রার্থনা চলে না। আপনার সাংসারিক বা শারীরিক অভাব মোচনের জন্য প্রার্থনা করা উচিত নহে। সে সম্বন্ধে কেবল "তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক!" এই প্রার্থনাই প্রার্থনা। কোন বাহ্য ক্রিয়া সাধনজন্য যেমন নিয়মাধীন হওয়া আবশ্যক, আধ্যাত্মিক অভাব মোচনার্থ সেইরূপ সাধারণ শাসনের অধীনে প্রার্থনা করিতে হইবে। প্রার্থিত বিষয় লাভের জন্য নিজের দিক হইতে যে টুকু করা প্রয়োজন তাহা করিয়া, অবশিষ্ট অতিরিক্ত কৃপাশক্তির জন্য ঈশ্বরের দ্বারে ভিখারী হইতে হয়।

এই মত এবং প্রণালী অনুসারে কেশবচন্দ্র প্রতিদিন এবং প্রতি সময়ে প্রার্থনা করিতেন। তিনিই জীবন্ত প্রার্থনাতত্ত্ব শিখাইয়া এবং তাহার দৃষ্টান্ত-স্বরূপ হইয়া ব্রাহ্মসমাজকে প্রার্থনাশীল করিয়াছেন। তাঁহার বাইবেল এবং ঈশাচরিত পাঠের ফল এই প্রার্থনা। এ সম্বন্ধে খ্রীষ্টের নিকট ব্রাহ্মেরা

ঋণী। মহাত্মা কেশবের তিন প্রকার প্রার্থনা ছিল। (১) অভাবমোচনের জন্য ভিক্ষা। (২) কথোপকথন। (৩) "তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক।" তাঁহার কৃত সজন প্রার্থনা ইদানীং অনেক দীর্ঘ হইত। তাহাতে আধ ঘণ্টা এক ঘণ্টা পর্য্যন্ত সময় লাগিত। কিন্তু তাহার ভিতর কথোপকথনের ভাগই বেশী, অবশিষ্ট মণ্ডলীর আধ্যাত্মিক অবস্থার বর্ণনা; শেষ দুই একটী প্রার্থনার শব্দ থাকিত। মায়ে ছেলেয় যেমন কথা হয়, তেমনি প্রচলিত গ্রাম্য ভাষায়, সহজ কথায় ইহা তিনি উচ্চারণ করিতেন। তাহাতে উপাস্য দেবতার সঙ্গে সখ্যভাবের প্রাধান্য লক্ষিত হইত। কখন কখন আরাধনা হইতে প্রার্থনা পর্য্যন্ত সমস্ত ভাব এবং ভাষা আমোদ কৌতুকে পরিপূর্ণ থাকিত। রূপক উদাহরণ দৃষ্টান্ত এত অধিক ব্যবহার করিতেন যে, প্রার্থনার মধ্যে না আসিত এমন বিষয় প্রায় ছিল না। পূর্ব্বের ন্যায় শব্দ সংজ্ঞার বাঁধাবাঁধিও দেখা যাইত না। সে সকল কথা হঠাৎ শুনিলে মনে হইত, যেন পৌত্তলিকতা, অথবা একটী ঘোর প্রহেলিকা। তজ্জন্য অনেকে বিরক্ত হইতেন। ঈশ্বরের সঙ্গে এত ইয়ারকি ভাল নয় মনে করিতেন; কিন্তু তাহার ভিতরে অনেক গভীর আধ্যাত্মিক তত্ত্ব অবস্থিতি করিত। এই প্রণালীর প্রার্থনা এখন অনেকেই করিয়া থাকেন। একটি আশ্চর্য্য এই, কেশবচন্দ্রের অবলম্বিত কোন মত বা নূতন প্রণালীকে প্রথমে যাহারা অন্যায় বলিয়া ঘোষণা করিয়াছে, পরে তাহারাই আবার সে পথের অনুবর্ত্তী হইয়াছে।

প্রার্থনাই কেশবের সকল মহত্ত্বের নিদান। তাঁহার দৈনিক প্রার্থনামালা পাঠ করিলে অনেক তত্ত্ব শিক্ষা করা যায়। তাঁহার শেষ জীবনের অল্প কয়েক বৎসরের দৈনিক প্রার্থনা তদীয় পুত্র কন্যা এবং পুত্রবধূ কর্ত্তৃক লিপিবদ্ধ হইয়া মুদ্রিত হইয়াছে। এরূপ প্রার্থনার এগার খানি পুস্তক প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইহা পাঠ করিলে আচার্য্য কেশবের আধ্যাত্মিক গভীরতা কত অধিক, তাহা সকলে বুঝিতে পারিবেন। ইহা অনেকের প্রতিদিনের জীবিকা, নিত্য ভজন সাধনের পরম সহায়।

বাহ্য প্রতিকূল অবস্থার উপর জয়লাভের জন্য তিনি উপায় অন্বেষণ করিতেন; কিন্তু কোন ঘটনাকে অমঙ্গলকর বলিতেন না। পীড়ার সময় ডাক্তারদিগকে বলিয়াছিলেন, "দুঃখ কষ্ট আমার বন্ধু, এ সমস্ত মা আমাকে দিয়াছেন, আমি তাহাদিগকে চুম্বন করিব।" তৎকালকার দুঃসহ যন্ত্রণা দর্শনে কোন আত্মীয় বলেন, ভগবানের এ কি বিচার? অকারণ তিনি কেন তাঁহার ভক্তকে এত দুঃখ দেন? আচার্য্য যোগমগ্ন চিত্তে তাহার উত্তর দিয়াছিলেন, "মা গো! তোমাকে না জানিয়াই ইহারা এইরূপে তোমার প্রতি দোষারোপ করে। এই অজ্ঞানদিগকে ক্ষমা কর। আমার আনন্দময়ী মা আমাকে ভিতরে ভিতরে ক্রোরপতি রাজা সম্রাট করিয়াছেন, আমি তাহাতে কৃতার্থ হইয়াছি; আমি তাঁহার নিকট সিকি পয়সার পুঁইশাক কি করিয়া চাইব?" ঈশ্বর-প্রীতিকামনার জন্য পার্থিব কোন অর্থ বিত্তের আবশ্যক হইলে

তদ্বিষয়ে প্রকৃতি এবং অবস্থাকে তিনি স্বয়ংই অনুকূল করিয়া দেন, এইরূপ বিশ্বাস কেশবের ছিল। হিন্দুস্থানের লাট মিওর একবার তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, "তোমার মুখশ্রী দেখিলে বোধ হয়, তুমি বড় সুখী।" সহসা সে কথা শুনিয়া তিনি কিছু বিস্মিত হন। পরে বুঝিতে পারেন, প্রার্থনাই তাহার মূল কারণ। বস্তুতঃ এ স্বর্গীয় অধিকার তিনি প্রচুর পরিমাণে সম্ভোগ করিয়া গিয়াছেন। কেশবচন্দ্র প্রার্থনাকেই সকল প্রকার শান্তি সুখ ও জ্ঞান লাভের উপায় মনে করিতেন। প্রতিদিনের প্রার্থনা তাঁহার নূতন ছিল। জলস্রোতের নিকট রোপিত বৃক্ষের ন্যায় তাঁহার জীবন সর্ব্বদাই ফল ফুলে শোভিত থাকিত। যখন যে কার্য্য উপস্থিত হইত, প্রার্থনা দ্বারা তাহা তিনি ঠিক করিয়া লইতেন। এক স্থানে বলিয়াছেন, "পরীক্ষাতে শিখিয়াছি, একটী পয়সা সংসারের জন্য যে চাহিবে, তার সমস্ত প্রার্থনা বিফল হইবে। এই জন্য প্রার্থনা বিমল রাখিবে। শেষে ইহলোক পরলোক, সমস্ত পৃথিবীর অধিকারী হইবে। এক দুই তিন চার ঠিক দিয়া তেরিজ কসিয়া যেমন অভ্রান্তরূপে কি হইল বলা যায়, প্রার্থনার সত্যও তেমনি করিয়া বুঝান যায়। পারত্রিক মঙ্গলেরই কামনা করিবে; অথচ সকলই হইবে। যখন গৃহে বিবাদ, মত লইয়া কলহ, ঠাকুরের সন্তানগণ তখন কেবল প্রার্থনাই করিবে।"

সময়ে সময়ে বিশেষতঃ বিপদ পরীক্ষার কালে যখন তিনি

প্রার্থনা করিতেন, তৎকালে মুখমণ্ডলে এবং ললাটফলকে ও নয়নদ্বয়ে যেন স্বর্গের জ্যোতি প্রতিবিম্বিত হইত। তখন যে সকল সুমিষ্ট তত্ত্ব কথা তিনি বলিতেন, তাহা এ পৃথিবীর নয়। মুঙ্গেরের আন্দোলনের বৎসর বন্ধুগণের নিকট বিদায় গ্রহণ-কালে জামালপুর প্ল্যাটফরমে জানু পাতিয়া যে ভাবে প্রার্থনা করিয়াছিলেন, তাহার মনোহর ছবি আমাদের অন্তরে এখনো জাগিতেছে। প্রথম বারে সিমলা পর্ব্বতে গিয়া নির্জ্জন বৃক্ষতলে একাকী ভূমি লুঠাইয়া যেরূপ প্রার্থনা করেন, তাহা ভাবিলে ঈশার কথা মনে পড়ে।

এই প্রার্থনা তাঁহার নিকট কবিত্ব বা কল্পনাপ্রসূত কতকগুলি সুমিষ্ট বাক্য মাত্র ছিল না, একটী জীবন্ত প্রত্যক্ষ অলৌকিক শক্তিরূপে ইহাকে তিনি বিশ্বাস করিতেন। নৈতিক চরিত্রের বিশুদ্ধতা রক্ষার প্রতি প্রথম বয়স হইতে প্রগাঢ় অনুরাগ থাকাতে তাঁহার প্রার্থনা সকল সর্ব্বদা হৃদয়গ্রাহী এবং নূতন ছিল। যাহাদের চরিত্রের কোন উন্নতি এবং পরিবর্ত্তন হয় না, তাহাদের প্রার্থনা প্রতিদিন একই প্রকারের চর্ব্বিতচর্ব্বণ কথা। সেরূপ প্রাণহীন বাঁধা বোলের প্রার্থনা তিনি করিতেন না। রিপুদমন সম্বন্ধে তাঁহার একটী সাঙ্কেতিক উপদেশ এই যে, "বাম হস্তের পঞ্চাঙ্গুলিকে কাম, ক্রোধ, লোভ, অহঙ্কার, স্বার্থ-পরতার প্রতিরূপ জানিয়া, তদুপরি দক্ষিণ হস্তের ধর্ম্মোৎসাহ, ক্ষমা, ব্রহ্মলোভ, দীনতা এবং বৈরাগ্যরূপী পঞ্চাঙ্গুলি সবলে আঘাত করিলে অর্থাৎ হাতে তালি দিয়া হরিসংকীর্ত্তন করিলে

পাপ দমন এবং পুণ্য সঞ্চয় হয়।" পুণ্য পবিত্রতা ছাড়া তাঁহার প্রায় কোন প্রার্থনা উপদেশ নাই।

বৈরাগ্য

আকাশের পক্ষীদিগের ন্যায় সুখে বিচরণ করিবে, কল্যকার জন্য ভাবিবে না। নির্লিপ্ত ভাবে সংসারে থাকিবে। ঈশ্বর-লাভ এবং তাঁহার আদেশ-পালনের পক্ষে যখন যাহা প্রতিবন্ধক উপস্থিত হইবে, তাহা ছাড়িয়া দিবে। বৈরাগ্যের জন্য বৈরাগ্য নহে, কেবল ঈশ্বরপ্রাপ্তির কামনায় তাহার সাধন প্রয়োজন। প্রকৃতিবিরুদ্ধ পথ অবলম্বন করিয়া শরীরকে কষ্ট দান, মনকে বিষণ্ণ করিয়া রাখা ঐশিক নিয়মের বিরোধী। স্বভাবের পথে মাতৃক্রোড়স্থ শিশুর ন্যায় নির্ভরশীল হইয়া প্রভুর আজ্ঞা-পালনই উচ্চ বৈরাগ্য। ব্যক্তিবিশেষের জন্য অবস্থা বিশেষে সময়ে সময়ে কোন কোন বস্তুর পরিবর্জ্জন আবশ্যক। ব্রত-গ্রহণের ফলবত্তা আছে। আপনা হইতে কঠোর বৈরাগ্যের কষ্ট লওয়া উচিত নহে, ভগবান্ যখন যে অবস্থায় কষ্ট দুঃখ আনিয়া দেন, অম্লানবদনে বিশ্বাসের সহিত তাহা বহন করা বৈরাগ্য। "তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক।" ইহাই বৈরাগ্যের মূল মন্ত্র।

এই স্বাভাবিক বৈরাগ্যের পথ অবলম্বনপূর্ব্বক কেশবচন্দ্র নিজের বিশেষ শিক্ষার জন্য যখন যখন যে ত্যাগস্বীকার আবশ্যক বুঝিতেন, তৎক্ষণাৎ তাহা সাধনে পরিণত করিয়াছেন। আহার বিহার পরিচ্ছদ বিষয়ে তিনি স্বভাবতঃ মিতাচারী ছিলেন।

সময় বিশেষে ব্রত গ্রহণ করিয়া তাহারও সঙ্কোচ করিতেন। চিত্তকে অধিকতররূপে ভগবদ্ভক্তিতে মাতাইবার জন্য শরীরকে কষ্ট দিতেও ভীত হইতেন না। তদ্ব্যতীত অবস্থাচক্রে যখন যে দুঃখ কষ্ট আসিয়া মস্তকে পড়িত, তাহা অবিচলিত-হৃদয়ে প্রসন্নচিত্তে বহন করিতেন। কিন্তু বাহ্য দুঃখ, কষ্ট, শুষ্ক মুখ দেখাইয়া বৈরাগ্যের প্রশংসা-প্রয়াসী তিনি ছিলেন না। ঐশ্বর্য্য প্রদর্শনপূর্ব্বক যাঁহারা মর্কট বৈরাগ্য দেখাইয়া জাঁক করে, তাহাদিগকে কৃপাপাত্র বলিয়া তিনি জানিতেন। গভীরদর্শী কেশব স্পষ্ট দেখিতেন, বৈরাগ্যের রুক্ষ কেশরাশির অভ্যন্তরেও দুর্ব্বাসনার দুর্গন্ধ বিরাজ করে, ছিন্নকন্থা এবং শুষ্ক মুখের অন্তরালেও বিলাসের রসরঙ্গ, অহঙ্কারের গরল উথলিয়া উঠে। এই জন্য তিনি বাহ্য বৈরাগ্যের উপর বেশী নির্ভর করিতেন না; অথচ একতন্ত্রী, গৈরিক, ব্যাঘ্রচর্ম্ম, কমণ্ডলু, কৌপীন, বৃক্ষতলে হবিষ্যান্ন আহার, কুটীরবাস, স্বহস্তে রন্ধন অত্যন্ত ভালবাসিতেন। একদিকে যেমন বাহ্য বৈরাগ্য তাঁহার ঘৃণার বিষয় ছিল, তেমনি অপরদিকে কর্ত্তব্যকর্ম্মের নামে বিলাস, সংসারাসক্তিও তিনি দেখিতে পারিতেন না। বিলাসী সমাজে বিলাসের মধ্যে থাকিলেও তাহার দূষিত দুর্গন্ধ অসহ্য বোধ ছিল। সামান্য আহার পরিচ্ছদ, কাঙ্গাল দুঃখী জনের সঙ্গ ভারি ভালবাসিতেন। যে সময় তিনি বৈরাগ্যের ব্রত লন, তখন নিজের তোষক বালিস বিলাইয়া দেন, এবং সাল, সোণার ঘড়ি এবং চেন বিক্রয় করিয়া সৎকার্য্যে দান করেন। তদবধি সোণার ঘড়ি চেন আর ব্যবহার

করেন নাই। সচরাচর কলার পাতে, কখন বা মেঝের উপর মাটীতে ভাত খাইতেন, মাটীর ঘটীতে জলপান করিতেন।

জীবনবেদের "জাতি-নির্ণয়" অধ্যায়ে বর্ণিত আছে, "মনের কামনা, অভিরুচি তন্ন তন্ন করিয়া নিষ্পন্ন হইতেছে যে, আত্মা দরিদ্রজাতীয়। যাহা কিছু আহার ব্যবহার দৈনিক, প্রচুর পরিমাণে তাহাতে দরিদ্রতাই লক্ষিত হয়। ধনাঢ্য পিতা পিতামহের দ্বারা পালিত ও বাহ্যিক ঐশ্বর্য্য সম্পদে বেষ্টিত হইয়াও, মন বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে স্বাভাবিক দৈন্যের পরিচয় দিতে লাগিল। সামান্য আহারে মন তৃপ্তি বোধ করে। আসক্তি যদি কোন পদার্থে থাকে, তবে সে পদার্থ শাক। হৃদয় স্বভাবতঃ শাকেতে এত তৃপ্তি বোধ করে, এত সুখ আরাম পায়, তাহাতেই বুঝিলাম, আমার প্রতি ঈশ্বরের বিশেষ করুণা। বাষ্পীয়শকটে যদি কোন খানে যাইতে হয়, তৃতীয় ছাড়িয়া প্রথম শ্রেণীতে যাইতে ভয় হয়। মনে হয়, বুঝি অনধিকারচর্চ্চা করিতেছি। 'সুখ ঐ স্থানে; উদ্বেগবিহীন যেমন তৃতীয় শ্রেণী, প্রথম শ্রেণী তেমন নয়।' এই যুক্তিতেই বুঝা যায়, আমি ধনীদের জন্য নই, দরিদ্রের জন্যই সৃষ্ট হইয়াছি। নগরসঙ্কীর্ত্তনে দুঃখীর মত চলিতে হইবে, কে বলিল? মানহানি হইবে জানিয়াও কেন ইহা করিলাম? উহা যে চিন্তার বিষয়, তাহাও মনে করিলাম না। কিন্তু বিনামা পরিত্যাগ করিয়া আপনা আপনি চলিলাম। কুটীরে থাকিলাম না, স্বভাবতঃ ধূলির মধ্য দিয়া হৃদয় চলিতে চাহিল। এ বিষয়ে আরও অনেক উদাহরণ সংগ্রহ করা যায়।

পৃথিবী বুঝুক, আর না বুঝুক, আমি ঠিক বুঝিয়াছি। এ স্বভাব কিছুতেই যাইবে না। এই জন্য সকলের সঙ্গে মিশিয়া নিরাপদে আছি। কে কে এই জাতির লক্ষণযুক্ত, ইঙ্গিতে বুঝিলাম। একটা কথা আমার শাস্ত্রে লেখা আছে, তাহাও বলা উচিত। যদিও নির্ধন দীনদিগের সঙ্গে আমি আছি, যাদের ছিন্ন বস্ত্র, গরীব যারা, যদিও তারাই আমার প্রাণের বন্ধু, তথাপি আমি সে কথা শিক্ষা করিয়াছি। কথিত ছিল, ধনীকে ঘৃণা করিয়া দীনকে মান্য করিবে। পর্ণকুটীরেই কেবল ধর্ম্ম বাস করেন। কিন্তু নববিধান মতে সিদ্ধান্ত হইয়াছে, ধনীকে মান দিবে এবং দুঃখীকেও মান দিবে। বাহিরে ধন থাকিলে ক্ষতি নাই, মনে দুঃখী হইলেই হইবে।”

রোগ দুঃখ ক্লেশ অবমাননা বহনকে তিনি কোন আশ্চর্য্য অলৌকিক ক্রিয়ার মধ্যে গণ্য করিতেন না। আমার উৎকট পীড়া হউক, কিংবা লোকে আমাকে কলঙ্কী বলিয়া অন্যায়রূপে ঘৃণা করুক, এ প্রার্থনা তাঁহার কখন ছিল না। এ সকল মর্কট বৈরাগ্যের লক্ষণ বলিয়া তিনি জানিতেন। বরং মিথ্যা কলঙ্ক রটিলে, কিংবা শরীর রোগাক্রান্ত হইলে যাহাতে তাহা অচিরে বিদূরিত হয়, তজ্জন্য স্বতঃ পরতঃ চেষ্টা করিতেন। কবীরের জীবনবৃত্তান্তে যেমন আছে,—তিনি জনসমাজে পাতকী বলিয়া গণ্য হইবার জন্য বারবিলাসিনীর সঙ্গে প্রকাশ্য পথে ভ্রমণ করেন; তাহা দেখিয়া দেশের রাজা তাঁহাকে দণ্ড দেয়, এবং কবীর আশ্চর্য্য অলৌকিক ক্রিয়া দ্বারা রাজাকে শেষে পদানত

করেন। কেশবচন্দ্রের সে অস্বাভাবিক বৈরাগ্যে শ্রদ্ধা ছিল না। তিনি বলিতেন বটে, যদি কপটতা করিতে হয়, তবে তাহা বৈরাগ্য সম্বন্ধে করা উচিত। কিন্তু সে বিষয়ে ভিতরে এক ভাব, বাহিরে অন্য ভাব তিনি দেখান নাই। বৈরাগ্যের বেশ ভূষা আচার আচরণ প্রকাশ্যরূপে করিতেন, তাহার প্রত্যেক সংবাদটি নিজহস্তে পত্রিকায় লিখিয়া দিতেন। ইহা দেখিয়া পরিষ্কার বোধ হয়, তাঁহার বৈরাগ্য ঢাকিবার কিংবা প্রকারান্তরে দেখাইয়া বাহাদুরী লইবার বৈরাগ্য নহে। তাহা স্বাভাবিক এবং অকৃত্রিম ও আধ্যাত্মিক। এই জন্য সভ্যসমাজে তাঁহার মত উচ্চপদস্থ লোকের পক্ষে সে বৈরাগ্য অত্যন্ত প্রশংসনীয়।

নির্ম্মমতা যথেষ্ট ছিল। অবহেলা করিয়া অন্যায়রূপে কোন বস্তু নষ্ট হইতে দিতেন না, কিন্তু দৈবগতিকে নষ্ট হইলে তজ্জন্য দুঃখও করিতেন না। একবার ঢাকা হইতে আসিবার সময় কুষ্ঠিয়ার নিকট ষ্টীমারে রূপার নস্যদানিটী হারাইয়া গেল। পূর্ব্বে তিনি বড় নস্য ব্যবহার করিতেন। নস্যদানিটী দেখিতে অতি সুন্দর ছিল। যখন তাহা হারাইয়া গেল, তখন সে জন্য আর কোন দুঃখ করিলেন না। অধিকন্তু নস্য লওয়া অভ্যাস সেই সঙ্গে ছাড়িয়া দিলেন।

অবস্থার অতীত অথবা অসাত্ত্বিক কোন সুখসেব্য ভোগ্য বস্তু নিজে ভোগ করিতে যেমন তিনি ভালবাসিতেন না, সঙ্গী ধর্ম্ম-সহচরগণকেও তৎপ্রতি আসক্ত দেখিলে তেমনি মিষ্ট রূপে ভর্ৎসনা করিতেন। প্রচারকগণের অনুগত কোন এক গরিব

ভৃত্য তাঁহাদিগকে একবার নিরামিষপোলাও ভোজন করাইয়াছিল। সে লোকটা কিছু উদার-চরিত্র, তাহার স্ত্রী পুত্র আত্মীয় কেহ নাই; কিন্তু ভাল সামগ্রী আপনি যেমন খাইতে ভালবাসে, প্রিয়জনকে খাওয়াইতেও তেমনি উৎসাহী। প্রচারক মহাশয়েরা ভাবিলেন, ভাল দ্রব্যত প্রায় রসনায় কখন পড়ে না, পোলাও অথচ নিরামিষ, ইহা ভগবান্ যদি দিলেন, তবে ক্ষতি কি? তখন কলুটোলার বাটীতে আড্ডা ছিল। এই মনে করিয়া তাঁহারা পোলাও ভোজন করিলেন। আচার্য্য ঘরে বসিয়া তাহা দেখিলেন, কিন্তু ভোজনের সময় কোন কথাই কহিলেন না। অনন্তর ভোজন সমাপ্ত হইলে তাহার অনুপযোগিতা সম্বন্ধে দুই একটী কথা তুলিলেন। তচ্ছ্রবণে প্রচারক মহাশয়দের মুখ শুকাইয়া গেল। উদরস্থ পোলাও লজ্জাতে সঙ্কুচিত হইল। তখন সকলেই বুঝিলেন, কাজটা সাত্ত্বিক আচারের বিরোধী হইয়াছে। মুড়ি মটরভাজা খাইয়া প্রচারকগণ জগতে অমূল্য রত্ন বিতরণ করিবে, এইটি তিনি চাহিতেন। মুড়ি ভোজনের সময় তাঁহাকে অংশী করিতেই হইত।

পারিবারিক সম্ভ্রম এবং উচ্চ অবস্থার সহিত কেশবচন্দ্রের বৈরাগ্য কিরূপে রক্ষা পাইত, এ সম্বন্ধে অনেকে কিছু বুঝিতে পারিতেন না। অধিকাংশ ব্যক্তি তাঁহার বাহিরের চাল চলন দেখিয়া বৈরাগ্যাভাব মনে করিতেন। প্রকাণ্ড রাজপ্রাসাদ তুল্য অট্টালিকায় বাস, সোণার চস্‌মা নাকে, চোগা চাপকান গায়, বড় বড় গাড়ী জুড়িতে চড়িয়া বাড়ীতে রাজা রাণী আসিতেছে, ক্রিয়া

কর্ম্মে নহবৎ বাজিতেছে, ধূম ধামে খরচ পত্র হইতেছে, এই সমস্ত দেখিয়া বাহিরের লোকেরা বিপরীত মনে করিত। এ দিকে আবার সদা সর্ব্বদা যাহাদের সঙ্গে তিনি ধর্ম্ম প্রচার করিয়া বেড়াইতেন, তাহাদের মলিন বসন, ছিন্ন পাদুকা, মুখে লাবণ্য নাই, অন্নবস্ত্রাভাবে তাহাদের পরিবারগণ হাহাকার করে, যেন কতকগুলি লোক অন্নাভাবে ধনী কেশবের শরণাগত হইয়াছে। অধিকাংশ স্থূলদর্শী লোকে বাস্তবিকই ইহা বিশ্বাস করিত। কোন এক জন ভদ্রলোক মন্দিরে উৎসব দেখিতে আসিয়া বলিয়াছিল, "কেশব বাবু খুব চতুর লোক। আপনি মাঝে মাঝে পাশের ঘরে গিয়া মিছিরি টুকু, দুধ টুকু, পানটা আসটা খেয়ে আসছে; উপবাসও করে না, কিছুই না। আর প্রচারকেরা না খেয়ে শুকিয়ে কেবল 'দয়াল এস হে! দয়াল এস হে!' করে চেঁচিয়ে মরছেন!" কেহ বা বলিত, "কেশব সেন কিন্তু কয়টা লোককে আচ্ছা ভ্যাড়া বানিয়ে রেখেছে!" দ্বারদেশে "কমলকুটীর" নাম পাঠ করিয়া কেহ কেহ মহারাগ প্রকাশ করিত। প্রচারকেরা অনাহারে মলিন-বসনে কাল কাটায়, আর আচার্য্য বাবুগিরি করেন, ইহা একটি বহু দিনের অপবাদ। এমন কি, কেশবচন্দ্রের আত্মীয় বন্ধুগণের নিকটেও ইহা শুনা যাইত। আপাতদৃষ্টিতে তাদৃশ বৈষম্য দর্শনে এরূপ মনে হওয়া অস্বাভাবিক নহে, এবং সেই বৈষম্য হেতু প্রচারকগণকে সাধারণতঃ লোকে অধিক বৈরাগী বলিত। কিন্তু কেশবের এ সম্বন্ধে বিশেষ মত ছিল। আহার পরিচ্ছদ অবস্থান বিষয়ে যে যেরূপ অভ্যস্ত, তাহার বহু

পরিমাণে সেই ভাবে থাকা তিনি ধর্ম্ম মনে করিতেন। যে বাল্যকাল হইতে কষ্ট সহিয়া আসিয়াছে, তাহার পক্ষে কষ্টসহ্য কিছু কঠিন কর্ম্ম নহে। অধিকন্তু ইহার উপর বৈরাগ্য নির্ভর করে না। ছিন্নকন্থা, পর্ণকুটীর, শাকান্নের মধ্যে অত্যাসক্তি থাকিতে পারে; পক্ষান্তরে সুখসেব্য বসন ভূষণেও মনুষ্যকে বৈরাগ্যবিহীন করিতে পারে না। বৈষম্যের ভিতর প্রেমের সাম্য সংস্থাপন তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল। এক অবস্থায় ভগবান্ যখন সকলকে রাখেন নাই, মনুষ্য কেন তবে সকলকে এক করিতে চাহিবে? বিচিত্রতা এবং বৈষম্যের ভিতরে যে একতা, তাহাই তিনি বাঞ্ছা করিতেন। তাঁহার নিজের বৈরাগ্যবিধি এবং আদর্শ স্বতন্ত্র ছিল। প্রত্যেকের অবস্থানুসারে তাহা স্বতন্ত্র হওয়া উচিত, এক নিয়মে সকলকে বাধ্য করা ঈশ্বরাজ্ঞার বিপরীত বলিয়া তিনি জানিতেন। কিন্তু মতে সকলে ভাই ভগ্নী, অথচ কাজে গভীর তারতম্য; নির্ব্বিকারচিত্ত উদারহৃদয় চিন্তাশীল বিজ্ঞানী ভিন্ন ইহার তত্ত্ব কে বুঝিতে পারে? আচার্য্য বলিয়াছেন, "আমার আদেশপ্রাপ্তি এবং বৈরাগ্য সম্বন্ধে আমি কাহাকেও সন্দেহ করিতে দিব না।" তিনি যে ভাবে চলিতেন, তাহার বাহ্য প্রণালীর অনুকরণ না করিয়া আন্তরিক ভাব অন্যে লইবে, এই তিনি চাহিতেন। তথাপি কেশব কাঙ্গালের বন্ধু। দরিদ্র প্রচারকপরিবারের দুঃখ-মোচনের জন্য তিনি নিশ্চেষ্ট ছিলেন না। এই প্রচারকপরিবারের জীবিকা-নির্ব্বাহপ্রণালী এ যুগে একটী নূতন ব্যাপার। প্রেরিত দাসবর্গ বিষয় কার্য্যে

জলাঞ্জলি দিয়া, বিধাতার উপর নির্ভর করিয়া, সপরিবারে এই দীর্ঘকাল জীবন ধারণ করিল, ইহা দেখিলে কে না বিশ্বাসী হইবে? কেশব ব্রহ্মরাজ্যের রাজস্ব সৃষ্টি এবং বৃদ্ধি করিয়াছেন। ত্যাগী সন্ন্যাসী কষ্টসহিষ্ণু ধার্ম্মিক লোকেরা তাঁহার নিকট যথেষ্ট সহানুভূতি প্রাপ্ত হইত। ভ্রান্তি কুসংস্কার দেখিয়াও অপর ধর্ম্মাবলম্বীদিগকে তিনি ফকিরী বিষয়ে শ্রদ্ধা করিতেন। এই কারণে ফকির, মহন্ত, দরবেশ, সন্ন্যাসী, যোগী, পরমহংস সকলে তাঁহাকে দেখিতে আসিত। গাজীপুরের পাহাড়ী (পবহারী) বাবা, ডোমরাওনের নাগাজী, দক্ষিণেশ্বরের পরমহংস তাঁহার ধর্ম্মবন্ধু ছিলেন। বিধাতৃপ্রেরিত যাবতীয় ভোগ্য বস্তু যথানিয়মে পরিমিত ভাবে উপভোগ করিয়াও তিনি বৈরাগ্য রক্ষা করিতেন। কঠোর সন্ন্যাসী, বিরক্ত সাধুদিগের ত্যাগস্বীকার কেশবচন্দ্রের শ্রদ্ধার বিষয় ছিল বটে, কিন্তু তাঁহাদের অনুকরণ তিনি কখন করেন নাই। ভিক্ষান্ন ভোজন, মস্তক মুণ্ডন, গৈরিক বস্ত্র ব্যবহার তিনি করিতেন, কিন্তু তাহা নববিধান অনুসারে। গৈরিক বস্ত্রে জরির পাড় বসান বিষয়ে একবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন। ক্ষুদ্র মৎস্য এবং পক্ষী পুষিয়া তাহাদিগের নিকট তিনি বৈরাগ্য শিখিতেন। অগাধ নির্ভর, অটল বিশ্বাস, গভীর উপাসনা, বিঘ্নের ভিতর শান্তি এবং আপনাকে ভুলিয়া নিয়ত জগতের হিতে ব্যস্ত থাকা, ইহাই বৈরাগ্য বলিয়া তিনি বিশ্বাস করিতেন।

যোগ

জ্ঞানে, ভাবে, কাজে, ইচ্ছায়, রুচিতে ব্রহ্মের সহিত জীবের মিলনই প্রকৃত যোগ। সহজ বিশ্বাসে ব্রহ্মসত্তা উপলব্ধি করিয়া, তাঁহাতে জীবিত থাকিয়া এবং অবস্থিতি করিয়া, কর্ম্মক্ষেত্রে বিচরণ করিতে হইবে। আমি আছি, এই আত্ম-জ্ঞানের বোধশক্তি যেমন স্বতঃসিদ্ধ, তিনি আমি দুই জন এক সঙ্গে থাকি, প্রকৃত যোগের অনুভূতি তদ্রূপ প্রত্যক্ষ। আমার জ্ঞান শক্তি ভাব ভক্তি দয়া সদ্‌গুণ তাঁহারি প্রকাশ। তিনি আমার, আমি তাঁহার; আমাতে তিনি, তাঁহাতে আমি এবং সমস্ত বিশ্ব; আবার আমাতে তিনি এবং সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড; কেশবচন্দ্রের এইরূপ যোগানুভব ছিল।

নিশ্বাস বন্ধ করিয়া রেচক পূরক কুম্ভক দ্বারা প্রাণায়াম সাধনপূর্ব্বক অলৌকিক কার্য্য করিব, এরূপ অভিলাষ কখন তাঁহার হয় নাই। প্রেততত্ত্ববাদ, থিয়োসফি, হটযোগ, বা অন্য কোন কৃত্রিম বিভূতিযোগ তিনি গ্রাহ্য করিতেন না। অস্বাভাবিক উপায়ে শরীর· শোষণ করিয়া বা অনাহারে রাত্রি জাগিয়া, দশ বিশ ঘণ্টা ধ্যানও করিতেন না। বিদ্যুতের মত কর্ম্মক্ষেত্রে ফিরিতেন, বিধর্ম্মী অধর্ম্মী ভিন্নধর্ম্মীদিগের সহিত মিশিয়া সামাজিক রাজনীতি ইত্যাদি তাবৎ বিষয়ে লিপ্ত থাকিতেন, আবার পরক্ষণে যোগের কুটীরে আসিয়া গভীর যোগতত্ত্বের উপদেশ দিতেন। কথিত আছে, সমরক্ষেত্রে উদ্যত

খড়েগর সম্মুখে দাঁড়াইয়া শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে যোগতত্ত্বের উপদেশ দিয়াছিলেন, সংসার-সংগ্রামের ভীষণ কোলাহলের মধ্যে কেশব তেমনি যোগ ভক্তি সেবা জ্ঞান, এই চতুর্ব্বিধ তত্ত্ব শিষ্যদিগকে শিক্ষা দিতেন। কেশবচন্দ্রের আগে ভক্তি, তাহার পর যোগ। স্বর্গের দুইটি বায়ু যেন দুই দিক্ হইতে আপনি আসিয়া তাঁহার হৃদয়ে এবং আত্মাতে প্রবিষ্ট হইয়াছিল। ভক্তিকে স্থায়ী করিবার জন্য ঈশ্বরপ্রেরিত যোগপথ ধরিলেন। এই পথ ধরিয়া তিনি জলে স্থলে শূন্যে চন্দ্রে সূর্য্যে বায়ুমণ্ডলে প্রতিক্ষণে ব্রহ্মসত্তা অনুভব করিতে লাগিলেন। অন্তর বাহির তখন হরিময় হইয়া গেল। আত্মজ্ঞানের সঙ্গে ব্রহ্মজ্ঞান এমনি চিরপ্রতিষ্ঠিত হইল যে, নিরন্তর তিনি ব্রহ্মগতপ্রাণ হইয়া রহিলেন। এই যোগ ভক্তিমিশ্র, সুতরাং অতি সুমিষ্ট এবং সারবান্। দুইটি স্রোত সম্মিলিত হইয়া এক দিকে অদ্বৈতবাদ, অপরদিকে পৌত্তলিকতা কুসংস্কার, এই উভয়ের মধ্য দিয়া চলিতে লাগিল। তিনি ঈশার ন্যায় ইচ্ছাযোগে যোগী ছিলেন। ইচ্ছা করিলে তিন চারি ঘণ্টা একাকী যোগে মগ্ন থাকিতে পারিতেন, কিন্তু প্রায় স্বতন্ত্র ভাবে সে প্রকার থাকিবার প্রয়োজন হইত না। অল্পক্ষণ নির্জ্জনে বসিলে প্রত্যাদেশের প্রবাহে প্রাণ ভাসিয়া যাইত। বেলঘরিয়া তপোবনে বৃক্ষতলে অল্পক্ষণ বসিয়া এমনি আহ্লাদিত হইতেন যে, তজ্জন্য উদ্যান-স্বামী বন্ধুবর বাবু জয়গোপাল সেনকে কৃতজ্ঞতা না দিয়া থাকিতে পারিতেন না। জীবনবেদে বলিয়াছেন, "এখন আর

বুঝিতে পারি না, আমার জীবনে যোগ অধিক, না কর্ম্ম অধিক। বিবেকের প্রভাব অধিক, না মৃদঙ্গ বাজাইয়া ভক্তিতে আনন্দ করা অধিক। ষোল আনা যদি আমার ভক্তি থাকে, তবে ষোল আনা যোগ আছে। দুই আনা যদি যোগ থাকে, তবে দুই আনা কর্ম্মও আছে।" এ যোগ তাঁহার সাধনের ধন নহে, কিন্তু সাধন দ্বারা রক্ষিত। শেষ জীবনে যোগসম্বন্ধে বিশেষ অনুরাগ দেখাইতেন। ভাবুকতার ভক্তিমধ্যে ফাঁকি চলিতে পারে, কিন্তু যোগভক্তিতে তাহা চলে না। ধর্ম্মবন্ধুদিগের জীবনে যোগের বৃক্ষ ফলবান্ হইল না বলিয়া দুঃখ প্রকাশ করিতেন। বস্তুতঃ তিনি যোগেতেই জীবিত ছিলেন। বহু কৃচ্ছ্র সাধনেও সে প্রকার নিত্যযোগ কেহ লাভ করিতে পারে না। যোগ-প্রসূত নিত্যশান্তিরসে তাঁহার চিত্ত ডুবিয়া থাকিত। এই কারণে ঘোর ব্যস্ততার ভিতরেও তিনি স্থির গম্ভীর অটল ভাবে অবস্থিতি করিতেন।

এই যোগের ভিতর বৌদ্ধের নির্ব্বাণ মিলিত হইয়াছে। অগ্রে বাসনা নির্ব্বাণপূর্ব্বক নির্ব্বিকার হওয়া, তাহার পর যোগানন্দের সম্ভোগ। তাঁহার ইচ্ছাশক্তির এমন পরাক্রম ছিল যে, সময়ে সময়ে একেবারে নিষ্ক্রিয় নিশ্চিন্তমনা হইতেন। ভাল মন্দ কোন বিষয় না ভাবিয়া স্থির অচঞ্চল হইয়া থাকিতেন। এই খানে শাক্যের সঙ্গে তাঁহার মিলন। এই সাধনে সিদ্ধ হইয়া তিনি ইচ্ছাধীনে স্বাধীনভাবে সার চিন্তা, সার কল্পনা, পবিত্র কামনাকে মনে স্থান দিতেন। যাহা কিছু অসার মিথ্যা,

ঈশ্বরেচ্ছার বিরুদ্ধ, সে সকল আর অন্তরে প্রবেশাধিকার পাইত না।

আন্তরিক এবং বাহ্য দুই প্রকার যোগ তাঁহার ছিল। যোগের পুস্তক খানি পড়িলে ইহার বিস্তারিত বিবরণ অবগত হওয়া যায়। নয়নরঞ্জন সৃষ্টিশোভা, ধর্ম্মপুস্তক, সাধু ভক্ত, মানবসমাজ, নিজ জীবনের ইতিহাস, ধর্ম্মার্থগৃহীত বিবিধ অনুষ্ঠানপ্রণালীর সাহায্যে তিনি ব্রহ্মযোগে মগ্ন হইতেন। অবার সম্পূর্ণ নিরবলম্ব হইয়া অনন্ত চিদাকাশে অনন্তের ক্রোড়ে বাস করিতেন। সে অবস্থায় বাহ্যাবলম্বন কিছুই থাকিত না। গৈরিক একতারা বাঘছাল ইত্যাদি উপকরণ সমস্ত পরিত্যাগপূর্ব্বক নিঃসঙ্গ নির্লিপ্ত ভাবে আত্মাময় হইতেন। পীড়ার অবস্থায় শেষোক্ত যোগই এক মাত্র তাঁহার শান্তিপ্রদ ছিল। যেমন কর্ম্মযোগের উৎসাহ, তেমনি জ্ঞান এবং ভক্তিযোগের গভীরতা। তাঁহার অনুষ্ঠিত কর্ম্মকাণ্ড, বাহ্য বেশ ভূষার আড়ম্বর দর্শনে যাঁহারা বিরক্ত হইতেন, তাঁহারা সেই সকল উপায় নিজেরা শেষে গ্রহণ করিয়াছেন কেবল তাহা নহে, বাহ্য বেশ ভূষায় অন্ধ হইয়া তন্মধ্যে অনেকে কর্ত্তাভজা, পৌত্তলিক বৈষ্ণব, ঘোর কুসংস্কারসেবী হইয়া গিয়াছেন। ইঁহারা এখন ব্রাহ্মধর্ম্মের বিরোধী। কিন্তু যোগী কেশব তৎসম্বন্ধে নিরপেক্ষ ছিলেন। বিশেষ কোন বাহ্য উপকরণ না হইলে চলিবে না, এমন তিনি কখনও মনে করিতেন না।

প্রাত্যহিক উপাসনা কিংবা উৎসবাদিতে ধ্যানের উদ্বোধন-বাক্য যিনি স্থিরচিত্তে শ্রবণ করিয়াছেন, তিনিই বলিবেন,

কেশবচন্দ্রের যোগজীবন কেমন গভীর। তিনি নিমেষের মধ্যে ধ্যানে মগ্ন হইয়া, যোগের ভিতর দিয়া, পরিশেষে সমাধির অনন্ত নির্ব্বাণের গূঢ় প্রদেশে গিয়া অবতরণ করিতেন, আর সেই সঙ্গে উদ্বোধনের মন্ত্র উচ্চারণ করিতেন। তাঁহার শব্দবিন্যাসই যোগসম্ভোগের পরিচায়ক। সেরূপ সহজে ধ্যান করিতে এবং করাইতে আর কে পারিবে? কথাগুলি শুনিলেই বোধ হইত, ইহা ব্রহ্মানুভূতির নিদর্শন। লোকেরা কপোতদিগকে যেমন উচ্চ আকাশে উড়াইয়া দেয়, কেশবচন্দ্র উপাসকমণ্ডলীর আত্মাকে তেমনি চিদাকাশের মহোচ্চ স্থানে উড়াইয়া দিতেন। তাঁহার রসনাবিনিঃসৃত ধ্যান আরাধনা প্রার্থনার বচনাবলী সচ্চিদানন্দের মধুর আঘ্রাণে পরিপূর্ণ থাকিত। অসার চর্ব্বিত-চর্ব্বণ শোনা কথা তিনি বলিতেন না। কেশবচন্দ্রের যোগধর্ম্ম কেবল ব্রহ্মধ্যান ধারণায় পর্য্যবসিত হয় নাই। তিনি মহাযোগে যোগী। ভগবানের সমস্ত ঐশ্বর্য্যের সহিত তাঁহার যোগ ছিল। সমস্ত ধর্ম্মশাস্ত্র, স্বদেশ বিদেশের সাধু ভক্ত, ভূত কালের ইতিহাস এবং ভবিষ্যতের অনন্ত উন্নতিশীলতা, নরলোক এবং অমরলোক, সকলের সহিত আপনাকে অভেদ্য একাকার জানিয়া এবং সমুদয়কে বক্ষে ধরিয়া তিনি মাহাযোগসাগরে অনন্ত সচ্চিদানন্দের ভিতরে প্রবিষ্ট হইতেন। তাঁহার যোগের অর্থই মহাযোগ। বিয়োগ আর যোগ তাঁহার খেলা ছিল। এই জন্য গ্লোবের উপর নিশান উড়াইয়া তাহা পূজাবেদীর সম্মুখে রাখিয়া দিয়াছিলেন।

ভক্তি

ভক্তির চরিতার্থতার জন্য লোকে কল্পিত দেবমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করে, এবং সেই মূর্ত্তির সেবা পূজা বন্দনা দর্শন স্পর্শ তাহাদের ভক্তির চরিতার্থতার উপায় হয়। কেশবের ভক্তি নিরাকারেই সম্পূর্ণরূপে চরিতার্থ হইয়াছিল। এজন্য তাঁহাকে বৈধী ভক্তির পথও অবলম্বন করিতে হয় নাই। আগে ভক্তি পাইয়া তাহার পর সাধনবিধি তিনি প্রচার করেন। নিজমুখে এক স্থানে বলিয়াছেন, "এক সময়ে ভক্তিভাব ছিল না, গান করা এক সময়ে আমার পক্ষে সম্পূর্ণ অসম্ভব ছিল। কখন যে ঈশ্বরকে মা বলিয়া ডাকিব জানিতাম না। এখন মনে হইতেছে, মাকে দেখিয়া বুঝি একেবারে পাগল হইয়া যাই। এখন জোর করিয়া বলিতে পারি, ভারতে লক্ষ লক্ষ লোক আছে, এই সকল লোকের বাড়ীতে মা নিশ্চয়ই গমন করিবেন। এক স্থানে যাহা ঘটিয়াছে, তাহা অপর স্থানে ঘটিবেই। প্রেম নাই ? ইংরাজি পুস্তক পড়িয়া সকলের মন শুষ্ক হইয়াছে ? প্রেম হইবে না ? তা নয়, আমার যখন দুর্দ্দিন গিয়াছে, তখন তোমাদেরও যাইবে।" পূর্ব্বে যিনি কেবল কঠের নীতির উপদেশ দিতেন, পরে ভক্তিতে তিনি কাঁদিতেন, হাসিতেন, নাচিতেন এবং গাইতেন। যত প্রকারের পাগলামি আছে, সমস্তই তাঁহাতে প্রকাশ পাইয়াছিল। আধুনিক সভ্যতার বিপরীত যাহা কিছু, সে

সমুদায় কার্য্যে অগ্রেই• তিনি পদচালনা করিতেন। পায়ে নূপুর, হাতে সোণার বালা পরিয়া হরিসঙ্কীর্ত্তনে যখন মাতিতেন, তখন থামাইয়া রাখা ভার হইত। হুঙ্কার গর্জ্জন নৃত্য কিছুই বাকী ছিল না। বন্ধুগণের গলা ধরিয়া হেলিয়া দুলিয়া নাচিতেন। মদ্যপের ন্যায় তখন তাঁহার মত্ততার আবির্ভাব হইত। যেখানে ভাব রস ভক্তি প্রেম পাইতেন, তাহাতেই প্রবেশ করিতেন, তখন কুসংস্কার পৌত্তলিকতা কিছুরই ভয় করিতেন না। ভক্তিমার্গের শান্ত দাস্য সখ্য বাৎসল্য এবং মাধুর্য্য রস তিনি ব্রাহ্মসমাজের শুষ্ক দেহে সঞ্চার করিয়া গিয়াছেন। দাস্যভাব ত প্রথমেই ঈশার নিকট লাভ করেন। অনন্তর আর্য্যঋষিদিগের ভোগ্য শান্তিরস পান করিলেন। শেষ জীবনে সখ্য বাৎসল্য মাধুর্য্য রসের প্রাধান্য লক্ষিত হইত। কিন্তু ইহা যোগভূমিতে স্থাপিত ছিল। বাৎসল্যপ্রেম যখন উচ্ছ্বসিত হইত, তখন গোপাল গোপাল বলিয়া ডাকিতেন, আর কাঁদিতেন। আবার আপনাকে সতীর ন্যায় জানিয়া হরিকে প্রাণপতিরূপে আদর করিতেন। পরিশেষে মহাযোগের মহাভাবে ডুবিয়া লজ্জা ভয় ঘৃণা নিন্দা জাতি কুল ধন মান সভ্যতায় একবারে জলাঞ্জলি দিয়াছিলেন। তথাপি কখন হতচেতন বা মূর্চ্ছিত হইতেন না। বিশুদ্ধ চৈতন্য রূপে দিব্যজ্ঞানে মহাযোগ এবং মহাভাবরস পান করিতেন। তালে বড় খবরদারি ছিলেন, বিকার ভ্রান্তি অসামঞ্জস্য তাঁহার হৃদয়ে স্থান পাইত না। ভগবানের

হাতের খেলনা হইয়া খেলিতেন, এই জন্য চারি দিকের ওজন সমান থাকিত। প্রেম ভক্তি যোগ বৈরাগ্য বিজ্ঞানের নির্দ্দিষ্ট সীমার পরপারে কদাপি গমন করে নাই। যে কেশব মহারাণী ভারতেশ্বরীর গৃহে এবং বড় লাটের ভবনে উন্নতাসনে বসিয়া নিরামিষ ভোজন করেন, তিনিই আবার দীন দুঃখী কাঙ্গালদের সঙ্গে পথে পথে দ্বারে দ্বারে নাচেন, গীত গান, খালিপায়ে ঘুরিয়া বেড়ান। এক স্থানে বলিয়াছেন ;—"হরিভক্তি এবং বিশ্বাসের তেজ যতই বাড়িল, মনে হইল, ধর্ম্মরাজ্যে এমন দল নাই, যাহাকে ভয় করিতে পারি। ঈশ্বরপ্রসাদে জীবনের প্রাতঃকালেই বুঝিলাম, মানুষ অসার। এই মস্তক সাহসে উত্থিত হইয়া ঈশ্বরের নাম কীর্ত্তন করে, কিন্তু ইহাই আবার সামান্য সামান্য মানুষের কাছে নত হইয়া থাকে।" একেশ্বরবাদ-ধর্ম্ম পৃথিবীতে তিষ্ঠিতে পারে না, ভারতের এবং ইংলণ্ড ও আমেরিকার একেশ্বরবাদীরা ভগ্নমনোরথ হইয়া শেষে শুষ্ক কাষ্ঠ পাষাণের মত হইয়া যায়, এরূপ সংস্কার এখনও অত্যন্ত বলবৎ। বাস্তবিকও ইহা এক কঠিন সমস্যা। যাহাতে কোন প্রকার বাহ্যাবলম্বন নাই, তাহা কিসের বলে রক্ষা পাইবে? দৈহিক পরিশ্রমে, বুদ্ধি বিচারে, অর্থব্যয় এবং বচনে অনেক উৎসাহ আড়ম্বর কিছু দিন দেখান যাইতে পারে। কিন্তু শুষ্ক নিরাকারবাদীর প্রাণের সম্বল কি? সমাজে নাচিয়া গাইয়া বকিয়া ঝগড়া করিয়া, শেষে বাড়ী আসিয়া যদি চক্ষে আঁধার দেখিতে

হয়, তবে উপায় কি ? •কিন্তু আমাদের কেশব এ সম্বন্ধে বড়ই চাতুরী খেলিয়াছিলেন। বাহ্যাবলম্বনে উদ্দীপনের ভ্রান্তি কুসংস্কার ছাড়িয়া দিয়া তাহা দ্বারা ভক্তি চরিতার্থ করিতেন, আবার বাহ্য উপায় অবলম্বন ছাড়িয়া দিয়া, শেষ নিরবলম্ব যোগে মগ্ন হইয়া, চিদানন্দসাগরে প্রেমানন্দের লীলালহরী দেখিতেন। লীলা হইতে নিত্যে, আবার নিত্য হইতে লীলাভূমিতে তিনি যাতায়াত করিতেন। দশাপ্রাপ্তি হইলে, বা জ্ঞান চৈতন্য হারাইলে যে ভক্তির পরাকাষ্ঠা হয়, সে বিশ্বাস তাঁহার ছিল না। কোথায় তাল কাটে, রস ভঙ্গ হয়, তাহা সহজে ধরিয়া ফেলিতেন। ব্যাকরণ, বিজ্ঞান, ন্যায় যুক্তি এবং মত ও ভাবের ভুল দোষ ধরিতে এমন ওস্তাদ্ আর আমরা দেখি নাই। পীড়িতাবস্থায় সমাধিমগ্ন চিত্তে যে সকল হাস্য ক্রন্দন বাক্যালাপ করিতেন, তাহাতে অর্থশূন্য কথা কিছু থাকিত না।

ক্রমে ক্রমে ভক্তিভাবের এমনি একটি জমাট করিয়া তুলিয়াছিলেন যে, তাহার ভিতরে ক্ষণকাল থাকিলে মত্ততা জন্মিত। যে কোন ধর্ম্মের ভক্ত হউন, কেশবসহবাসে তিনি আকৃষ্ট হইবেনই হইবেন। নতুবা কেমনে প্রতিদিন তিন চারি ঘণ্টা, উৎসবাদিতে সমস্ত দিন শত শত নরনারী উপদেশ সঙ্গীত শুনিত, কিছু মাত্র কষ্ট অনুভব করিত না। এ কি সামান্য শিক্ষা ? ধ্যানের সময় পিন্ পড়িলে শব্দ শুনা যায়, এমন নিস্তব্ধতা। শ্রোতৃমণ্ডলীর রোদন, নৃত্য,

কীর্ত্তন, ধ্যান, শ্রবণ মনন কি এক অভূতপূর্ব্ব দৃশ্যই ছিল। দীর্ঘ উপাসনায় এরূপ সম্ভোগ এবং অভ্যাস কেশবেরই দৃষ্টান্তে হইয়াছে।

কেশবচন্দ্রের প্রতিষ্ঠিত প্রচারকদল, ব্রাহ্মপরিবার, বিদ্যালয়, সংবাদপত্র, উপাসনামন্দির, দেবালয় প্রভৃতি কীর্ত্তি সমুদায় যদি নির্জ্জীব হইয়া যায়, কিংবা একবারেই বিলুপ্ত হয়, তথাপি পার্কার নিউমান চ্যানিং ভয়সির পরিশ্রমের ন্যায় তাঁহার যত্ন নিষ্ফল হইবার নহে। যে ভক্তির ব্রাহ্মধর্ম্ম তিনি হৃদয়ে হৃদয়ে সংক্রামিত করিয়া গিয়াছেন, তাহা হিন্দুজাতির শোণিতের সহিত চিরকাল মিশ্রিত থাকিবে। ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের প্রচারিত ভক্তিরসের সঙ্গীত সঙ্কীর্ত্তন উপদেশ তাহার চিরসাক্ষী হইয়া রহিল। জ্ঞানী মুর্খ নরনারীর হৃদয়পিপাসা যাহাতে নিবারিত হয়, তাহার উপায় তিনি দেখাইয়া গিয়াছেন। নির্গুণ ব্রহ্মের লীলারস পান করিয়া এখন লোকে তৃপ্ত হইতেছে। সরস উপাসনা উৎসব সংকীর্ত্তন যোগ বৈরাগ্য ভক্তি সাধনের সঙ্গে তাঁহার নাম মিশিয়া গিয়াছে। এই ভক্তিপ্রভাব কেবল ব্রাহ্মদলের মধ্যেই বদ্ধ নহে। অন্যধর্ম্মাবলম্বী ভক্তিপিপাসু যে সকল ব্যক্তি গুপ্ত ভাবে নানা স্থানে অবস্থিতি করিতেছেন, যাঁহাদের সহিত কেশবচন্দ্রের পরিচয় ছিল না, ভিতরে ভিতরে তাঁহারাও তাঁহাকে ভক্তি করেন।

এই ভক্তিপ্রভাবে তাঁহার উপাসনা শেষে এত মিষ্ট হইয়াছিল

যে, তাহা শ্রবণে কত লোক মুগ্ধ হইয়া যাইত। প্রত্যেক সাম্বৎসরিক উৎসবের সময়, প্রাত্যহিক উপাসনায়, অত্যন্ত আমোদ বোধ হইত। যাত্রা জমিয়া গেলে যেমন কাণে স্থর লাগিয়া থাকে, কেশবের উপাসনা-সভায় তেমনি জমাট বাঁধিয়া যাইত। তাহার সঙ্গে আবার সঙ্গীত সঙ্কীর্ত্তনের যোগ। দেবমূর্ত্তিপ্রিয় স্ত্রী জাতি এবং অজ্ঞ পুরুষেরাও ইহা শ্রবণে তৃপ্তি লাভ করিয়াছে। উপাসনা প্রার্থনা বক্তৃতায় তিনি কত কত জ্ঞানী সভ্যকে কাঁদাইয়া দিয়াছেন। যে সময়ে তিনি জন্মিয়াছিলেন, এবং যে ছিদ্রান্বেষী ছলদর্শী লোকসমাজে সর্ব্বদা বাস করিতেন, তাহাতে নিত্য নূতন নূতন ভাব যোগাইতে না পারিলে তাঁহার পক্ষে কাজ করা অত্যন্ত কঠিন হইত। উপযুক্ত এবং চতুর শিক্ষক ভিন্ন যেমন নাগরিক ছাত্রদলকে বশে রাখিতে পারে না, ব্রাহ্মসমাজের নূতনতাপ্রিয় বিচারনিপুণ দোষদর্শী সভ্যদিগকে তেমনি কেশব ভিন্ন কেহ চালাইতে সক্ষম হয় না। ভগবান্ তাঁহার ভিতর দিয়া এমন এক উৎস খুলিয়া দিয়াছিলেন যে, তাহার আর বিরাম ছিল না। পুরাতন ভাব, পুরাতন উপদেশ এক দিনও কেহ সহ্য করিতে চাহিত না। উপাসনা বক্তৃতা প্রার্থনা ধর্ম্মপ্রসঙ্গ বিষয়ে যে উচ্চ রুচির সৃষ্টি তিনি করিয়া গিয়াছেন, তাহাতে আর যে কেহ এ আসরে ভাব ভক্তির জমাট করিবেন, সে আশা বড় নাই। বরং প্রত্যেকে আপনি উপাসনা করিবে, তথাপি হৃদয়ের সহিত অন্য কাহারো উপাসনায় যোগ দিবে না।

প্রধান আচার্য্য মহাশয় উপাসনার প্রথম বিদ্যালয় স্থাপন করেন। ছাত্রদিগের সেখানে বেদান্তশাস্ত্র শিক্ষা এবং মুদ্রিত নয়নে বসিয়া ক্ষণকাল ব্রহ্মের মহিমা এবং প্রেম করুণা সম্ভোগ করিবার কিছু কিছু অভ্যাস জন্মিয়াছিল। তদনন্তর বিদ্যাবিশারদ কেশবচন্দ্র এক উচ্চ শ্রেণীর কলেজ খুলিয়া তাহাতে বেদ পুরাণের সামঞ্জস্য, যোগ ভক্তি জ্ঞান কর্ম্মের মিলন, বৈরাগ্য প্রার্থনা, পারিবারিক ধর্ম্ম শিক্ষা দিলেন। এখানকার উচ্চ শিক্ষাপ্রাপ্ত কতিপয় ছাত্র এক্ষণে ব্রাহ্মসমাজের মুখ উজ্জ্বল করিতেছে। দুই ঘণ্টাকাল একাসনে নিস্তব্ধ ভাবে বসিয়া, তাহারা নিরাকার চিন্ময় ব্রহ্মের উপাসনায় শান্তি অনুভব করিতেছে, ইহা বর্ত্তমান হিন্দুসমাজের পরম গৌরবের বিষয়, সন্দেহ নাই।

উপাসনায় যেমন তিনি ব্রহ্মানন্দ সম্ভোগ করিয়া মত্ত হইতেন, পৃথিবীর অতুল ঐশ্বর্য্যশালী ব্যক্তিও সেরূপ মত্ত হইতে পারে না। তাঁহার মত কথা অনেকে বলেন, বাহিরে নানা হাব ভাব দেখান, কিন্তু ব্রহ্মানন্দ কেশব উপাসনার সময় যে কোন্ গভীর স্থানে ডুবিতেন, তাহার কেহ অনুসন্ধান পাইত না। চিদানন্দসমুদ্রে ডুবিয়া ডুবিয়া যেন তিনি প্রেম পুণ্যের জ্ঞান ভক্তির বিচিত্র রত্নরাজী উদ্ধার করিতেন। "পান কর আর দান কর" এই তাঁহার মন্ত্র ছিল। পানেও যেমন উৎসাহ অনুরাগ, দানেও তদধিক। যত বলিতেন, লিখিতেন, ততই আরো ভাবস্রোত খুলিয়া যাইত। তাঁহার প্রচারিত "আশ্চর্য্য

গণিত” শাস্ত্রের যদি কিছু গভ্য অর্থ থাকে, তবে তাহা এই খানে সংলগ্ন হইতে পারে। বাস্তবিক তাঁহার ভক্তিবিভাগের হিসাব দেখিলে মনে হয়, “অল্প হইতে বহু বাদ দিলে অনেক বাকী থাকে।” উদ্বেলিত সিন্ধুবক্ষ যেমন তর্জ্জন গর্জ্জন করে, কেশবহৃদয়ের ভক্তিসিন্ধু তেমনি বেগবান্ হইয়া উঠিত। কত কাজ করিব, কত উপদেশ দিব, কত প্রবন্ধ লিখিব, ইহা ভাবিয়া তিনি আর কূল কিনারা পাইতেন না।

নববৃন্দাবন নাট্যাভিনয়ের সঙ্গে সঙ্গে নবনৃত্য আরম্ভ হয়। কোন কার্য্যকে তিনি বিশৃঙ্খল অবস্থায় রাখিতে চাহিতেন না। মত্ততা এবং বিজ্ঞানের মিলন তাঁহার চরিত্রে বর্ত্তমান ছিল। এই জন্য প্রণালীপূর্ব্বক নৃত্য যাহাতে হয়, তাহার ব্যবস্থা করিলেন। ১৮০৪ শকের ভাদ্রোৎসবের দিবস প্রথমে ব্রহ্ম-মন্দিরে নবনৃত্য হইয়াছিল। বৃত্তাকারে তিন দল লোক পর্য্যায়-ক্রমে দাঁড়াইলেন। কেন্দ্রস্থলে একটি বালক নববিধানপতাকা ধরিয়া রহিল। তাহার চারি পাশে বালকবৃন্দ, তাহাদিগকে ঘেরিয়া যুবক দল, সকলকে বেষ্টন করিয়া অধিকবয়স্ক ভক্তদল চক্রাকারে নাচিতে লাগিলেন। কখন ধীরে, কখন বেগে, কখন হেলিয়া দুলিয়া, কখন বা মত্ত মাতঙ্গবৎ ;—নানা অঙ্গভঙ্গী ও ভাবরসসহকারে নবনৃত্যের গান গাইতে গাইতে বালক বৃদ্ধ যুবা নৃত্য করিলেন। ভক্তবৃন্দ এইরূপে ঘুরিয়া ঘুরিয়া যখন নাচিতেন, তখন কেশবচন্দ্র কি করিতেন ? তিনি বন্ধুগণের গলা ধরিয়া, কখন বা দুই বাহু তুলিয়া মহানন্দে ঢলিয়া ঢলিয়া

নাচিতেন। নৃত্যকালে ভাই অমৃতলাল আচার্য্যপদে নূপুর এবং হস্তে সুবর্ণ বলয় পরাইয়া দিতেন। এই সমস্ত আমোদ উল্লাস রঙ্গরস বিলাস মত্ততা দেখিয়া মনে হইত, যেন আবার আমাদের সেই প্রেমিক চৈতন্যের দল ফিরিয়া আসিয়াছে। যেখানে হরিসঙ্কীর্ত্তন, প্রেমোন্মত্ততা, ভক্তির বিলাস, সেই খানে নদিয়ার গোরা থাকিবেন, ইহা তিনি বলিয়া গিয়াছিলেন। আমরা কি তবে তাঁহাকে এই ভক্তদলের মধ্যে না দেখিয়া থাকিতে পারি ? নববৃন্দাবনে নবনৃত্যে কেবল গৌরাঙ্গ কেন, ভগবান্ আপনার ভক্তপরিবার লইয়া স্বয়ং অবতীর্ণ হইতেন। সে স্বর্গীয় অনুপম শোভা কি আর চক্ষু হইতে কখন অন্তরিত হইবে ?

সদাচারনিষ্ঠা

একদিকে কেশবচন্দ্র ঊনবিংশ শতাব্দীর সভ্য ভদ্রলোক ; আধুনিক সভ্যতার মধ্যে যাহা কিছু সার আছে তাহা তিনি গ্রহণ করিতেন, আহার পান আমোদ ব্যবহার বিষয়ে কোন কুসংস্কার ছিল না, অপর দিকে তিনি সেকেলে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের মত চলিতেন। পরিশুদ্ধ নিরামিষ ভোজন ভাল বাসিতেন। আদা ছোলাভিজে জলখাবার, কলার পাতে ভাত, মাটীর ভাঁড়ে জল, ব্যঞ্জনের মধ্যে শাক, আদামিশ্রিত বেগুনপোড়া, ডালবাটা ও মোচা ভাতে, চড়চড়ি, মটরডালের বড়া বিশেষ প্রিয় ছিল। পুষ্টিকারক খাদ্যের মধ্যে সচরাচর দুই সের দুগ্ধ

পান করিতেন। মিষ্টান্ন পক্কান্ন লুচি ইতিপূর্ব্বে প্রতিদিন জল খাইতেন, কিন্তু শেষ সময়ে ফল আর মুড়ি ছোলাভাজা জনারপোড়ার প্রতি অনুরাগ প্রকাশ করিতেন। ইদানীং প্রায় প্রতিদিন ছোলাভাজা জলখাবার বন্দোবস্ত ছিল। গুরু-পক্ক দুষ্পাচ্য ভোগ্য বস্তুর স্পৃহা রাখিতেন না। উৎকৃষ্ট সামগ্রী অল্প পরিমাণে খাইতেন। ভগবান্‌কে স্মরণ করিয়া আহারের প্রথা তাঁহা হইতেই ব্রাহ্মদলে প্রচলিত হইয়াছে। ঋতুবিশেষে নূতন ফল বা সামগ্রীবিশেষ কৃতজ্ঞতার সহিত আহার ও ব্যবহার করিতেন। আহার্য্য পদার্থ সমূহে ভক্ত-শোণিত বৃদ্ধি হয়, তদুৎপন্ন স্বাস্থ্যে পুণ্য বাড়ে, এই বিশ্বাসে তাহাদিগকে সাধুচরিতের প্রতিরূপ জানিয়া ভোজন করিতেন। অন্ন জলে হরির আবির্ভাব উপলব্ধি করিতেন। প্রতিদিনের স্নান তাঁহার জলসংস্কার মনে হইত। পিতা পুত্র পবিত্রাত্মার নামে জল মাথায় দিতেন। প্রত্যেক সামান্য সামান্য কার্য্যের সঙ্গে পবিত্র ভাবের যোগ। সেই ভাবযোগ সহচরবৃন্দের ধর্ম্মজীবনেও অল্পাধিক সংক্রামিত হইয়াছে। অপরের ভোজ্য বা পানপাত্রে আহার পান করিতে চাহিতেন না। নিরামিষ ভোজনের দৃষ্টান্তে দেশে সাত্ত্বিক আচার ব্যবহার প্রচলিত হইবে, মদ্য মাংসের প্রতি আসক্তি কমিয়া যাইবে, এই বিশ্বাস ছিল। বহু পরিমাণে নিজদলের মধ্যে তিনি তদ্বিষয়ে কৃত-কার্য্যও হইয়াছিলেন। কেশবচন্দ্র ইদানীং প্রায় বলিতেন, "এমন একটি কোন খাদ্য পাওয়া যায় যে, তাহা এক সঙ্গে

মিশাইয়া গলায় ঢালিয়া নিশ্চিন্ত হই। পাঁচটা স্বতন্ত্র দ্রব্য আর খাইতে ভাল লাগে না।” নববিধানের মত একটী অখণ্ড খাদ্য বস্তু যেন ইচ্ছা করিতেন।

পরিচ্ছদ সম্বন্ধেও অতি বিশুদ্ধ রুচি ছিল। যৌবনের প্রারম্ভেই শাদা ধুতির ব্যবহার আরম্ভ করেন। কটুকে জুতা এবং খড়ম, হাতকাটা বেনিয়ান, লক্ষ্ণৌছিটের বালাপোষ, দিল্লীর ছদ্‌রি, কাণঢাকা টুপি, এই সকল ব্যবহার করিতে ভাল বাসিতেন। ভদ্র পোষাকের মধ্যে কাল বনাতের চোগা চাপকান্ ছিল। মূল্যবান্ ধাতুর মধ্যে কেবল চক্ষে সোণার চস্‌মা। এক খানি চস্‌মাতেই জীবন কাটিয়া গিয়াছে। বিলাতের কোন এক বিবি আর এক খানি দিয়াছিলেন, তাহা ব্যবহার করিতে হয় নাই। আহার বিষয়ে যেমন পরিষ্কার সহজ অথচ পুষ্টিকর দ্রব্য ইচ্ছা করিতেন, পরিচ্ছদ সম্বন্ধেও তেমনি পরিষ্কার অথচ সুলভ মূল্যের সামগ্রীর প্রশংসা করিতেন। অপরের ব্যবহৃত কোন বস্ত্রাদি ব্যবহার করিতে চাহিতেন না। বিলাস-সামগ্রীর মধ্যে ফুলেলতৈল মাখিতেন, তাহাও পরে ছাড়িয়া দেন। মস্তকের কেশ তাঁহার কখন কেহ বিশৃঙ্খল দেখে নাই। এক নূতনবিধ কেশবিন্যাস-পদ্ধতি ছিল, তাহাতে বিলাসিতার দুর্গন্ধও থাকিত না, অথচ অভদ্রতা শ্রীহীনতাও প্রকাশ পাইত না। মিস্ কারপেণ্টার একবার বিরক্ত হইয়া বলেন, “মিষ্টার সেন, এ তোমার কিরূপ সৃষ্টিছাড়া কেশবিন্যাস?” যেরূপই হউক, তাহা একই ভাবে চিরদিন ছিল। অত্যন্ত রোগের সময়েও তাহা দেখা

গিয়াছে। আহার পরিচ্ছদ সম্বন্ধে নব্য শিক্ষিত দলের মধ্যে যে সকল ম্লেচ্ছ রীতি, বৈদেশিক রুচির প্রাদুর্ভাব দৃষ্টিগোচর হয়, কেশব নিজ ব্যবহার দ্বারা তাহা এইরূপে প্রতিবাদ করিয়াছেন এবং একটি নূতন স্রোত খুলিয়া দিয়াছেন। ব্রহ্মজ্ঞানীরা মদ্যপায়ী, মাংসাশী, যথেচ্ছাচারী, যার তার সঙ্গে খায়, এই যে এক প্রাচীন সংস্কার হিন্দুদিগের মনে বদ্ধমূল ছিল, তাহা কেশবচন্দ্র বহু পরিমাণে উন্মূলিত করিয়াছেন। এমন কি, তাঁহার আচার নিয়ম হিন্দু এবং বৈষ্ণবদিগকেও লজ্জা দিয়াছে। সত্বগুণাবলম্বী ঋষির ন্যায় তাঁহার আচরণ ছিল। সঙ্গত-সভার আলোচনা সকল তদীয় নৈতিক বিশুদ্ধতার সাক্ষী হইয়া রহিয়াছে।

বিনয়

কেশবচন্দ্রের বাহিরের ব্যবহারে কোনরূপ বিনয়ের চিহ্ন সহসা দেখা যাইত না। এজন্য অভিমানী আত্ম-গৌরবান্বিত বলিয়া অনেকে তাঁহাকে নিন্দা করিত। বাস্তবিক শিষ্টাচার ভদ্রতা বিষয়ে তেমন বিশেষ কিছু তাঁহার নিয়ম ছিল না। নতশির হইয়া প্রায় আমরা তাঁহাকে কাহারো নিকট কখন প্রণাম করিতে দেখি নাই। কেহ তাঁহার পাদস্পর্শ করে, ইহাও তিনি চাহিতেন না। আমি নরাধম পাপী চণ্ডাল নরকের কীট, এরূপ মৌখিক বিনয়-বাক্য আমরা তাঁহার মুখে কখন শুনি নাই। তাদৃশ কপট বিনয়-ব্যবহার মনুষ্যকে বাস্তবিকই পাপী করিয়া ফেলে, এই তাঁহার বিশ্বাস ছিল। যেখানে ঈশ্বরের কার্য্য, ভগবানের আদেশ,

সেখানে কেশব সিংহের ন্যায় পরাক্রমশালী। লৌকিক বিনয়-ব্যবহার দ্বারা ঈশ্বরের মহিমা, ঐশী শক্তির অবমাননা কখনই তিনি করিতে চাহিতেন না। জীবনের যে অংশে ভগবানের আধিপত্য, সেখানে প্রভুত্ব এবং মহত্ত্বের অগ্নি জ্বলিত। কিন্তু মানবীয় অংশে আপনাকে তিনি তৃণের ন্যায় হীন বলিয়া জানিতেন। যেখানে আমিত্ব নাই, সেখানে বিশ্বপতির স্বামিত্ব; আর যেখানে কিঞ্চিৎ 'আমিত্বের ভাব, সেখানে তিনি বিনয়ী। তেজীয়ান্ সাধু হইয়াও মানবের দেবভাবের নিকট চিরদিন নতশির ছিলেন। ভাল নূতন সঙ্গীত যখন শুনিতেন, তখন কৃতজ্ঞ অন্তরে গায়কের পদে অবনতমস্তকে প্রণাম করিতেন। বস্তুতঃ তিনি ভগবানের দাস ও সয়তানের প্রভু ছিলেন। তাঁহার জীবনে বিনয় ও মহত্ত্বের সুন্দর সামঞ্জস্য দৃষ্ট হইত।

পাপ সম্বন্ধে তাঁহার মত এবং বোধশক্তি বড় পরিষ্কার ছিল। পাপ বলিয়া কোন সামগ্রী বিধাতার সৃষ্টিতে নাই। মনুষ্যের কোন অঙ্গ বা প্রবৃত্তি, বাহ্য কোন পদার্থ পাপ নামে অভিহিত হইতে পারে না। পাপ একটী দুর্ব্বলতা, অর্থাৎ অভাবাত্মক শব্দ। শূন্য অন্ধকার যেমন কোন পদার্থ নহে, জ্যোতি এবং পদার্থের অভাব মাত্র; পাপও তেমনি অভাব পদার্থ। কোন কার্য্যও পাপ নহে। অভিপ্রায় চিন্তা কল্পনা সঙ্কল্প বিশুদ্ধ হইলে পাপ থাকে না। পাপের মূল ভিতরে। তাহা থাকিতে সাধু হওয়া যায় না। যখন ইচ্ছা প্রবৃত্তি চিন্তা সমস্ত ঈশ্বরাদিষ্ট পথে চলিতে আরম্ভ করে, তখন পুরাতন নূতন পাপ সমস্তই চলিয়া

যায়। বর্ত্তমানে পাপাচার যদি বন্ধ হয়, তাহা হইলে ভূতকালের পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয়। পাপবাসনা সম্বন্ধে তিনি আপনাকে বঞ্চক, নরঘাতী, ইন্দ্রিয়াসক্ত, মৎসর প্রভৃতি সমস্ত জঘন্য নামে অভিহিত করিতেন। ভগবৎ উক্তিতে পর্য্যন্ত এ কথা ব্যক্ত করিয়াছেন। প্রচারকগণ তাঁহা অপেক্ষা পবিত্র-চরিত্র সাধু, এ কথাও বলিয়াছেন। পুণ্যের আদর্শ অতিশয় উচ্চ থাকাতে পাপবোধও অত্যন্ত প্রখর ছিল। তজ্জন্য পাপের সম্ভাবনাকেও তিনি সামান্য দৃষ্টিতে দেখিতেন না। জীবনবেদে উক্ত হইয়াছে, "গণনা যদি করি, এ জীবনে কত পাপ করিয়াছি! এই চুয়াল্লিশ বৎসরে দশ লক্ষ পাপ করিয়াছি বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। মনে পাপবোধ এত ভয়ানক যে, ছোট ছোট পাপও ধাঁ করিয়া মন ধরিয়া ফেলে। সেই পাপবোধ কষ্ট দেয়। যেন মাকড়সার প্রকাণ্ড জালে কোথাও মাছি পড়িলেই মাকড়সা অনুভব করিয়া অমনি ধরিতে পারে, তেমনি আধ্যাত্মিক স্নায়ু। অধিক কি বলিব, এমন কর্ম্ম নাই যাহা করিতে পারি না। আর এই জন্যই আজ পর্য্যন্ত আমাকে কেহ পাপী বলিয়া লজ্জিত করিতে পারে নাই। আমার জাগ্রত নরক জাগ্রত স্বর্গের কারণ। ঘড়ির কাঁটা বার বার বাজে, আর বার বার কে বলে, 'তোর কিছু হয় নাই।' আশ্চর্য্য এই, আমি কাঁদি আবার হাসি।"

কেশবচন্দ্র এত বড় মহৎ ব্যক্তি হইয়াও পৃথিবীর ধনী জ্ঞানী মানী এবং গুণীদিগের নিকট দাঁড়াইতে কুণ্ঠিত হইতেন। তাঁহা-দিগের সভায় এক পার্শ্বে স্থান অন্বেষণ করিতেন। ছাদখোলা

জুড়িগাড়ী চড়িয়া প্রকাশ্য পথে চলিতে, কিংবা সম্ভ্রান্ত লোকদিগের মধ্যস্থলে বসিতে চাহিতেন না। কিন্তু বড় লোকেরা তাঁহাকে খুঁজিয়া বাহির করিত। এবম্প্রকারে সম্মান পাইলে তিনিও তাহা ঈশ্বরদত্ত বিশ্বাস করিয়া কৃতজ্ঞ এবং বিগলিতচিত্ত হইতেন। পৃথিবীর সর্ব্বোচ্চ শ্রেণীর লোকসমাজে তিনি সম্মান এবং প্রশংসা পাইতেন, কিন্তু তাহাতে হৃদয় তৃপ্ত হইত না। যাঁহাদের সঙ্গে ধর্ম্মের যোগ নাই, তাঁহাদের সহবাস ভয়ঙ্কর মনে হইত। সেখানে একাকী ভয় পাইতেন। এদিকে বড় লাজুক ছিলেন। এক স্থানে বলিয়াছেন, "ঈদৃশ স্থলে কেবল মনে হয়, কখন সভা শেষ হইবে, কখন গরিব বন্ধুদের কাছে যাইব, কখন আপনার পরিচিত দলে গিয়া মিশিব, কখন নিজগৃহে যাইয়া স্বভাবের স্বচ্ছন্দতা ভোগ করিতে পাইব।"

সমস্ত প্রশংসা গৌরব তুচ্ছ করিয়া গরিব ভাইদের সঙ্গে মিশিতেন। কিন্তু ঈশ্বরদত্ত পদগৌরবের এবং সমাজের উন্নতির সামান্য সংবাদও অপ্রকাশ রাখিতেন না। উহা দেখিয়া লোকে বিরক্ত হইত, আত্মশ্লাঘা মনে করিত, তথাপি তিনি ক্ষান্ত হইতেন না। আপনার সাধুতা নিঃস্বার্থতার উপর অন্যের অপেক্ষা অধিক গুরুত্ব স্থাপন করিতেন। এই কারণেই লোকে তাঁহাকে আত্মাভিমানী বলিত। জীবনের যে অংশ ব্রহ্মের সঙ্গে এক, তাহার উপর তাঁহার অটল বিশ্বাস ভক্তি ছিল। অথচ সাধু মহাজনদিগের একান্ত দাস বলিয়া তিনি আপনাকে মনে করিতেন। একদা কোন

বন্ধুর গৃহে গমন করিয়া দেখিলেন, তাঁহার ঘরের দেওয়ালে খ্রীষ্টের উপরিভাগে কেশবের অর্দ্ধ মূর্ত্তি স্থাপিত রহিয়াছে। তৎক্ষণাৎ আপনার উপরিভাগে খ্রীষ্টের ছবিখানি টাঙ্গাইয়া দিলেন। ভারতাশ্রমে ভোজনকালীন এক দিন কোন অনুগত বন্ধুকে বলিলেন, প্রতি জনের পাত্র হইতে কিছু কিছু উচ্ছিষ্টান্ন লইয়া আইস। অন্ন আনীত হইলে তাহা ভক্তির সহিত ভক্ষণ করিলেন।

ক্ষমা ও ঔদার্য্য

মনুষ্য ক্ষমা করিতে পারে না, কেবল ঈশ্বরই তাহা পারেন, ভগবানের যাহারা শত্রু তাহারা ক্ষমা পাইবার যোগ্য নহে, এই তাঁহার বিশ্বাস ছিল। ভদ্রতার ক্ষমাপ্রার্থনা তিনি গ্রাহ্যই করিতেন না। যে পাপে প্রশ্রয় দেয়, ঈশ্বরাদেশ ভঙ্গ করে, তাহার সম্বন্ধে মহোম্মদরূপ ধারণ করিতেন এবং আপনার শত্রুকে ক্ষমা করিয়া তিনি ঈশ্বরের শত্রুর উপর আক্রমণ করিতেন।

কোন সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্ম একবার তাঁহাকে অতিক্রম করিয়া কয়েক জন প্রচারক দ্বারা স্ত্রীর আদ্য-শ্রাদ্ধ সম্পাদন করেন। কেশব সেন বড় লোক, আধিপত্যাভিলাষী, এই সংস্কারে তিনি তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করেন নাই। কিন্তু যখন তিনি বিনা-নিমন্ত্রণে ক্রিয়াস্থানে গিয়া উপস্থিত হইলেন, তখন গৃহস্বামীর মন গলিয়া গেল। যাঁহাকে তিনি বড় অভিমানী জ্ঞান করিতেন, তিনি বিনা আহ্বানে দ্বারে আসিয়া দণ্ডায়মান।

কয়েক দিন পরে ক্রিয়াকর্ত্তা কলুটোলার ভবনে আসিয়া বলিলেন, “আমি এক জন অপরাধীর স্থায় এখানে আসিলাম।” তখন উভয়েরই হৃদয়ে স্বর্গ অবতীর্ণ হইল।

আর এক জন ব্রাহ্ম ভারতাশ্রম এবং বিদ্যালয়-সংক্রান্ত আন্দোলনে নানা প্রকারে কেশবের কুৎসা ঘোষণা করেন। এতদূর শত্রুতা তিনি করিয়াছিলেন যে, কোন কালে আর বুঝি মিলন হইবে না, এরূপ মনে হইয়াছিল। কয়েক বৎসর পরে আন্দোলন ফুরাইয়া গেল; তখন তিনি দারিদ্র্যকষ্টে অতিশয় ক্লেশ পাইতে লাগিলেন। কিছু দিনান্তে শেষ কেশবচন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। এই রূপে মাঝে মাঝে দেখা করিয়া কিছু কিছু সাহায্য লইয়া যাইতেন। তাঁহার স্ত্রী পুত্রের দুরবস্থার কথা শুনিয়া কেশবচন্দ্র একবার বস্ত্র এবং খাদ্য সামগ্রী দ্বারা তত্ত্ব করেন।

একবার বাড়ীর এক জন চাকর চুরি করিয়া ধরা পড়ে। সকলে তাহাকে তিরস্কার এবং শাসন করিতে লাগিল। কেশবচন্দ্র তাহাকে পারিবারিক উপাসনাগৃহে লইয়া গিয়া তাহার হস্তে ফুল দিয়া তাহার সঙ্গে জানু পাতিয়া প্রার্থনা করিলেন। তদনন্তর তাহাকে প্রেমে পরাস্ত করিয়া আবার তাহাকে কার্য্যে নিযুক্ত করেন। এইরূপ তাঁহার ক্ষমার শাসন ছিল। আর একবার তাঁহার সহধর্ম্মিণী নিজের কোন এক শিশু সন্তানকে প্রহার করেন। কেশবচন্দ্র তদ্বিষয় উল্লেখ করিয়া এক খণ্ড কাগজে অনুতাপসূচক একটী প্রার্থনা লিখিয়া তাঁহার নিকট পাঠাইয়া দেন।

শেষাবস্থায় তাঁহার উদার ব্যবহারে হিন্দু খ্রীষ্টীয়ান ব্রাহ্ম সকলেই সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। নরপূজা এবং অন্যান্য আন্দোলনে যে সকল ব্রাহ্ম যোগ দিয়াছিলেন, কিছু দিন পরে তাঁহারাও পুনরায় কেশবচন্দ্রের প্রসন্নতা প্রাপ্ত হন। কেহ দল ছাড়িয়া গেলেও তাঁহাকে তিনি ছাড়িতেন না। নানা প্রকারে তাঁহাকে আকর্ষণ করিতেন। দলত্যাগী প্রচারক বিজয়কৃষ্ণ এবং যদুনাথকে তিনি চিরদিন আপনার বলিয়া বিশ্বাস করিতেন।

সংবাদপত্রের সম্পাদকগণ তাঁহাকে বড় গালাগালি দিত। হিন্দু খ্রীষ্টীয়ান ব্রাহ্ম কেহই এ বিষয়ে কোন দিন দয়া প্রকাশ করে নাই। কেশব সেনকে গালাগালি দিলে গ্রাহক-সংখ্যার বৃদ্ধি হয়, ইহাও অনেকের সংস্কার ছিল। নিতান্ত নীচভাবে যাহারা নিন্দা করিত, তাহার সংবাদ তিনি লইতেন না; কিন্তু যুক্তিযুক্ত ভদ্র গোছের সমালোচনা এবং নিন্দা উপহাসের প্রবন্ধগুলি সময়ে সময়ে নিজের কাগজে তিনি উদ্ধৃত করিয়া দিতেন। ইহাতে নিন্দাকারীরাও অবাক্ হইত। এই তাঁহার উপদেশ, "সহস্র মতভেদ বিবাদ হইলেও এক ঘরে বাস করিতে হইবে।" কিন্তু নববিধান-প্রতিবাদকারীদিগকে তিনি কিছুতেই ক্ষমা করিতে চাহিতেন না। তাহার কারণ আমরা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। অন্য সম্প্রদায়ের লোক শত্রুতা করিলেও তাঁহাদিগের সহিত তিনি মিলনের চেষ্টা পাইতেন।

কেশবচন্দ্রের কোন কোন অনুগত সহচর একবার গুরুতর অপরাধে দোষী বলিয়া সাব্যস্ত হন। দোষীকে দণ্ড দিয়া কিরূপে আবার তাহাকে ভাল বাসিতে হয়, তাহা তিনি বেশ জানিতেন। তাঁহার উদার দয়া না থাকিলে উক্ত অপরাধী বন্ধু ব্যক্তিরা একবারেই দলচ্যুত হইয়া পড়িতেন সন্দেহ নাই। দোষীদিগের কষ্টভোগ যথেষ্ট হইল, কিন্তু কেশবের প্রেমের প্রসাদে তাঁহারা বঞ্চিত ছিলেন না। কেবল তাঁহারই স্বর্গীয় আকর্ষণে তাঁহারা দলের মধ্যে রহিয়া গেলেন, নতুবা নির্দ্দয় কঠোর শাসনে তাঁহাদের মন ভাঙ্গিয়া যাইত।

কবিত্ব

কেশব গম্ভীরস্বভাব বিজ্ঞ যোগী বৈরাগী, অথচ আবার বালকবৎ ক্রীড়াশীল, বিচিত্র রসে রসিক। পবিত্রতা নীতি বৈরাগ্য বিষয়ে যেমন কঠোর শাসন, তেমনি আবার স্বাভাবিক ক্রিয়া সকলের উপর অনুরাগ। পৃথিবীর ধর্ম্মসম্প্রদায় সকল ঈশ্বরপ্রতিষ্ঠিত স্বাভাবিক নিয়মের বিপরীত পথে গমন করিয়া শেষে মারা পড়িয়াছে। এক সময় যে কঠোর তপস্বী, অন্য সময়ে সেই আবার ব্যভিচারী বিলাসী পাতকী। যে ধর্ম্মে এইরূপ ব্যভিচার না ঘটে, তাহারই পথে তিনি দণ্ডায়মান ছিলেন। এই জন্য ঘোর দুরাচারী ব্যক্তিকেও পতিত বলিয়া তিনি বিশ্বাস করিতেন না। মনুষ্যের পক্ষে যাহা চির

অসুখকর, বিরক্তিজনক, তদ্বিষয়ে উপদেশ দিতেন না। কারণ, তিনি জানিতেন, যিনি উপাস্য দেবতা, তিনি হাসেন, তিনি নবরসের রসিক হইয়া লীলা খেলা করেন। হরি স্বয়ং সুরসিক, কবিকুলচূড়ামণি। স্বাভাবিক বিরতি বৈরাগ্য মিতাচারিতা সত্ত্বেও কেশব প্রেমিক প্রফুল্লহৃদয় কবি।

কিন্তু একটি সঙ্গীত, কি দশ ছত্র পদ্য রচনা তাঁহার নাই। যেমন তিনি বিস্তৃত বিধি নিষেধের তালিকা না দিয়া ধর্ম্মবন্ধু-দিগকে অবস্থার উপযোগী বিধি সমুদায় সৃজনের উপায় বলিয়া দিতেন, তেমনি কবিত্ব-শক্তি সঞ্চার করিয়া লোকদিগকে কবি করিয়া তুলিতেন। উপাসনা প্রার্থনা বক্তৃতার কালে তাঁহার কবিত্বের স্রোত উন্মুক্ত হইত। কল্পনাশক্তি অতিশয় উর্ব্বরা ছিল। তাহা অসার কল্পনা নহে, সত্যমূলক বিশুদ্ধ ভাবের কল্পনা। ইহার বলে তাঁহার নবীনত্ব চিরদিন বজায় ছিল। প্রকৃত বিশ্বাসের সার সত্যের ভূমিতে দাঁড়াইয়া যে ভাব ভক্তি প্রেমের তরঙ্গে সাঁতার খেলে, তাহার কল্পনা মৃগতৃষ্ণিকার ন্যায় নহে। কেশবচন্দ্রের কবিত্ব-কল্পনা স্বর্গের ছবি আঁকিয়া দেখাইত। তাহাতে মিষ্টতা যথেষ্ট ছিল। তাঁহার জীবনে পদ্য এবং গদ্য উভয় সমান ভাবে বিরাজ করিত। সুগভীর স্থির সমুদ্রের উপরিভাগে যেমন তরঙ্গের লীলালহরী, কেশবচরিত্রের গূঢ় এবং দৃঢ় বিশ্বাসের উপর তেমনি প্রেমের খেলা। কঠোর কর্ত্তব্য, গভীর তত্ত্বচিন্তার সঙ্গেও তাঁহার রসিকতা প্রকাশ পাইয়াছে। একবার গায়ে ভস্ম মাখিয়া বাঘছাল পরিয়া সন্ন্যাসীর

সাজে মঙ্গলপাড়ার ভিতরে আসিয়াছিলেন। সে বেশ দেখিয়া রাজা বলিলেন, "গোসাঞীজী, আমাকে বর দিন।" তিনি উত্তর দিলেন, "বর আর কি দিব, কন্যা দিয়াছি।" পূজার ছুটির সুলভে তিনি কত বার আমোদজনক গল্প এবং ছবি মুদ্রিত করিয়াছেন। বেঙ্গল মেগাজিনে একবার "হনূমান দাস" স্বাক্ষরিত প্রস্তাবে ডারুইনের মত সম্বন্ধে. দিব্য রসিকতা প্রকাশ করিয়াছিলেন। মধ্যে মধ্যে তাঁহার ইংরাজি বক্তৃতায় কাব্যরসের বিলক্ষণ সুরুচি প্রদর্শিত হইত। দেশ বিদেশের সুন্দর সুন্দর গল্প এবং ঘটনা বর্ণন করিয়া লোকদিগকে হাসাইতেন। অনেকের হয়তো সংস্কার থাকিতে পারে, কেশব সেন কেবল চক্ষু বুজিয়া ধ্যানই করিত। তাহা নহে, বিষয়াসক্ত, বিলাসী আমোদপ্রিয় নব্য সভ্যগণ অপেক্ষা তাঁহাতে রসিকতা—বিশুদ্ধ রসিকতা ছিল। সময়ে সময়ে ছোট ছোট ছেলে মেয়েদিগকে সঙ্গে লইয়া খেলাঘর, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাগান প্রস্তুত এবং গল্প করিতেন। তাহাদিগকে খেলনা পুতুল দিতেন। ছোট ছেলেদের সভায় সুরাপাননিবারণ ইত্যাদি বিষয়ে গল্পচ্ছলে যাহা বলিতেন, তাহা শ্রবণে বালক বৃদ্ধ যুবা সকলেই সন্তুষ্ট হইত। সকল অবস্থার নরনারীগণের প্রকৃতির মধ্যে তিনি প্রবেশ করিতে পারিতেন। তাঁহার মুখের বৈজ্ঞানিক কঠোর বিষয় সকলও মধুময় কোমল এবং সরস বোধ হইত। কখন কখন ছবি আঁকিতেন। কোন নকসা ছবির প্রয়োজন হইলে আপনি তাহা অগ্রে আঁকিয়া দিতেন। নাটকের অভিনেতা এবং অভিনেত্রীদিগকে উৎকৃষ্টরূপে সাজাইতে জানিতেন। সময়ে

সময়ে ক্ষুদ্র শিশুদিগের সহিত এমনি আমোদ বিহার করিতেন, যেন তিনিও এক জন শিশু। ছেলেরাও তাঁহার সঙ্গে বেশ আমোদ অনুভব করিত; কিন্তু কেশবচন্দ্রকে ছেলে কোলে লইয়া আদর করিতে প্রায় কেহ দেখে নাই। তরু লতা ফুল ফল নদী পর্ব্বত দর্শনে তাঁহার প্রাণ যেন মাতিয়া উঠিত। কবিত্বের যে অংশ উদ্ভাবন করিতে পারিতেন না, তাহা অনুভব করিতে সক্ষম হইতেন। এই জন্য বোধ হয়, পাগলেরা তাঁহাকে বড় ভালবাসিত। প্রায় দুই এক জন ধর্ম্মপাগল তাঁহার নিকট যাতায়াত করিত, কেহ ক্রমাগত পত্রই লিখিত। সে সকল পত্রে পাগলের উক্তি পাঠ করিলে অনেক শিক্ষা লাভ হয়। বিশুদ্ধ আমোদ, যথা—যাত্রা নাটক কথকতা কীর্ত্তন শ্রবণ, বাজী ও রাক্ষস পোড়ান, ভেল্কী বাজী করা, নৌকায় এবং বাগানে বেড়ান, দেশ ভ্রমণ, এই সমস্তগুলি তাঁহাতে চির বিদ্যমান ছিল। নববিধান-সমাজের ভক্তবৃন্দের নৃত্যগীত প্রমত্ততা কেশবচন্দ্রের কাব্য ও কবিত্ব-রসের মূর্ত্তিমান ছবি।

প্রেম এবং দয়া

কেশবচন্দ্রের দয়া-বিষয়ক মত সমস্ত মানবজাতিকে আলিঙ্গন করিয়াছিল। স্বজাতিকে ভাল বাসিতে গিয়া অনেকে ভিন্ন দেশীয় লোকদিগকে ঘৃণা করে, তিনি তাহা করিতেন না। বহু-দূরস্থিত দেশে দুর্ভিক্ষ-নিবারণের সাহায্য পাঠাইতেন। সাধারণ দয়ার কার্য্যে তাঁহার চেষ্টা উৎসাহ উদ্বেগ চিন্তা যথেষ্ট ছিল।

বন্যা, মারিভয়, দুর্ভিক্ষ উপশমের জন্য অনেকবার সভা এবং বক্তৃতা দ্বারা প্রচুর অর্থ সংগ্রহ করিয়াছেন। যে যখন যে বিষয়ের জন্য ধরিয়াছে, স্বতঃ পরতঃ যেমন করিয়া হউক, তাহাকে সাহায্যদানে ত্রুটি করেন নাই। বাল্যকালে গৃহকার্য্যের শৃঙ্খলার জন্য ভ্রাতৃগণ এক একটী কার্য্যের ভার গ্রহণ করেন। কেশব তখন নিতান্ত বালক। তিনি স্ব-ইচ্ছায় গরীবদিগকে চাল ভিক্ষা দিবার ভার লন। অবশ্য যে জাতীয় দয়ার জন্য বিদ্যাসাগর মহাশয় বিখ্যাত, সেরূপ উচ্ছ্বসিত দয়া কেশবচন্দ্রে অধিক দেখা যাইত না। সৌজন্য লৌকিকতার অভাবে তাঁহাকে কত সময় কত লোকে নির্দ্দয় আত্মম্ভরি বলিয়াছে। এমন কি, ধর্ম্মবন্ধু ও নিতান্ত প্রিয়জনের ব্যারাম হইলেও বড় দেখিতে যাইতেন না। বাহিরে বিশেষ করিয়া কোন সংবাদ লইতেন না। অনেক লোক যাহার আত্মীয় বন্ধু, সে কয় জনেরই বা বিশেষ সংবাদ লইতে পারে? নিজের ছেলে মেয়ে পরিবারের পীড়াতেও স্বয়ং সাহায্য করিতে পারিতেন না। সে ভার বন্ধুগণের উপর ছিল। তজ্জন্য বোধ হয়, অনেকে মনে মনে বিরক্ত হইয়াছেন; কিন্তু তিনি পরের দুঃখ গোপনে ভাবিতেন। অবস্থাবিশেষে দুঃখ ক্লেশ রোগাদি মোচনের জন্য উপায়ও করিতেন। তাঁহার সুপ্রশস্ত হৃদয় ভাবের সমভাবী হইয়া দুঃখের অশ্রুজল মুছাইয়া দিত। দয়ার প্রধান কার্য্য মনুষ্যকে সাধু সচ্চরিত্র ভক্ত করিয়া দেওয়া। ইহার তুল্য জীবে দয়া আর কি হইতে পারে? ঈদৃশ স্বর্গীয় দয়া প্রেমে তিনি সমস্ত জীবন ঢালিয়া অকাতরে অবিশ্রান্ত পরিশ্রম

করিতেন। তজ্জন্য কত নিন্দা অপমানই না সহ্য করিয়া গিয়াছেন!

একদা কোন বন্ধু সাংঘাতিক রোগে আক্রান্ত হন। তাঁহার এক দিকে মৃত্যু, অপর দিকে উত্তমর্ণ যেন শোণিত শোষণ করিতেছিল। বন্ধুর আশা বৰ্দ্ধন এবং দুশ্চিন্তার হ্রাস করিবার জন্য তাঁহার উত্তমর্ণ এক বিধবাকে কেশব নিজ হইতে কিছু টাকা শোধ দিয়াছিলেন। একদিন তাঁহার জন্য বিশেষ প্রার্থনা করিয়া বন্ধুগণকে নিকটে পাঠাইয়া দেন। ঋণের চিন্তায় পাছে তিনি অকালে মরিয়া যান, এই ভয়ে কত রূপে তাঁহাকে সান্ত্বনা দিতেন।

দয়ার বাহ্য ক্রিয়াকে তিনি সর্ব্বস্ব মনে করিতেন না। তাহাতো কুলি-মজুরের দ্বারাও সম্পন্ন হইতে পারে। হয়তো একটী কথা বলিলেন, কিংবা দয়ার শক্তিকে এমনি জাগ্রত করিয়া দিলেন যে, তাহাতে শত সহস্র লোকের কষ্ট দূর হইয়া গেল। বাড়ীর ভৃত্যেরা যথাসময়ে বেতন না পাইলে মনে করিতেন, আমি অনায়াসে সুখে পান ভোজন করিতেছি, আর ভৃত্যেরা পরিশ্রম করিয়া খাইতে পাইবে না। ইহা আমার পক্ষে মহাপাপ। আম কাঁটালের সময় ছাপাখানার ও অন্যান্য ভৃত্যদিগকে ভোজন করাইতেন; গ্রীষ্মের সময় জলসত্র দিতেন, বরফ খাওয়াইতেন। প্রতি বৎসর সাম্বৎসরিকের দিনে দরিদ্র লোকদিগের নিমিত্ত বিশেষ প্রার্থনা হইত। ব্রতাদি গ্রহণের প্রণালীমধ্যে দরিদ্র-ভোজনের ব্যবস্থা লিখিয়া দিতেন। একটি

দাতব্য বিভাগ স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। তাহার আয় হইতে দুঃখীরা প্রতিপালিত হয়। তাঁহার হস্ত পদ এ কার্য্যে সকল সময় খাটিত না বটে, কিন্তু মস্তিষ্ক এবং হৃদয় যথেষ্ট পরিশ্রম করিত। তাঁহার মত মহৎ ব্যক্তির একটী কথা, একটি সুপরামর্শ সহস্র লোকের দারিদ্র্য-দুঃখ-মোচনের কারণ।

প্রচারকপরিবারের প্রতি তাঁহার ভালবাসা সম্বন্ধে কেহ অবিশ্বাসী হইলে, তিনি তাহার প্রতিবাদ করিতেন। ভালবাসা তাঁহার হৃদয়ের গভীর স্থানে অবস্থিতি করিত, এই জন্য তাহা বাহিরে সচরাচর কার্য্যাড়ম্বরে প্রকাশ পাইত না। অনুগত কিংবা আত্মীয় বন্ধুদিগের সামান্য সামান্য বিষয়ে বিস্তারিতরূপে সংবাদ লওয়া এবং তাহা দূর করার দায়িত্ব তাঁহার উপর ছিল না। দয়ার বাহ্য বিস্তৃত ক্রিয়া অপেক্ষা তাহার মূল শুভাভিপ্রায় এবং ভাবের প্রতি তিনি অধিক মনোযোগ দিতেন। এই জন্য সামান্যতঃ বাহিরে উদাসীনের ন্যায় দৃষ্ট হইত। প্রচারকপরিবারেরা দুঃখে মরে, আর তিনি সুখে স্বচ্ছন্দে থাকেন, অনুগত ব্যক্তিদিগের কোন তত্ত্ব লন না, এই বলিয়া অনেকে তাঁহার নিন্দা করিয়া আসিয়াছে। কিন্তু তিনি তাহাদের দুঃখে দুঃখী ছিলেন না, ইহা কেহ বলিতে পারিবেন না। একবার নিজ অর্থে মাসিক ব্যয় অগ্রিম দিয়া এই পরিবারের ক্লেশ মোচন করেন। কিন্তু কত দিন অগ্রিম দিবেন? অভাবই যাহাদের স্বভাব, তাহাদের দারিদ্র-দুঃখ কে মোচন করিতে পারে? সে নিয়ম চলিল না, সুতরাং তিনি অপারগ হইলেন। প্রচারক-দলের যখন গঠন আরম্ভ হয়, তখন অর্থকষ্ট

অত্যন্ত ছিল। কেশবচন্দ্র গোপনে আপনার জননীকে জানাইয়া তাঁহাদের দুই এক জনকে নিজভবনে আহার করাইতেন। কখন নিজের বাক্সের এক কোণে পয়সা রাখিয়া দিতেন। মধ্যে মধ্যে তাহা হইতে দুই চারি আনা লইয়া সকলে বাজার খরচ করিতেন। অভাবের সময় ঐ বাক্সটি পুনঃ পুনঃ অনুসন্ধান করা হইত।

প্রভুত্ব এবং স্বাধীনতা

কেশবচন্দ্রের পোপের ন্যায় একাধিপত্য, প্রচারকদল তাঁহার অন্ধানুগামী, এরূপ সংস্কার অনেকের ছিল; কিন্তু স্বাধীনতা বিষয়ে তাঁহার মত অতি উদার এবং বিশুদ্ধ। ঈশ্বর যেমন মনুষ্যকে স্বাধীনতা দিয়া ভাল করেন, তিনি সেই আদর্শে চলিতেন। আপনিও কাহারও নিকট স্বাধীনতা বিক্রয় করিতেন না, অন্যের স্বাধীনতাও লইতে চাহিতেন না। প্রত্যক্ষভাবে কাহাকেও আদেশ করা তাঁহার মতবিরুদ্ধ ছিল; কিন্তু তাঁহার স্বাধীনতার অর্থ ঈশ্বরের আজ্ঞাধীনতা। ভগবানের আদেশে পিতা, মাতা, গুরুজন, ভাই, বন্ধু ও দেশের লোকের কথা তিনি অগ্রাহ্য করিতেন। অন্যের সম্বন্ধেও তদ্রূপ বলিতেন। এক স্থানে বর্ণিত আছে, "আমি যখন কাহারো দাসত্ব করি নাই, তখন তোমরা দাসত্ব করিবে? যে আপনাকে কখন কাহারো দাস করে নাই, সে যদি অন্যকে দাস করিবার চেষ্টা করে, অথবা দাস দেখিয়া হাস্য করে, তার মত পাপী কপট আর কে

আছে ? এক শত লোক যদি এখানে আসিয়া থাকেন, তবে তাঁহারা স্ব স্ব প্রধান।”

দাসবৎ বা জড়বৎ তাঁহার অধীনতা কেহ না করে, ইহা যেমন তিনি চাহিতেন, তেমনি যে কার্য্যের ভার তাঁহার মস্তকে ছিল, তাহা পালনের জন্য সহকারীদিগকে প্রকারান্তরে আদেশ করিতেন। সে জায়গায় কেহ স্বাধীনতা লইতে পারিত না। আচার্য্যের প্রতি ঈশ্বরের যাহা আদেশ, তাহা যদি কেহ ঈশ্বরের অনভিপ্রেত বলিয়া বিশ্বাস করেন, তবে তিনি তদনুসারে চলিতে পারেন ; কিন্তু আচার্য্যের চিহ্নিত কার্য্যক্ষেত্রে তাঁহার সে স্বাধীনতা চলিবে না। না বুঝিতে পার, অপেক্ষা কর, সময়ে বুঝিতে সক্ষম হইবে। দলস্থ কোন কোন ব্যক্তি স্বাধীনচেতা, কোন কোন ব্যক্তি আচার্য্যের সম্পূর্ণ কর্তৃত্বাধীন ছিলেন। কেশবচন্দ্র স্বাধীনতা এবং অধীনতার সামঞ্জস্য চাহিতেন। এই জন্য এক দিকে যেমন অন্ধানুগত্য ভালবাসিতেন না, তেমনি অতিরিক্ত স্বাধীনতারও প্রতি বিরাগ প্রকাশ করিতেন। ঈশ্বরাদেশ সাধারণ সম্পত্তি, তাহা যদি শুনিতে পাও, তবে তদনুসারে কার্য্য কর, তাহার বিপক্ষে কাহারও কোন কথা শুনিবে না। এক-দিকে এই উপদেশ ছিল। অপরদিকে যে যে প্রচারক বন্ধু ঈশ্বরাদেশ বা বিবেকবাণী অনুসারে স্বাধীনভাবে স্বতন্ত্র দল বাঁধিতেন, কিংবা কোন দলের ভিতর বিশেষরূপে একটু প্রভাব-শালী হইতেন, তাঁহাদের কার্য্য ব্যবহার চাল চলন তিনি পছন্দ করিতেন না। তাঁহাদের বিরুদ্ধে নিজের বিশেষ অনুগত

প্রচারকদিগের মুখে অনেক নিন্দা বাক্য শুনিয়া, আপনিও তৎসম্বন্ধে অনেক কথা কহিতেন। স্বাধীন প্রচারকদলের দ্বারা তাঁহার ধর্ম্ম নষ্ট হইবে, ইহাও মনে করিতেন। পরোক্ষে এইরূপ নিন্দাচর্চ্চা হওয়াতে দলের মধ্যে দলাদলি ও বিচ্ছেদের সূত্রপাত হইয়াছিল। প্রত্যেকের স্বাধীন ইচ্ছা তাঁহার অধীন হইবে, এই যে আশা তিনি করিয়াছিলেন, শেষে তাহা অমীমাংসিত প্রহেলিকাবৎ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। এ বিষয়ে তাঁহার নিজের কথা কিছু কিছু আমরা এখানে তুলিয়া দিলাম।

"আমি জঘন্য পাপী, তা তোমরা জান ? আমি সত্য বলিতেছি, ইহা বিশ্বাস কর। তোমরা আমার শিষ্য নহ, বন্ধু; মূল্যবান্ সহকারী। সাবধান! প্রফেটদের (ভবিষ্যদ্বক্তা) মধ্যে আমাকে গণ্য করিও না। তাহাতে তাঁহাদিগকে অবমাননা এবং স্পষ্ট মিথ্যা দ্বারা নিজের হৃদয় অপবিত্র করা হইবে। আমি তাঁহাদের দাস। এই আমার উপাধি। আমাকে তোমরা অনুকরণ করিও না। অনুকরণ মৃত্যু এবং অন্ধ বাধ্যতা দাসত্ব। ঈশ্বরের অনুকরণ এবং অনুসরণ কর। তোমাদের মধ্যে যে কেহ আমাকে পরিত্রাতা বলে, সে অসত্য বলে। আমার পিতা তোমাদিগকে শিক্ষা দিন এবং চালিত করুন। আমাকে কেহ গুরু বলিও না। আমাকে গুরুজ্ঞান করিয়া আমার শিক্ষার উপর মতামত কি প্রকাশ কর ? তাহা করিও না। আমার অনুরোধে আমার নিকট হইতে কিছু লইও না, এবং বিদ্যার অনুরোধে আমার কথা অগ্রাহ্যও করিও না। আমি যাহা বলি, তাহা সত্য কি না, তাহা

জানিবার জন্য প্রত্যেক বার ঈশ্বরের নিকট যাও। তাঁহার ইঙ্গিতানুসারে গ্রহণ এবং প্রত্যাখ্যান কর।"

প্রার্থনা—"হে ঈশ্বর! তোমার নিয়োজিত আচার্য্যের নিকট কি পরিমাণে আমরা আমাদের স্বাধীনতা বিসর্জ্জন দিব?"

উত্তর—"আমার প্রদত্ত পবিত্র অধিকার একটুও ত্যাগ করিবে না। তোমরা চিরদিন স্বাধীন থাকিবে। মনুষ্যের শিষ্য! ঘৃণিত কথা। তোমরা আমার শিষ্য, কোন সৃষ্ট জীবের নিকট তোমরা দাসের ন্যায় মস্তক নত করিবে না।"

প্রার্থনা—"তিনি যদি আমাদের সেবক হইলেন, তবে তাঁহাকে প্রধান বলিয়া কি মানিব না?"

উত্তর—"অন্যের ন্যায় বিধাতার বিশেষ কার্য্যভার তাঁহার উপর আছে, সেই অর্থে তিনি প্রধান, তাহার বহির্ভাগে তাঁহার আর প্রাধান্য নাই।"

প্রার্থনা—"প্রভো! তিনি কি আমাদের অপেক্ষা পবিত্র এবং জ্ঞানী নহেন?"

উত্তর—"নিশ্চয়ই নহেন। তাঁহা অপেক্ষা অধিক জ্ঞানী এবং পবিত্রমনা লোক তোমাদের মধ্যে আছেন। বৈরাগ্য ন্যায় দীনতা দয়াশীলতা পবিত্রচরিত্রতা সম্বন্ধে তোমাদের মধ্যে কোন কোন ব্যক্তি তাঁহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। আমি বিচার করিয়া দেখিয়াছি, তাঁহাতে ত্রুটি আছে। গুরু অপেক্ষা অনেক শিষ্য স্বর্গরাজ্যের নিকটবর্ত্তী।"

প্রার্থনা—"এমন লোককে তবে আমাদের উপর নিযুক্ত

করিলে কেন ? আমরা তবে এখন কি করিব, বুঝিতে পারিতেছি না।"

উত্তর—"সেবকজ্ঞানে আচার্য্যকে তোমরা মান্য কর, ভালবাস। আমি যত দূর যাইতে বলিব, সেই পর্য্যন্ত তাঁহার প্রদত্ত শিক্ষার অনুসরণ করিবে, তদতিরিক্ত নহে। তাঁহার কথা অবশ্য বিশ্বাস সহকারে শুনিবে এবং ভক্তির সহিত পোষণ করিবে।"

প্রার্থনা—"তাঁহার কি ভুল নাই ? যদি থাকে, তবে তাহার কি প্রতিবাদ করিব না ? এবং তাঁহার ভিতর যাহা কিছু মন্দ এবং অবিশুদ্ধতা আছে, তাহা হইতে কি দূরে থাকিব না ?"

উত্তর—"প্রকাশ্য ধর্ম্ম-জীবনের বহির্ভাগে যাহা কিছু তাঁহার আছে, তাহার সঙ্গে স্বর্গের কোন সংস্রব নাই। গৃহেতে যদি তিনি ধর্ম্মহীন, মন্দচরিত্র, স্বার্থপর, ক্রোধী, উচ্চাভিলাষী, প্রবঞ্চক, মৎসর, সত্যবিরোধী হন, নিশ্চয় সে সকল দুরাচারের তোমরা অনুকরণ করিবে না। তজ্জন্য তিনি ইহ পরকালে প্রতিফল পাবেন। অন্যায় কার্য্যের জন্য তিনি অন্যান্য দোষীর ন্যায় ঈশ্বর এবং মনুষ্য দ্বারা কঠিন রূপে নিন্দিত এবং বিচারিত হইবেন।"

প্রার্থনা—"হে প্রভো! প্রত্যেক বিষয়ে যদি তাঁহাকে আমরা বিচার এবং পরীক্ষা করি, তাহা হইলে আচার্য্য এবং নেতা বলিয়া কিরূপে ভক্তি শ্রদ্ধা করিব ? পোপের ন্যায় তাঁহাকে মানিব না ইহা বুঝিলাম, কিন্তু আমাদের মত এক জন বলিয়া তাঁহাকে যদি গণ্য করি, তাহা হইলে যে তাঁহাকে আমরা অধিক শ্রদ্ধা দিতে

পারিব না এবং সমবেতভাবে ধর্ম্মসমাজের কল্যাণ বুঝিতে পারিব না ?"

উত্তর—"যখন তিনি আফিসের পদে নহেন, কিন্তু বাড়ীতে থাকেন, তখন তিনি তোমাদের মত এক জন ; কিন্তু বিধিনিয়োজিত কার্য্যালয়ে তিনি অন্য প্রকার। যখন তিনি তোমাদের আত্মার সেবার জন্য প্রার্থনা করেন, প্রচারকার্য্য-সাধনে অনুমতি দেন, কিংবা আধ্যাত্মিক উন্নতি বিষয়ে সাহায্য করেন, তখন আচার্য্য বলিয়া তাঁহার নিকট মস্তক নত কর এবং সমস্ত উপাসকমণ্ডলীকে তাঁহার উপদেশের অনুসরণ করিতে দাও। কার্য্যালয়ের প্রধান কর্ম্মচারীর নিকট নিম্ন কর্ম্মচারীরা যেরূপ করে, তদ্রূপ আনুগত্য বাধ্যতা তিনি অবশ্যই লইবেন।"

প্রার্থনা—"কোন্ বিষয়ে আমরা তাঁহার শিক্ষা গ্রহণ করিব ?"

উত্তর—"বর্ত্তমান বিধানের উন্নতি এবং জয়লাভ সম্বন্ধে যাহা কিছু বলিবেন, সমস্ত। নিরাকার ঈশ্বর এবং পরলোকগৃহ উপলব্ধি, পৃথিবীর সাধু মহাপুরুষদিগকে প্রেম ভক্তি দান, প্রার্থনা, ধ্যান, সভ্যতার সহিত বৈরাগ্যের মিলন, বিশ্বাস এবং বিজ্ঞানের সামঞ্জস্য, বর্ত্তমান বিধানের এই সকল মূল মত সম্বন্ধে আচার্য্যকে তোমরা সম্পূর্ণ বাধ্যতা দিবে। তিনি তোমাদিগকে সাহায্য দান করিবেন।"

প্রার্থনা—"তাহাই হউক। কিন্তু এ সমস্ত বিষয়ে আমরা তাঁহার নিকট যথেষ্ট আলোক পাই নাই, এবং তৎসম্বন্ধে যাহা তিনি বলেন, সব সময় তাহা বোধগম্য হয় না। যে স্থলে বুঝিতে পারি না, সেখানে কি অন্ধভাবে চলিব ?"

উত্তর—"অন্ধভাবে নয়, কিন্তু বিশ্বাসের সহিত কার্য্য করিবে। এই আশা বিশ্বাস রাখিবে যে, উপযুক্ত সময়ে আমি সে সকল তোমাদিগকে পরিষ্কাররূপে বুঝাইয়া দিব। পবিত্রাত্মা ভিন্ন অধ্যাত্ম রাজ্যের গভীর সত্য সকল কেহ কাহাকে বুঝাইতে পারে না। অতএব বিশ্বাস কর, তোমাদের বিশ্বাসে আমি জ্ঞান সংযোগ করিব।"

প্রার্থনা—"আর এক কথা, হে ঈশ্বর। যদি আমি মনে করি, তিনি বিধান-সম্বন্ধীয় কোন গুরুতর বিষয়ে ভ্রান্ত হইয়াছেন, তাহা হইলে তাহা কি বুঝাইতে চেষ্টা করিব না ?"

উত্তর—"হইতে পারে তোমারই ভুল, তাঁর ভুল নয়। তোমার প্রতিবাদে আমার ইচ্ছার বিপরীত পথে তাঁহাকে তুমি লইয়া যাইতে পার। যেখানে তিনি আমার অনুজ্ঞা পাইয়াছেন, সেখানে সমস্ত বিঘ্নের মধ্যে অটল শৈলের ন্যায় স্থির থাকিয়া আমার ইচ্ছা তিনি পালন করিবেন। তাঁহার বিরুদ্ধে কিছু বলিবার থাকিলে আমাকে বলিবে। কিন্তু স্মরণে রাখিও, তোমাদের ভিতরকার কোন উৎকৃষ্ট ব্যক্তির অনুরোধেও যদি আমার ভৃত্য আমার বিন্দুমাত্র আদেশ লঙ্ঘন করে, তজ্জন্য আমি তাহাকে দায়ী করিব।"

প্রার্থনা—"তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক।"

প্র। "আচার্য্য যদি স্পষ্ট আদেশ কাহাকেও না করেন, কেবল সাধারণ সত্য বলেন, তাহা হইলে ভ্রান্ত ব্যক্তিকে ঠিক পথে কিরূপে আনা হইবে ?"

উ। "আচার্য্য কদাচিৎ সাক্ষাৎ"ভাবে আদেশ করেন। তিনি বিচারপতি এবং বিধিপ্রদাতা নহেন। তিনি কেবল স্বভাব এবং বিবেকের ভাষ্যকার। কাহাকেও জড়যন্ত্রের মত চালাইবার তিনি চেষ্টা করেন না, প্রত্যেক ব্রাহ্মের ভিতরে বিধিসৃজনের ক্ষমতাকে বিকাশ করিতে ইচ্ছা করেন; তদ্দ্বারা সে দৈনিক জীবনের প্রত্যেক বিষয়ের জন্য দাসবৎ মনুষ্যের উপর নির্ভর না করিয়া আপনি আপনার বিধান হইবে। অন্তরস্থ উপদেষ্টা কর্ত্তৃক যখন সকলে চালিত হইবে, তখন তাহারা স্বভাবতঃ এক হইয়া যাইবে। কেহ বিপথগামী হইলেও সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে প্রতিবাদ করা বা পরামর্শ দেওয়া হইবে না। কারণ, পথভ্রান্ত ব্যক্তিরা ঘুরিয়া ফিরিয়া শেষ স্বভাবের নিয়মে নিজদোষ সম্বন্ধে চৈতন্য লাভ করিবে।"

দলস্থ প্রচারকগণকে প্রচারকার্য্যে কিরূপ স্বাধীনতা তিনি দিতেন, তাহা ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দের লিখিত এই পত্রখানিতে প্রকাশ পাইবে।

"প্রিয় অমৃত! প্রচারযাত্রার মনোহর বৃত্তান্তপূর্ণ পত্র কয়েক খণ্ডের দ্বারা অনুগৃহীত করিয়াছ, তজ্জন্য তুমি আমার ধন্যবাদ গ্রহণ কর। ভ্রাতঃ! অগ্রসর হও! আরো অগ্রসর হও! বিধাতা তোমাকে প্রার্থনাশীলতা, বিশ্বাস এবং উৎসাহ প্রদান করুন! যে ব্রত তুমি গ্রহণ করিয়াছ, তৎসংক্রান্ত কার্য্যের স্বাধীনতার উপর আমি বাধা দিতে ইচ্ছা করি না। আমি তোমার প্রভু নহি, কিন্তু 'কর্ত্তব্য' তোমার প্রভু। কর্ত্তব্য যেখানে যাইতে বলে,

যাও এবং যাঁহা করিতে বলে, তাহা কর। আমরা এক জীবন্ত সময়ে বাস করিতেছি। সুযোগ এবং ক্ষমতা যাহা পাইয়াছি, তাহার ব্যবহারের জন্য আমরা প্রত্যেকে ঈশ্বরের নিকট দায়ী।”

যে সুমহান্ কার্য্যের ভার তাঁহার মস্তকে ছিল, তৎসম্বন্ধে তিনি সহকারীদিগকে কতকটা স্বীয় কর্ত্তৃত্বাধীনে রাখিতে বাধ্য হইতেন। আফিসের প্রধান কর্ম্মচারী যেমন অধীন সহকারী-দিগকে অন্যান্য বিষয়ে স্বাধীনতা দিয়া আফিসের কার্য্যের জন্য শাসন করে, আচার্য্য কেশব প্রচারকদিগকে সেই ভাবে শাসন এবং বাধ্য করিতেন। এরূপ প্রভুত্ব ও কর্ত্তৃত্বে তিনি লজ্জিত ছিলেন না; কিন্তু সে প্রভুত্ব এমন ভাবে পরিচালিত করিতেন যে, তাঁহার প্রভুত্ব বলিয়া অনেক সময় কাহাকেও তাহা বুঝিতে দিতেন না। প্রার্থনা উপদেশ দ্বারা প্রত্যেকের বিবেককে জাগাইয়া দিয়া কর্ত্তব্য-জ্ঞান উত্তেজিত করিয়া তাহা সাধন করিয়া লইতেন। সুতরাং সকলে মনে করিতেন, ইহা আমার অবশ্য কর্ত্তব্যকর্ম্ম। পিতার প্রভুত্ব যেমন নাবালগ পুত্রের উপর এবং সেনাপতির কর্ত্তৃত্ব যেমন সেনাবৃন্দের উপর কল্যাণের কারণ, ইহাও তদ্রূপ ছিল।

ভাবুক কেশবের ভাবের স্বাধীনতায় ব্রাহ্মসমাজ কুসংস্কার এবং লোকভয়ের দাসত্ব হইতে মুক্তি লাভ করিয়াছে। বর্ষার জল-প্লাবনে যেমন উচ্চ নীচ স্থান সমান হইয়া যায়, তখন যেখানে ইচ্ছা সেইখান দিয়া নৌকা চলে এবং অতি গুপ্ত স্থান ক্ষুদ্র পল্লী পর্য্যন্ত আরোহিগণের দৃষ্টিপথে আইসে; কেশবচন্দ্র ভক্তিভাবের

স্রোতে অঙ্গ ঢালিয়া দিয়া তেমনি ব্রহ্মসত্তার নিগূঢ় গুপ্ত স্থান ভেদ করিয়া চলিয়া যাইতেন। তাঁহার পশ্চাতে যাহারা চলিত, তাহারা ভগবানের বিচিত্র ঐশ্বর্য্য এবং বিলাসের সূক্ষ্ম সৌন্দর্য্য-চ্ছটা দেখিয়া কৃতার্থ হইত। কিন্তু ভক্তিবিরোধী সে পথে অধিক দূর যাইতে পারিত না। তাহাদের ভয় হইত, পাছে কল্পনা কুসংস্কারের রাজ্যে আসিয়া পড়ে। বাস্তবিক সে চক্রে এবং আবর্ত্তে পড়িলে সহজে আত্মরক্ষা করা যায় না। তুমি চতুর বুদ্ধিমান, যতক্ষণ তাহার ব্যাকরণ শব্দার্থ লইয়া তর্ক করিবে, ততক্ষণ ভাবুক ভক্ত ভাবার্থ-স্রোতে ভাসিয়া গোলোক-ধামের নিকটবর্ত্তী হইবে। প্রমুক্তাত্মা রসগ্রাহী কেশবচন্দ্র হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টীয়ান, বৌদ্ধ, যোগী, ভক্ত, কর্ম্মী ও জ্ঞানীদিগের সাম্প্রদায়িক বাঁধ ভাঙ্গিয়া, সমস্ত একাকার করিয়া ফেলিয়া, তাহার ভিতরে প্রবীণ মীনের ন্যায় বিচরণ করিতেন। নব-বিধানের মহাদ্রাবক তাঁহার ভিতরে ছিল, তাহা দ্বারা তিনি স্বতন্ত্র কঠিন বস্তুকেও দ্রবীভূত করিয়া লইয়াছিলেন। পুরাতন ধর্ম্মের ভিতর হইতে নূতন ভাবার্থ বাহির করিতেন। ঈশা তাঁহার ধর্ম্মপথের প্রধান সহায় ছিলেন, কিন্তু তাঁহাকেও তিনি বাহ্যভাবে গ্রহণ করেন নাই। একটী প্রার্থনায় আছে, "পৌত্তলিকের ন্যায় আমি কি রক্ত মাংস এবং জড়পদার্থনির্ম্মিত মূর্ত্তির সম্মুখে প্রণাম করিব? না, ঈশ্বর, তাহাতে আমাকে সন্তুষ্ট করিতে পারি না। আমি আধ্যাত্মিক খ্রীষ্টকে চাই। করুণা তাঁহার চক্ষু, দয়া কর্ণ, প্রার্থনা রসনা, ঈশ্বরেচ্ছা পুণ্য, রক্তমাংস জগতের প্রায়শ্চিত্ত।

এই সকল অঙ্গে আমার প্রিয় যিশুর শরীর নির্ম্মিত। ঈশার মত বিশ্বাস যাহার আছে, সেই খৃষ্টের শিষ্য। তাঁহাকে না মানিলেও সে খৃষ্টীয়ান।" এইরূপ তাঁহার উদার মত ছিল।

যেমন ভাবের স্বাধীনতা, তেমনি কাজের স্বাধীনতা। তুমি যোগ দাও আর না দাও, যাহা কর্ত্তব্য তাহা তিনি না করিয়া ছাড়িবেন না। কোন ব্যক্তিবিশেষের উপর বিশেষ কার্য্যের জন্য নির্ভর করিয়া থাকিতেন না। সহস্র উপকার করিয়াও কেহ তাঁহার বাধ্যতা পাইত না, কিন্তু প্রেম কৃতজ্ঞতা নিশ্চয় পাইত। তিনি বিশ্বাস করিতেন, ভাবের অধীন হইয়া নিজে স্বভাবতঃ সত্য পথে ঠিক থাকিবেন, কিন্তু শাসন এবং নিয়ম ভিন্ন সাধারণে তাহা পারিবে না। যাহা অন্যের পক্ষে অধর্ম্ম, তাহা কেশবচন্দ্রকে কলঙ্কিত করিতে পারিত না কেন? আত্ম-পক্ষ সমর্থনের তাঁহার এই এক ভূমি ছিল যে, তিনি বিশ্বাস করিতেন, আমি ঈশ্বরেব আদেশে কার্য্য করিতেছি। অন্যে সেরূপ সাহস সহকাবে বলিতে পারিত না, সুতরাং তাহার ভিতরে অবশ্য গোল আছে মনে হইত। অন্যের অভিপ্রায় এবং গূঢ় চরিত্র বুঝিবারও তাঁহার অসাধারণ ক্ষমতা ছিল। ধর্ম্মসংস্কারের প্রভাবে স্বভাবতঃই লোকের আভ্যন্তরীণ অবস্থা বুঝিতে পারিতেন। প্রার্থনার সময় ব্যতীত প্রকাশ্যে প্রায় তাহা বলিতেন না, কিন্তু সন্দেহ করিতেন। তাঁহার প্রত্যেক ব্যবহার আচরণ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সহচর প্রতিবাসীরা তীব্র দৃষ্টিতে দেখিতেছে, ইহাও তিনি বুঝিতেন।

সমাজের শাসনপ্রণালীতে প্রত্যেকের অধিকার সমান আছে, তাহা তিনি মানিতেন; কিন্তু তাহা স্বীয় প্রতিভা-শক্তির অধীনে চালাইতে চেষ্টা করিতেন। ব্রহ্মমন্দিরের এবং সমাজের কার্য্যে তাঁহার অধিক কর্তৃত্ব ছিল, সে কর্তৃত্ব তিনি ধর্ম্মবিশ্বাসের সহিত ব্যবহার করিতেন। মন্দির এবং সমাজ তাঁহার হাতের গড়া সামগ্রী, তাহার সভ্যদিগকে অধিকার বুঝাইয়া দিবার ভারও তাঁহার উপর ছিল। তিনি যাহা দিতে আসিয়াছেন, তাহা স্বাধীন-ভাবে দিবার জন্য মন্দিরটি হাতে থাকা আবশ্যক হইত। তাহার স্বত্বাধিকার কিংবা বেদীর আচার্য্যপদ যদি গুটি কতক মস্তিষ্ক, এক এক খানি হাত, আর এক একটী টাকা চাঁদার উপর নির্ভর করে, তাহা হইলে সভ্যগণের ধর্ম্ম নষ্ট এবং পারমার্থিক ক্ষতি হইবে, ইহা তিনি বিশ্বাস করিতেন। তাঁহার মতে সাধারণে স্বীয় উচ্চ অধিকার বুঝিয়া লইবার উপযুক্ত তখনও হয় নাই। পিতা যেমন অপ্রাপ্তবয়স্ক সন্তানের মঙ্গলের জন্যই তাহাকে অকালে বিষয় সম্পত্তি দান করেন না, আচার্য্য কেশব সেই ভাবে সমাজের সমস্ত অধিকার নিজহাতে রাখিতেন। এই কারণে বিপদ আপদের সময় দলিল এবং রাজার সাহায্যেও তাহা নিজহস্তে রাখিতে বাধ্য হইতেন। মন্দিরের উদ্দেশ্য বিফল হইবে বলিয়া ট্রাষ্টিও করেন নাই।

কিন্তু পৃথিবী তাহাতে সন্তুষ্ট হয় নাই। তিনি বলিয়াছেন, "এখন আমরা ভাবের দিকে বেশী দৃষ্টি রাখিয়া ঈশ্বরাদেশে কাজ করিব, ভবিষ্যতে নিয়ম প্রণালী শাসনবিধি আপনাপনি

সংরচিত হইবে।" পৃথিবীর প্রচলিত নীতির অধীনতা না করিয়া, দেবপ্রতিভাতে চিরদিন তিনি কার্য্য করিয়া গিয়াছেন, ইহাতে তাঁহাকে অনেক বন্ধু হারাইতে হইয়াছে।

ভক্তদল-গঠন

কেশব দলপতি এবং নেতা হইয়া জন্মিয়াছিলেন। ব্রাহ্ম-সমাজে নেতৃত্ব এরূপে কেহ আর করিতে পারেন নাই। ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে বিষয়কর্ম্ম ছাড়িয়া তিনি প্রচারব্রত গ্রহণ করেন। তাঁহার সাধু দৃষ্টান্তে প্রতাপচন্দ্র মজুমদার ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে তাহাতে যোগ দিলেন। তদনন্তর ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে অমৃতলাল বসু, ১৮৬৫ হইতে উমানাথ গুপ্ত, মহেন্দ্রনাথ বসু, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, অন্নদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, অঘোরনাথ গুপ্ত। তাহার পর ক্রমে যদুনাথ চক্রবর্ত্তী, গৌরগোবিন্দ রায়, ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল, কান্তিচন্দ্র মিত্র, দীননাথ মজুমদার, প্রসন্নকুমার সেন, প্যারীমোহন চৌধুরী, রামচন্দ্র সিংহ, কেদারনাথ দে, কালীশঙ্কর কবিরাজ। ইহার মধ্যে অন্নদা, যদুনাথ, বিজয়কৃষ্ণ ব্যতীত অবশিষ্ট চতুর্দ্দশ জন তাঁহার সঙ্গে শেষ দিন পর্য্যন্ত ছিলেন।

এত গুলি ভদ্রসন্তান এই কলিযুগে বিষয়কার্য্যে জলাঞ্জলি দিয়া ভগবানের চরণ-সেবার্থ জীবন উৎসর্গ করিলেন, ইহা সামান্য ঘটনা নহে। কেহ কাহার নিকট পরিচিত ছিলেন না, ভিন্ন জাতি, ভিন্ন অবস্থা; বিধাতা তাঁহাদিগকে ডাকিয়া

এক পরিবারে আবদ্ধ করিলেন। অন্যূন বিশ বৎসর কাল এই দলের উপর কেশব কর্ত্তৃত্ব করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার ধর্ম্ম-নীতির উচ্চ আদর্শ এই দলের মধ্যে যাহাতে কার্য্যে পরিণত হয়, তজ্জন্য তিনি যথোচিত চেষ্টা করিয়াছেন। কতকগুলি ভক্ত প্রস্তুত করা তাঁহার বিশেষ কাজ ছিল। এক প্রত্যাদেশের স্রোত সকলের মধ্যে বহিবে, স্বাভাবিক বিচিত্রতা প্রেমেতে সমান হইয়া যাইবে, এই তাঁহার উদ্দেশ্য। তাহার জন্য এক স্থানে বাস, এক অন্ন ভোজন, এক নিয়মে অবস্থিতির ব্যবস্থা করেন। প্রচারকদলের বহির্ভাগে আর এক দল সাধক ব্রাহ্ম দণ্ডায়মান ছিলেন। তাঁহারা সমাজের বৈষয়িক এবং আধ্যাত্মিক কার্য্যের সহায়। এই দুইটি দলের জীবন কেশবচরিত্রের ছাঁচে এক প্রকার গঠিত হইয়াছে। তিনি যে সকল নূতন নূতন সত্য এবং ভাবরস প্রচার করিতেন, তাহা ইহাঁদের অন্তরে প্রতিবিম্বিত হইত। সেই প্রতিবিম্বচ্ছটা আবার কেশবহৃদয়ে পুনঃ প্রতিফলিত হইত। এই দলটি তাঁহার কৃষিক্ষেত্র বিশেষ। কেশবচন্দ্র দ্বারা অনেকগুলি ভক্তাত্মা উৎপন্ন হইয়াছে। সকলের গঠন সমান হয় নাই বটে, কিন্তু অন্ততঃ পঞ্চাশটি নরনারীর মুখচ্ছবিতে কেশব কারীগরের নামাঙ্কিত আছে। রামমোহন এবং দেবেন্দ্র-নাথের ছাঁচেগড়া জীবন দেখিলেই যেমন চেনা যায়, বর্ত্তমান সময়ে কেশবস্কুলের ছাত্রদিগের মধ্যে তেমনি বিশেষত্ব দৃষ্ট হয়। শেষোক্তদিগের ভাব ভঙ্গী, আহার পরিচ্ছদ, রচনা

এবং বক্তৃতা, উপাসনা ভজন সাধন এক নূতন প্রকারের। তাঁহাদিগকে দেখিলেই চেনা যায়, ইঁহারা কেশব সেনের লোক। উত্তরপাড়ায় সঙ্কীর্ত্তন হইতেছে, পরমহংস দক্ষিণেশ্বরে থাকিয়া বুঝিতে পারিলেন, এ কেশব সেনের দল। ইহা ভাড়াটে লোকের গান নয়। অন্যান্য ধর্ম্মপ্রচারকেরা কোন কোন বিষয়ে লোকের মনে সাময়িক সদ্ভাব উদ্দীপন করিতে পারেন, কিন্তু চরিত্র গড়িয়া তাহাতে ছাপ মারিয়া দিতে সকলে সক্ষম হন না। কেশব-বিশ্ববিদ্যালয়ে বিধিবদ্ধ প্রণালী অনুসারে ধর্ম্মশিক্ষা হইত। শিক্ষার্থিগণ তাহা শিখিয়া পরীক্ষা করিয়া লইতেন। এখানকার ধর্ম্মমত এবং সাধনতত্ত্ব ঈশ্বরের নামাঙ্কিত, তাহা বাজে কারীগরের দ্রব্যের ন্যায় আধুনিক নহে। বিশুদ্ধ যুক্তির অনুগত, বিবেকসঙ্গত, সাধারণের অনুমোদিত, এরূপ কাঁচা কথা তিনি ব্যবহার করিতেন না। ঈশ্বরের হাতের স্বাক্ষর আছে কি না, তাহা দেখিয়া লইতে বলিতেন। যখন যাহা মনে ভাব হইত, তদনুসারে উপদেশ দিয়া কাজ উদ্ধারের জন্য তাঁহার ধর্ম্ম ছিল না। বর্ত্তমান বংশের ভিতরে কতকগুলি লোকের চরিত্র নিজছাঁচে তিনি ঢালিয়া গিয়াছেন। তাঁহার জীবনচ্ছবির সহিত সেগুলির সাদৃশ্য যদিও অতি কম, তথাপি দেখিলে চিনিতে পারা যায়।

কেশবচন্দ্রের গঠিত দলের ইতিহাস অতি মনোহর। তিনি ইহাঁদের সঙ্গে কিরূপে দিন কাটাইতেন, তাহা অনেকে অবগত নহেন। দলস্থ ব্যক্তিগণ এক এক কার্য্যে বিশেষ

সুদক্ষ। নববিধানের পক্ষে যাহা প্রয়োজন, তাহার উপযোগী গুণ ইহাঁদের মধ্যে দৃষ্ট হইয়াছে। কেহ মুসলমানধর্ম্মশাস্ত্রে পারদর্শী মৌলবী, কেহ সংস্কৃতশাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত, কেহ খ্রীষ্টীয়ান-ধর্ম্ম এবং ইংরাজি বিদ্যায় অভিজ্ঞ, কেহ পরিশ্রমে পটু, কেহ যোগী, কেহ ভক্ত, কেহ গায়ক, কেহ বাদক, কেহ উপদেশ-লেখক, কেহ বা সেবক। এইরূপ লোকের সভায় কেশবচন্দ্র নিয়ত বিহার করিতেন। তিনি স্বয়ং যেরূপ স্বর্গবিদ্যালয়ে সাধুমহাজনদিগের নিকটে বিবিধ বিদ্যা উপার্জ্জন করিয়াছিলেন, তেমনি ভিন্ন ভিন্ন আকারে ঐ সকল বিদ্যা বিস্তার করিতেন।

দল ভিন্ন এক দিন তাঁহার চলিত না। প্রতিদিন উপাসনার সঙ্গী কেহ না থাকিলে অভাব বোধ হইত। এই দলই তাঁহার নিদ্রিত মহত্ত্ব এবং গূঢ় ধর্ম্মভাব-বিকাশের উপলক্ষ। এই সকল অনুগত ধর্ম্মবন্ধুগণের আনুগত্য বাধ্যতা যে পরিমাণে বৃদ্ধি হইয়াছে, সেই পরিমাণে তিনি নিজ অধিকার, কার্য্যভার পরিষ্কাররূপে বুঝিতে পারিয়াছেন। সদলে ধর্ম্মরাজ্য বিস্তার করিয়া যেমন কৃতকার্য্য হইলেন, তেমনি উৎসাহ আশাও ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইতে লাগিল। দলের মধ্যে কয়েকজন তাঁহার ধর্ম্মমত বিস্তার করিতেন, আর কয়েক জন তাঁহার এবং প্রচারকপরিবারের সেবায় ও প্রচারকার্য্যালয়ে থাকিতেন। আত্মীয় ভাই বন্ধু কুটুম্ব অপেক্ষা অধিকতর স্নেহে ইহাঁরা পরস্পরের সঙ্গে প্রথমে

একত্রিত হন। মহাত্মা কেশব সকলের সহিত একসঙ্গে বসিয়া দুই তিন বার এই দলের ছবি তোলেন। সে ছবি এখনও বর্ত্তমান আছে। আজ্ঞাবহ দাসের ন্যায় সহচর ভক্তবৃন্দ তাঁহার অনুগমন করিতেন। কিন্তু যতই তাঁহারা উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেন, ততই তিনি আদর্শ বাড়াইয়া দিতেন। এই জন্য প্রাণপণে খাটিয়াও কেহ বিশ্রাম লাভ করিতে পারিতেন না।

আচার্য্যের প্রাতে উঠিতে প্রায় আটটা বাজিত। কারণ, রাত্রি একটা দুইটার পূর্ব্বে নিদ্রা আসিত না। প্রাতে উঠিয়া স্নানান্তে দলস্থ বন্ধুগণের সঙ্গে তিনি প্রাত্যহিক উপাসনা করিতেন। উপাসনান্তে আহারাদির পর লেখাপড়া, লোকদিগের সহিত আলাপ করা, কিংবা কোন সভায় যাওয়া, ইহাতেই সন্ধ্যা পর্য্যন্ত অতিবাহিত হইত। রজনীতে কখন সবান্ধবে সাধন ভজন, কখন প্রকাশ্য উপাসনাকার্য্য সম্পাদন, কখন অন্যবিধ কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিতেন। অপর বন্ধুরা আপনাপন কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া রাত্রি দশটার সময় কেশবচন্দ্রের দরবারে একত্রিত হইতেন। সে দরবারে না উঠিত এমন বিষয় ছিল না। রাজনীতি, সাধনতত্ত্ব, সমাজসংস্কার, চরিত্রশোধন, পরনিন্দা সকল বিষয়েরই আলোচনা হইত। কখন কীর্ত্তন, কখন আমোদজনক গল্প, হাস্য কোলাহল, কখন তর্ক বিতর্ক, নানা বিষয়ের অভিনয় সৃষ্টি হইত। এক দিন এ দল কি সুখের আলয়ই ছিল! পার্থিব

কোন সম্বন্ধ নাই, অথচ যেন সকলে সহোদর ভাই অপেক্ষাও আত্মীয়। তাঁহাদের প্রতি কেশবের স্নেহ প্রীতি মাতৃস্নেহ অপেক্ষাও মধুর। তাঁহার মুখ কিংবা হস্ত প্রায় প্রেম প্রকাশ করিত না বটে, কিন্তু চক্ষের দৃষ্টি, কথার স্বরে প্রেম উৎসারিত হইত। কত ভালবাসেন, তাহা জানিতেও দিতেন না। বাহিরে যদি এক গুণ দেখাইতেন, ভিতরে দশগুণ চাপিয়া রাখিতেন। সুতরাং সে প্রেম বড় ঘনতর এবং সুমিষ্ট ছিল। সেই স্বর্গীয় প্রেম দ্বারা কয়টা লোককে তিনি একবারে দাস করিয়া ফেলিয়াছিলেন। প্রচারক-পরিবারগণের দারিদ্র-কষ্ট সমধিক ছিল। স্ত্রীলোকেরা সে জন্য যথেষ্ট কষ্ট অনুভব করিতেন। কেশবচন্দ্রের সঙ্গে দেনা পাওনার সম্বন্ধ ছিল না। অথচ তাঁহার মুখের দুইটি কথায় তাঁহাদের হৃদয়ভার দূর হইয়া যাইত। এমনি তাঁহার কোমল হৃদয়, দুঃখী দুঃখিনীরা সেখানে গিয়া প্রাণ জুড়াইত। কি এক মিষ্ট আকর্ষণ ছিল, সে কথা আর বলিয়া উঠা যায় না।

এক একবার বন্ধুদিগকে লইয়া তিনি যেন ভেল্কীবাজী করিতেন। এই দলটি অগ্নির সন্তান। সর্ব্বদা অগ্নিময় উৎসাহ উত্তেজনার মধ্যে সকলের জীবন অতিবাহিত হইয়া আসিয়াছে। হয় লোকানন্দা, বিপক্ষের আক্রমণ এবং অপমানের পীড়ন ; না হয় ভক্তি প্রেমের উৎসাহ ; একটা না একটা উত্তেজক বিষয় সর্ব্বদাই এ দলের মধ্যে কার্য্য করিত। সহচরগণ কখন ভীত, কখন অগ্নিশর্ম্মা, কখন প্রেমে মত্ত ; কিন্তু তাঁহারা রসের মাত্রা ঠিক রাখিতে পারিতেন না। কেশবচন্দ্র নিজজীবনের দৃষ্টান্তে

সমস্ত ঠিক করিয়া দিতেন। সমবয়স্ক হইলে কি হয় ? গুণে ক্ষমতায় সর্ব্বাপেক্ষা অতিশয় গুরু এবং উচ্চ ছিলেন। সুদক্ষ ময়রার মত কত উত্তাপে কি প্রণালীতে কোন্ সামগ্রী প্রস্তুত হয়, তাহা বুঝিতে পারিতেন। আসন্ন কোন বিপদ্ উপস্থিত হইলে বন্ধুমণ্ডলীমধ্যে প্রথমে তাহা এমনি ভয়ানক আকারে চিত্রিত করিতেন যে, শুনিয়া সহচরবৃন্দের মুখ শুকাইয়া যাইত, প্রাণ কাঁপিত। পরক্ষণে আবার তাহার অন্য দিক্ এমন ভাবে দেখাইয়া দিতেন যে, তাহা শুনিলে জয়ের আশায় সকলের হৃদয়কমল বিকসিত হইত। কথায়, ভাবে মানুষকে ক্ষেপাইয়া তুলিতে পারিতেন। সমরকুশল সেনাধ্যক্ষের ন্যায় আশ্চর্য্য গুণ এবং ক্ষমতা ছিল। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ সৃষ্টির পর উভয় দলে দেখা হইলেই বিবাদ তর্ক উঠিত। এ সম্বন্ধে উপদেশ দিলেন, "কেহ যদি তর্ক করিতে আইসে, অগ্রে তাহাকে বলিবে, এস, দুই জনে প্রার্থনা করি। প্রার্থনার পর যাহা বলিতে হয় বলিবে।" কাজে আর সেটা বড় ঘটিত না, কেবল বিবাদই হইত। কেহ জিজ্ঞাসা করিলেন, উহাদিগকে নমস্কার করিব কি না ? আচার্য্য বলিয়া দিলেন, "অবশ্য করিবে। কিন্তু ঈশ্বরের শত্রুজ্ঞানে।"

হরিভক্ত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় ব্রহ্মজ্ঞানীদিগের চক্রে পড়িয়া একবার বক্তৃতা করেন যে, হরিনাম লওয়া উচিত নয়। ইহা ব্রাহ্মধর্ম্ম-বিরুদ্ধ। আচার্য্য তাহা শুনিয়া আদেশ করিলেন, তোমরা প্রাতে বিজয়ের দ্বারে গিয়া হরিগুণ গান করিবে। তিন চারি জন প্রচারক কয়েক দিন ধরিয়া তাহাই করিতে লাগিলেন।

তাঁহাদের মুখে হরিনাম শুনিয়া গোস্বামী মহাশয় করতালের সহিত "দিন গেল দয়াল বল না" গান ধরিয়া দিতেন। কেশব সেনের চেলাদের দৌরাত্ম্যে কলিকাতা ছাড়িয়া শেষ তিনি বিদেশে গেলেন। সুখের বিষয় এই, শেষে তিনি হরিপ্রেমে পাগল হইয়াছিলেন। কিন্তু তৎসঙ্গে গভীর দুঃখের কথা এই যে, তিনি সচ্চিদানন্দ হরির প্রতি প্রথমে কিছু দিন ভক্তিবিরুদ্ধ ব্যবহার করিয়া, সেই অপরাধে শেষ বয়সে রাধাকৃষ্ণ এবং গৌরাঙ্গোপাসক হইয়া অন্ধ ভক্তির পক্ষপাতী হইয়া পড়িয়াছিলেন।

এই দলের মধ্যে পড়িয়া কেশব আপনার পুত্র কলত্রদিগকে দেখিবার অবসর পাইতেন না। রাত্রি দুই প্রহর পর্য্যন্ত বন্ধুদিগের সঙ্গে কাটিয়া যাইত। অন্তঃপুরে আহারে বসিয়াছেন, সেখানে দুই জন সহচর বসিয়া আছেন। বিছানায় শয়ন করিলেন, সেখানেও দুই জন বন্ধু পা মাথা টিপিতেছেন। হয়তো টিপিতে টিপিতে তাঁহারা আগেই সেখানে ঘুমাইয়া পড়িলেন। এরূপ অদ্ভুত দল পৃথিবীতে কেহ কোথাও দেখে নাই। ভাল প্রসঙ্গ হউক আর না হউক, কোন কাজ থাকুক না থাকুক, প্রচারকদল কেশবের সঙ্গ ছাড়েন না। আচার্য্য গভীর চিন্তাশীল প্রবন্ধ লিখিতে বসিয়াছেন, দুই এক জন কাছে বসিয়া গল্প করিতেছেন, লিখিবার অবসর দিতেছেন না; কিন্তু তাহা পড়িবার জন্য ব্যাকুল। তথাপি তিনি লিখিতেন, আর কথার উত্তর দিতেন। তাঁহারা দুই প্রহর রাত্রি পর্য্যন্ত তাঁহার নিকট না থাকিলে যেন কর্ত্তব্য কার্য্যের হানি মনে করিতেন। কেহ মশা তাড়াইতেছেন, কেহ ধূলিধূসরিত

মাদুরে পড়িয়া নিদ্রা যাইতেছেন, কেহ অর্দ্ধশায়িতাবস্থায় নাক ডাকাইতেছেন। এমন সময় এক হস্তে জলের ফেরুয়া, এক হস্তে তাম্বুলকরঙ্ক লইয়া আচার্য্য প্রবেশ করিলেন। নিদ্রিত বন্ধুদিগকে দেখিয়া দুঃখ প্রকাশ করিতেন। তাঁহার আগমন শব্দে তাড়াতাড়ি কেহ বা জাগিয়া উঠিতেন, কেহ বা ভাণ করিতেন যেন জাগিয়াই আছেন। গুরুমহাশয়ের ভয়ে ছেলেরা যেমন করে, সেরূপ ভাবও কতকটা ছিল। ইহা আমোদের মধ্যে গণ্য হইত। মশা তাড়াইবার কালে কেহ বা দশ বিশ গণ্ডা মশার প্রাণ বধ করিতেন। দল যে ঘরে বসিত, সেখানে মশারও আমদানি কিছু বেশী ছিল। কিন্তু আচার্য্য মশা মারিতেন না। ঝাঁকে ঝাঁকে মশা গায়ে পড়িতেছে, আর তিনি চেয়ারে বসিয়া ধৈর্য্য সহকারে বস্ত্রাঞ্চল দ্বারা তাহাদিগকে বিদায় করিতেছেন। ভ্রাতৃগণের নিদ্রার প্রাবল্য দেখিয়া নিয়ম করিলেন, সৎপ্রসঙ্গের স্থলে কেহ ঘুমাইতে পাবে না। কিন্তু নিদ্রালুর শ্রান্ত দেহ কি সে নিয়ম পালন করিতে পারে? সমস্ত দিন নানা প্রকারের পরিশ্রমের পর ভ্রাতৃবৃন্দ সেখানে আসিলেন, অমনি চক্ষে ঘুম আসিল। কেহবা ক্ষুধায় অবসন্ন হইয়াছেন, কেহ বা পরিশ্রমে কাতর হইয়া পড়িয়াছেন। খুব উত্তেজক সৎপ্রসঙ্গ অথবা পরনিন্দা উঠিলে ঘুম চলিয়া যাইত। কাহারো পক্ষে যোগ ভক্তি দর্শন শ্রবণের গভীর প্রসঙ্গ ঘুম পাড়াইবার মন্ত্র ছিল। আচার্য্য নিজেও চেয়ারে বসিয়া মধ্যে মধ্যে একটু একটু ঘুমাইতেন, তজ্জন্য নাসিকায় শব্দ হইত; কিন্তু তিনি নাকডাকার অপবাদ

সহ্য করিতে পারিতেন না। নাক ডাকাইয়া নিদ্রা যাওয়াটাকে ভয়ানক অসভ্যতা মনে করিতেন। নিদ্রাবস্থায় তাঁহার নাক ডাকে, সহচরেরা শুনিতে পান, কিন্তু তিনি তাহা জানিতেন না। এই কথা লইয়া কতবার আমোদ পরিহাস হইয়া গিয়াছে। তাঁহার চক্ষে নিদ্রাভাস দেখিলে কেহ কেহ বাড়ী যাইবার চেষ্টা করিতেন। যাই তাঁহারা উঠিতেন, অমনি কেশব জাগিয়া বলিতেন, "কি হে!" অমনি হাসির রোল উঠিত। জননীর নিদ্রা যেমন সজাগ, তাঁহারও তেমনি ছিল। শীঘ্র মজলিস্ ভাঙ্গে, এটি ভাল বাসিতেন না। গবর্ণমেণ্ট হাউসে কিংবা অন্য কোন সাহেববাড়ী নিমন্ত্রণে গিয়াছেন, বন্ধুরা অপেক্ষা করিতেছেন; রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর হইয়া গিয়াছে, তবু একবার গল্পের জমাট বাঁধে, এজন্য ছলে কৌশলে সকলকে আটকাইয়া রাখিতেন। এমন দিন কতই গিয়াছে। হয়ত গভীর রাত্রি সময়ে এমন এক কথা তুলিলেন যে, দুই এক ঘণ্টা তাহাতে কাটিয়া গেল। কাহারো কাহারো ঘুমে চক্ষু ভাঙ্গিয়া পড়িত, এ জন্য তাঁহারা ভাল কথায় প্রায়ই যোগ দিতে সক্ষম হইতেন না। নানা রঙ্গের লোক, কেহ এক বিষয়ে গুণবান্, অন্য বিষয়ে দুর্ব্বল; কিন্তু সকলের সমবায়ে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর এক দেহ প্রস্তুত হইয়াছিল।

ভগবানের যোগাযোগ, মনুষ্য শাসন পীড়ন করিয়া বলপূর্ব্বক ইহা গড়েও নাই, রাখিতেও পারে না। প্রাতঃকাল হইতে রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর পর্য্যন্ত একত্র বাস, সকলে যেন এক রক্ত মাংস, এক আত্মা। কেশবচন্দ্রের গৃহ প্রচারকগণের বাসস্থান।

তাঁহার জননী সকলেরই জননী। ক্রমে ক্রমে এই পরিবারের সঙ্গে সকলের একটি সুমিষ্ট এবং ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ দাঁড়াইয়াছিল। দুই পাঁচ জন লোক দিন রাত্রি কেশবের নিকট পড়িয়াই আছেন। আচার্য্যের সেবায় তাঁহারা চিরদিন সমান উৎসাহী ছিলেন। কেশবচন্দ্র এ দলের বন্ধনরজ্জু এবং প্রধান স্তম্ভ। তাঁহাকে ভালবাসিব, সেবা ভক্তি করিব, তাঁহার প্রিয় হইব, এ ইচ্ছা প্রত্যেকেরই ছিল। কারণ, কেশবের ন্যায় প্রিয়দর্শন, কোমল-স্বভাব, মহচ্চরিত্র, গুণবান্ ক্ষমতাশালী প্রেমিক জনের প্রিয় অনুগত হইবার ইচ্ছা কাহার না হয়? কিন্তু তিনি কেবল তাহা চাহিতেন না। তিনি বলিতেন, দলস্থ প্রত্যেককে ভালবাসাই আমার প্রতি প্রকৃত ভালবাসা। প্রচারকগণ যে পরস্পরকে ভালবাসিতেন না, তাহাও নহে। ভালবাসা শ্রদ্ধা আন্তরিক বন্ধন বেশই ছিল, সময়ে সময়ে তাহার বিনিময়ে প্রত্যেকেই স্বর্গভোগ করিয়াছেন; কিন্তু প্রেমপরিবার স্থাপন পক্ষে তাহা যথেষ্ট হয় নাই। এবং প্রথমাবস্থায় প্রেমের যে গাঢ়তা ছিল, শেষে তাহা থাকে নাই। ধর্ম্মবন্ধুতা ক্রমে ক্রমে শেষ ঘোর শত্রুতায় পরিণত হইয়া উঠে। দলই কেশবের একমাত্র সুখের হেতু, এবং দলই শেষ দুঃখের কারণ হয়। দলকে কিরূপ ভালবাসিতেন, তাহার উন্নতির জন্য কত দূর ব্যস্ত এবং উদ্বিগ্ন থাকিতেন, পত্র দ্বারা তাহা সময়ে সময়ে বন্ধুদিগের নিকট প্রকাশ করিয়াছেন। ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে মুঙ্গের হইতে প্রতাপ বাবুকে এই পত্র লিখেন :—

"প্রিয় প্রতাপ! আমার নির্দ্দয় ব্যবহারের বিষয়ে তুমি অভিযোগ করিয়াছ। তোমাকে বর্জ্জন! কে বলিল? নিশ্চয় জানিও, তোমাদের সকলের এবং প্রত্যেকের নিমিত্ত আমি আমার হৃদয়মধ্যে গৃহ নির্ম্মাণ করিয়াছি; আমি যে তোমার কল্যাণপ্রার্থী, তদ্বিষয়ে বিশ্বাসী হইয়া তথায় অবস্থান কর। তোমাকে রাখিব কি পরিত্যাগ করিব, সেরূপ স্বাধীনতা আমার নাই। যে কোন ব্যক্তিকে ঈশ্বর আমার হাতে সমর্পণ করিয়াছেন, চাকরের মত তাহার সেবা করিতে আমি বাধ্য। পিতার নিকটে তোমাদিগকে পৌঁছিয়া দিবার জন্য সাধ্যানুসারে চেষ্টা করা এবং সকলকে ভালবাসা আমার জীবনের পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজন। প্রতাপ, আমি ভাড়াটে নই। আমার ব্যবহারপ্রণালীর বিষয় কেহ যেন কিছু মনে না করেন। কারণ, চিকিৎসক যেমন রোগীর অভাবানুসারে ঔষধের ব্যবস্থা করে, আমিও তেমনি করিয়া থাকি। রোগ আরোগ্য করাই উভয়ের উদ্দেশ্য। যে পরীক্ষা এবং সংগ্রামের পেষণে তুমি ভারাক্রান্ত হইয়াছ, তাহা কৃতজ্ঞতা, ধৈর্য্য এবং আশার সহিত বহন কর; কেন না, তাহা তোমার মঙ্গলের জন্য। তোমার যথেষ্ট বিশ্বাস আছে কি না, তাহা তোমাকে দেখাইবার জন্য তাহারা আসে। অতএব অবিশ্রান্ত ব্যাকুল প্রার্থনা দ্বারা তাহা তুমি গ্রহণ কর। আমি তোমাকে কত বার বলিয়াছি, পূর্ব্বে যাহারা কখন গণ্ড-গোলে পড়ে নাই, তাহাদের ঘর সুদৃঢ় করিবার পক্ষে ইহা এক শিক্ষা। পরীক্ষা বিপদের ভিতর দৈব কার্য্যের রহস্য লোকে

বুঝিতে পারে না এবং চায় না; সেই জন্য তাহারা যা বুঝিয়া সন্দেহ এবং নৈরাশ্যে পড়িয়া সচরাচর ঈশ্বরকে ছাড়িয়া দেয়। সমস্ত যদি চলিয়া যায়, তথাপি তুমি বিশ্বাস এবং আশাকে নিশ্চয় পোষণ করিবে। বিধাতার উপর নির্ভর এবং ভাল হওয়ার আশা যদ্দারা পরীক্ষিত হয়, তাহা সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন পরীক্ষা। ঈশ্বরের পথ করুণার পথ, পরীক্ষার সময় ইহা স্মরণ রাখিবে।”

উক্ত বর্ষে ভাগলপুর হইতে অমৃত বাবুকে লিখিয়াছেন, “আত্মার যোগই প্রকৃত যোগ। শরীর সম্বন্ধে নিকটে কিংবা দূরে থাকিলে লাভ ক্ষতি নাই; আত্মার গভীরতম প্রদেশে যে সম্মিলন হয়, তাহাই প্রার্থনীয়। যদি আমরা সকলে ঈশ্বরকে মধ্যবিন্দু করিয়া আন্তরিক যোগে তাঁহার সঙ্গে গ্রথিত হই, তাহা হইলে পরস্পরের মধ্যে যে আধ্যাত্মিক প্রণয় হইবে, তাহাই যথার্থ স্থায়ী প্রণয়; তাহা সংসার দিতেও পারে না, লইতেও পারে না। কখন কোন্ স্থানে কোন্ অবস্থাতে আমাদের থাকিতে হইবে, তাহার কিছুই স্থিরতা নাই। যদি তাঁহার কার্য্যে সকলে নিযুক্ত থাকি, তিনিই আমাদের যোগ হইবেন এবং আমাদের হৃদয়কে পরস্পরের নিকট রাখিবেন। এত দিন যে প্রণালীতে উপাসনা হইত, প্রতিদিন সেইরূপ উপাসনা দ্বারা ঈশ্বরের পবিত্র সামীপ্য উপলব্ধি করিতে যত্নবান্ হইবে। কিসে তাঁহাকে নিজের বলিয়া আয়ত্ত করিতে পারি, ইহার জন্য প্রার্থনা কর। যদি বন্ধু হইতে দূরে থাকিলে হৃদয় শুষ্ক

ও বিষণ্ণ হয়, ঈশ্বরকে নিকটে না দেখিলে কি প্রকারে শান্তি হইবে? তিনি বাস্তবিক 'আমার', তবে কেন 'আমার' ঈশ্বর বলিয়া তাঁহার শরণাপন্ন না হই? ঈশ্বরের কার্য্যে নিয়মিতরূপে ও শ্রদ্ধার সহিত নিযুক্ত থাকা পাপ ও অসাড়তা নিবারণের প্রধান উপায়।"

এ দলের শাসনবিধি একটি নূতনবিধ গবর্ণমেণ্টের ন্যায় বিজ্ঞানসঙ্গত। অপর সাধারণ এ পথে চলে না। তাহারা আপাততঃ যাহা কার্য্যে পরিণত হয়, তজ্জন্য প্রতিনিধিপ্রণালীতে কাজ উদ্ধার করিয়া লয়। অনেকে আবার কাজ উদ্ধারের জন্য আদর্শ খাট করিয়া লইয়া বলে, আমরা কি মহাপুরুষের উচ্চ আদর্শে চলিতে পারি? কিন্তু উপদেশ দিবার কালে অত্যুচ্চ আদর্শ লোকের সম্মুখে খাড়া করিয়া দেয়। দুই দিকেই সুবিধা। ছোট আদর্শে কাজও বেশ আদায় হইল, অথচ উচ্চ উপদেশ দানের যে মান মর্য্যাদা সাধুতা, তাহাও পাওয়া গেল। কেশব খুব উচ্চ আদর্শ ধরিয়াছিলেন। কিছু দিন স্বাধীনভাবে তাহা চলিয়াছিল, কিন্তু বিচিত্র প্রকৃতির জীবন্ত-স্বভাব মানবকে এক করা কি সহজ কথা? ভগবান্ কাহার ভিতরে কিরূপ লীলা করিতেছেন, তাহা কে বুঝিবে? সমবেত স্বাধীন ইচ্ছায় যখন কাজ চলিল না, তখন আচার্য্যের ব্যক্তিত্বের সহিত প্রত্যেকের স্বাধীনতার সামঞ্জস্যের জন্য চেষ্টা হইল। সে প্রণালী যত দূর কার্য্যকর হইবার তাহা হইয়াছিল, কিন্তু তদ্দ্বারা দল উচ্চ আদর্শ

ধরিতে পারিল না। তদ্দর্শনে আচার্য্য ব্যক্তিত্বের আধিপত্য অধিক পরিমাণে ব্যবহার করিতে লাগিলেন। সেই সঙ্গে ভিতরে ভিতরে প্রত্যেকেরই ব্যক্তিত্ব ভাব বাড়িয়া গেল। তখন বিধি নিষেধের নিয়ম কাগজে লিপিবদ্ধ হইল। পূর্ব্বে প্রাত্যহিক উপাসনায় ইচ্ছানুসারে সকলে আসিতেন। যখন কিছু দিন তাহা এক সঙ্গে হইতে লাগিল, তখন উহাতে অনুপস্থিতি, বা বিলম্ব করা দোষার্হ হইয়া দাঁড়াইল। এক জন যদি সে নিয়ম ভঙ্গ করে, পাঁচ জনে তাহাকে মন্দ বলে। এইরূপে আহার ব্যবহার, দৈনিক কর্ত্তব্য, সংসারপালন এক এক করিয়া সমস্তই শাসনের মধ্যে আসিয়া পড়িল। অনেক কার্য্য অবশ্য আত্মশাসনপ্রণালীতেই সম্পন্ন হইত।

প্রধান এবং সাধারণতন্ত্র শাসন সম্বন্ধে আচার্য্য একবার বলিয়াছিলেন, উভয় দলের ভিন্ন ভিন্ন অধিকার স্থাপনের জন্য যে সংগ্রাম, তাহা স্বাভাবিক। আচার্য্য এবং শিষ্য সমবয়স্ক, কোন কোন শিষ্য আচার্য্য অপেক্ষা বয়সে বড় ছিলেন; তথাপি সর্দ্দার এবং তাবেদারের যে সম্বন্ধ, তাহা প্রচলিত ছিল। দলের মধ্যে কোন দোষ ঘটিলে আচার্য্য শিষ্যদিগকে দোষ দিতেন। তাঁহারাও আবার আচার্য্যস্কন্ধে ভার চাপাইয়া নিশ্চিন্তমনে আমোদ আহ্লাদ করিয়া বেড়াইতেন। বিধানকার্য্যের সমগ্র গুরুভার আচার্য্যকেই বহন করিতে হইত। যখন প্রতিজনে আদেশ বুঝিয়া কিম্বা আচার্য্যের কথায় সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া চলিতে পারিলেন না, সুতরাং একতাও স্থাপন

হইল না, তখন লোকশিক্ষার্থ তিনি বিশেষ বিধি ব্যবস্থা প্রণয়ন করিলেন। মানুষকে তিনি বলিতেন ব্রহ্মখণ্ড। দলস্থ বন্ধু-দিগকে ঈশ্বরের অনুচর জ্ঞানে শ্রদ্ধা সম্মানও যথেষ্ট করিতেন। যাঁহারা "প্রেরিত" উপাধি গ্রহণে কুণ্ঠিত হইতেন, তিনি বল-পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে সেই পবিত্র উপাধি প্রদান করেন। প্রচারকদল সম্বন্ধে জননীর ন্যায় কেশবচন্দ্রের শাসন এবং ভালবাসা দুই ছিল। শেষাবস্থায় তিরস্কার ভর্ৎসনা শাসন অনুযোগ, তৎসঙ্গে নিজের বিরক্তি এবং অসন্তোষ অধিক দেখা যাইত। মন্দিরের উপদেশ, টাউনহলের বক্তৃতার উচ্চ এবং গভীর কথা সমস্ত তাঁহাদের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া তিনি বলিতেন। এই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল যে, যদি এই কয়টী আত্মা প্রেম-বন্ধনে একত্র দলবদ্ধ হয়, তাহা হইলে ইহাই স্বর্গরাজ্যের বীজস্বরূপ হইবে। তাঁহাদের ধর্ম্মসাধন এবং সিদ্ধিতে কেশব-চন্দ্রের গৌরব নির্ভর করিত। দলসম্বন্ধে দুই এক খানি পত্র লেখককে যাহা তিনি লিখিয়াছিলেন, তাহা এই স্থলে প্রকাশ করা যাইতেছে :—

"আজ কাল এখানে জীবন দেখা যাইতেছে। আশ্রমের বিশেষ কিছু হয় নাই। প্রচারকদিগকে লইয়া পড়া গিয়াছে। স্বাধীনতা ও অহঙ্কার পরিত্যাগ করিয়া সৈন্যের ন্যায় দলবদ্ধ হইয়া বিধানের অধীন হও, এক মাসের মধ্যে তোমরা ফল দেখিতে পাইবে। এখন আমার এই উপদেশ, এই শাস্ত্র। করিয়া দেখ, অধীন হইলে উপকার হয়, ফলদ্বারা বুঝিতে

পারিবে। একদল গোরা ক্ষেপিলে যেমন হয়, তোমরা কয় জন দলবদ্ধ হইয়া মাতিলে ঈশ্বররাজ্য সহজে স্থাপিত হইবে।"

যে অধীনতা তিনি চাহিতেন, তাহা দিয়া লোকে কৃতার্থ হইত। ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে তিনি এই পত্রখানি লেখেন। এই সময় হইতে কয়েক বৎসরকাল আনন্দের সহিত দলটি চলিয়াছিল। কেশবচন্দ্রের দলের একতা উৎসাহ দর্শনে কত লোক প্রশংসা করিত। একটি মহাশক্তি বলিয়া তাহাদের মনে হইত। এই কয়টা লোককে সঙ্গে লইয়া তিনি কত কার্য্যই করিয়া গিয়াছেন! এখন লোকে যে যাহা বলে বলুক, কিন্তু এই দলটি অসাধারণ দল সন্দেহ নাই। কিন্তু ভাল উদ্দেশ্য সফল না হইলে, তাহা হইতে আবার বিপরীত ফল প্রসূত হয়। ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে রাণীগঞ্জ হইতে গ্রন্থকারকে এই পত্রখানি তিনি লিখিয়াছিলেন :—

"তোমরা কি ভাবিয়াছ? তোমাদের বর্ত্তমান অবস্থা ভাবিলে আমারতো অত্যন্ত কষ্ট ও আশঙ্কা হয়। যাহা কলিকাতায় দেখিয়া আসিলাম, তাহা অতি ভয়ানক ব্যাপার। তাহা স্মরণ ও চিন্তা করিলে আমার মন কখন শান্ত থাকিতে পারে না। যদি এত অবিশ্বাস আমাদের দলের মধ্যে আসিয়াছে, তাহা হইলে কি হইবে? হে ঈশ্বর! কি হইবে। হাতের সামগ্রী, বুকের সামগ্রী এই দলটি কি ভাঙ্গিবে? আমাকে কি প্রাণের ভাই বন্ধু সব ছাড়িয়া একে একে পলায়ন করিবে? ঈশ্বর মঙ্গল করুন। আমাকে স্বার্থপর, লোভী,

সংসারপরায়ণ, অভক্ত মনে করাতে আমার কিছুই ক্ষতি হইবে না ; কিন্তু যাঁহারা বলিবেন, তাঁহাদের দশা কি হইবে, এই ভাবিয়া আমার প্রাণ কাতর। আমি প্রেমের খাতিরে খুব গালাগালি সহ্য করিয়াছি এবং আরো কত সহিতে হইবে। খুব নিকটস্থ যাঁহারা, তাঁহারা কি আমায় নিষ্কৃতি দিয়াছেন ? ঐ দেখ, বিজয়! তাঁহার কি হইল ? আমার প্রতি বিশ্বাস করিলে যদি দয়াময়ের মুক্তিপ্রদ বিধানকে অগ্রাহ্য করা হয়, তাহা হইলে কি হইবে, এই ভাবনায় আমার কষ্ট হয়। আমাকে অস্বীকার ও অতিক্রম করিয়া যদি কেহ বাঁচিয়া যাইতে পারেন, তাহাতে আমার আপত্তি নাই ; কিন্তু তাহা কি সম্ভব ? আমি অবিশ্বাসকে বড় ভয় করি। ইহা ভয়ানক পাপ হইতেও ভয়ানক। খুব পরস্পরকে শাসন কর, এবং সকলে বিশ্বাসী হও, স্বর্গরাজ্য নিকটবর্ত্তী হইবে।"

কোন এক জন প্রচারক বন্ধু তাঁহার প্রতি অবিশ্বাসের ভাব প্রকাশ করায় এই পত্র তিনি লিখেন। দলের ভিতর অসাম্মিলনের কয়েকটি কারণ নির্ণয় করা যাইতে পারে। শাসনবিধি এবং ধর্ম্মনিয়মের যখন অধিক বাঁধাবাঁধি হইল, তখন কেহ ভাবের দিকে, কেহ অক্ষরের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িলেন। উভয় উভয়ের বিপক্ষে আচার্য্য-সমীপে অভিযোগ করিতেন। আচার্য্য অবশ্য দুয়ের সামঞ্জস্য চাহিতেন। এইরূপে ক্রমে ক্রমে পরস্পরের অসাক্ষাতে নিন্দা সমালোচনা

চলিত। প্রত্যাদেশ দ্বারা নিজ নিজ কার্য্যকে সমর্থন করিবার প্রথাও প্রচলিত হইল। ঝগড়া বিদ্বেষ কটুবাক্য পীড়ন নির্য্যাতন সকলই প্রত্যাদেশের কার্য্য। এইরূপে আচার্য্যের বাহ্য অনুকরণ সকলে করিতে লাগিলেন। পরিশেষে আচার্য্যসেবক এবং আচার্য্যসহযোগী দুই দল ইহার ভিতর দাঁড়াইয়া গেল।

ইহা দেখিয়া শেষাবস্থায় আচার্য্য বার্ষিক রিপোর্টে এইরূপ লিখিয়া গেলেন, "ইহারা স্বার্থপর হইতেছে। বৈরাগ্য-ধর্ম্ম ছাড়িতে আরম্ভ করিয়াছে। যোগ-সাধনে অবহেলা করিতেছে। ব্যক্তিত্ব বিষয়ে অহঙ্কারী হইতেছে।" অর্থাৎ যোগ বৈরাগ্য ভ্রাতৃভাব সম্বন্ধে তাঁহার যত্ন নিষ্ফল হইল। রোগশয্যায় মুমূর্ষু অবস্থায় এই কয়টী কথা লিখিয়া যান। ধর্ম্মের কোন অঙ্গ অবহেলা করিয়া অপর অঙ্গের প্রতি পক্ষপাতিতা না জন্মে, সর্ব্ব অঙ্গের সামঞ্জস্য হয়, এই বিষয়ে সাবধান করিয়া গেলেন। এ সকল অভাব পূর্ব্বেও ছিল, সুতরাং ইহা দলভঙ্গের পূর্ব্ববর্ত্তী কারণ নহে। যথেষ্ট প্রেম সহিষ্ণুতা না থাকায় এ সকল ক্ষতি আর পূরণ হইল না। পৃথিবীতে তাঁহার অন্তর্দ্ধানের সঙ্গে সঙ্গে প্রেমের বন্ধনরজ্জু খুলিয়া গিয়াছে। কয়েকটী প্রধান প্রচারক নেতৃত্ব-লাভের জন্য নিজ নিজ পদমর্য্যাদা এবং ধর্ম্মাভিমানে অন্ধ হইয়া এমন সোণার সংসারটীকে ছারখার করিয়া দিয়াছেন। যাহা হউক, নববিধান ইহ পরকালে বিভক্ত। অনন্তধামে

তত্ত্বপক্ষ, পৃথিবীতে তাহার ঐতিহাসিক প্রকাশ। সুতরাং এখানকার লীলা বিকাশের ভিতর স্বর্গীয় ভাবের হ্রাস হইলেও, অমরগণের সঙ্গে নববিধানবিশ্বাসী চরিত্রযোগে অনন্ত কালের নববিধানলীলারস পান করিতে পারিবেন। বিধানাচার্য্য সমাজগত এবং ব্যক্তিগত জীবনে এখানে এবং অমরগণসঙ্গে পরলোকে চিরদিন সে আনন্দ ভোগ করিবার সঙ্কেত বলিয়া দিয়া গিয়াছেন। তথাপি বৈধপ্রেম সাধন দ্বারা যাহাতে একটী ভ্রাতৃমণ্ডলী পৃথিবীতে থাকে, তাহার জন্য কতিপয় বিধি ব্যবস্থা তিনি প্রচার করিলেন। এই কয়টি তন্মধ্যে প্রধান ;—

"আমি নারীকে ব্রহ্মকন্যা জানিয়া প্রীতি এবং সম্মান করি এবং তৎসম্বন্ধে কোন অপবিত্র চিন্তা বা ইচ্ছা হৃদয়ে পোষণ করি না।

আমি আমার শত্রুদিগকে প্রীতি এবং ক্ষমা করি, উত্যক্ত হইলে রাগ করি না।

আমি অপরের সুখে সুখী হই এবং হিংসা বা ঈর্ষা করি না।

আমি নম্রস্বভাব। আমার অন্তরে কোন প্রকার অহঙ্কার নাই।—কি পদের অহঙ্কার, কি বিদ্যার অহঙ্কার, কি ক্ষমতার অহঙ্কার, কি ধর্ম্মের অহঙ্কার।

আমি বৈরাগী। আমি কল্যকার জন্য চিন্তা করি না। পৃথিবীর ধন অন্বেষণ করি না, স্পর্শ করি না, কেবল যাহা বিধাতার নিকট হইতে আইস, তাহা গ্রহণ করি।

আমি সাধ্যানুসারে স্ত্রী পুত্রদিগকে ধর্ম্ম এবং উপাসনা শিক্ষা দিই।

আমি ন্যায়বান্। প্রত্যেককে তাহার প্রাপ্য প্রদান করি। দ্রব্যাদির মূল্য এবং লোকদের বেতন যথাসময়ে দিয়া থাকি।

আমি সত্য বলি এবং সত্য ভিন্ন কিছু বলি না। সকল প্রকার মিথ্যা আমি ঘৃণা করি।

আমি দরিদ্রদিগের প্রতি দয়ালু এবং দুঃখ-মোচনে ব্যাকুল। আমি সঙ্গতি অনুসারে দাতব্যে ধনদান করি।

আমি অপরকে ভালবাসি। এবং মনুষ্য জাতির মঙ্গল-সাধনে সর্ব্বদা যত্ন করি, আমি স্বার্থপর নই।

আমার হৃদয় স্বর্গীয় বিষয়েতে সংস্থাপিত। আমি সংসারাসক্ত নহি।

আমি প্রত্যেক প্রেরিত ভ্রাতাকে আপনার বলিয়া খুব ভাল-বাসি এবং সম্মান করি। এই দলমধ্যে ঐক্য-স্থাপনের জন্য আমি সর্ব্বদা ব্যাকুল ও যত্নবান্।" [আদর্শ জীবন।]

ইহা ব্যতীত প্রচারকগণের জীবিকা-নির্ব্বাহ সম্বন্ধে কয়েকটি বিধি লিপিবদ্ধ করিয়া দেন। তাহার স্থূল তাৎপর্য্য এই যে, বৈরাগ্য প্রেম উদারতা পবিত্রতার মহাব্রত গ্রহণ করিতে হইবে। প্রচারকদের স্ত্রীরাও স্বামীর সঙ্গে বৈরাগিনী হইবেন। কোটী কোটী কারণ অন্য পক্ষে থাকিলেও প্রেম করিতে হইবে। প্রেমের ভিতর ক্ষমা সহিষ্ণুতা থাকিবে।

কোন সত্য ছাড়িবে না। ধর্ম্মের উচ্চ সাধন করিতে গিয়া নীতিকে উল্লঙ্ঘন করিবে না।

যোগিবর যিশু যে গৃহের পত্তনভূমি করিয়া যান, যিশুদাস কেশব তাহার উপর অনেক দূর গাঁথিয়া তুলিয়াছিলেন ; কিন্তু ছাদ পর্য্যন্ত শেষ করিতে পারেন নাই। ভবিষ্যদ্ধর্ম্মসংস্কারকের হস্তে সে ভার রহিল। কেশবচন্দ্রের যতটুকু করিবার ছিল, ভূভারহারী ভগবান্ তাহা করাইয়া লইয়াছেন।

সংসার-ধর্ম্ম

কেশবচন্দ্র সংসারী বৈরাগী। সংসারেই লোকের সকল ধর্ম্ম কর্ম্ম যোগ তপস্যা নষ্ট হইয়া যায়, এই জন্য তাহাকে তিনি হরিময় করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। যখন তিনি স্ত্রী পুত্র কন্যাদিগকে লইয়া আমোদ আহ্লাদ করিতেন, তখন দেখিলে মনে হইত, ইহা একটী সুখী পরিবার। পরিবারমধ্যে যাহা কিছু ধর্ম্মভাব প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা তাঁহারই দৃষ্টান্তে। ধর্ম্ম শিক্ষা দিবার জন্য তিনি কোন প্রণালী অবলম্বন করেন নাই, কিন্তু তাঁহার আলয়ে নিত্য নব নব ধর্ম্মের ব্যাপার সংঘটিত হইত, তাহার প্রভাবে আপনাআপনি সকলে ধর্ম্মসংস্কার লাভ করিয়াছে। সর্ব্বদা দেশের হিতে তিনি ব্যস্ত থাকিতেন বটে, তথাপি পিতা ও স্বামীর যে কর্ত্তব্য, তাহা যথাসাধ্য সম্পাদন করিয়া গিয়াছেন। সহধর্ম্মিণীকে যোগ বৈরাগ্য শিক্ষা দিয়া ধর্ম্মপথের সঙ্গিনী

করিবার জন্য নানা প্রকারে চেষ্টা করিয়াছিলেন, সে চেষ্টা তাঁহার নিষ্ফল হয় নাই। পত্নী তাঁহার দৃষ্টান্তে মহিলাগণকে লইয়া বহুদিন উপাসনাদি করিয়াছেন। তিনি ব্রহ্মচর্য্যব্রত-ধারিণী হইয়া পাতিব্রত্য-ধর্ম্ম পালন করিয়াছেন। অবস্থা-বিশেষে তাঁহার ভক্তির উচ্ছ্বাস এবং ব্যাকুলতা অতীব প্রশংসনীয়। ধর্ম্মবিষয়ে তাঁহার বুঝিবার ক্ষমতাও বেশ ছিল। তিনি বুদ্ধিমতী এবং ভক্তিপরায়ণা নারী।

কেশবচন্দ্র অর্থ উপার্জ্জনের জন্য স্বতন্ত্র কোন নিয়ম অবলম্বন করেন নাই; ভগবানের সেবা করিতেন, তাহাতেই সংসার চলিত। পৈতৃক ধন বিশ সহস্র মুদ্রা প্রাপ্ত হন। তদ্ব্যতীত বাড়ীভাড়া, বাগান ও জমিব কর কিছু কিছু পাইতেন। উক্ত সঞ্চিত মুদ্রার অর্দ্ধেক অংশ নানা কারণে ক্ষতি হইয়া যায়। সমাজের বিশেষ বিশেষ কার্য্যেও উক্ত ক্ষতির অংশ আছে। পৈতৃক বিষয় এবং সঞ্চিত অর্থের বিনিময়ে "কমলকুটীর" ক্রয় করেন। নিত্য ব্যয়নির্ব্বাহের জন্য মুদ্রা-যন্ত্র ও পুস্তকাবলী হইতে অনুমান মাসিক দুই শত টাকা আয় ছিল, কয়েকটি বন্ধু ইহা দ্বারা সংসার চালাইয়া দিতেন। ইহার পূর্ব্বে আয় আরো কম ছিল। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যয় বন্ধুরাই চালাইতেন। কিন্তু বহুপরিবার উক্ত অল্প আয়ে ভালরূপ চলিত না। একটি প্রকাণ্ড সংসার রক্ষা করা সহজ কথা নয়। কেশবচন্দ্রের এ সম্বন্ধে যেরূপ উচ্চ আদর্শ ছিল, তাহার অনুগমনের জন্য তিনি চিরদিন প্রতিকূল অবস্থার

সহিত সংগ্রাম করিয়া গিয়াছেন। তৎপক্ষে যথাসাধ্যে যত্ন চেষ্টার কখন ত্রুটি হয় নাই।

প্রয়োজনীয় অর্থাভাবে অনেক সময় কষ্ট উপস্থিত হইত বটে, কিন্তু কোন অভাবও থাকিত না। ভগবানের সেবক যে, সে উপযুক্ত বেতন পায়। বিধাতা তাঁহাকে সুখেই রাখিয়াছিলেন। দেশের মঙ্গলের জন্য যেরূপ তিনি পরিশ্রম করিতেন, সভ্য দেশ হইলে এরূপ ব্যক্তিকে আরো সুখে রাখিতে পারিত। তথাপি ভারতকে ধন্যবাদ! বিশেষ বিশেষ ব্রাহ্মবন্ধুদিগকে ধন্যবাদ যে, তাঁহারা আচার্য্যের সেবা এবং সাহায্যের ত্রুটি করেন নাই। পরিবারমধ্যে যাহাতে ষোল আনা ধর্ম্ম থাকে, তাহার জন্য তিনি ক্রমাগত চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। টাকা, নূতন বস্ত্র বা সামগ্রী উৎসর্গ করিয়া ব্যবহারের নিয়ম ছিল। এ জন্য পূজাবেদীর নিকট একটি আধার রাখিয়া দেন। কোন সামগ্রী ধর্ম্মহীন নাস্তিক না থাকে, এই জন্য ঈশ্বরের নামে সমস্ত পবিত্র করিয়া লইতেন। একবার আহার্য্য বস্তুর ভাণ্ডার রীতিপূর্ব্বক উৎসর্গ করিয়াছিলেন। বাড়ী ঘর প্রস্তুত, টব আয়না ছবি দ্বারা তাহা সাজান, নানা দেশের শিল্পসামগ্রী সংগ্রহ বিষয়ে যথেষ্ট অনুরাগ ছিল। সময়ে সময়ে স্বহস্তে উৎসাহের সহিত ঘর সাজাইতেন। কিন্তু গরিবানা চাল, বৈরাগ্যাচরণ কোন দিন পরিত্যাগ করেন নাই। সম্ভ্রান্ত গৃহস্থ, সুশিক্ষিত জ্ঞানী সভ্য হইয়া, স্ত্রী পুত্র পরিবারবর্গের সহিত উৎকৃষ্ট বাসভবনে,

উচ্চশ্রেণীর ভদ্রসমাজে থাকিয়াও, কেমন করিয়া যোগ বৈরাগ্য ভক্তির ধর্ম্ম পালন করিতে হয়, তাহারই জন্য মহাত্মা কেশবের জন্ম হয়। বর্ত্তমান সময়ে এ বিষয়ে তাঁহার দৃষ্টান্ত একান্ত অনুসরণীয়, তাহাতে সন্দেহ নাই। ভিন্ন ভিন্ন সদ্‌গুণে অনেকে বিখ্যাত থাকিতে পারেন, কিন্তু একাধারে নানা গুণের সামঞ্জস্য এরূপ আর দেখা যায় না।

সমাজসংস্কার

কেশবচন্দ্র একজন সমাজসংস্কারক, তিনি জাতিভেদ পৌত্তলিকতা বাল্যবিবাহ উঠাইয়াছেন, শঙ্কর ও বিধবাবিবাহ এবং স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রীস্বাধীনতা দিয়াছেন, এই জন্য ইয়োরোপ আমেরিকায় তাঁহার নাম বিখ্যাত; কিন্তু এ সকল কার্য্য তাঁহার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল না। বরং ভ্রান্ত কুসংস্কারী হরিভক্তকে তিনি ধর্ম্মহীন প্রখরবুদ্ধি সংস্কারকের অপেক্ষা অধিক ভাল বাসিতেন। স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রীস্বাধীনতা বিষয়ে কতকটা তিনি রক্ষণশীল। বিধবা পাইলেই অমনি তাহাকে ধরিয়া বিবাহ দিতে হইবে, এরূপ তাঁহার মত ছিল না। বরং ব্রহ্মচর্য্য-ব্রত ধারণপূর্ব্বক বৈধব্য আচরণকে ভাল মনে করিতেন। স্ত্রীজাতির জ্ঞান ধর্ম্ম সভ্যতার উন্নতি বিষয়ে জাতীয় এবং দেশীয় রীতির পক্ষপাতী ছিলেন। স্ত্রীলোকেরা তাঁহাকে পবিত্রচরিত্র স্বর্গদূতের ন্যায় দেখিতেন। নারীশিক্ষার জন্য "স্ত্রীর প্রতি উপদেশ" এবং "সুখী পরিবার" নামক দুই খানি ক্ষুদ্র পুস্তিকা তিনি লিখেন। ধর্ম্মসাধন

এবং উচ্চ প্রকৃতি বিকাশের পক্ষে যত দূর প্রয়োজন, তত টুকু সমাজসংস্কার চাহিতেন। আহার ব্যবহার বিবাহাদিতে জাতিভেদ না মানিয়াও সাত্ত্বিক হিন্দুর ন্যায় চলিতেন। স্ত্রীদিগের পুরুষোচিত আচরণ ও বিদ্যার্জ্জন তাঁহার মতের বিপরীত ছিল; এজন্য ভিক্টোরিয়া কলেজ স্থাপন করেন। নিজের কন্যাদিগকে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবর্ত্তিত পুরুষোচিত উচ্চশিক্ষা এই জন্য দেন নাই। গৃহকর্ম্ম সম্পাদনের জন্য বিশুদ্ধ প্রণালী সকল প্রবর্ত্তিত করিয়া গিয়াছেন। অপৌত্তলিক সংস্কৃত একটি ধর্ম্মসমাজ সংগঠিত হয় এবং তাহা উদার ও বিশুদ্ধ নীতির শাসনে চলে, এ সম্বন্ধে তাঁহার অনেকানেক মত ছিল। দেশীয় বিশুদ্ধ আচার পুনর্গ্রহণেও কখন অবহেলা করিতেন না। ভ্রাতৃদ্বিতীয়া, পুত্রকন্যাগণের জন্মোৎসব, অন্যান্য অপৌত্তলিক দেশাচার হিন্দুর ন্যায় প্রতিপালন করিতেন। তাঁহার প্রকাশিত নবসংহিতাগ্রন্থ এ বিষয়ে লোকদিগকে অনেক তত্ত্ব শিক্ষা দিয়াছে। ভক্তি প্রেম যোগের ভাবের সহিত উহার বিধি সকল এমন সুন্দররূপে রচিত যে, তাহা পড়িলে এবং পালন করিলে সংসারে স্বর্গভোগ হয়। মাংসাহার, অশ্লীলভাষা, বাইনাচ, পশুর প্রতি অত্যাচার ও মাদকতা-নিবারণ এবং দেশের অন্যান্য যাবতীয় কুপ্রথার উন্মূলন বিষয়ে কেশবচন্দ্র অগ্রগণ্য ছিলেন। এ সম্বন্ধে যে কোন রাজবিধি বাহির হইত, লোকে মনে করিত, এ কেশব সেনের কাজ। কলিকাতার সিমলা পাড়ার কাঁসারি-

দের মন্দ সং বাহির হওয়া বিষয়ে একবার আইন জারি হয়, তাহাতে আমোদপ্রিয় লোকেরা কেশবচন্দ্রকে বড় গালাগালি দিয়াছিল। অথচ তিনি তাহার কিছুই করেন নাই। একদিকে তিনি কুপ্রথার উচ্ছেদ করিতেন, অন্যদিকে স্বাস্থ্যকর সামাজিক সুপ্রথারও সৃষ্টি করিতেন। দেশের রুচি ফিরাইবার জন্য সদলে নর্ত্তক সাজিয়া নাটক পর্য্যন্ত করিয়া গিয়াছেন। মদ্যপান, ব্যভিচার, ম্লেচ্ছরীতির বিপক্ষ হওয়াতে স্বেচ্ছাচারী বঙ্গীয় যুবকদল তাঁহার উপর বড় চটা ছিল। কেশবচন্দ্র সভ্য সংস্কৃতমনা ব্রাহ্ম হইয়াও হিন্দুসমাজের বিশেষ উপকার করিয়া গিয়াছেন।

ভবিষ্যৎ পুরাবৃত্ত লেখকের চক্ষে ভারতের সামাজিক উন্নতির যে সকল কারণ অবধারিত হইবে, তন্মধ্যে কেশবচন্দ্র একটি প্রধান কারণ হইয়া অতি বিস্তৃত ভূমি ব্যাপিয়া থাকিবেন, সন্দেহ নহে। বিদ্যালয়ের যুবকবৃন্দকে নীতি উপদেশ দিয়া, ধর্ম্মজ্ঞান শিখাইয়া তিনি সৎসাহসী বক্তা করিয়া তুলিয়াছিলেন। হিন্দুজাতিকে উন্নতির দিকে বহু দূর পর্য্যন্ত অগ্রসর করিয়া দিয়া গিয়াছেন। দেশের কুরীতি সংশোধনের জন্য কেমন করিয়া সভা ডাকিতে হয়, কিরূপে আন্দোলন করিতে হয়, তদ্বিষয়ে তিনিই পথপ্রদর্শক। আপনাকে ভুলিয়া পরের জন্য, স্বদেশের মঙ্গলের জন্য কিরূপে কার্য্য করিতে হয়, তিনি তাহার এক প্রধান দৃষ্টান্ত। পাঁচিশ বৎসর কাল অবিশ্রান্ত হিন্দু সমাজটীকে যেন তিনি আলোড়িত করিয়াছেন।

রাজনীতি

রাজভক্তি কেশবচন্দ্রের ধর্ম্মের একটি মূল মত। তাঁহার ক্ষমতা শক্তি বাগ্মিতা কোন দিন রাজদ্রোহিতাকে উৎসাহ দেয় নাই। এই জন্য তিনি রাজনৈতিক আন্দোলনে কখন যোগ দিতেন না। ইংরাজ জাতির সহিত যাহাতে দেশের প্রজাবর্গের সদ্ভাব থাকে, তজ্জন্য শত শত প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, প্রার্থনা এবং বক্তৃতা করিয়াছেন। কিন্তু রাজপ্রসাদ-লাভের জন্য লালায়িত ছিলেন না। যে বৎসর দিল্লীতে দরবার হয়, সে বার তাঁহাকে গবর্ণমেণ্ট এক খানি সার্টিফিকেট দিতে চাহিয়াছিলেন, তিনি তাহা গ্রহণ করেন নাই। প্রথমে যে বৎসরে কলিকাতায় মিউনিসিপাল কমিসনর সকল নিযুক্ত হন, তৎকালে তাঁহাকে ঐ পদ গবর্ণমেণ্ট দিতে চাহিয়াছিলেন, এবং সার রিচার্ড টেম্পল্ দিল্লী দরবারের সময় একটী মেডেল দিবার প্রস্তাব করেন। ইহার কোনটীই তিনি গ্রহণ করেন নাই। রাজভক্তির সহিত রাজকার্য্যের দোষ ঘোষণাও করিতেন। পোষ্টেল বিভাগের ডাইরেক্টর হগ সাহেব বলিয়াছিলেন, "ইলবার্ট বিল্ আন্দোলনে লোকেরা যেরূপ উত্তেজিত হইয়াছিল, তাহার উপর কেশববাবু যদি স্বীয় প্রভাব বিস্তার করিতেন, তাহা হইলে ভয়ানক কাণ্ড হইত। কিন্তু তিনি তাহা না করিয়া বরং যাহাতে শান্তি বিস্তার হয়, তাহা করিলেন। অতএব তাঁহার স্মরণার্থ আমরা যথাসাধ্য যত্ন করিব।" কৃষ্ণদাস পাল আর কেশবচন্দ্র সেন এই দুই

জন উভয় জাতির মধ্যে সেতুস্বরূপ ছিলেন। রাজভক্তির উদ্দীপনের জন্য কেশবচন্দ্র অনেক উপদেশ দিয়াছেন। ভারতেশ্বরীকে তিনি মাতার ন্যায় অবলোকন করিতেন এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্য ও শাসনের ভিতর বিধাতার প্রত্যক্ষ হস্ত দেখিতেন। প্রধান রাজপুরুষগণও তাঁহাকে বিশ্বাসী রাজভক্ত প্রজা বলিয়া আদর সম্মান যথেষ্ট করিয়াছেন। খ্রীষ্টের প্রতি অনুরাগ বশতঃ খ্রীষ্টিয়ান জাতিকে তিনি পরম মিত্র, পাদরীদিগকে পরমোপকারী বন্ধু বলিয়া কৃতজ্ঞতা দান করিতেন। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় পাঞ্জাবে রাজকীয় বিষয়ে বক্তৃতা করিতে যান, তিনি কেশবচন্দ্রের নিকট পরামর্শ গ্রহণ করেন। তিনি পরামর্শ দিয়াছিলেন যে, ব্রিটিশ শাসন বিধাতৃপ্রেরিত, এই কথা যেন প্রচার করা হয়। সুরেন্দ্র বাবু সেই ভাবেই সর্ব্বত্র বক্তৃতা করিতেন। অন্তরদৃষ্টিতে দেখিতে গেলে রাজনৈতিক আন্দোলন বিষয়েও কেশবের প্রভাব অস্বীকার করা যায় না; কিন্তু তাঁহার প্রভাব বড় স্বাস্থ্যকর ছিল। রাজকীয় সম্ভ্রমেরও তাঁহার চূড়ান্ত হইয়াছিল। মহারাণী ভিক্টোরিয়া পর্য্যন্ত তাঁহাকে সম্মান করিতেন। এত রাজভক্তি সত্ত্বেও দুষ্ট ইংরাজেরা তাঁহাকে আক্রমণ করিয়াছে; কেন না, তিনি নির্ভয়ে গবর্ণমেণ্টের সুরাব্যবসায়ের দোষ দুর্ব্বলতা দেখাইয়া দিতেন। তাঁহার রাজভক্তি আইনে বদ্ধ ছিল না, আইন পরিচালক রাজা বা রাজপ্রতিনিধির ব্যক্তিত্বে তাহা সমর্পিত হইত। তিনি অন্ততঃ কতকগুলি লোককে রাজভক্ত করিয়া গিয়াছেন। রাজনৈতিক বিজ্ঞানের আলোচনা যথেষ্ট করিতেন।

সংবাদপত্রে তদ্বিষয়ে যুক্তিসঙ্গত নীতিগর্ভ প্রবন্ধ অনেক লিখিয়াছেন। হোলকার প্রভৃতি বড় বড় রাজারা তাঁহার নিকট এ বিষয়ে পরামর্শ এবং সহায়তা ভিক্ষা করিতেন।

জ্ঞানপ্রতিভা

কেশবচন্দ্র বাল্যকাল হইতেই সহজজ্ঞান ও বুদ্ধিশক্তিতে বিশেষ প্রতিভাশালী ছিলেন। তিনি সৃষ্টপদার্থ, গ্রন্থ এবং মনুষ্যের ভিতর হইতে যাহা সার, তাহাই নিংড়াইয়া লইতেন। অসার বিষয় লেখা কি পড়া তাঁহার ছিল না। তাঁহার রচনা কিংবা বক্তৃতা উপদেশে সারবত্তা অধিক থাকিত, ভাষা অলঙ্কারের দিকে তিনি দৃষ্টি করিতেন না। তিনি বলিতেন, আমি ইংরাজি জানি না, বক্তা আমি নই। ইহা বিশ্বাসের কথা; বিনয়বাক্য নহে। মাথাটি এমন পরিষ্কার, যেন দর্পণের মত। এই জন্য ধর্ম্মরাজ্যে যেখানে যাহা সার পদার্থ ছিল, তাহা উদ্ধার করিয়া লইতে পারিয়াছিলেন। ঈশা মুসা চৈতন্য শাক্য মহোম্মদ সক্রেটিশ পল রামমোহন দেবেন্দ্রনাথ প্রভৃতি মহাত্মাগণ বড় লোক এ কথা সকলেই স্বীকার করে, তাঁহাদের গুণের সাধারণ প্রশংসা সকলেই করিয়া থাকে; কিন্তু কাহার চরিত্রে কোন্‌টি বিশেষ গুণ, তন্মধ্যে আমাদের পক্ষে কোন্‌টিই বা শিক্ষণীয় ও ফলপ্রদ, ইহা নির্ব্বাচন অল্প লোকেই করিতে পারে। কেশবচন্দ্র দিব্যজ্ঞানে এ সমস্ত নির্ব্বাচনপূর্ব্বক আপনার করিয়া লইয়াছিলেন। মানবস্বভাব বিলক্ষণ বুঝিতে পারিতেন। মহাজন-

দিগের সম্বন্ধে যেমন, তেমনি আবার ধর্ম্মশাস্ত্রের কোথায় কি সার বস্তু আছে, তাহাও লইতে পারিতেন। হিন্দু বৌদ্ধ খ্রীষ্টান ধর্ম্মের কত শত প্রহেলিকাবৎ জটিল মত তিনি ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন। তেমন ব্যাখ্যা পূর্ব্বতন মহাজনদিগের মুখেও কেহ শুনেন নাই। নিজের ভিতর এত তত্ত্ব উদ্ভূত হইত যে, তাহা ভোগ করিয়া শেষ করিতে পারিতেন না। মধ্যে মধ্যে বলিতেন, "কত যে আমার এখনো বলিবার আছে, তাহার অন্ত করিতে পারি না।" বিদ্যা উপার্জ্জনে প্রাচীন হইয়া গিয়াছেন যে সকল ব্যক্তি, তাঁহাদের নিকট ছাত্রের ন্যায় থাকিতেন; কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তিনি লোকগুরু গভীরদর্শী পণ্ডিত। ঘোর বিষয়ী চতুর ব্যক্তিরাও তাঁহার নিকট বিষয়বুদ্ধির পরামর্শ লইত। উপার্জ্জিত জ্ঞান বিজ্ঞান তাঁহার সহজজ্ঞানের নিকট নিষ্প্রভ হইয়া যাইত। দৈববিদ্যা তিনি লাভ করিয়াছিলেন, সুতরাং তাঁহার নিজের বিশেষ নির্দ্দিষ্ট কার্য্যের পক্ষে যে জ্ঞান প্রয়োজন, তাহার অভাব কোন কালে থাকিত না। কেশবের প্রতিভা সম্বন্ধে ইয়োরোপ আমেরিকার বিজ্ঞজনেরা প্রশংসা করিতেন। প্রধান আচার্য্য এক সময়ে এইরূপ বলিয়াছিলেন;—"কেশবের মধ্যে আধ্যাত্মিক অন্তরদৃষ্টি এত অধিক পরিমাণে বিদ্যমান ছিল যে, তাঁহার সহিত আলাপ করিয়া ধর্ম্মজ্ঞান ও ধর্ম্মশাস্ত্র সমুদায়ে সুপণ্ডিত ব্যক্তিরও চমৎকার বোধ হইত। যে কোন প্রকারের, যতই কঠিন হউক না কেন, ধর্ম্ম ও আধ্যাত্মিক বিষয়ে প্রশ্ন করিবামাত্র অষ্টাদশ বর্ষীয় যুবা কেশবচন্দ্র নিজ স্বভাব-সুলভ সরলভাবে ও ভাষায়

সেই প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিতেন। বেঁদ কোরাণ জেন্দাভেস্তা বাইবেল প্রভৃতি গ্রন্থসকলের কোন স্থানেই ঐরূপ উত্তর পাওয়া যাইত না; সুতরাং উহা কেশবের নিজের হৃদয়ের উত্তর, অথচ অতি প্রাঞ্জল, জ্ঞানগর্ব্ব, হৃদয়গ্রাহী, শ্রবণমাত্র ব্যুৎপত্তি-প্রদায়ক বলিয়া অনুভূত হইত। আমি বেদ ও বাইবেল তন্ন তন্ন করিয়াও ঐরূপ ভাব পাইতাম না। কোন স্থানে কখন পড়ি নাই, অথচ আমার হৃদয়ের ভাবের সহিত মিলিয়া যাইত। আমি প্রতিদিনই কেশবের সন্দর্শন লাভমাত্র ঐরূপ দুই একটী প্রশ্ন উপস্থিত করিতাম; মুহূর্ত্তেকের মধ্যেই যেন নিজের বিদ্যালয়ের অভ্যস্ত পাঠাবৃত্তির ন্যায় উত্তর প্রদান করিতেন। কেশবের অভিনবত্ব এত অধিক ছিল যে, হস্তাক্ষর পর্য্যন্ত সুন্দর। যে ভাষায় হউক না কেন, সেই ভাষা জানুন বা না জানুন, যেরূপ অক্ষর দেখিতেন, অবিকল তাহার প্রতিলিপি করিতে পারিতেন। একদা আমি তাঁহাকে পারসি ভাষার পুস্তক দিয়াছিলাম। সেই পুস্তক কলিকাতার কোন দোকানে পাওয়া যাইত না। কেশবের তখন পারসি বর্ণ-পরিচয় হয় নাই। কিন্তু তিনি পারসি পড়িবেন বলিয়া ঐ পুস্তকখানি আমার নিকট হইতে লইয়া যান। পর দিন প্রাতে আসিয়া ঐরূপ আর একখানি পুস্তক আমাকে দেখাইলেন। উহা ছাপা বোধ হইল। আমি আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া কহিলাম, এই পুস্তক তুমি কোথায় পাইলে? সুন্দর ছাপা, চমৎকার বই! কেশব বলিলেন, ভাল করিয়া দেখুন। আমি অনেকক্ষণ দর্শনের পরেও কহিলাম, ইহা নিশ্চয় ছাপা,

তুমি কোথায় পাইলে ? 'শেষে কেশব হাস্যান্বিত হইয়া আমার কৌতূহল ভাঙ্গিয়া বলিলেন, ইহা আপনার পুস্তকের অবিকল প্রতিলিপি করিয়া আমি স্বহস্তে লিখিয়াছি" [প্রভাতী]

ধর্ম্মমতগুলি বিজ্ঞান যুক্তি ইতিহাস দ্বারা অতি পরিষ্কাররূপে গঠন করিয়া গিয়াছেন। যাহা বলিতেন, তদপেক্ষা শতগুণ ভাব অন্তরে থাকিত। যেমন ধর্ম্মজ্ঞান প্রখর ছিল, তেমনি আবার বিষয় কর্ম্মের সূক্ষ্মতা তিনি বুঝিতে পারিতেন। আদি-সমাজ ছাড়িয়া আসার পর, ভারতবর্ষীয় সমাজের দলাদলি পর্য্যন্ত তাঁহাকে অনেক বার অনেক বিপদে পড়িতে হইয়াছিল। তাহাতে আইন কাননের তত্ত্বও অনেক ঘাঁটিতে হইত। কিরূপ সভা করিলে তাহা বিধিসঙ্গত হয়, তাহা বেশ বুঝিতে পারিতেন। মিরার পত্রিকা দেবেন্দ্রবাবুর হস্ত হইতে বহুকষ্টে উদ্ধার করেন। ভাব ভক্তির তরঙ্গে ভাসিয়াও আসল কাজ ভুলিতেন না। ব্রহ্মমন্দির নিজনামে যদি লেখা পড়া করিয়া না রাখিতেন, এত দিন উহার কি দশা হইত, বলা যায় না। অন্য যুবকেরা কেবল উৎসাহ মত্ততায় ঘুরিয়া বেড়াইতেন। কেশব আপনি মাতিয়া তাঁহাদিগকে মাতাইলেন; অথচ ভবিষ্যৎ ভাবিয়া পাকা দলিল করিয়া রাখিলেন। শেষ নেশা ছুটিয়া গেলে অনেকের চৈতন্য উদয় হইল। তাঁহাকে চতুর বলিয়া এ জন্য অনেকে দোষ দেন, কিন্তু তিনি কি করিবেন ? কাহার হস্তে তেমন সামগ্রীটি দিবেন ? বিশ্বাসী ধর্ম্মপিপাসু মাত্রেই বলিত, উত্তম পাত্রে উহা আছে। ভিতরে আন্তরিক মঙ্গল কামনা ছিল, তাহার সঙ্গে

বুদ্ধি ক্ষমতাও তিনি ব্যবহার করিয়াছেন। মৃত আইনের অক্ষরের শর্ত্ত পূর্ণ করা তাঁহার ব্রত ছিল না, যাহাতে ধর্ম্ম থাকে, তাহাই করিতেন। তাহার সঙ্গে বুদ্ধি বিদ্যার যোগ ছিল। অবশ্য ইহার অনুকরণ ফল বড় বিষময়। কারণ, তাঁহার উচ্চ ভাব না পাইলে কে সে পথে চলিতে পারে ?

পৃথিবীতে সচরাচর জ্ঞানী পণ্ডিত বলিয়া যাঁহারা বিখ্যাত, কেশব সে শ্রেণীর জ্ঞানী ছিলেন না। ইহা তিনি নিজমুখে স্বীকার করিতেন। তাঁহার বক্তৃতাশক্তি প্রসিদ্ধ বলিয়া সকলে জানেন, কিন্তু তিনি তাহা মানিতেন না। কত কত যুবক তাঁহার নিকট বক্তৃতা করিবার সঙ্কেত শিখিতে চাহিত। তাহারা জিজ্ঞাসা করিত, কোন্ কোন্ পুস্তক পড়িলে আপনার মত বক্তৃতা করিতে পারা যায় ? তিনি হাসিতেন। টাউনহলে যে সমস্ত গুরুতর বিষয়ে প্রতি বর্ষে বক্তৃতা করিতেন, তাহা মুখস্থ বক্তৃতা নহে ; কিন্তু তাহার একটি ছবি অগ্রে আঁকিতেন। যে কয়টি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ আবশ্যক, তাহা মনে অঙ্কিত করিতেন ; কিন্তু কাহার সহিত কোন্‌টির কি সম্বন্ধ, তাহার প্রকৃত অর্থ বক্তৃতার সময় ভাল বুঝা যাইত না। তখন তাঁহার ভাব ভঙ্গী ও ভাষার সৌন্দর্য্যে শ্রোতৃগণ স্তম্ভিত হইয়া থাকিতেন। পরে বাড়ী আসিয়া বন্ধুদিগকে পুনর্ব্বার তিনি তাহা বুঝাইয়া দিতেন। তখন দেখা যাইত, তাহার ভিতর কেমন একটি সর্ব্বাবয়বসম্পন্ন ছবি বর্ত্তমান ছিল। গভীর চিন্তার উপর মধুর ভাব দিয়া তিনি উহাকে সাজাইতেন। এই জন্য না বুঝিয়াও

লোকে মুগ্ধ হইত। তাঁহার বিদ্যা ছিল না, কিন্তু বিদ্যাদেবী তাঁহার সহায় ছিলেন। এই জন্য সকলই বুঝিতে পারিতেন। তাঁহার মস্তক, চক্ষু, মুখের গঠন দেখিয়া ইয়োরোপের লোকেরা বড় লোক বলিয়া চিনিতে পারিয়াছিল। কেশব যাহা জানিতেন না, যাহা শিখেন নাই, তাহাও বুঝিতে পারিতেন। পবিত্রাত্মা বিদ্যাদেবীর সন্তান যিনি, তিনি দৈববিদ্যাবলে জড় এবং জীবতত্ত্বের গূঢ়তম সংবাদ পাঠ করিতে পারেন।

কার্য্যশৃঙ্খলা ও উদ্যম

ভুবনবিখ্যাত কেশবচন্দ্রের প্রত্যেক কার্য্যসম্বন্ধে যেমন পরিষ্কার মত ছিল, এবং সেই সমস্ত মত যেমন ঈশ্বরের শাসনবিধি এবং ইচ্ছার অন্তর্গত, তেমনি কার্য্যপ্রণালী অতি পরিপাটী ছিল। শরীরটী, আহার, পরিচ্ছদ, বাসস্থান, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। অন্তঃকরণটী যেমন নির্ম্মল দর্পণের ন্যায় স্বচ্ছ, প্রত্যেক কার্য্যের ব্যবস্থা তেমনি সুন্দর। কিরূপে ধর্ম্মরাজ্য শাসন করিতে হয়, জনসমাজ কিরূপে সত্যের পথে স্থির থাকিতে পারে, তাহা বেশ জানিতেন। অনিয়মে কোন কার্য্য করিতেন না। "নবসংহিতা" গ্রন্থ তাঁহার বিধিসৃজনী-শক্তির নিদর্শন। কঠোর সামাজিক নিয়ম ও কর্ম্মকাণ্ডের মধ্যে এত ভাব রস দিয়াছেন যে, উহা পড়িলে উপাসনার কার্য্য হয়। মানবস্বভাব কি আশ্চর্য্যরূপে বুঝিতে পারিতেন, তাহাও ইহাতে বুঝা যায়। ইহার অক্ষরের উপর স্বাধীনতা দিয়া ভাব লইতে অনুরোধ

করিয়াছেন। চিঠি কি সংবাদপত্রের জন্য কাপি লিখিবেন, তাহা এমনি পরিষ্কার এবং স্পষ্টাক্ষরে লিখিবেন যে, দেখিলে চক্ষু জুড়ায়। ঠিক ছাপার মত করিয়া লিখিতে পারিতেন। কম্পোজিটারেরা তাঁহার হাতের কাপি পাইলে পরমাহ্লাদিত হইত। চিঠি এবং তাহার খাম অতি সুন্দর করিয়া লিখিতেন। বাক্সের কাগজ কলম, পত্রাদি যেখানে যেটি প্রয়োজন, সেইখানে তাহা থাকিত। সংবাদপত্র পরিচালনা বিষয়ে অতিশয় সুদক্ষ ছিলেন। কি কি বিষয় কোন্ ভাবে লিখিলে কাগজখানি সুপাঠ্য হয়, তাহা সুন্দররূপে বুঝিতে পারিতেন। সহকারী বন্ধুগণ এ সম্বন্ধে অনেক অবিবেচনার কর্ম্ম করিয়া ফেলিতেন। এ জন্য একবার কয়েকটি নিয়ম কাগজে ছাপাইয়া দেন। সে নিয়মগুলি অতিশয় হিতকর হইয়াছিল। ছাপার ভুল, ভাব এবং ভাষার দোষ আশ্চর্য্যরূপে ধরিয়া দিতে পারিতেন। প্রকাশ্য সভা এমন করিয়া চালাইয়া দিতেন যে, তাহাতে বিপক্ষ দলের দিগ্‌গজ দিগ্‌গজ বিদ্বানেরা ঘোল খাইয়া যাইত। বিধি ব্যবস্থা নিয়মপ্রণালী রচনা বিষয়ে অত্যন্ত গভীর দৃষ্টি ছিল। বাল্যলীলা হইতে নববিধানের ধর্ম্মসমন্বয় পর্য্যন্ত চিরদিন নেতার কার্য্যই করিয়া আসিয়াছেন। তাঁহাকে জন্মনেতা বলা যায়। ভগবান্ এই কাজেই তাঁহাকে পাঠাইয়াছিলেন। সমস্ত কার্য্য দল বাঁধিয়া করিতেন। অন্য যুবকেরা আহ্লাদের সহিত বরাবর তাঁহার পশ্চাতে চলিত। কেশবের অনুবর্ত্তী হওয়া অনেকের গৌরবের বিষয় মনে হইত। কেশব সেনের লোক বলিলে

আফিসের অনেক সাহেবও ব্রাহ্মদিগকে মান্য করিত। সভা করিয়া ন্যায়যুদ্ধে কেহ তাঁহার উপর জয় লাভ করিতে সক্ষম হইত না। একবার কতকগুলি বিরোধী ব্রাহ্ম ব্রহ্মমন্দিরে অধিকার স্থাপনের জন্য অনেক চেষ্টা করেন। দলিল দস্তাবেজ সঙ্গে লইয়া তাঁহারা রণক্ষেত্রে দাঁড়াইলেন। কত বিতণ্ডা বাগাড়ম্বর করিলেন। অবশেষে যাইবার সময় আচার্য্যের মতে মত দিয়া তাঁহাদিগকে ঘরে ফিরিতে হইল। প্রায় পাঁচ ঘণ্টা কাল এইরূপ সংগ্রাম চলিয়াছিল। বিপক্ষের মন নরম করিবার জন্য কেশবচন্দ্র এক ঘণ্টা বক্তৃতা প্রার্থনা করিয়াছিলেন। এ সকল বীরত্বের লক্ষণ। বিবাহ আইন পাসের সময় কি আদিসমাজ কম হাঙ্গামা করিয়াছিলেন? কিন্তু কিছুই করিতে পারেন নাই। এ সব দেখিয়া শেষে লোকে ভয় করিত যে, বুদ্ধি বিচারে কেশব সেন হারাইয়া দিবে। ধর্ম্মসম্বন্ধেও লোকের বিলক্ষণ ভয় ছিল। তাহারা বলিত, তিনি প্রার্থনায় যাদু করিয়া ফেলেন। কি ধর্ম্মেতে, কি বিদ্যা বুদ্ধি ক্ষমতাতে কেহ তাঁহাকে আঁটিয়া উঠিতে পারিত না। বড় বড় ইংরাজেরা পর্য্যন্ত ভয় করিত। সমাজের কাজ কর্ম্মে যেমন নিয়ম প্রণালী, ভদ্রতা সভ্যতার দিকেও তেমন যথেষ্ট দৃষ্টি ছিল। ধর্ম্মবন্ধু সহচরবৃন্দ তাঁহাকে ভৃত্যের ন্যায় সেবা করিতেন। অন্য লোকে সে সব কাজ দেখিয়া পাছে ঘৃণা করে, তজ্জন্য বড় কুণ্ঠিত হইতেন। বিশেষ বিশেষ স্থলে তাঁহাদের সেবা লইতে চাহিতেন না।

একদিকে প্রবল উৎসাহ, অন্যদিকে শান্তি, দুয়ের মিলনে

তাবৎ কার্য্য নিষ্পন্ন করিতেন। ট্রেণে যাইবার সময় ঘড়ি ধরিয়া ঠিক সময়ে বাহির হইতেন। সঙ্গের দ্রব্যাদি এমনি করিয়া গোছাইয়া লইতেন যে, পথে আর কোন দ্রব্যের অভাব থাকিত না। সহস্র অশ্বের বলে তাঁহার জীবনযন্ত্র চলিত, অথচ কোথাও প্রায় দুর্ঘটনা ঘটিত না। উৎসাহ উদ্যম বেশী হইলে অনেকে কাজে ভুল করিয়া ফেলে, কেশবচন্দ্রের উদ্যম শান্তি সমান ওজনে কার্য্য করিত। সহসা দেখিলে মনে হইত, বুঝি চুপ করিয়া বসিয়া আছেন, বুঝি বা আলস্যে কাল হরণ করিতেছেন ; কিন্তু ভিতরে তখনও মহাগ্নি জ্বলিত। গুরুতর দায়িত্বের ভার মস্তকে ছিল, অন্যেরা হাত মুখ গুটাইয়া নিদ্রিত হইল, আর তাহাদের কোন ভাবনা নাই ; কিন্তু কেশবের মস্তিষ্ক সেই গভীর নিশীথ সময়ে নানা চিন্তায় আকুল রহিয়াছে। তেমন দায়িত্ববোধ কি আর কাহারো হয় ? অসীম দায়িত্ব। যেমন দায়িত্ব জগদ্‌ব্যাপী, কার্য্যও তেমনি অফুরন্ত। বকিতেও কি কম পারিতেন! প্রতি দিন উপাসনায় তিন ঘণ্টা বকুনি, বিশেষ দিনে লোকজনের সঙ্গে ধর্ম্মালাপ, ছেলেদিগকে ধর্ম্মতত্ত্ব শিক্ষাদান, মন্দিরে উপাসনা, রসনা বিশ্রাম অতি অল্পই পাইত। মস্তক, হৃদয় এবং মুখ প্রভুর কার্য্যে নিয়ত ব্যস্ত হইয়া থাকিত। মনে কর, বড় বড় লোহার এঞ্জিনগুলি দুই তিন বৎসরের বেশী আর চলে না, ক্ষয় হইয়া যায় ; মনুষ্যের শরীর আর কত সহিবে ? এই জন্য কেশবচন্দ্রকে রোগে বড় ভুগিতে হইত। আশ্চর্য্য এই যে, ব্যারাম সারিতে না সারিতে অমনি নির্দ্দিষ্ট পথে ছুটিতেন। জীবনের গতিক্রিয়া কি অদ্ভুত!

পীড়ার সময় বোধ হইত, যেন কেহ কেশবের হাতে পায়ে শিকল বাঁধিয়া রাখিয়াছে। শরীর শ্রান্ত হইয়া পড়ে, মন বলে তুই দৌড়ে চল্ না? পঁচিশ বৎসর ক্রমাগত তাঁহার এই ভাবে কাটিয়াছে। এমন এক অসাধারণ অননুভূত ব্রহ্মাগ্নি ছিল, যদ্দারা আর্দ্রকাষ্ঠরূপ স্বার্থপর মনুষ্যদিগকে তিনি জ্বালাইয়া তুলিতে পারিতেন। বাক্যে, মুখে, চক্ষে, হস্ত পদে, কণ্ঠেতে শতধা হইয়া সে অগ্নি নিরন্তর বাহির হইত। এরূপ মনুষ্য পৃথিবীতে এই জন্য অধিক দিন বাঁচে না। আমাদের ভাবের উদয় হইলে বুক দুর দুর করে, শরীর কাঁপে, চক্ষে জল ঝরে, সর্ব্বাঙ্গ যেন কেমন করিতে থাকে; জগৎহিতৈষণার প্রভূত ভাবরাশি তাঁহার হৃদয়ে উথলিয়া উঠিত, কিন্তু তিনি চাপিয়া রাখিয়া অল্পে অল্পে ধীরে ধীরে তাহার ব্যবহার করিতেন। মহা অগ্নির উত্তাপের মধ্যে সর্ব্বদা বাস ছিল। এক স্থানে বলিয়াছেন, "বাল্যকালাবধি আমি অগ্নি-মন্ত্রের উপাসক, অগ্নিমন্ত্রেরই পক্ষপাতী। অগ্নির অবস্থাকে পরিত্রাণের অবস্থা জ্ঞান করি। ইহা যে সাময়িক বীরত্বের ভাবে দেখা যাইতেছে, তাহা নহে। উত্তাপের অর্থই জীবন। সততই উৎসাহের অগ্নি জ্বালিয়া রাখিতাম। ক্রমাগত নূতন ভাব লইবার, নূতন পাইবার, নূতন সম্ভোগ করিবার ইচ্ছা হইতেছে। একটু ঠাণ্ডা ভাব দেখিলাম, বলিলাম, 'দয়াময়, এ বিপদ হইতে সন্তানকে বাঁচাও', এই বলিবামাত্র হোমের আগুন জ্বালিলাম, ঘি ঢালিতে লাগিলাম। নিষ্ক্রিয় হওয়া আমার পক্ষে সহজ নহে। দল ছাড়িয়া এক স্থানে লুকাইয়া থাকা এক প্রকার অসম্ভব।"

আদেশ-শ্রবণ

কেশবচন্দ্র আদেশ-শ্রবণ বিষয়ে লোকের মধ্যে এক ঘোর পরিবর্ত্তন আনিয়া দিয়া গিয়াছেন। ইহা ধর্ম্মের মূল, সত্যাসত্য ধর্ম্মাধর্ম্ম প্রভেদ করিবার যন্ত্র। বিবেকবাণী বলিয়া যে শব্দ সচরাচর উক্ত হইয়া থাকে, অন্তরের যে শক্তি দ্বারা লোকে সত্য ন্যায় কর্ত্তব্য নির্ণয় করে, তাহাই তাঁহার আদেশ। অনেকের পক্ষে ইহা ফলাফলের উপর নির্ভর করে, কিন্তু আচার্য্য কেশবচন্দ্র ফলাফলনিরপেক্ষ ঈশ্বরপ্রেরিত দিব্যজ্ঞানকে আদেশ বলিতেন। এইরূপ তাঁহার উপদেশ আছে ;—"অন্তরে যদি কেহ কথা কয়, সাধারণ লোকে তাহাকে ভূত বলিয়া মানে। যে ব্যক্তি প্রেতগ্রস্ত হইয়াছে, সেই ভিতরের এবং বাহিরের বাণী শ্রবণ করে। ধর্ম্মজীবনের আরম্ভ অবধি অনেক সময় এই প্রকার বাণী ভিতরে এবং বাহিরে শ্রবণ করিয়াছি। অথচ তাহা প্রেত-বাণী বলিয়া মনে করি নাই। এক জনের ভিতর দুই জন থাকে, দুইটী ভিন্ন ভিন্ন স্পষ্ট স্বর শ্রবণ দ্বারা আয়ত্ত করা যায়। এমন এক জনকে স্পষ্ট অনুভব করি, তাঁহার কথা শুনিয়াই ধর্ম্মকার্য্য করিতে চাই। ইহা যদি উন্মাদের ব্যাপার হয়, তবে আমি এ প্রকার উন্মাদগ্রস্ত হইতে অভিলাষ করি। এই বাণীর প্রতি আমি এক চুলও অবিশ্বাস করিতে পারি না। এ শব্দ বন্ধুর নয়, পিতা মাতা স্ত্রী পুত্রের নয়, আমার নিজের নয়, পুস্তকের শিক্ষিত সত্য নয়, পূর্ব্ব কালের কথা স্মরণপথে উদিত হইল এরূপও নয়,

কল্পনাদেবী ভাল ভাল রঙ দিয়া দিয়া চিত্র করিলেন, তাহাও নয়। কোন পাপ হইতে নিবৃত্ত হইবার জন্য, কি কোন সদনুষ্ঠান আরম্ভ করিবার জন্য তিনি বলিতেছেন। নিজে এ সকল কার্য্য করিতেছি, ইহা একবারও মনে হয় না। যিনি স্বভাবকে এই প্রকার স্বভাব দিয়াছেন, তিনিই বলিতে পারেন, আপনার ভিতর এই প্রকার শব্দ শুনিলে লোকের মনে কিরূপ ভাবের উদয় হয়। বুদ্ধি চেষ্টা করিয়া, কত উপায় অবলম্বন করিয়া এই বাণীকে তাড়াইতে পারে নাই। এই যে ভাল কথাগুলি, এ সব ঈশ্বরের, আর মন্দ কথা সমস্তই আমার। যেখানে আপনার বুদ্ধি দেখাইতেছে দৈন্য অসুস্থতা, অপমান, সেই খানে একটি লোক বলিতেছে, 'কুস্ পরোয়া নেই!' বার বার ইহারই জন্য আত্মীয় কুটুম্ব পরিত্যাগ করিতে হইয়াছে, বহু কষ্টের মুখে পড়িতে হইয়াছে। আমার এ বিশ্বাস এখন যে কেহ হাসিয়া উড়াইবে, তাহা পারিবে না। বিশ বৎসরের বিশ্বাস। বার বার ভিতরের পুরুষ কথা কয়। আপীলের আদালত খোলাই রহিয়াছে। ভগবান্ বলিতেছেন ভিতরে, ইহাই আমাকে শুনিতে হয়; নতুবা সাত শত ভূতের জ্বালায় আপনাকে জ্বালাতন বোধ করিতে হয়। অত বড় পণ্ডিত যে সক্রেটিশ, তিনিই এই ভূতের কথা শুনিতেন। ফলাফল বিচার করিয়া বিশ্বাস করি নাই। ঈশ্বরের প্রশংসা কেন নিজে হরণ করিব? নিজের দোষ কেন ঈশ্বরের স্কন্ধে আরোপ করিব? হে জীব, বলিতে পার, 'তোমার যদি ভাল খাইবার সাধ যায়, নিজের দুষ্কর্ম্ম ও কামনার মত বাণী সকল তুমি

ঈশ্বরের মুখ হইতে বাহির করিবে।' কিন্তু কেহ প্রবঞ্চিত হইতে পারে বলিয়া আমি ধর্ম্ম ছাড়িতে পারি না। এ বিষয়ে আমাকে অনুতাপ করিতে হয় নাই। আমি দেখিতেছি, জীবাত্মা আর পরমাত্মা এক বাটীতে গোলা। আমার হাতের ভিতর তাঁর হাত, রসনার ভিতর তাঁর রসনা, প্রাণের মধ্যে অনন্ত প্রাণবায়ু। যখন আমি বলি, আমার আত্মিক ভাবে উচ্চারিত হয়, জিহ্বা মাংসখণ্ডে নয়। যখন তিনি বলেন, তাঁরও কথা আত্মিক ভাবে উচ্চারিত হয়। আত্মার কথা লোহার তার, নদীর তর তর শব্দ, কি পাখীর সুস্বরের ন্যায় নহে; অথচ তাহা আশ্চর্য্যকর ও অত্যন্ত সুস্বর।"

এই আদেশবাণী সম্বন্ধে কেশবচন্দ্র পৃথিবীতে কতই না অপমানিত হইয়াছেন! কিন্তু তাঁহার কথা পৃথিবী এখন হাজার হাজার বৎসর ভাবিতে চলিল। অনেক গভীর অধ্যাত্ম বিজ্ঞানের তত্ত্ব ইহাতে আছে।

আধ্যাত্মিক রহস্য

ভক্ত কেশব এক দিকে যেমন নিরাকারবাদী ব্রাহ্ম হইয়াও বাহ্য ক্রিয়া কর্ম্মের চূড়ান্ত করিয়াছেন, তেমনি অন্যদিকে যাহাতে কুসংস্কার নরপূজা জড়াসক্তি পৌত্তলিকতা কল্পনা না আইসে, তাহার বিষয়েও তীব্রভাবে উপদেশ দিয়া গিয়াছেন। ইদানীং রূপক-বর্ণনা, বাহ্যাবলম্বন, কর্ম্মকাণ্ডের যেরূপ প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল, দুর্ব্বলমনা ভাবান্ধ ব্যক্তিদিগের পক্ষে তাহা একটি

প্রবলতর প্রলোভন।* কারণ, সে সকল লোক একবার যদি বাহিরের কতকগুলি পদার্থ ধরিতে পায়, সহজে আর তাহা ছাড়িতে চাহে না, এবং বাহ্য ছাড়িয়া আন্তরিক পথে যাইতেও পারে না। তৎসম্বন্ধে পদে পদে তিনি সাবধান করিয়া দিতেন। নববিধান আপাতদৃষ্টিতে পৌত্তলিক ভাবের প্রতি যেরূপ উৎসাহ দিয়াছিল, তাহাতে অনেকে ভাবিতেন, বড় সুবিধাই হইল; কিন্তু সেরূপ সুবিধা বড় ছিল না। একটু অসার মিথ্যা কল্পনা, অদ্বৈতবাদ, অবতারবাদ, মধ্যবর্ত্তিত্ব, কি পৌত্তলিকতার গন্ধ তিনি সহ্য করিতে পারিতেন না। সে বিষয়ে অনেক নিষ্ঠুর উপদেশ দিতেন। সাধু ভক্তের ঐতিহাসিক, কিংবা শারীরিক কোন নিদর্শন লইয়া যে শেষ টানাটানি করিবে, আর তাঁহাদের চরিত্রের অনুকরণ বিষয়ে উদাসীন থাকিবে, সে পথ খুলিয়া রাখেন নাই। "মহৎ লোকেরা কোথা? কোথাও না। তাঁহারা কেবল চরিত্রের সঙ্গে সংযুক্ত। তাঁহারা তোমার আমার নিকট নামিয়া আসেন না, তাঁহাদের মত বিশুদ্ধ-চরিত্র হইলে তবে উভয়ের যোগ হয়।" এইরূপ উপদেশ দিয়া গিয়াছেন। এডেন হইতে সেবার ব্রাহ্মবন্ধুদিগকে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহাতে আছে, "তোমরা কোন প্রকার পৌত্তলিকতা পোষণ করিবে না।" পাছে পৌত্তলিকতা আইসে, সে জন্য ব্রহ্মমন্দিরে কোন ব্যক্তির স্মরণচিহ্ন রাখিতে দিতেন না। বাহিরের অবলম্বনে যত ভাব সংগ্রহ করিতে পার কর, কিন্তু উপায়কে উদ্দেশ্য করিতে পারিবে না, এইরূপ

উপদেশ। ভক্তির বাহ্য আড়ম্বর সম্বন্ধেও এইরূপ সাবধান করিয়া দিতেন। এ বিষয়ে সচরাচর গাঁজাখোরের দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিতেন। তাহারা যেমন ধোঁয়া গিলিয়া অল্পে অল্পে ছাড়ে, ভিতরে নেশাটাকে খুব জমাইয়া লয়, তদ্রূপ ভক্তির সাধন চাই। পৌত্তলিকদিগের ব্যবহৃত অনেক শব্দ এবং অনুষ্ঠান তিনি গ্রহণ করিয়াছিলেন, সে জন্য অনেকে বলিত, কেশব বাবুর এ সব কার্য্যে অবশেষে কুসংস্কার ও পৌত্তলিকতা আসিবে। তাহা শুনিয়া তিনি হাসিতেন। অপব্যবহার হইবে বলিয়া কোন সুনিয়ম সদুপায় গ্রহণে ভীত হইতেন না। ঈশ্বরকে লক্ষ্মী সরস্বতী কালী দুর্গা গোপাল ইত্যাদিরূপে বিভাগ করিয়া করিয়া, শেষ চিদাকাশ স্বরূপ বলিয়া উপদেশ দিলেন। তাহাতেই সমস্ত সন্দেহ মীমাংসা হইয়া গেল। তাঁহার অক্ষর লইয়া যে থাকিবে, সে ভয়ানক গোলের মধ্যে পড়িবে। কারণ, তাহাতে সকল প্রকার অর্থই ঘটান যাইতে পারে। কিন্তু তিনি মহোম্মদ কালাপাহাড়ের ন্যায় পৌত্তলিকতার শত্রু। থাঁটি অমিশ্র চিন্ময় দেবতাকে চক্ষু কর্ণ নাসিকা হস্ত পদ এবং বিচিত্র বর্ণ ও অলঙ্কার দিয়া সাজাইতেন। তদ্বিষয়ে বাক্যার্থ যদি লও, তাহা হইলে হয় তাঁহাকে পাগল, নয় পৌত্তলিক অজ্ঞানান্ধ বলিবে। আবার আধ্যাত্মিক যৌক্তিক ব্যাখ্যান শুনিলে, হয় রাগে অন্ধ, না হয় হতবুদ্ধি হইয়া বলিবে, এ লোকটা কি রকমের? কি বলে, কিছুই বুঝিতে ·ারা যায় না। বাস্তবিক তিনি বড় মজার লোক ছিলেন।

এক্ষণে তাঁহার বিশুদ্ধ ভাবের ভাষা সকল টীকাকার ও ভাষ্যকার মহাশয়দের অনুগ্রহের উপর রহিয়া গেল। ফলতঃ তাঁহার মত বিশ্বাস কার্য্যপ্রণালী সমস্ত অদ্ভুত প্রহেলিকাবৎ। সহসা নির্ব্বোধ পাগল কিংবা বুজরুক বলিয়া উড়াইয়া দিতে পারিবে না। এমন বিজ্ঞান যুক্তি দেখাইবেন যে, তাহাতে বড় বড় পণ্ডিতের মাথা ঘুরিয়া যাইবে। অথচ প্রকৃত শব্দার্থ কি, তাহাও সহজে খুঁজিয়া পাইবে না; জীবনবেদের আশ্চর্য্য-গণিত অধ্যায়ে বলিয়াছেন, "যে দেশ হইতে আমি আসিয়াছি, সেখানকার রীতি পদ্ধতি এখানকার সহিত ঐক্য হয় না। তেজের সহিত বলিব, সে অঙ্কশাস্ত্র অতীব আশ্চর্য্য; কেন না, তাহার মতে তিন হইতে পাঁচ লইলে সতের অবশিষ্ট থাকে। যেখানে বলিয়াছি, অল্প হইতে বহু বাদ দিলে অনেক বাকী থাকে, সেই খানেই জিতিয়াছি। গৃহনির্ম্মাণ করা উচিত বুঝিলাম, অমনি করিলাম। তার পর পত্তন ভূমি নির্ম্মাণ করিলাম। যাহারা ভিত্তি পত্তন করিয়া গৃহ নির্ম্মাণ আরম্ভ করে, তাহাদিগকে আমরা নির্ব্বোধ বলি। আগে ভাবিয়া করিবে না। আগে করিয়া পরেও ভাবিবে না। আমাদের দেশের লোকে কন্যার বিবাহ দিতে হইলে কেবল আকাশের দিকে তাকায়; বলে হরি, তোমার এই কন্যার কি বিবাহ দিতে হইবে? হাঁ, ৫ই আশ্বিন দিন স্থির। শুভ লক্ষণে বিবাহ হইয়া গেল। যেখানে দেখা গেল, সকল লোকেই এই কার্য্যে সুখ্যাতি করে, সাধক অমনি বুঝিলেন, এ কার্য্য

মন্দ কার্য্য, করা হইবে না। আকাশের দিকে তাকাইয়া বুঝা গেল, এ একটু ভাল কার্য্য, ধনাঢ্য পণ্ডিত ভাল লোকে পাগল বলিতেছে, বিপক্ষ হইয়াছে; স্থির হইল, ইহা করিতেই হইবে। এ কার্য্য করিলে সবাই নিন্দা করিবে, আপনার লোকে ছাড়িয়া যাইবে, শরীর মন বুদ্ধি ক্ষীণ হইবে; যাই এইরূপ দেখিলাম, মন্ বলিল, ঠিক হইয়াছে, এই কার্য্য করা উচিত। পৃথিবীর যাতে শত্রুতা হয়, ঈশ্বরের তাতেই মিত্রতা হয়। বার জন লোকে যা করে, বার লক্ষ জনে তাহা পারে না। করিতে গেলেই মন্দ হয়। এই জন্য চেষ্টা করি, লোক যাহাতে অল্প থাকে। লোক বাড়ান ঈশ্বরের আজ্ঞাবিরুদ্ধ। অল্প লোকেই স্তম্ভস্বরূপ হইয়া মাথায় করিয়া ধর্ম্মসমাজ রক্ষা করিবে। দুর্জ্জয় দ্বাদশ ধরাতলে জয়ী হইল। এখনও এত লোক! আশাপথে এত লোক! আরও শক্ত সাধন প্রবর্ত্তিত হইল। শাণিত ক্ষুরধারের ন্যায় স্থানে দণ্ডায়মান হইয়া ধর্ম্ম স্থাপন কর। লক্ষ টাকা পায়ের নীচে রাখিয়া তবে তুমি দয়াব্রত স্থাপন করিবে? না, না। দয়াব্রত স্থাপন কর, কাপড় ছিঁড়িয়া একটি সূতা হাঁতে করিয়া বল, আয় আয় টাকা আয়। পর দিন সকালে সূর্য্যের মুখ হইতে, যত প্রয়োজন ঈশ্বর দিবেন। আমার কিছুই নাই। হরির টাকা না পাইলে সাহস হয় না। ঈশ্বরের ইশারা বুঝিয়া এ প্রণালীতে কার্য্য করিতে হয়।”

এই সব বাক্য অবিশ্বাসীর নিকট অযৌক্তিক কল্পনা,

কুসংস্কারাপন্ন; অন্ধবিশ্বাসীর নিকট অদ্ভুত ক্রিয়া বলিয়া প্রতীয়-মান হয়। ইহার বাক্যার্থ কেবল গ্রহণ করিলে সিদ্ধান্ত হইবে, কেশবচন্দ্র লোকবৃদ্ধি করা এবং সংসারনির্ব্বাহের বিষয়ে অর্থ চেষ্টা করাকে পাপ মনে করিতেন। বাস্তবিক তাহা নহে। টাকার বিষয় তিনি ভাবিতেন, লোকসংগ্রহের জন্যও প্রাণপণে চেষ্টা করিতেন, ইহাতে কোন প্রকৃতিবিরুদ্ধ অলৌকিক ক্রিয়া ছিল না। বিশ্বাস ভক্তিতে স্বভাবের অব্যভিচারে যে সকল অদ্ভুত কার্য্য হয়, তাহাই এখানে বুঝিতে হইবে। ঈশা চৈতন্য এবং মুসার বিষয়ে যে সকল কল্পিত অলৌকিক কথা প্রচলিত আছে, তাহার সঙ্গে কেশবের কথাকে কেহ যেন এক শ্রেণীতে ভুক্ত না করেন। তাঁহার চক্ষে স্বভাবের কার্য্যই অলৌকিক দৈবকার্য্যরূপে প্রতীয়মান হইত।

তাঁহার নিজের সম্বন্ধে কিংবা দলের পৌরোহিত্য আধিপত্য বিষয়ে তিনি বড় সাবধান ছিলেন। ঈশা সম্বন্ধীয় যে প্রার্থনা করিয়াছেন, তাহা বুঝিতে পারিলেই তাঁহার প্রতি ব্যবহার স্থির হইয়া যায়। কেশবের ভাষা, কি বাহ্য ব্যবহার যেমন কেশব নয়, তেমনি তাঁহার আসন টুপি গৈরিক বসন বেদী কেশব নহে। বাহ্য চিহ্নকে তিনি পৌত্তলিকতা বলিতেন। মন্দিরের বেদীতে পৌরোহিত্যের একাধিপত্য না হয়, তজ্জন্য তাহাতে বিষয়ী গৃহস্থ ব্রাহ্মদিগকে বসাইয়া সে পথ বন্ধ করিয়া গিয়াছেন। মন্দিরের নিয়মপত্রে লিখিত আছে, "কোন খোদিত বা চিত্রিত প্রতিমূর্ত্তি, অথবা কোন বাহ্যিক চিহ্ন যাহা ব্যক্তি-

বিশেষের ঘটনা স্মরণার্থ ব্যবহৃত হইয়াছে বা হইবে, তাহা এখানে রক্ষিত হইবে না।”

সমন্বয় এবং জয়

সামঞ্জস্য ও মিলনই কেশবচন্দ্রের জীবন। এক বিচিত্র ধর্ম্মযন্ত্র বিধাতা সৃষ্টি কাল হইতে মনুষ্যকে দিয়া রাখিয়াছিলেন; কিন্তু সে সুন্দর বীণা-যন্ত্রটি কেহ মিলাইয়া এত দিন বাজাইতে পারে নাই। এক সঙ্গে তাহা বাজে না মনে করিয়া, পৃথিবীর লোকে তাহাকে ভাগ ভাগ করিয়া ফেলিয়াছিল। দার্শনিক এবং বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণ তাহাকে আরও ছিন্ন ভিন্ন করেন। এক একটি তার কেহ কেহ বাজাইয়াছেন, কিন্তু সব গুলি এক সঙ্গে কেহ বাজাইতে চেষ্টাও করেন নাই। তাই সে যন্ত্র জগতের এক কোণে ধূলিমাখা হইয়া পড়িয়াছিল। কেশবচন্দ্র সেটীকে খুঁজিয়া বাহির করিলেন, তারগুলি মাজিলেন, তাহাদের কাণ মলিলেন, শেষ বিশ বৎসর পরিশ্রমের পর সে এমনি ঝঙ্কার করিয়া উঠিল যে, তাহা শ্রবণে তিনিও হাসিলেন, পরমগুণাকর যন্ত্রী হরিও হাসিলেন। অতঃপর উভয়ে মিলিয়া তাহার সঙ্গে ধর্ম্মসমন্বয়ের মহামিলনসঙ্গীত গাহিলেন, শ্রবণে দেব মানব সবাকার হৃদয় উল্লসিত হইল। এখন অনেকে ইহা কিছু কিছু বাজাইতে শিখিতেছে।

প্রথমে কিছু দিন পর্য্যন্ত কেশবের হাতেও ইহা সমস্বরে বাজে নাই, স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ভাবে টুং টাং করিত। তাই তিনি

বলিয়াছেন, "সংযোগ বিয়োগ এক সময়ে দুই ভাবের সামঞ্জস্য হইল, এরূপ বলা যায় না। সাধারণ মানবমণ্ডলীর ন্যায় আমিও প্রথমে আংশিক দর্শনের পক্ষপাতী ছিলাম। এক একটি করিয়া বুঝিব, এই ইচ্ছাই বলবতী ছিল। যখন এক একটি অভাব মোচন হইতে লাগিল, তখন দেখি, প্রকৃতির আশ্চর্য্য কৌশল। আংশিক ধর্ম্ম ছাড়িয়া হৃদয় এখন পূর্ণতার দিকে গিয়াছে। মহর্ষি ঈশা বলিয়াছেন, 'ঈশ্বরের মত পূর্ণ হও', বহু দিন হইতে স্বর্ণাক্ষরে এই উপদেশ মনে লেখা ছিল। এক জনকে ভাল বাসিয়া আর এক জনকে কম ভাল বাসিলে মনে হয়, উনি কি মনে করিবেন? দুই বাদ্যযন্ত্র বাজিয়া উঠিল। সমুদায় যন্ত্র মিশিয়া এক যন্ত্র হইল। বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্রের স্বর মিলিয়া এক সুমিষ্ট স্বর উৎপন্ন হইল। বাল্য-কালে চলিয়াছি, যৌবনে ভ্রমণ করিয়াছি, মৃত্যুর পরেও দৌড়িতে হইবে। নববিধানের পূর্ণতা হইবে।"

তাঁহার চরিত্রের গুণের যে তালিকা দিলাম, তাহাতে সমস্ত নিঃশেষিত হইল কি না জানি না। বোধ হয়, হইল না। এক্ষণে ঐ সমস্ত এক পাত্রে সংগ্রহ কর, উহাকে পবিত্রাত্মার উত্তাপে রাখ, দেখিবে কি অদ্ভুত রাসায়নিক ক্রিয়া সমুৎপন্ন হয়। কেশবপ্রচারিত ধর্ম্মসমন্বয় যান্ত্রিক একতা নহে, ইহা রাসায়নিক মিশ্রণ। তাঁহার প্রশস্ত হৃদয়াধারে সমস্তগুলির সমাবেশ হইয়াছিল। নববিধানরূপ মহাদ্রাবকের দ্বারা তাহা এমনি মিশিয়া গিয়াছিল যে, শোণিতের ন্যায় তাহা একাকার

হইয়া যায়। তরল ও কঠিন, তিক্ত ও মধুর, অম্ল, কটু ও কষায়, শীতল ও উষ্ণ বিবিধ খাদ্য দ্রব্য পাকস্থালীর মধ্যে পড়িয়া জঠরাগ্নির উত্তাপে যেমন পরিপক্ক হয়, এবং ক্রমে তাহার দূষিত ক্লেদাংশ বাহির হইয়া যায়, পরে তদুৎপন্ন বিশুদ্ধ শোণিতরাশি শরীরের সর্ব্বাঙ্গে শিরা ধমনী স্নায়ু মস্তিষ্কের ভিতরে আপনি ছড়াইয়া পড়ে, এবং পরিণামে সেই শোণিত অস্থি মজ্জা মেদ মাংসপেশীরূপে পরিণত হয়; কেশব-চরিত্রে তেমনি ঐ সকল ধর্ম্মোপাদানের মিশ্রণে এক আশ্চর্য্য পবিত্র শোণিত উৎপন্ন হইল, তাহাই শেষ যোগ বৈরাগ্য প্রেম ভক্তি বিশ্বাস জ্ঞান পুণ্য বিনয় সাহস দয়া নীতি সাধুকর্ম্মের আকার ধারণ করিয়াছিল। শোণিত বিশুদ্ধ থাকিলে সহজেই স্বাস্থ্য লাবণ্য তেজ বীর্য্যে শরীর এক সর্ব্বাঙ্গসুন্দর মূর্ত্তি পরিগ্রহ করে। কেশবের সমস্ত ধর্ম্মাঙ্গ তেমনি সাধু মহাত্মাগণের শোণিতে সুন্দর হইয়াছিল। আবার তাঁহার হৃদয়ের হিতৈষণাশোণিত বর্ত্তমান ও ভাবী বংশের শিরার মধ্যে এখন প্রবাহিত হইতে চলিল। পৃথক পৃথক রূপে তাঁহার যে সকল গুণ বর্ণনা করিলাম, তাহার প্রত্যেক গুণ অপর গুণের সহিত সম্মিলিত। এই জন্য আমরা তাঁহার জীবনে পরস্পরবিপরীত গুণের সামঞ্জস্য দেখিতে পাইয়াছি। ঈশ্বরের সৃষ্টিতে যে কোন সত্য কোন সত্যের বিরোধী নয়, তাহা এই জীবনে প্রকাশ পাইয়াছে। যদি কেহ জিজ্ঞাসা করেন, কেশব কি? আমরা উত্তর দিব, তিনি সামঞ্জস্য।

যোগের সহিত ভক্তি এবং কর্ম্ম, কার্য্যের সহিত যোগ সমাধি ধ্যান, সভ্যতা এবং গার্হস্থ্য ধর্ম্মের সহিত বৈরাগ্য, শান্তির সহিত উদ্যম, বিনয়ের সহিত মহত্ত্ব, প্রেমের সহিত পুণ্য, দেশীয় ভাবের সহিত বিদেশীয় সভ্যতা, অদ্বৈতবাদের সহিত দ্বৈতবাদ এই সকল পরস্পরবিপরীত গুণের মিলন তাঁহাতে হইয়াছিল। পৃথিবীতে স্বর্গ, নরলোকে অমরধাম, নূতনে পুরাতন, বিচ্ছেদে মিলন, বৈষম্যে সাম্য, ইহকালে পরকাল, বর্ত্তমানে ভূত ভবিষ্যৎ, স্বদেশে বিদেশ দেখিয়া, যাবতীয় দূরত্ব ভেদাভেদ ব্যবধান উচ্চ নীচ সমতল এবং একাকার করিয়া, তিনি আপনাকে সেতুস্বরূপ করিলেন। কেশবসেতুর উপর দিয়া স্বর্গের লোক মর্ত্ত্যে এবং মর্ত্ত্যের লোক স্বর্গে যাতায়াত করিবে। ইহা ধর্ম্মবিজ্ঞানের শেষ মীমাংসা এবং ইহারই জন্য কেশবচন্দ্রের অবতরণ। যাহারা কখন পাঁচ খানি বাদ্যযন্ত্র এক সুর লয় তানে মিলাইয়া সঙ্গীতরসে মজিয়াছে, বিচ্ছেদের মধ্যে মিলন দেখিয়া হাসিয়াছে, বহু পরিশ্রম ও মস্তিষ্ক আলোড়নের পর গণিতের কঠিন প্রতিজ্ঞা মীমাংসা করিয়া এবং হিসাবের ভুল ধরিয়া আরাম পাইয়াছে, যাঁহারা বদ্ধভাবের মধ্য হইতে বাহির হইয়া প্রমুক্ত বায়ু সেবন করিয়াছে, এবং অশান্তি বিবাদ সংগ্রামের রাজ্য হইতে শান্তির আলয়ে পৌঁছিয়াছে, তাহারাই এই বিধান-সঙ্গীত গান করিবে। কেশবচন্দ্রের হৃদয়বৃন্দাবন ভগবানের পুরুষ প্রকৃতি উভয় স্বভাবের যুগলমিলনের স্থান। এই শুভসম্মিলন দর্শনে বেদ বাইবেল কোরাণ পুরাণ ললিত-

বিস্তর গীতা ভাগবত জেন্দাভেস্তা হরিগুণ গান করিল, সেই গানে মত্ত হইয়া ঈশা চৈতন্য দাউদ জনক নারদ শিব শুক যাজ্ঞবল্ক্য ধ্রুব প্রহ্লাদ নানক কবীর জন্ পল্ লুথর সক্রেটিশ রাম কৃষ্ণ শঙ্করাচার্য্য শাক্য কনফুস্ যোরোয়েস্তর সকলে গলাধরাধরি করিয়া নাচিলেন, গার্গী সীতা সতী মৈত্রেয়ী সাবিত্রী প্রভৃতি দেবকন্যাগণ শাঁক্ বাজাইলেন, পৃথিবীর হিন্দু মুসলমান খ্রীষ্টান বৌদ্ধ নর নারী তাহার সঙ্গে যোগ দান করিল, অনন্ত চিদাকাশে নববিধানের বিজয় নিশান উড়িল, দয়াময় বিধান-বিধাতার মঙ্গল ইচ্ছা পূর্ণ হইল।

জীবনের অভ্যন্তরে যেমন সমন্বয়, বাহিরে তেমনি জয়লাভ। এই মহাব্রতে জয়ী হইয়া কেশবচন্দ্র আহ্লাদিতমনে বলিতেছেন, "পরের কথায় বিশ্বাস করিয়া ইহাতে প্রবৃত্ত হইলাম না; যাহা আপনার নয়, তাহা আপনার বলিলাম না। জীবনের সুপ্রভাতে বিধাতা বলিয়া দিলেন, তিনি নগদ দেন, ধারে দেন না। এখন সত্যসূর্য্যের দিকে তাকাইয়া, সত্য অগ্নির মধ্যে হাত রাখিয়া বলা যায়, যাহা পাইবার পাইয়াছি, যাহা দেখাইবার তাহা দেখাইয়াছি। জন্মের পর যার জন্যে ঈশ্বর অবিনশ্বর অক্ষরে 'জয়লাভ' লিখিয়া দিয়াছেন, তাহার জয়লাভ কে খণ্ডন করিতে পারে? তাঁহার প্রেমের ভূরি ভূরি নিদর্শন দেখিয়াছি। চারিদিকে আমাদের এক শত দুই শত কীর্ত্তিস্তম্ভ স্থাপিত হইল।"

নববিধানে ঈশ্বরের ইচ্ছা পূর্ণ হইল, হরিভক্ত কেশবচন্দ্র

ধর্ম্মযুদ্ধে জয়লাভ করিলেন, আমার কার্য্যও ফুরাইল; এক্ষণে উপসংহার করিয়া বিদায় হই।

অনেকে ধর্ম্ম করে এবং করিয়া গিয়াছে, কেশবচন্দ্র ধর্ম্ম হইয়া গিয়াছেন। এরূপ ফলবান্ জীবন অতি বিরল। এক জীবনে কত কাজই তিনি করিয়া গেলেন! আশানুরূপ মণ্ডলী গঠন না হওয়াতে যদিও নিরাশার সহিত বলিয়াছেন, "আমার ধর্ম্ম আর রহিল না, আমাকে তোমরা বিদায় করিয়া দিলে, কেবল পুস্তক কয়েক খণ্ডে আমার ধর্ম্ম থাকিল; ইহা দেখিয়া আমার ধর্ম্ম লোকে বুঝিতে পারিবে।" কিন্তু তাঁহার যে জয়লাভ হইয়াছে, তাহা তিনি অপর স্থানে স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। কেশবচন্দ্র অনেকগুলি নূতন সত্য এবং সাধু কার্য্যের প্রবর্ত্তক, এবং সুবহু সৎ কার্য্যের উত্তেজক। কার্য্যকারণের দুষ্প্রবেশ্য গতির মধ্যে যাঁহারা প্রবেশ করিতে পারেন, তাঁহারা এদেশের বিবিধ সদনুষ্ঠানের ভিতরে কেশবশোণিত দেখিতে পাইবেন। তাঁহার উপদেশ মত বিশ্বাস এবং কীর্ত্তিকলাপের বিস্তারিত বিবরণ আমি দিতে পারিলাম না, অনেক পুস্তকে তাহা পাওয়া যাইবে; কেবল গুটিকতক নূতন সত্য এবং সদ্দৃষ্টান্তের তালিকা নিম্নে প্রকাশ করা গেল :—

(১) সহজজ্ঞান সকল তত্ত্বের মূল। (২) ব্রহ্মদর্শন ও শ্রবণে সাধারণের অধিকার। (৩) সর্ব্বশাস্ত্র, সমস্ত সাধু এবং সমস্ত সাধু কার্য্যের একতা মিলন। (৪) নিরাকারে প্রেম ভক্তি মত্ততা। (৫) জ্ঞান ভক্তি যোগ কর্ম্মের

সামঞ্জস্য। (৬) সংসারে বৈরাগ্য সভ্যতা। (৭) হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্ম্মের সহিত খৃষ্ট ধর্ম্মের মিলন। (৮) অখণ্ড সচ্চিদানন্দ ঈশ্বরের ভিতরে দেব দেবী এবং দেশ বিদেশস্থ সাধুদিগকে দর্শন। (৯) ইহ পরকালের একত্ব।

আচার্য্য কেশবের প্রচারিত এবং আচরিত যোগ বৈরাগ্য ভক্তির ব্যবহার প্রাচীন কালের সহিত এক নহে। তাঁহার সমস্তই মিশ্রযোগে রচিত এবং নবীভূত। সামঞ্জস্যের ধর্ম্ম হইলে যাহা প্রয়েজন, তাহা এই সকলেতে বর্ত্তমান ছিল।

কার্য্যের দৃষ্টান্ত ঃ—(১) প্রাত্যহিক উপাসনা এবং সাধন ভজন, (২) পাপত্যাগের জন্য অনুতাপ ও প্রার্থনা, (৩) মৃদঙ্গ করতালের সহিত চিদানন্দ হরির সংকীর্ত্তন, (৪) নিরামিষ ভোজন ও শুদ্ধাচার, (৫) মাদকসেবন, জাতিভেদ, পৌত্তলিকতা ও বাল্যবিবাহের উচ্ছেদ, (৬) বিবাহের রাজবিধি ও সঙ্কর বিবাহ, (৭) ধর্ম্মপ্রচার, (৮) প্রচার আফিস, (৯) প্রচারকদল, (১০) ব্রহ্মবিদ্যালয়, (১১) ভারত-আশ্রম, (১২) মঙ্গলপাড়া, (১৩) স্ত্রীবিদ্যালয়, (১৪) ব্রাহ্মিকাসমাজ, (১৫) ব্রাহ্মনিকেতন, (১৬) ব্রহ্মমন্দির, (১৭) আলবার্ট হল, (১৮) ইণ্ডিয়াক্লাব, (১৯) আনন্দবাজার স্থাপন, (২০) এক পয়সা মূল্যের সংবাদপত্র, (২১) দৈনিক ইংরাজি কাগজ, (২২) ভারতসংস্কার সভা, (২৩) সাধনকানন, (২৪) ইংরাজি ও বাঙ্গালা বক্তৃতা, (২৫) সহজ বাঙ্গালা ভাষা বিস্তার, (২৬) ধর্ম্মবিজ্ঞান প্রচার, (২৭) সমস্ত দিন উৎসব, (২৮) নববৃন্দাবন নাটক ইত্যাদি।

ইহা ব্যতীত বাঙ্গালা ইংরাজি ক্ষুদ্র বৃহৎ কতকগুলি পুস্তক, একটী বড় পরিবার, একদল সাধক, এক দল প্রচারক, এক দল আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্ম তাঁহার মহৎ কার্য্যের সাক্ষী হইয়া রহিয়াছেন। তিনি যেমন ইহাঁদিগকে রাখিয়া গিয়াছেন, তেমনি ইহাঁরা যদি ভবিষ্যৎ বংশের মধ্যে কতকগুলি ধর্ম্মাত্মা উৎপাদন করিয়া যাইতে পারেন, তবে ধারাবাহিক-রূপে কেশবচন্দ্রের কমনীয় স্নিগ্ধ রশ্মি পুরুষানুক্রমে দেশ দেশান্তরে বিকীর্ণ হইয়া পড়িবে। কেশবের সঞ্চিত ধর্ম্ম-সম্পত্তি এখন পৃথিবী মনের সাধে উপভোগ করুক। প্রকাণ্ড এক আধ্যাত্মিক নূতন রাজ্য তিনি খুলিয়া দিয় গিয়াছেন। বর্ত্তমান যুগে এই মহাপুরুষের জীবনচরিত আমাদের অনেক বিষয়ে সাহায্য করিয়াছে এবং যুগ যুগান্তরে, দেশ দেশান্তরে অনন্ত ভবিষ্যতের লোকদিগকে বিপুল সাহায্য প্রদান করিবে। ভক্তবৎসল ভগবান্ তাঁহার সাধু পুত্রের সুচরিত্র দ্বারা সাধারণ মানবমণ্ডলীর এবং দুঃখী বঙ্গবাসীর গৌরব ও কল্যাণ বর্দ্ধন করুন। ধন্য বঙ্গদেশ! যে সে এমন লোকগুরু ধর্ম্মাচার্য্যকে বক্ষে ধরিয়াছিল। ধন্য ঊনবিংশ শতাব্দী! যে সে এমন পবিত্র সন্তানকে দেখিল। পিতা দীনবন্ধু আমার দেশস্থ নরনারীদিগকে পবিত্র কেশবচরিত্রের আদর্শে সংগঠিত করুন।

[সমাপ্ত।]